কিরীটী অমনিবাস

একাদশ খণ্ড

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

KIRITI OMNIBUS Vol. XI
Collection of Detective Stories & Novels
by Niharranjan Gupta
Published by Amar Sahitya Prakashan
7 Tamer Lane, Calcutta ৯

নভেম্বর, ১৯৬০

•

প্রকাশক :
এন. চক্রবর্ত্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : •
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট •
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

আদি কাল থেকেই মানুষ গল্প শুনে আসছে। মানুষের জীবিকার সঙ্গে গল্পের অবিচ্ছেদ্য যোগ। মানুষের কর্মে সাফল্যে এবং বিফলতায় গল্পের উদ্ভব এবং তার জয়যাত্রা। কৌতূহলের তৃপ্তি খুঁজেছে মানুষ গল্পে। গল্পকারের লক্ষ্য ছিল ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে এই কৌতূহল সঞ্চয় করা এবং ধীরে ধীরে তাকে পরিণামমুখী করে তোলা। এই গল্পের রাজ্যে বিচরণ করে আমরা আনন্দ পাই; কখনও বা জ্বালাতাপ মোচনের তৃপ্তিও আসে গল্পপাঠের সাহায্যে।

এই গল্পের একটি শাখা ডিটেকটিভ গল্প। ডিটেকটিভ গল্প যদি শিল্পসার্থক হয় তবে তার মধ্যে গল্পের শিল্পরূপের মৌল উপাদানগুলি নিশ্চয়ই পাব। কিন্তু অন্যান্য গল্পগুচ্ছ থেকে ডিটেকটিভ গল্পের প্রধান পার্থক্য বিষয়বস্তুতে। ডিটেকটিভ গল্পের কাঠামো গঠিত হয় কোনো অপরাধমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে। আর এই বিশিষ্ট বিষয়ের জন্যই বর্ণনা-বিবৃতি-স্থান-কাল-পাত্র ডিটেকটিভ গল্পে উপস্থাপিত হয় স্বতন্ত্র ভাবে।

ভাবতে অবাক লাগে এত বিধিবিধান সত্ত্বেও অপরাধকে নির্মূল করা সম্ভব হয়-নি। মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চা যেমন অব্যাহত গতিতে চলেছে তেমনি অপরাধ এবং অপরাধপ্রবণতাও কালে কালে নানা রঙে নানা বেশে আবির্ভূত হয়েছে। আবার এই সম্বন্ধেও আমাদের ধারণার কত পরিবর্তন কালে কালে ঘটেছে এবং ঘটছে। এককালে যা ছিল অপরাধ কালান্তরে তাই হয়ত সভ্যসমাজের আচরণীয় বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকেরা সে-সব বিষয় নিয়ে করেছেন এবং করছেন। গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক অপরাধকে মানুষেরই এক বিশেষ মানসিকতার প্রকাশ রূপে দেখলেন। আর যেহেতু সাহিত্যে মানুষই অন্বিষ্ট সেহেতু এই জাতীয় গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে মানুষের বিরাগ অপেক্ষা অনুরাগই প্রত্যাশিত। মানুষ আগ্রহে এই গল্প-উপন্যাসকে গ্রহণ করেছে। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে অপরাধের বিশ্লেষণ নেই কিন্তু অপরাধীর শাস্তিবিধানের উল্লেখ আছে। বিচিত্র অপরাধের বিচিত্র শাস্তির ব্যবস্থা থেকে আমরা অন্তত এইটুকু বুঝি যে সেকালে অপরাধী বুদ্ধিমান ছিল এবং স্মৃতির শাসনকে ফাঁকি দিয়ে চোর তার কার্যসিদ্ধি করে গেছে। স্মৃতিগ্রন্থ এইটি প্রমাণ করে যে সেকালে অপরাধীর সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু এসব অপরাধ নিয়ে কি সেকালে গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে? সম্ভবত হয়েছে। তাদের সন্ধান

পাব সেকালের লোককথায় যা কালবাহিত হয়ে একালে এসে পৌঁছেছে। শেয়াল পণ্ডিতের ধূর্ততা এবং তার জালিয়াতি ধরবার জন্য অন্যান্য প্রাণীদের বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। ডিটেকটিভের মতই তারা অগ্রসর হয়েছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে সিঁধেল চোরের সন্ধান পাই। জ্যোতিরীশ্বরের ধূর্ত সমাগম নাটকটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে অপরাধ এবং অপরাধপ্রবণতা সমাজে চিরকালই নিন্দনীয় ছিল। একালেও তাই। সুতরাং এ-বিষয়ে গল্প-উপন্যাস-রচনা করে সাফল্যলাভ দুরূহ ব্যাপার ছিল। যদিও বা গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে সেগুলির মূল্যায়ন করতে সমালোচকবৃন্দের অনীহাই লক্ষ্য করা গেছে। এ-সাহিত্যকে আমরা কিছুটা অপাংক্তেয় করে রেখেছি। অথচ সুযোগ এবং সময় পেলে ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাস পড়তে আমরা বিশেষ আগ্রহ বোধ করি। এ ব্যাপারে আমাদের আচরণে এবং তার প্রকাশে একটা ব্যবধান আছে। ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের আলোচনায় কোথায় যেন আমাদের কুণ্ঠা আছে। মনোবিজ্ঞানী বলবেন এও এক জাতীয় অপরাধবোধ।

* * *

যথার্থ ডিটেকটিভ গল্পের উদ্ভব এডগার অ্যালেন পো'র রচনায়। কিন্তু তাঁর গল্পের পাঠক খুব বেশী তিনি পাননি। কিছুকালের মধ্যেই পো রহস্যগল্প লেখা ছেড়ে দিলেন। পো'র রচনাকর্মেই ডিটেকটিভ গল্পের মৌলিক উপাদানটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আমরা জানি অপরাধীকে ধরবার জন্য প্রত্যেক দেশেই বিরাট পুলিসবাহিনী থাকে। এরা জানে অপরাধী অপরাধ করবার সময় কোনোরূপ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেয় না। বেশ পূর্বপরিকল্পনা প্রসূত তাদের উদ্যোগ আয়োজন। পুলিসের নানা কৌশল উদ্ভাবন সত্ত্বেও প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে না। শার্লক হোমস সম্বন্ধে ওয়াটসনের মন্তব্য এইরকম, He was still, as ever, deeply attracked by the study of crime, and occupied his immense faculties and extraordinary powers of observation in following out those clues and clearing up those mysteries, which had been abandoned as hopeless by the official police.* পুলিসের শত চেষ্টাতেও অনেক হত্যার রহস্য অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। এখানে

* A. C. Conan Doyle. A Scandal in Bohemia

অপরাধীর সূক্ষ্ম কৌশলের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কোন ব্যক্তি অপরাধীর মুখোস খুলে দিতে সমর্থ হয়। কিছুকালের মধ্যেই এই সব বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিল। আবির্ভাব ঘটল ডিটেকটিভের। পুলিসের তদন্তের ভুলের জন্য এমনও দেখা গেছে যে দোষী সাজা না পেয়ে নির্দোষকে সাজা পেতে হয়েছে। প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন এবং দোষীর শাস্তি-বিধানের জন্যই এই ডিটেকটিভদের আদর হতে লাগল। ডিটেকটিভবৃন্দ কিছুকালের মধ্যেই সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপার উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। ডিটেকটিভের কর্মে আমরা আমাদেরই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হতে দেখি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ডিটেকটিভকে বলেছেন সত্যান্বেষী। পুলিসও অনেক সময় এঁদের সাহায্য পেলে খুশী হন। এমনও দেখা গেছে পুলিসে-ডিটেকটিভে অসম প্রতিযোগিতা চলছে অপরাধ নির্ণয়ে। পো'র The purloined letter গল্পটিতে দেখি পুলিস অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে কী বিপুল পরিশ্রম করছে! একটা রহস্যজনক চিঠির খোঁজে সমস্ত বাড়ি প্রায় খোঁড়া হল, সে বাড়ির আসবাবপত্রগুলির প্রতি ইঞ্চি পরীক্ষা করা হল। কিন্তু সে চিঠির কোনো সন্ধান মিলল না। বিপুল পরিশ্রমের এই ব্যর্থতা প্রদর্শন পো দেখালেন। এলেন তাঁর ডিটেকটিভ Dupin. তিনি পুলিসের পথ ধরলেন না। Dupin কৌশলে পত্রটি আবিষ্কার করলেন। পুলিসের কাজে পরিশ্রম আছে কিন্তু বুদ্ধির অভাব সেখানে প্রকট। ডিটেকটিভের বুদ্ধি এবং পরিশ্রম দুই-ই আছে। এজন্য ডিটেকটিভের আসন উঁচুতে। লক্ষণীয় অধিকাংশ ডিটেকটিভ গল্পে পুলিসের এই ব্যর্থতার চিত্র দেখানো হয়। জানি না পুলিসের সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা আছে তা থেকেই এর উদ্ভব কিনা। যারা আমাদের রক্ষক যে-কোনো কারণেই হোক তাদের সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব একতরফা নয়। আমরা পুলিসকেও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখি। ডিটেকটিভ গল্পের লেখক সাধারণের এই সংশয় প্রবণতার উপর ভর করে ডিটেকটিভকে দিয়ে তার অভিপ্রেত উদ্দেশ্যটিকে আদায় করে নেন।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের বইতে আমরা হত্যারহস্য সন্ধানে কিরীটীর সঙ্গে পুলিসকেও দেখতে পাই। এখানে তিনি পুলিসের ভূমিকাকে বিশদ করেননি। নীলকুঠি উপন্যাসে অবশ্য পুলিসের ভূমিকা বিস্তৃত। সে যাই হোক অন্যান্য রচনাগুলিতে পুলিসও তাদের প্রাথমিক কর্তব্যটুকু শেষ করে কিরীটীর উপর দায়িত্ব অর্পন করে নিশ্চিন্ত। আমরা পুলিসকে দেখতে পাই বিভিন্ন

ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণেই তারা ব্যস্ত। এ জবানবন্দি যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ হয় সেদিকেই পুলিস কর্তৃপক্ষের কড়া নজর। কিরীটীও জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু দু-পক্ষের জিজ্ঞাসার মধ্যে কত তফাত। এক পক্ষের কাজ যেন রুটিন অনুসরণ। অন্য জনের জিজ্ঞাসায় রুটিন অনুসরণ আছে নিশ্চয়ই কিন্তু তিনি অবস্থা অনুযায়ী তাঁর প্রশ্নবান এমন ভাবে নিক্ষেপ করেন যাতে সকলেই তাদের গোপনতম প্রদেশে আঘাত পায়। সে আঘাতে বরফ গলে এবং সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। অনেক সময়েই হত্যাকারী চতুরভাবে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে গা ঢাকা দেয়। যাদের উপর দোষ চাপানো হয় তারা খানিকটা ভয়ে খানিকটা স্বভাব-দুর্বলতার বশে অসহায় হয়ে পড়ে। তখন এ মানুষগুলি যা বলে ভুল বলে, অনেক সময় মিথ্যাও বলে। মিথ্যা লুকোতে গিয়ে নূতন করে মিথ্যা বলে। ডিটেকটিভের এখানে কঠিন পরীক্ষা। হীরকাঙ্গুরীয় গল্পে মোক্তিকে হত্যাকারী বলে পাঠকের মনে হতে থাকে, নাসির হোসেনও সন্দেহের বাইরে পড়ে না। কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু এদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে একসময়ে অব্যর্থভাবে প্রকৃত হত্যাকারীকে স্পর্শ করে। অহল্যা ঘুম গল্পে বিয়ের রাতে হত্যা ব্যাপারে পুলিস যখন জিজ্ঞাসাবাদ নিয়েই ব্যস্ত তখন কিরীটী দোতালার নক্সা অনুধাবনে তৎপর এবং বাথরুমে ছোটখাটো কিছু পড়ে আছে কিনা সেদিকে তার শ্যেন দৃষ্টি। ডিটেকটিভ পুলিস কর্তৃক উপেক্ষিত এমন কোনো তুচ্ছ বস্তু থেকে গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হন। ইউরোপে ভ্রমণকারী একজন নিহত জাপানীর দেহ যখন সনাক্তকরণের বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন আকস্মিকভাবে একজনের বুদ্ধিতে নিহত জাপানীর প্যান্টের ধোপার বাড়ির চিহ্নের সাহায্যে সমস্ত ঘটনাটির রহস্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ডিটেকটিভের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সতর্কতা এবং সন্দেহপরায়ণতা অপরাধের রহস্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়। অতএব ডিটেকটিভ একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে আমাদের প্রশংসাভাজন হন। এডগার অ্যালেন পো'র গল্প লেখার আগেই ডিটেকটিভ বৃত্তির সূচনা হয়েছিল কিন্তু পো'র গল্পই ডিটেকটিভের দায়িত্ব এবং তার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে পুলিস বিভাগও এ সম্বন্ধে এখন সচেতন। পুলিসের একটি বিভাগ এখন বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে যার নাম ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। এরই সঙ্গে যুক্ত করা যায় সরকারের ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু এত সত্ত্বেও সখের ডিটেকটিভদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব আমাদের যেন একটু বেশী টানে। এই স্বাতন্ত্র্যে এরা উজ্জ্বল এবং এই স্বাধীনতা আছে বলেই এদের ব্যক্তিত্ব প্রখর এবং তীক্ষ্ণ।

আসলে হত্যাকারী সম্বন্ধেই আমাদের ধারণার বদল হয়েছে। হত্যাকারী বোধ নয়; গোঁয়ার-গোবিন্দ নয়। সে জগদীশ গুপ্তের বেণী* নয় যে মুণ্ডচ্ছেদ করে ই মুণ্ডু নিয়ে থানায় হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে। ডিটেকটিভ উপন্যাসে এবং গুবেও অনেক সময় আমরা দেখি হত্যাকারী অথবা অপরাধী রীতিমত শিক্ষিত ব্যক্তি। ডিটেকটিভের যেমন সন্ধানী দৃষ্টি রয়েছে তেমনি হত্যাকারীও সমস্ত সাক্ষ্য-লোপাট করার জন্য আটঘাট বেঁধে কাজে অগ্রসর হন। হত্যাকারী যে কত বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করে তার প্রমাণ মিলবে অহল্যা ঘুমে। সব গল্পেই অবশ্য মিলবে। এখন গল্প-উপন্যাস ছেড়ে অসংখ্য বাস্তব উদাহরণের মধ্যে একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করি। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদ :†

[দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে উড়ে, সেরা হোটেলে ভোগ-বিলাস ও আনন্দ উচ্ছ্বাসে এক বছরেরও বেশি বেশ কেটেছিল ওদের। কিন্তু সেই মদিরায় মাতোয়ারা দিনগুলি সুখস্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে, সেও প্রায় বছর দেড়েক আগে। এখন তাদের দিন কাটছে দিল্লির তিহার জেলে, শৃঙ্খলিত অবস্থায়। ** আপাতত যে অভিযোগের বিচার চলছে তা হল—১৯৭৬ সালের জুন মাসে লুক সলোমান নামে এক তরুণ ফরাসী পর্যটককে ওরা নেশায় অচৈতন্য করে হত্যা করে এবং তার সর্বস্ব অপহরণ করে। কিন্তু ইন্টারপোল ও ভারতীয় পুলিসের ধারণা এমন অপরাধ ভারতে অন্তত আটটি, তাইল্যাণ্ডে পাঁচটি এবং নেপালে দুটি সংঘটিত হয়েছে। ** অভিযুক্ত তিনজনের নাম চার্লস গুরুমুখ সোভরাজ (৩৩), মিস মেরী আঁদ্রে লেসির্ক (৩২) ও জাঁ হুইসমে (৩৪)। ভারতীয় পিতা ও ভিয়েৎনামী মায়ের সন্তান সোভরাজ একটি আন্তর্জাতিক মাদক ও মৃত্যুচক্রের মধ্যমণি। তাকে আদালতে আনার সময় যে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা থাকে তা প্রায় নজিরবিহীন। তার হাতে হাত-কড়া পায়ে বেড়ি থাকা সত্ত্বেও ১৬জন পুলিস স্টেনগান নিয়ে ও তিনজন রাইফেল নিয়ে তার চারপাশে আগলে রাখে। তা ছাড়াও থাকে দুটি ওয়ারলেস ভ্যান। এত সতর্কতার কারণ ইন্টারপোলের হুঁসিয়ারি—সোভরাজ যাদু জানে, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়ার ক্ষমতারও অদ্বিতীয়। ক্যারাটের প্যাঁচেও ও বড় ওস্তাদ, দশজনকে মুহূর্তের মধ্যে ঘায়েল

* জগদীশ গুপ্তের গল্প, 'আদি কথায় একটি'

† যুগান্তর ২৫ ফাল্গুন ১৩৮৪

করার ক্ষমতা ও রাখে। ** সোভরাজের লেখাপড়া ফ্রান্সে, সরবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। মনস্তত্ত্ব ও আইনের ছাত্র, কিন্তু ইংরেজি, ফরাসি, জার্মা স্প্যানিশ, ভিয়েৎনামী ও জাপানী ভাষাতেও সমান দক্ষতা।* বিক্রম হোটেলে ম্যানেজার ঐ দিন রাত্রে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পুলিসকে জানান যে ঐ হোটেলে ২০জন ফরাসী মাদক দ্রব্য পান করে ঘন ঘন বমি করছে এব তারা বলছে হোটেল ম্যানেজার তাদের বিষ খাইয়েছে। কিন্তু একটি নাম শোনামাত্র দিল্লি পুলিস তড়িতাহতের মতো চমকে ওঠে; সকলের অবস্থা খারাপ হলেও অ্যালাইন গথিয়ার নামে একজন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। ইন্টারপোল মারফৎ ঐ নাম পুলিসের জানা ছিল। তাই দিল্লি পুলিস গিয়ে প্রথমেই তাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর ফরাসী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারত সরকার জানতে পারেন ঐ কীর্তিমানের আসল নাম চার্লস ডুমার্কো (৩২)। বহু জালিয়াতি ও চুরি-জোচ্চুরির অপরাধে ১৯৭৪ সালে তাকে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত করা হয়। তারপর সে অনেক নাম নিয়েছে। পাসপোর্ট পালটিয়েছে তার শিকারদের নাম অনুসারে। ভারতে গথিয়ার ঢুকেছিল চার্লস গুরুমুখ সোভরাজ নামে।]

এই সোভরাজের ভালবাসার পাত্রী মিস মেরী আন্দ্রে লেসির্ক। ইনিও সোভরাজের দুষ্টচক্রের একজন। মিস মেরী রীতিমত শিক্ষিত এবং কানাডায় একসময়ে তার চিকিৎসা বিদ্যার খ্যাতি ছিল।

এই বিবরণটি থেকে আমরা বুঝতে পারি অপরাধী কি পরিমাণ তথাকথিত শিক্ষিত হতে পারে। এই সংবাদ থেকে কেবল জানা গেল না কেন সোভরাজ এরকম কাজ করে বেড়ায়। কেবল অর্থলোভ নাকি অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা? যাই হোক এহেন হত্যাকারীকে ধরতে ডিটেকটিভ যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর না হন তবে ব্যর্থতা অনিবার্য।

অজানা বস্তুকে ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হয়। সেই অজ্ঞাত বস্তু বা শক্তি কেবলই ভয়ভীতির সঞ্চার করে। সেই ভয়ভীতি থেকে দূরে সরে থাকতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে এই অজ্ঞাত শক্তি-বস্তু সম্বন্ধে তার কৌতূহল অদম্য। ডিটেকটিভের ধীর পদক্ষেপ, তার হিসেবের গরমিলে কখনও এগিয়ে কখনও পেছিয়ে আসা, ছিন্ন সূত্রগুলির প্রতি বারবার মনোযোগ দেওয়া এগুলি যেমন কৌতূহল সৃষ্টি করে তেমনি একজাতীয় ভয়ের শিহরণও জাগায়। গা-ছমছম্ পরিবেশে কিরীটীর অভিযান অথবা ব্যোমকেশের গাণিতিক

ণীর পদক্ষেপে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কিংবা ফেলুদার দুঃসাহসিক অভিযান আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে লক্ষ্য করতে থাকি। কোন্ উপায়ে যে হত্যাকারীর কৌশলকে পরাস্ত করা হল সেইটিই অনুধাবনযোগ্য ব্যাপার। সম্পত্তির লোভ, দুষ্প্রাপ্য বস্তুর অধিকার, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র, নারীঘটিত জিঘাংসাবৃত্তি যে-ভাবে হত্যাকর্মে প্ররোচিত করে তার বিশদ বিবরণ এসব গল্প-উপন্যাসে লভ্য। ডস্টয়েভস্কির রাসকলিনিকভ হত্যা করেছিল; হত্যাকারীকে পুলিস ধরেওছিল। কিন্তু সেখানে নায়ককে ধরার গল্পটাই বড় নয়। হ্যামলেটেও হত্যাকারী ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য হ্যামলেট নাটকে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে অভিযানের গল্পটা মুখ্য নয়। ঐ উপন্যাস ও ঐ নাটকের সর্বকালজয়ী আবেদন অন্যত্র। কিন্তু ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসে জরুরী হল হত্যাকারীর সনাক্তকরণ এবং কীভাবে সে হত্যা করল সেটাও জানা আবশ্যক। কেননা বিচারের সময় তথ্য-প্রমাণ চাই। ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসে জাল গুটিয়ে আনার সময় ঔপন্যাসিককে সতর্ক থাকতে হয়। ডিটেকটিভ জানেন হত্যাকারী কে? কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। ক্রাইম এবং ক্রিমিনোলজির যোগকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সেকালে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার যত উপায়ই উদ্ভাবিত হোক না কেন বর্তমান কালের তুলনায় সে-সব করণ-কৌশল নিতান্তই প্রাথমিক ধরনের ছিল। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক পন্থা যুক্ত হয়ে অপরাধ-প্রবণতা যেমন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে হত্যাকারীকে সনাক্তকরণ ততই দুরূহ পর্যায়ে ঠেকেছে। ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিককে হত্যাকারীর know-how সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হয়। নীহারবাবুর কিরীটী ডাক্তারীশাস্ত্র সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞ। এখানে কিরীটীর অন্তরালে ডাক্তার-লেখকের সাক্ষাৎ পাই। ক্যাকটাসের বিষ, মরফিন, হাইপোডার্মিক নীডল, একিমোসিস এসবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে পাঠকের। অথবা মনোবিকলনের সূক্ষ্ম তরঙ্গগুলির ওঠানামার মধ্য দিয়ে যখন গল্প এগিয়ে যায় তখন লেখকের অভিজ্ঞতার পরিধি সম্বন্ধে আমরা সজাগ হই।

•   •   •

ডিটেকটিভ উপন্যাসের বাজারদর কখনও ওঠে কখনও পড়ে। বিদেশে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে এবং তার পরেও ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। পেপারব্যাক বই বার হবার পর এই জাতীয় উপন্যাসের প্রচলন খুবই বেড়ে যায়। বাংলাভাষায় ডিটেকটিভ গল্পের প্রচলন এই শতাব্দের গোড়ার দিকে। সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্য চর্চায় ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের কদর যে বেড়েছে তার প্রমাণ পাই অপরাধ-বিষয়ক গোয়েন্দা, রহস্য, রোমাঞ্চ পত্র-পত্রিকার আবির্ভাবে। বিদেশী গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসের অনুবাদও লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। এসব গল্প-উপন্যাসে এখনও কোনো অভিভাবকত্ব দেখা না দিলেও

ভবিষ্যতে ভালো রচনার অপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ভঙ্গি দিয়ে কেউ ভোলাবার চেষ্টা করেন তবে এই শাখার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হবে না।

এতদিন অপরাধী কে এবং অপরাধী কিভাবে হত্যা করল—এই ছিল আমাদের কৌতূহলের বিষয়। কিন্তু এখন ডিটেকটিভ উপন্যাসে-গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রবেশ করছে। তার ফলে হত্যাকারী কেন হত্যা করল এই জিজ্ঞাসা আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দিচ্ছে। অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনার প্রশ্ন না তুলেও তার হত্যার সাহসিকতা সম্বন্ধে আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠছি। অর্থাৎ কেবল হত্যাকারীর নিষ্ঠুর, নির্মম দিকটিই নয় এই নির্মমতার জন্ম কোন্ স্থানে তা জানবার আগ্রহেও আমরা উত্তেজিত হচ্ছি। ফলে ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিকও ঘন ঘন রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা না করে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে অগ্রসর হচ্ছেন। শিখেন্দু নির্বাণীতোষকে কেন হত্যা করল এটা জানতে আমাদের কৌতূহল। তার ব্যর্থ প্রেম শেষ পর্যন্ত যে আত্মঘাতী পথ বেছে নিল তার বিশ্লেষণ নীহারবাবু বিশেষ করেননি। কেন না তিনি গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু ঘুম ভাঙার রাতে রাধারাণী, সুধা সচ্চিদানন্দর কাহিনীতে সামান্য হলেও লেখক বিশ্লেষণের পথ ধরেছেন। সচ্চিদানন্দের প্রথম স্ত্রী সুধার জীবনে যে ব্যর্থতা, তার কন্যার মর্মান্তিক পরিণতি এসব তাকে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে নিয়ে গেছে। সে যে কেন সচ্চিদানন্দের গৃহে ফিরে এল তার সমূলক ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেও নারীর জটিল মনস্তাত্ত্বিক স্বভাবেরই এরকম পরিণতি ঘটল তা আমরা বুঝতে পারি। নীলকুঠি উপন্যাসে সুজাতার তার কাকা সম্বন্ধে মিশ্র মনোভাব এরকম আর একটি উদাহরণ। অবশ্য এ বিশ্লেষণেরও একটা সীমা আছে। কেননা লেখক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হত্যারহস্যমোচন উদ্ঘাটন করবেন। গল্পের টানের দিকে নীহারবাবুকে অবহিত হতে হয়েছে বলে বিশ্লেষণের মাত্রাধিক্য ঘটনা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এখানেই G. K. Chesterton-এর চতুর অথচ অব্যর্থ আলোচনার কথা মনে আসে। তিনি একশ্রেণীর লেখককে বলেছেন Cut-throats আর এক শ্রেণীর লেখককে বলেছেন Poisioners. ছুরি বসিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। এই তাৎক্ষণিক মৃত্যু নিয়ে ভাববার অবকাশ কম। ডিটেকটিভ রচনা যেগুলি ছোট গল্পের সমধর্মী সেখানে এই ক্রুতি প্রত্যাশিত। লেখক একটি মাত্র ঘটনাকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। বড় গল্পের প্রত্যাশা সম্ভাবনাকে লেখক নিজেই ছুরি চালিয়ে সংক্ষিপ্ত করে আনেন। হতভাগ্য পাঠক বিষণ্ণচিত্তে তা মেনে নেয়। এখানে হত্যার ভয়াবহতা হত্যাকারীর জিঘাংসা, নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ সবই মিলে মিশে সবেগে ধাবিত হয়। এরকম গল্প হীরকাঙ্গুরীয়। অহল্যা ঘুমও তারই কাছাকাছি। আর এক জাতীয় মৃত্যু ঘটে বিষ প্রয়োগের ফলে। সেখানে মৃত্যু

* G. K. Chesterton. A Century of Detective Stories, 'Introduction'.

তৎক্ষণাৎ নয়। শরীরে বিষক্রিয়ার ফল ধীরে ধীরে দেখা দেয়। মৃত্যুযন্ত্রণা সেখানে নিদারুণ, মর্মান্তিক। এ রকম রচনাকে ডিটেকটিভ উপন্যাস বলতে পারি। লেখক ধীরেসুস্থে এখানে অগ্রসর হন। তাঁর তাড়া নেই। নানা আঁকাবাঁকা পথে নানা গলিঘুঁজি ঘুরিয়ে লেখক পাঠককে হত্যাকারীর মুখোমুখি করেন। ফোঁটা ফোঁটা জলের সাহায্যে তিনি ক্ষীণস্রোতাকে খরস্রোতা করে তোলেন। পাঠকের যন্ত্রণাও অপরিসীম। আর এসব উপন্যাসে যত যন্ত্রণাভোগ তত উত্তেজনা। বলা বাহুল্য ডিটেকটিভ উপন্যাসেই মনোবিশ্লেষণের অবকাশ সমধিক। উপন্যাসের গতি মন্থর বলে ডিটেকটিভ কখনও হত্যাকারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কৌশলে হত্যার কারণ সন্ধান করেন। Cut-throats জাতীয় লেখক সে সুযোগ পান না। নীলকুঠি এবং ঘুম ভাঙার রাত রচনা দুটি এই পর্যায়ের। এখানে গল্প নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে। আমরা একবার সিঙ্গাপুরে ঘুরে আসি। কলকাতা থেকে ঘটনা উত্তরপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। রাত্রে সুজাতা ভৌতিক শরীর দেখে অজ্ঞান হয়, বিনয়েন্দ্রের ল্যাবরেটারির কিঞ্চিৎ বর্ণনাও এখানে উপস্থিত। তেমনি ঘুম ভাঙার রাতে যাতে যতীন-শিবানী কাহিনী, শিবানীর অপহরণ, যতীনের দেশত্যাগ, সচ্চিদানন্দের রক্ষিতারূপে সুধার বাস, সুধার পলায়ন, এবং তার থিয়েটারের জীবন সবই লেখক বিস্তৃতভাবে বলেছেন। এইসব ক্ষেত্রে নীহারবাবু Poi-ioners.

* * *

কিন্তু ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাস অলৌকিক রসের রচনাকর্ম নয়। এর ঘটনা সংস্থান—অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যাই হোক না কেন হতে হবে একান্ত বাস্তব। এখানেই উপন্যাসের সঙ্গে ডিটেকটিভ উপন্যাসের যোগ। উপন্যাসে সমাজের প্রেক্ষাপটে পারিবারিক জীবনের যে বিচিত্র রঙ্গলীলা দেখতে পাই ডিটেকটিভ উপন্যাসে সেসব উপাদান অনিবা ভাবেই আসে। মায়ের মমতা, পিতার সন্তানপ্রীতি, পিতার অপরাধের জন্য পুত্রের মনোবেদনা, কামনা-লালসা-পীড়িত পুরুষ। ত্রিভুজ প্রণয়ের ব্যর্থতা-সাফল্য, যৌথ পরিবারের রাগ-বিরাগ, জীবনে প্রতিষ্ঠিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সুখের সংসারে আকস্মিক বিপদপাত, বন্ধুর প্রণয় ও ঈর্ষা এ সবই ডিটেকটিভ গল্পে-উপন্যাসে লভ্য। আসলে ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাস তা যত স্থূল অথবা প্রাথমিক পর্যায়েরই হোক না কেন আমাদেরই জীবনের একাংশের চিত্র তার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখি। সাধারণ উপন্যাসেও ডিটেকটিভ উপন্যাসের উপাদান অর্থাৎ রহস্যময়তা প্রাপ্তব্য। E. M. Forster উপন্যাসে Mystery উপাদানের কথা বলেছেন। অবশ্যই সেই Mysteryর লক্ষ আর ডিটেকটিভ উপন্যাসের Mystery এক বস্তু নয়। যাই হোক এখনকার ডিটেকটিভ উপন্যাসকে নিছক খুন-জখমের কাহিনী বলা যাবে না। এখানে লেখক হত্যাকারীর মোটিভ সন্ধান করেন। এই সন্ধানে বেরিয়ে তিনি ভালোবাসার ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পান। নীলকুঠি উপন্যাসে পুরন্দর চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে এই পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। অহল্যা ঘুম গল্পে শিবতোষের প্রথম স্ত্রী প্রতি দুর্ব্যবহার এবং প্রথম সন্তানকে না-পাওয়ার বেদনা নীহারবাবু উদ্ঘাটিত করেছেন অথবা শিবতোষের প্রথম পক্ষের সন্তান আশুতোষের পিতার প্রতি ঘৃণা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা উপন্যাসেরই বিষয়। আবার বিবাহরাত্রে গোপনে আশুতোষের নির্বাণীতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ভাইয়ের বিবাহে স্নেহোপহার প্রদানের মধ্য দিয়ে আশুতোষের আপাত নীরস স্বভাবের মধ্যে হৃদয়বত্তার চকিত উদ্ঘাটন দেখতে পাই। তাছাড়া শিখেন্দুর ভালোবাসাকে অবলম্বন করে একটি উপন্যাসই তো গড়ে উঠতে পারত। ঘুম ভাঙার রাতে সুধার পিতা যতীনের অনমনীয়তা, কন্যাপ্রীতি চিত্রণ উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া আর কি? সচ্চিদানন্দের মাঝে মাঝে কন্যার জন্য রেজেষ্ট্রি ডাকে টাকা পাঠানো কেবল কি কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না পিতৃস্নেহ? কিরীটী-কৃষ্ণার দাম্পত্য জীবনের চকিত চিত্র যেমনি প্রসন্ন তেমনি স্নিগ্ধ। ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিককে অবশ্য সর্বদাই স্মরণ রাখতে হয় এ সবেরই উপযোগিতা হত্যাকারীর দুরভিসন্ধি উদ্ঘাটনে, তাকে সনাক্তকরণের সার্থকতায়। যেমন ধরা যাক আশুতোষের কাহিনীটি। এ কাহিনীর স্বতন্ত্র মূল্য কিছু নেই। পাঠকের মধ্যে প্রথমেই যে সন্দেহ দেখা দিতে পারে তা হল সম্পত্তিবঞ্চিত আশুতোষের সম্পত্তিলাভের আশায় নির্বাণীতোষকে খুন করার প্রবৃত্তি। পাঠকের এই সন্দেহের উপর ভর করেই লেখক আশুতোষের কাহিনীকে বিস্তৃত করেন। হত্যাকারী সম্বন্ধে পাঠক যখন জটিল গ্রন্থিগুলির একটি খুলতে পেরেছে বলে মনে করতে থাকে তখন লেখক প্রকারান্তরে আর একটি গ্রন্থির সূচনা করে দিলেন। এ গ্রন্থিমোচন ঘটবার জন্যে পাঠককে সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এমন কি শিখেন্দুর তিন বন্ধুর সংলাপেও পাঠকচিত্তে মুহুর্মুহু ঘোরাফেরা করে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার জন্য। স্বাতীর আচরণের অস্বাভাবিকতাও কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য ঠেকে। এক সময়ে সেও হত্যার সঙ্গে জড়িত এরকম সন্দেহ হতে থাকে। সব চাইতে মজা এই যে আসল হত্যাকারী কিন্তু কাছে থেকেও নানা গোলকধাঁধার সাহায্যে নিজেকে নিরীহ নির্দোষ রূপে বেশ কিছুকাল চালিয়ে দেয়। ডিটেকটিভ সেই নিরীহতার নির্মোক খুলে দেন। এজন্যই হীরকাঙ্গুরীয় গল্পে ভাগ্নে-মামী সম্পর্কটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাহানারা এবং নাসেরের সম্পর্কটিতে যে প্রীতির (!) পরিচয় পাওয়া যায় তার উপর অকারণ রহস্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন লেখক। এর ফলে প্রকৃত হত্যাকারী সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বাড়তে থাকে। সাধারণ উপন্যাসে এসব আয়োজন অর্থহীন। উপন্যাসেও কৌশল অবলম্বিত হয়। সে কৌশল মানব-চরিত্রের সত্য উদ্ঘাটনে সহায়তা করে। আবার ডিটেকটিভ উপন্যাসের কাছে এ দাবি অচল। কখনও কখনও অবশ্য লেখক নিহত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র

ঘটনাটুকু ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটে সেসবে একটা তাৎপর্যদানে আগ্রহী হন। মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের সমবেদনাও জাগে। এমন কি যে অবস্থার বিপর্যয়ে একজন সাধারণ মানুষ খুনীরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা লাগে। নীলকুঠি উপন্যাসে বিনয়েন্দ্রের জন্য আমরা দুঃখবোধ করি। সিঙ্গাপুরী মুক্তোর প্রতি তাঁর আসক্তির কারণ যখন জানতে পারি তখন তাঁকে কেবল একজন নেশাগ্রস্ত মানুষ বলে ঘৃণা করি না। তাঁর জন্য কিঞ্চিৎ করুণারও উদ্রেক হয়। সুধার জিঘাংসার কারণ খুঁজে পাওয়ার পর তার ছলনা, ক্রূরতাও কিঞ্চিৎ লঘু হয়ে যায়। শিখেন্দু ক্ষমার অযোগ্য কিন্তু হত্যাকারীর মানসিক যন্ত্রণার পরিচয় যদি এখানে পেতাম তবে তো উপন্যাসেরই অভিজ্ঞতা লাভ করতাম।

* * *

ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসে ভয়ের শিহরণ জাগে। এককালে এই ভয়ই ডিটেকটিভ উপন্যাসের মুখ্য স্থান জুড়ে ছিল। অথচ আধুনিক কালের ডিটেকটিভ উপন্যাসে এই ভয় জাগানো পরিবেশ অনেক পরিমাণে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। নীহারবাবুর প্রথম তিনটি গল্প-উপন্যাসে হত্যা থাকলেও সে হত্যাকাণ্ড আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে না। আমরা যেন কয়েকটি বীভৎস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পেলাম মাত্র। নির্বাণীতোষের বাথরুমের মধ্যে পড়ে থাকা অথবা জাহানারার জলসাঘরে আমূল ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে মরা এবং সচ্চিদানন্দের ক্যাকটাসের কাচঘরে মৃত্যু বীভৎস, মর্মান্তিক এবং আকস্মিক সবই, কিন্তু এসব মৃত্যু আমাদের ভয় জাগায় না। নীলকুঠিতে বিনয়েন্দ্রকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার কোনো চমক সৃষ্টি করে না। এমন কি রামচরণের মৃত্যুতেও আমরা ভয়ে শিউরে উঠি না। এ উপন্যাসে অবশ্য সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে আততায়ীর ধাবমান দৃশ্য অঙ্কন করে কিঞ্চিৎ ভয় জাগাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেও যথেষ্ট বিভীষিকাময় নয়। আসলে বিভীষিকাকে খানিকটা পরিহার করতে চেয়েছেন আধুনিক কালের ডিটেকটিভ গল্পের লেখক। আতঙ্কের সৃষ্টি করে রহস্যের মাত্রাধিক্য সঞ্চার করা লেখকের অভিপ্রায় নয়। শুরু থেকেই কিরীটীর আবির্ভাব ঘটে। নীলকুঠিতে এ দায়িত্ব পালন করেছেন অনেকটা ইন্সপেক্টর প্রশান্ত বসাক। কিরীটীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যেন একটা ল্যাবরেটারিতে উপনীত হই। কিরীটীর পরীক্ষা-নিরীক্ষাই আমাদের মনোযোগের বিষয়। কেমন করে দুয়ে আর দুয়ে চার হয় সে রহস্যই কিরীটীই বলে দেন। এখানেই দেখি মৃত্যু কখন ঘটল, মৃতের হাতে লাল সুতো কি করে এল, মৃতের পাশে সিরিঞ্জের ভাঙা অংশ, মৃতের কাঁধে একিমোসিস, ফোলা ঠোঁট, আমূল বিদ্ধ ছুরি কতটা বিদ্ধ করেছে তাই দেখে হত্যাকারী পুরুষ না স্ত্রীলোক, মৃতের একান্ত অন্তরঙ্গজনকে প্রশ্ন করে হত্যাকারীর হত্যার উদ্দেশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা। ফোরেনসিক রিপোর্টের খুঁটিনাটি ইত্যাদি বিষয়ে ডিটেকটিভের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কৌতূহলী হই। হত্যাকারী

কেন এই হত্যা করল সে বিষয়ে রীতিমত গবেষণায় আমরা মেতে উঠি। এখনকার ডিটেকটিভ উপন্যাস অনেক সময়েই বুদ্ধির ব্যায়ামের ফসল। আমাদের বুদ্ধিকে যথেষ্ট শাণিত করে হত্যাকারী ও ডিটেকটিভের দাবাখেলার টানাপোড়েনে। আমার ধারণা ডিটেকটিভ উপন্যাস এর ফলে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু যে লাভ হয়নি তা নয়। কিন্তু অজ্ঞাত হত্যাকারীর নৈশ অভিযানে যে রোমাঞ্চ গল্পে উপন্যাসে বিস্তৃত হয়ে যেত সে রোমাঞ্চ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। আমাদের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীকে উত্তেজিত করে হত্যাকারী অথবা অপরাধী ডিটেকটিভ এবং পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে কখনও কখনও হাড়-ভাঙানো ভয় ধরিয়ে দিয়ে অট্টহাসে মিলিয়ে যেত সে হত্যাকারীর আর দেখা পাওয়া যায় না। হা রে রে রে রে রে। র ধ্বনিই আমাদের বোধকে শিহরিত করে তুলত। যাই হোক বুদ্ধির অনুশীলনও একদিকে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সমাজে অপরাধ এবং অপরাধপ্রবণতার মোটিফের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এই বুদ্ধির ব্যাপারেও কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের ভূমিকাই প্রধান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হত্যাকাণ্ডের সম্মুখীন হয়ে সকলেই যখন বিহ্বল এবং বিভ্রান্ত তখন ডিটেকটিভ অনুত্তেজিত। তাঁর মস্তিষ্ক তখন সচল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ইঁদুর ধরবার আগ্রহে তিনি বেড়ালের মতই ওৎ পেতে বসে থাকেন। এখন তিনি মনোবিকলনের অস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করতে উদ্যত হন। আপাত-ভালো মানুষটি আমাদের চোখে ধূলো দিলেও ডিটেকটিভ মানুষের গোপন লালসা ঈর্ষা লোভ দেখতে পান এবং কেন এই ব্যাপার ঘটল তার সন্ধানে ব্যাপৃত হন। এখানে তাঁর শ্রেষ্ঠতা।

* * *

কিছুকাল যাবৎ বাংলা গল্প-উপন্যাসে যৌন আবেগ এবং যৌনযন্ত্রণার প্রকাশ বেশিমাত্রায় প্রকাশ পাচ্ছে। বিষয়টি নিষিদ্ধ এলাকা থেকে সগর্বে সাধারণের মধ্যে এসে পড়ে উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কামনার এই ঘোষণায় আমরা হকচকিয়ে গেছি সত্য কথা। সাহিত্যের কমলবনে এ উৎপাত অনেকে বিরূপ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। কিন্তু কখনও কখনও পাষাণপুরীর অন্দরমহলের রিরংসা, এবং প্রচণ্ডতার সাক্ষাতে নূতন করে বিষয়টি সম্বন্ধে কেউ কেউ ভাবছেন। দুর্বার যৌন শক্তি মানুষকে কতটা প্রমত্ত করে তোলে সাধারণ গল্প-উপন্যাসে তার কিছু বিবরণ পাই। সাহিত্যিকরা অন্তত স্বাভাবিক হবার প্রত্যাশায় যৌনকামনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে রাজী নন।

বলা বাহুল্য এই খণ্ডে প্রকাশিত চারটি গল্পেই যৌনবোধের বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। নীহারবাবু ডিটেকটিভ উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসের এই বিশেষ প্রবণতাটিকে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য ডিটেকটিভ উপন্যাসে যে-ভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা উচিত সেভাবেই তিনি উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে ব্যক্তির যৌনচেতনা

অমোঘ শক্তি রূপে নায়ক-নায়িকাকে আলোড়িত করে। এই যৌন আবেগের নিষ্পেষণে অজস্র চিন্তার তন্তুগুলিকে অর্পণ করতে চান লেখক। ডিটেকটিভ উপন্যাসে সে অবকাশ নেই। ঔপন্যাসিক যৌনচেতনাকে দেখেন ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপাদান রূপে আর ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিক যৌনচেতনাকে শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাধিরূপে চিত্রিত করেন। সে ব্যধির নাম অপরাধ। এই অপরাধে শিখেন্দু তার বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। বন্ধুরা সকলেই দীপিকাকে ভালোবাসত। কিন্তু সমাজ শাসন এবং আইনের শাসনে কবলিত অন্যান্য বন্ধুরা দীপিকার নির্বাণীতোষকে বরং মেনে নিয়েছিল। কিন্তু শিখেন্দু মানতে পারেনি। সেজন্য দীপিকার প্রেমে দগ্ধ হয়ে সে বিকৃত পথ ধরল। সে হয়ে উঠল খুনী। সেদিক থেকে হীরকাঙ্গুরীয়ের নবাবের লালসা গোড়া থেকেই ব্যাধিরূপে চিহ্নিত। তার এই লালসার মাশুল তাকে দিতে হল। সচ্চিদানন্দের বন্ধুপ্রীতি আসলে সুধাকে লাভ করবার মুখোস। সুধাকে সচ্চিদানন্দ বিবাহ করতে চায়নি; বিবাহ সে করেওনি। রক্ষিতা হিসাবে সে সুধার দেহ ভোগ করল। সেই সুধাই কিভাবে দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর সচ্চিদানন্দের গৃহে এল তার কাহিনী আমরা জানতে পারলাম। সচ্চিদানন্দ তার একটা পাপকর্মকে গোপন করবার জন্যে মিথ্যার পর মিথ্যা রচনা করে যেতে লাগল। নীলকুঠিতে যৌনবিকৃতি এবং সিঙ্গাপুরী সোনার পাপব্যবসার কী শোচনীয় পরিণাম! বিনয়েন্দ্র-পুরন্দর-লতার ত্রিভুজ প্রণয়কাহিনী কিভাবে বিকৃত পথ নিল সে সম্বন্ধেও নীহারবাবু আগ্রহ সঞ্চার করেন। এসব অপরাধ কাহিনী দুঃখজনক কিন্তু সমাজে এর অবস্থিতিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমরা এগুলি পড়ে সমাজের বিকৃত দিকটি সম্বন্ধে অবহিত হই এবং পাপীর দণ্ডবিধানে আশ্বস্ত বোধ করি। কে জানে এরকম অপরাধপ্রবণতার কাহিনী পড়ে আমরাই আমাদের সুপ্তলোকে অবস্থিত পাপবোধকে সুষুপ্তির মধ্যে সমাধিস্থ করতে চাই কি না। বিকৃতির উদাহরণগুলি সুকৃতিকে আলোকিত করে। সে আলোকে আমরা উদ্ভাসিত হই।

• • •

আগেই বলেছি ডাক্তার লেখক তাঁর গল্প-উপন্যাসে চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু জ্ঞান তিনি রচনাকর্মে ব্যবহার করেছেন। এই খণ্ডে লক্ষণীয় একটি বিষয় তিনটি গল্প-উপন্যাসেই দেখা দিয়েছে। দীপিকার বাক্‌রোধ, রাধারাণীর বিহ্বলতা এবং সুজাতার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলি স্মরণ করছি। কোনো ভয় থেকে মানুষের সাময়িক স্মৃতিলোপ (amnesia) ঘটতে পারে। পাশ্চাত্য ডিটেকটিভ গল্পে (আলফ্রেড হিচকক) এই স্মৃতিলোপের ব্যাপার দেখা যায়। আলোচ্য উপন্যাস-গল্পে যে ভাবে স্মৃতিলোপ ঘটেছে তা যেমনি করুণ তেমনি মর্মান্তিক। ভয় এর মূলে নিশ্চয়ই আছে। আততায়ীর জিঘাংসার সামনে স্মৃতিলোপ ঘটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমরা যখন দেখি সেই আততায়ী আমাদেরই

একান্ত ভালোবাসার কোনো ব্যক্তি তখন ঘটনার প্রতিক্রিয়া সজোরে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রীকে আঘাত করে। অবিশ্বাস্য বস্তুকে সংঘটিত হতে দেখলে তার তীব্রতা আমাদের মুহূর্তেই ঝলসে দিতে পারে। দীপিকার ক্ষেত্রেও ঘটনাটা এরকম। সে প্রকৃত আততায়ীকে না দেখলেও সঞ্জীবকেই আততায়ী মনে করেছিল। সঞ্জীব দীপিকার কলেজের বন্ধু এবং একসময়ে ভালোবাসার পাত্রও ছিল বোধ করি। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এতকাল যে বিশ্বাস পোষণ করছিল সে বিশ্বাসে দারুণ আঘাত লেগে সব কিছুই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এতে স্মৃতিভ্রংশ স্বাভাবিক। রাধারাণীর স্মৃতিভ্রংশ সেরকম না হলেও প্রায় সেরকমই একটি ঘটনা। তার বাক্‌রোধ হয়নি। সাময়িকভাবে সে উন্মাদ। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত। এমন একটা ভয়াবহ আকস্মিক বিপদের সামনে সে পড়ল যার জন্য বোধ করি সে প্রস্তুত ছিল না। গোড়া থেকেই রাধারাণী কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ। কিন্তু সচ্চিদানন্দের মৃত্যুর দিনে তাকে পাকাপাকিভাবে উন্মাদে পরিণত করল। সুধা যখন প্রতিহিংসার জ্বালায় সচ্চিদানন্দের গৃহে উপস্থিত হয়েছিল তখন অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তার হয়ে সচ্চিদানন্দকে রাধারাণীই অজ্ঞাতসারে খুন করল। সুধার তখন রাধারাণীর প্রতি মমতা দেখা দিয়েছে। সে রাধারাণীর মধ্যে তারই মতো একটি বঞ্চিত নারীকে দেখতে পেল। উন্মাদ রাধারাণী স্বামীর মৃত্যুর জন্য হয়ত প্রস্তুত ছিল না। অথবা সঙ্কল্প সাধনের শেষমুহূর্তে তার মধ্যে স্ত্রীর সংস্কার জেগে উঠেছিল। এখন, এসব ঘটনা জানবার কোনো উপায়ই ছিল না। কিরীটীর পক্ষেও সম্ভব নয়। কেননা দীপিকা এবং রাধারাণী তাঁকে কোনো দিক থেকেই সাহায্য করতে পারছে না। প্রত্যক্ষ সাক্ষী একজন নির্বাক অন্যজন উন্মাদিনী। সেজন্য কিরীটী রায় যে-ব্যবস্থা নিলেন তা হল হত্যার রাত্রে যে-ভাবে হত্যাটি সংঘটিত হয়েছিল ঠিক অনুরূপ স্থান-কাল-পাত্রের যোগাযোগ ঘটিয়ে সত্য উদ্ঘাটিত করা। এখানে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সে অভিনয়ের ফাঁদে হত্যাকারী ধরা পড়েছে, সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। যে ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে দীপিকার স্মৃতিলোপ ঘটেছিল সে ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে তার স্মৃতি ফিরে এল। একটা শকে স্মৃতিলোপ আর একটা শকে স্মৃতির উদ্ধার। এরকম therapyর ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানীরা করে থাকেন। নীহারবাবু সে therapyকে গল্পরচনায় প্রয়োগ করলেন। আমরা প্রথমে হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাই সমাপ্তির কাছাকাছি এসে সে হত্যাকর্মটির প্রত্যক্ষ উপস্থাপন দেখি। অবশ্যই সেটি অভিনয়। গল্পরচনায় এ কৌশল ডিটেকটিভ উপন্যাসকে বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করে।

* * *

নীহারবাবু যেখানে Poisioners-এর ভূমিকা নিয়েছেন সেখানে গল্পের মধ্যে গল্প রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। ঘুম ভাঙার রাতে একটা গল্প সচ্চিদানন্দ-রাধারাণী-সুধাকে কেন্দ্র করে, আর একটি গল্প যতীন-শিবানীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

দুই গল্পেই আছে। সুধা একদিন এলাহাবাদ থেকে সচ্চিদানন্দ এবং মেয়েটিকে ফেলে রেখে চলে গেল। স্বভাবতই সুধার কাহিনী জানতে পাঠকের মনে জাগে। এক মুসলমান ওস্তাদের আশ্রয়ে এসে সুধার জীবনের পরিবর্তন। গানের পর চিত্রজগতে। সেখানে তার খ্যাতি ইত্যাদির কথা আমরা জানতে পারিলাম। এখানেই সে হঠাৎ শিবানীর সাক্ষাৎ পেল। হারানো-প্রাপ্তিতে তা'র স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। শিবানীকে সে নিয়ে এল সিনেমা জগৎ থেকে। যে শিবানী একদিন তার বাপের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল সে শিবানী শেষ পর্যন্ত বিমাতা রাধারাণীর কাছ থেকে গলাধাক্কা খেয়ে পথে নেমে এসেছিল। অসহায় অবস্থায় সে এক বৃদ্ধের আশ্রয় পায়। সে বৃদ্ধের পাষণ্ড পুত্র শিবানীকে গ্রাস করতে চাইলে সে আবার পথে নেমে আসে। তখন এক সহৃদয় যুবকের সাহায্যে সিনেমা জগতে আসে। সেখানে সে পেল সুধাকে। কিন্তু যেদিন সে সুধাকে মা বলে জানল সেদিন সে উন্মাদ হয়ে গেল। শিবানীর গল্প অত্যন্ত দ্রুততালে ফুরিয়ে গেছে। এ কাহিনী স্বতন্ত্র গল্পের উপাদান হতে পারত। নীহারবাবু সচ্চিদানন্দের চারিত্রিক দুর্বলতা এবং সুধার আক্রোশ পরিস্ফুট করবার জন্য দ্বিতীয় গল্পের সূচনা করলেন। অহল্যা ঘুমে নিছক কৌতুকের জন্য সঞ্জীবের নীলবসনা সুন্দরী সাজা একটি স্বতন্ত্র গল্পের টুকরো। নীলকুঠিতে এ ব্যাপার আরও বেশি। বিনয়েন্দ্রের পরিবারিক জীবন এবং বিনয়েন্দ্রের অধ্যাপক-গবেষক জীবন দুটো আলাদা বিষয়। পুরন্দর-বেলা আখ্যান নূতন গল্পের সূচনা করে। সিঙ্গাপুরে পুরন্দরের ভাগ্য পরিবর্তন চমকপ্রদ। সিঙ্গাপুরী মুক্তোর ব্যাপারটিও খানিকটা কৌতূহল উদ্রেক করে।...নীহারবাবু বর্মামুলুককে নিয়ে আর একটি কালো ভ্রমর গড়ে তোলেননি সত্য কথা। কিন্তু আন্তর্জাতিক বন্দরটি এসব নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের লেনদেনে এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সিঙ্গাপুরে এরকম ঘটনার সাক্ষাতে আমাদের বাস্তবতাবোধ আশ্বস্ত হয়। বেলা-পুরন্দরের কাহিনী শাখা-প্রশাখায় বেড়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি গল্পের খাতিরেই। আবার বিনয়েন্দ্র-লতা কাহিনীও ডিটেকটিভ উপন্যাসের দিক থেকে কৌতূহল সঞ্চারে অব্যর্থ। তবে একথা ঠিক, মূল গল্পের বাইরে যে গল্পগুলির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেগুলির তাৎপর্য হত্যা-রহস্যের সঙ্গে জড়িত। সেগুলির ততটুকুই সার্থকতা যতটুকু তারা অপরাধের কে, কি, কেন'র উত্তর দিতে সাহায্য করেছে।

* * *

'গদ্য পদ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনের দুটি অংশের উল্লেখ করেছিলেন। একটি অংশ ছন্দ ও ধ্বনির, অন্য অংশ ভাব ও অর্থের প্রত্যাশা করে। আসলে আমরা যত অগ্রসর হচ্ছি এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করছি ততই এ দাবি জোর গলায় করছি যে আমরা সব কিছুতেই প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছি। আমাদের মধ্য থেকে শিশু-চিত্তটি বিদায় নিচ্ছে এরকমই আমাদের ধারণা। অথচ কার্যকালে দেখতে পাই

প্রৌঢ়ের শিশুজীবনের প্রতি লোলুপতা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। দিদি নাতনীর শরীর থেকে উত্তাপ টেনে নিয়ে আরাম উপভোগ করে। রূপ রাজ্য থেকে নির্বাসিত আমরা রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফে সুদূরের প্রেয়সী আমাদের হাতছানি দেয়।

অনুরূপভাবে বলতে পারি আদিম মানুষ যে-কালে শত্রু প্রকৃতির সঙ্গে বাস করত সেকালে ভয়ভীতি ছিল তার চিরসঙ্গী। নিয়ত সংগ্রাম করে সে প্রকৃতিকে জয় করতে চাইত। সেই সংগ্রামের কাহিনী সবাই মিলে যখন আগুনের চারধারে বসে মাংস ঝলসানোর সঙ্গে সঙ্গে শুনত তখন "ভয়ে-আতঙ্কে জয়ে-পরাজয়ে তাদের ভোজন পর্বটিকে মুখরিত করত। শত্রুদমনের নেশায় তারা উত্তেজিত হয়ে উঠত। গুহামানবের সেই কাল ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। বন কেটে বসত গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সভ্য হয়ে উঠলাম।' প্রকৃতিকে জয় করে অজানাকে অনেকটাই জেনে ফেলেছি বলে আমরা গর্বিত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমাদের মধ্য থেকে সেই গুহামানবের সংস্কার কি বিদায় নিয়েছে? কার্যত সে মনটিকে পরিত্যাগ করেছি বললেই তা পরিত্যক্ত হয় না। রহস্যের প্রতি আমাদের টান এখনও রয়েছে। আর যতই মননচর্চা করি না কেন লাঠি হাতে মাথায় ঝাঁকড়া চুল নিয়ে কানে জবার ফুল গুঁজে যখন ডাকাতরা এসে পড়ে তখন ভয় ও আতঙ্কে যেমন আমরা শিউরে উঠি তেমনি ডাকাতদের সঙ্গে মনে মনে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হই। বীরপুরুষের কাহিনী শোনার আগ্রহ আমাদের চিরন্তন। শার্লক হোমস, ডাক্তার থর্নডাইক, এর্কুল পোয়ারো, ব্যোমকেশ, কিরীটী, ফেলুদা সেই বীরপুরুষেরই বংশধর। তাঁদের অভিযান, বুদ্ধি, কৌশল আমাদের আনন্দ দেয়। ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাস পাঠের সময় সেই গুহামানবটি জেগে ওঠে। তারই ভোজ্য যোগান কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিষ্টি, পাঁচকড়ি দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত এবং সত্যজিৎ রায়। উপন্যাসের গল্প সম্বন্ধে E. M. Forster যে কথা বলেছেন তা ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, what the story does in this particular capacities, all it can do, is to transform us from readers into listeners, to whom 'a' voice speaks, the voice of the tribal narrator, squatting in the middle of the cave, and saying one thing after another until the audience falls asleep among their offal and bones.*

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

E. M. Forster, Aspects of the

কিরীটী—১১শ

অহল্যা ঘুম

॥ এক ॥

সানাইয়ে বাজছে মধুর ইমন কল্যাণ। মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় সানাইয়ের ক্লান্ত রাগিণী মিলন-রাত্রির কথাই জানিয়ে দিচ্ছিল।

নিমন্ত্রিতের দল একে একে চলে গিয়েছে। শূন্য বিরাট প্যাণ্ডেলটায় জ্বলছে চোখ-ধাঁধানো শক্তিশালী বিদ্যুৎবাতিগুলো। সারি সারি তখন সাজানো রয়েছে টেবিল-চেয়ারগুলো। এখানে-ওখানে ফুলের মালা আর ছিন্ন পাপড়ি ছড়িয়ে রয়েছে, উৎসবের চিহ্ন।

সন্ধ্যার আগে থাকতেই সারি সারি যে গাড়িগুলো বাড়ির সামনের রাস্তাটায় ভিড় করে ছিল, সেগুলো আর এখন নেই, রাস্তাটা একেবারে খালি।

কেবল বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে এঁটোপাতা-কাগজ-গ্লাস-প্লেটগুলো নিয়ে গোটা দুই কুকুর মহোৎসব লাগিয়েছে। আর কিছু ভিখারী—তারাও যোগ দিয়েছে সেই ভোজন-উৎসবে।

বাড়ির সবাই প্রায় তখন ক্লান্ত, কেউ কেউ শোবার ব্যবস্থা করছে।

বাড়ির কর্তা শিবতোষবাবু তাঁর শয়নঘরে পাখার হাওয়ার নীচে বসে একটা সিগারেট টানছিলেন।

হঠাৎ একটা দীর্ঘ চিৎকার যেন সানাইয়ের রাগিণী ছাপিয়ে শিবতোষবাবুর কানের গোড়ায় এসে আছড়ে পড়ল। জ্বলন্ত অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা আঙুলের ডগা থেকে খসে নীচে পায়ের কাছে কার্পেটের উপর পড়ে গেল শিবতোষের।

চিৎকারটা একবারই শোনা গেল। সানাই তখনো বেজে চলেছে। সোফা থেকে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি কোনমতে স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে বের হয়ে এলেন ঘর থেকে সামনের বারান্দায় শিবতোষবাবু।

সামনেই পড়ে গেল শিখেন্দু।

কে অমন করে চিৎকার করল শিখেন্দু!

বুঝতে পারলাম না কাকাবাবু, শিখেন্দু বললে, মনে হল, যেন তিনতলা থেকেই—

যারা তখনও জেগে ছিল দোতলায়, তাদেরও কারও কারও কানে চিৎকারের শব্দটা পৌঁছেছিল—শিবতোষবাবুর বোন রাধারাণী দেবী, তাঁর স্ত্রী কল্যাণী, বড় মেয়ে স্মৃতি—

শিবতোষবাবুর একমাত্র ছেলে নির্বাণীতোষের বৌভাত ছিল।

ফুলশয্যার ব্যবস্থা হয়েছিল তিনতলায় নির্বাণীতোষেরই ঘরে।

সবাই যেন কেমন হতভম্ব, কেমন যেন অকস্মাৎ বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কেউ কথা বলে না, কিন্তু সকলেরই চোখেমুখে যেন একটা প্রশ্ন স্পষ্ট, কিসের চিৎকার শো গেল? কে চিৎকার করে উঠেছিল একটু আগে?

শিখেন্দুই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, আমি দেখে আসি একবার তিনতলাটা।

কথাগুলো বলে শিখেন্দু আর দাঁড়াল না, এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে তিন তলায় উঠে গেল।

ওরা সকলে দাঁড়িয়েই থাকে। একটা অজ্ঞাত বোবা ভয় যেন ওদের সকলের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে অকস্মাৎ। কিসের ভয়, কেন ভয়—তা জানে না ওরা। হয় ভাবতেও পারে না কেউ কথাটা। ভয় বস্তুটা এমনিই একটা ব্যাপার—। এমনি সংক্রামক—এক মন থেকে অন্য মনে ছড়িয়ে পড়ে।

পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনের মিনিট প্রায় হতে চলল, এখনও কই শিখেন্দু তো উপর থেকে নীচে নেমে এল না, কি করছে এখনো ও উপরে! সকলেই যেন ঐ প্রশ্নটা করতে চায়, কিন্তু কেউ করছে না কাউকে। কারও মুখেই কোন কথা নেই তখনও।

শেষ পর্যন্ত স্বস্তিই যেন অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে প্রশ্নটা উচ্চারণ না করে আর পারে না। বললে, শিখেন্দু কি করছে ওপরে? আসছে না কেন? ওপরে গিয়ে দেখে আসব আমি একবার বাবা—?

শিবতোষবাবু যেন কেমন অসহায় দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন একবার, তারপর কোন কথা না বলে নিজেই পায়ে পায়ে এগুলেন সিঁড়ির দিকে।

ঝকঝকে চওড়া মোজাইক করা সিঁড়ি। সিঁড়ির পথ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। কিন্তু ক্ষণপূর্বের সেই ভয়টা যা তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেটাই যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর গতি শ্লথ করে দিচ্ছে প্রতি পদবিক্ষেপে।

উপরে তিনতলাতেও ঠিক দোতলার মতই টানাবারান্দা—আগাগোড়া ডিজাইন টালিতে সব তৈরী। উপরের বারান্দাতেও আলো জ্বলছিল।

বারান্দাটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, উপরের তলায় চারখানি ঘরের মধ্যে, শেষের দুটি ঘর নিয়েই নির্বাণীতোষ থাকত। তার শয়নকক্ষেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ঘরের দরজাটা খোলা।

কোন সাড়াশব্দ নেই, কেবল সানাই তখনও বেজে চলেছে, ইমন কল্যাণের সুর।

খোলা দরজাপথে ভিতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন শিবতোষ।

শিখেন্দু স্তব্ধ হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার ঠিক সামনেই দামী

.টে মোড়া মেঝের উপরে পড়ে আছে নববধূ নির্বাণীতোষের সম্ভবিবাহিতা স্ত্রী পিকা।

পরনে দামী আকাশ-নীল রংয়ের বেনারসী, হাতে চুড়ি, জড়োয়ার চূড়। কানে হীরের —সিঁথিতে সিঁথিমৌর।

কাত হয়ে পড়ে আছে দীপিকা।

একটা হাত তার প্রসারিত, অন্য হাতটা দেহের নীচে চাপা পড়েছে, ঘোমটা খুলে গিয়েছে, জরির ফিতে দিয়ে বাঁধা বেণীটা কার্পেটের উপরে লুটোচ্ছে।

দুটি চক্ষু বোজা। কপালে চন্দন, সিঁথিতে সিঁদুর।

পদশব্দে ফিরে তাকাল শিখেন্দু।

কি ব্যাপার—বৌমা—, কথাটা শেষ করতে পারলেন না শিবতোষ। গলাটা তাঁর পতে কাঁপতে থেমে গেল। শেষ কথাটা উচ্চারিত হল না।

বুঝতে পারছি না কাকাবাবু। ঘরে ঢুকে দেখি এখানে এইভাবে দীপিকা পড়ে আছে—

খোকা—খোকা কোথায়?

তাকে তো ঘরের মধ্যে দেখি নি। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, হাত দিতেই খুলে যেতে ভেতরে ঢুকে দেখি ঐ ভাবে দীপিকা পড়ে আছে—

কিন্তু খোকা! খোকা কোথায় গেল? এবারে যেন আরও স্পষ্ট করে প্রশ্নটা উচ্চারণ করলেন শিবতোষ।

তার বন্ধুরা শেষ ব্যাচ খেয়ে চলে যাবার পরই, রাত তখন পৌনে এগারটা হবে, নির্বাণী আমাকে বললে মাথাটা বড্ড ধরেছে, আমি ওপরে চললাম। সেও ওপরেই চলে এসেছিল। ধীরে ধীরে বললে শিখেন্দু।

তবে কোথায় গেল সে? কেমন যেন অসহায় ভাবে আবার প্রশ্নটা করলেন শিবতোষ।

বাথরুমের দরজাটা তো খোলাই দেখছি, আলো জ্বলছে ভিতরে, ওখানে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না—কথাটা বলতে বলতেই শিখেন্দু বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

বাথরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল।

কি! কি হল শিখেন্দু! শিবতোষ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। এবং বাথরুমের মধ্যে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

নির্বাণীতোষের দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে বাথরুমের মেঝের উপরে। ঠিক

বেসিনের নীচে, সামনে পিঠের বাঁ দিকে একটা ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে। গরদের পাঞ্জাবিটা রক্তে লাল। হাত দুটো ছড়ানো।

প্রথম বিহ্বল মুহূর্তটা কাটবার পরই দীর্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন শিবতোষ: খোকা—তারপরই দুম করে বাথরুমের মেঝেতেই পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে।

আরো ঘণ্টা দুই পরে।

রাত তখন দুটো সোয়া দুটো হবে।

সানাই থেমে গিয়েছে।

শিবতোষের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তাঁকে ধরাধরি করে আগেই নীচে তাঁর দোতলার ঘরে নিয়ে আসা হয়েছিল। কেমন যেন প্রস্তরমূর্তির মত নিস্প্রাণ বসেছিলেন শিবতোষ সোফাটার উপরে।

একটা কান্নার সুর ভেসে আসছে রাত্রিশেষের স্তব্ধতার উপর থেকেও। করুণ। কল্যাণী কাঁদছে। শিবতোষের স্ত্রী কল্যাণী কাঁদছে। নির্বাণীর মা।

দীপিকারও জ্ঞান ফিরে এসেছে, কিন্তু সে যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। একটি প্রশ্নেরও জবাব এখনো পর্যন্ত তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

শিখেন্দু এ-বাড়ির ছেলে নয়, শিবতোষের বন্ধু সুখেন্দুর ছেলে। সুখেন্দু বিশ্বাস ভারত সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারী, বর্তমানে দিল্লী রাজধানীতেই তাঁর কর্মস্থল।

শিখেন্দু তাঁর তৃতীয় পুত্র, কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করবার জন্য অনেক দিন থেকেই সে কলকাতায় আছে।

হস্টেলে থাকে। গত বছর ডাক্তারী পাস করে বর্তমানে হাউস স্টাফ, কয়েক মাসের মধ্যেই সে আবার উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাবে, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছে।

কলেজ-জীবন থেকেই শিবতোষ ও সুখেন্দুর মধ্যে বন্ধুত্ব এবং দুই পরিবারে ঘনিষ্ঠতা। শিবতোষ সুখেন্দুর চাইতে কয়েক মাসের ছোট, তাই সুখেন্দুর ছেলেমেয়েরা শিবতোষকে কাকাবাবু বলে আর শিবতোষের ছেলেমেয়েরা সুখেন্দুকে জ্যাঠাবাবু বলে ডাকে।

শুধু বন্ধুত্বই নয়, সুখেন্দু ও শিবতোষের মধ্যে পরস্পরের ভাইয়ের মতই প্রীতির ও ভালবাসার সম্পর্ক একটা গড়ে উঠেছিল।

নির্বাণীতোষ শিবতোষের একমাত্র পুত্র, শিখেন্দুরই সমবয়সী, সেও শিখেন্দুর সঙ্গেই গত বৎসর ডাক্তার হয়ে বের হয়েছে এবং তারও একই সঙ্গে বিলেত যাবার কথা ছিল।

বিবাহের ব্যাপারে আজ দিন দশ-বারো থেকেই, বেশীর ভাগ সময়েই শিখেন্দু শিবতোষের বাড়িতেই আছে। সব কাজে সাহায্যও করেছে, পরিশ্রম করেছে।

নির্বাণীতোষের স্ত্রী অর্থাৎ শিবতোষের পুত্রবধূ দীপিকাও ছিল নির্বাণীতোষ ও শিখেন্দুর সহপাঠিনী, সেও ডাক্তার। গত বৎসর একই সঙ্গে পাস করেছে সে।

পড়তে পড়তেই উভয়ের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা, নির্বাণীতোষ ও দীপিকা প্রায় সমবয়সী, তাই শিবতোষের ইচ্ছা ছিল না খুব একটা দীপিকা তাঁর পুত্রবধূ হয়ে আসে।

শিবতোষ বলেছিলেনও ছেলেকে কথাটা, কিন্তু নির্বাণী কান দেয়নি বাপের কথায়।

সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই আমরা ঠিক করেছিলাম বিয়ে করব! অতএব আজ আপনি যা বলছেন তা সম্ভব নয় বাবা। স্পষ্ট করেই নির্বাণীতোষ তার সিদ্ধান্তের কথাটা শিবতোষকে জানিয়ে দিয়েছিল।

একটি মাত্র ছেলে এবং বরাবরই অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে একটু বেশী জেদী ছিল নির্বাণীতোষ, তাই শিবতোষ অনিচ্ছা এবং আপত্তি থাকলেও বিবাহে আর বাধা দেননি।

তাছাড়া স্ত্রী কল্যাণীও বলেছিল, ছেলে যখন বিয়ে করতে চাইছে করুক, আপত্তি করো না।

শিবতোষ জবাবে বলেছিলেন, তোমাদের মা ও ছেলের যখন ইচ্ছে হোক বিয়ে, করুক বিয়ে ওকেই, তবে বলে রাখছি এ-বিয়ে সুখের হবে না।

কেন হবে না শুনি? কল্যাণী বলেছিল।

কেন হবে না, অত কথা বলতে পারব না। তবে হবে না বলে রাখলাম, দেখে নিও।

অমতের কারণ ছিল শিবতোষের, কারণ দীপিকারা ঠিক তাদের সমতুল্য পার্টি-ঘর নয়। শিবতোষ ধনী, কলকাতা শহরের একজন ধনী ব্যক্তি। চার-পাঁচটা কয়লাখনির মালিক। পৈতৃক সূত্রেই খনিগুলোর মালিক হয়েছিলেন শিবতোষ অবিশ্যি। এবং কেবল ওই খনিই নয়, শিবতোষের বাবা রায়বাহাদুর প্রিয়তোষ মল্লিক কলকাতা শহরে খান পাঁচেক বাড়িও করেছিলেন। সেগুলো থেকেও বৎসরের ভাড়া আদায় বেশ মোটা অঙ্কের টাকাই হয়। ব্যাঙ্কেও মজুত টাকা অনেক।

আর দীপিকার বাবা, সদানন্দ রায় বেসরকারী কলেজের সাধারণ একজন অধ্যাপক মাত্র, খুবই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর। চার মেয়ে, দুই ছেলে—ঐ দীপিকাই বড় মেয়ে, অত্যন্ত মেধাবী ছিল দীপিকা বরাবর, বৃত্তি নিয়েই পড়ে এসেছে।

শ্যামবাজার অঞ্চলে ছোট একটা ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন সদানন্দ রায়। সামান্য মাইনে। যত্র আয় তত্র ব্যয়। নির্বাণীতোষের মত ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে বা কোন দিন হতে পারে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাঁর।

তাছাড়া তিনি ব্রাহ্মণ, আর নির্বাণীতোষ কায়স্থ।

তবু বিয়ে হয়ে গেল, বিয়েতে তিনি বাধা দেননি—মেয়ের কথা ভেবেই।

ঘটনার আকস্মিকতায়, বীভৎসতায় ও বেদনায় বাড়ির সকলেই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। সবাই বোবা, কেবল কল্যাণী কাঁদছিল। সমস্ত বাড়ির মধ্যে কেবল তার করুণ বিলাপ-ধ্বনি একটানা সকলের কানে এসে বাজছিল।

কাকাবাবু!

শিখেন্দুর ডাকে শিবতোষ মুখ তুললেন।

পুলিসে তো একটা খবর দেওয়া দরকার।

পুলিস! কেমন যেন বোকার মতই কথাটা উচ্চারণ করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন শিবতোষ শিখেন্দুর মুখের দিকে, কথাটা যেন তাঁর আদৌ বোধগম্য হয়নি।

হ্যাঁ, পুলিস,—মানে থানায় একটা খবর দেওয়া তো দরকার।

কেন?

মানে, যে ভাবে ওর মৃত্যু হয়েছে, বোঝাই তো যাচ্ছে কেউ ওকে খুন করে গেছে।

খুন করে গিয়েছে, কেন, কে করল? সমস্ত বুকটা নিংড়ে যেন অসহায় বিমূঢ় শিবতোষের মুখ থেকে কথাগুলো বের হয়ে এল কেঁপে কেঁপে।

কেন খুন করল, কে খুন করল নির্বাণীতোষকে তা শিখেন্দুই বা কেমন করে বলবে! তবু সে বললে, অস্বাভাবিক মৃত্যু, থানায় তো একটা খবর দিতেই হবে।

বেলতলা রোডে শিবতোষের বাড়ি 'মল্লিক ভিলা', ভবানীপুর থানার আওতারেই পড়ে এবং সেখানকার থানার বড়বাবু অর্থাৎ ও. সি. বীরেন মুখার্জীর সঙ্গে শিবতোষের আলাপও আছে। এদিন রাত্রে বীরেন মুখার্জীও এসেছিলেন উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে।

শিবতোষের বীরেন মুখার্জীর কথা মনে পড়ল, তিনি বললেন, তাহলে বীরেনবাবুকে একটা ফোন করে দাও, শিখেন্দু।

শিখেন্দু আর কালবিলম্ব করে না, বারান্দায়ই ফোন ছিল, দেয়ালের গায়ে ব্রাকেটের উপর বসানো। এগিয়ে গিয়ে থানায় ফোন করল।

ফোন ধরল থানার ছোটবাবু, ভবানীপুর থানা—

ও. সি. আছেন?

তিনি ওপরে ঘুমোচ্ছেন।

তাঁকে একটু বলবেন এখুনি একবার বেলতলা রোডে মল্লিক ভিলায় আসতে।

ছোটবাবু রণজিৎ সিন্‌হার মল্লিক ভিলাটা ও তাঁর অধিকারী শিবতোষ মল্লিক অপরিচিত নয়। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন? কি দরকার?

দেখুন এ বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে—

ঐ বাড়িতে তো আজ উৎসব ছিল—

হ্যাঁ, তাঁর ছেলের বৌভাত ছিল—

তা হঠাৎ আবার কি দুর্ঘটনা ঘটল ?

তাঁর ছেলে—

কি হয়েছে তাঁর ?

সে মারা গেছে।

মারা গেছে—নির্বাণীতোষবাবু ! শিবতোষবাবুর একমাত্র ছেলে !

হ্যাঁ।

কি করে মারা গেল ? কি দুর্ঘটনা ঘটল ? কখন ?

সে তো বলতে পারব না—ঘণ্টা দুই আগে. তিনতলায় তার শোবার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে তাকে ছোরাবিদ্ধ মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—

সে কি—কি বলছেন !

হ্যাঁ। ও. সি-কে পাঠিয়ে দিন, না হয় আপনিই একবার আসুন।

এখুনি আসছি।

শিখেন্দু ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

কেউ বারান্দায় নেই।

সবাই শিবতোষবাবুকে ঘিরে তখনও তাঁর ঘরের মধ্যেই নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই বীরেন মুখার্জী, থানার ও. সি. নিজেই এসে হাজির হলেন।

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে, অত্যন্ত কর্মঠ ও তৎপর একজন অফিসার। এতদিন তাঁর প্রমোশন হওয়া উচিত ছিল, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সুনজরে না থাকার দরুন আজ পর্যন্ত কোন প্রমোশনই হয়নি। তার জন্য বীরেন মুখার্জীর অবিশ্যি কোন দুঃখও নেই। লম্বা চওড়া বেশ বলিষ্ঠ গঠন।

জীপের শব্দ শুনে শিখেন্দুই নীচে নেমে এসেছিল, তার সঙ্গেই প্রথমে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল বীরেন মুখার্জীর, গেটের ভিতরে ঢুকে জীপ থেকে নামতেই।

দুপাশে বিরাট লনে তখনও প্যাণ্ডেলের মধ্যে আলো জ্বলছে।

বীরেন মুখার্জী বললেন, শিবতোষবাবু কোথায় ?

চলুন ওপরে দোতলায়, তাঁর ঘরে—

আপনি কে ?

আমি এ বাড়ির কেউ নই—শিবতোষবাবুর বাল্যবন্ধু সুখেন্দু বিশ্বাসের ছেলে আ।
—আমার নাম শিখেন্দু বিশ্বাস।

উৎসবের ব্যাপারেই বোধ হয় এসেছিলেন আপনি ?

নির্বাণীতোষ আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গেই আমরা ডাক্তারী পাস করেছি। গত দশদিন থেকেই এ বাড়িতে আমি আছি।

নির্বাণীতোষবাবু আপনার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন ?

হ্যাঁ।

ফোন করেছিল কে থানায় ?

আমিই।

চলুন—বীরেন মুখার্জী একজন কনস্টেবলকে নীচে রেখে অন্য একজনকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগুলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বীরেন মুখার্জী প্রশ্ন করলেন, মৃতদেহ ডিসটার্ব করা হয়-নি তো ?

না। তিনতলায় তার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যেই এখনও আছে, শিখেন্দু বললে।

দুদিনের খাটাখাটুনির ক্লান্তিতে যারা হাঁপ ছেড়ে বিশ্রামের জন্য শয্যা নিয়েছিল, তারা সবাই একে একে জেগে উঠেছে ততক্ষণে। বাড়িতে উৎসব উপলক্ষে দুই মেয়ে এসেছে, বড় মেয়ে স্মৃতি—তার জামাই বীরেন, ছোট মেয়ে স্বাতী—তার জামাই ভবেশ, শিবতোষের একমাত্র বোন রাধারাণী—তার ছোট ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে এসেছে, ভগ্নী-পতি সমরবাবু আসতে পারেননি।

তাছাড়া চাকর ও দাসীরা। তাদের মধ্যে দুজন ভৃত্য অনেক দিন ধরেই শিবতোষের গৃহে আছে, গোকুল আর রাজেন। দাসী বেলা, রাঁধুনীবামুন নরেন আর শিবতোষের গৃহ-সরকার যতীশ সামন্ত।

যতীশ সামন্তও বছর দশেক আছেন ঐ বাড়িতে। বয়েস হয়েছে তা প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন। অকৃতদার মানুষ, ঐ বাড়ির নীচের তলাতেই একটা ঘরে থাকেন।

অন্যান্য দূর ও নিকট-সম্পর্কের আত্মীয় যারা এসেছিল, তারা উৎসব চুকে যাবার পর যে যার গৃহে চলে গিয়েছিল।

সবাই জেগে উঠেছিল। সবাই দুঃসংবাদটা শুনেছিল।

সবাই যেন সংবাদটা শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই বাড়িটাও একেবারে স্তব্ধ।

যতীশ সামন্তই সংবাদটা পেয়ে সানাইওয়ালাদের থামিয়ে দিয়েছিলেন।

বাড়িতে কে কে আছেন ? বীরেন মুখার্জী জিজ্ঞাসা করলেন।

শিখেন্দুই বলে গেল কে কে আছে।

শিবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন ? শিখেন্দু প্রশ্ন করে।

না। আগে চলুন ডেড্‌বডিটা দেখে আসি। বীরেন মুখার্জী বললেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলার বারান্দা অতিক্রম করে দুজনে গিয়ে নির্বাণীতোষের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করল।

বিরাট একটা খাট, দামী শয্যা বিছানো। খাটটা ফুলে ফুলে সাজানো। রজনী-গন্ধার মৃদু সুবাস ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

ঘরে কেউ ছিল না।

দীপিকার জ্ঞান হবার পর তাকে স্বাতী ও স্মৃতি নীচে দোতলায় নিয়ে গিয়েছিল।

শিবতোষ মল্লিক শহরের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি। তাঁর যে কেবল অর্থ ও সম্পদের জন্যই সমাজে তিনি পরিচিত ছিলেন তা নয়, নানা সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি নানাভাবে জড়িত বলে ঐ অঞ্চলে তাঁর একটা বিশেষ পরিচয়ও আছে।

মানুষটি নিরহংকারী সদালাপী ও সহৃদয় বলে পাড়ার সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। বীরেন মুখার্জীর সেটা জানা ছিল ঐ তল্লাটে থানা-অফিসার হিসাবে। ঐ থানায় বীরেন মুখার্জী বছর দুই হল এসেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে শিবতোষ মল্লিকের সঙ্গে বীরেন মুখার্জীর বেশ আলাপও আছে। আজ তাঁর একমাত্র ছেলের বৌভাত উৎসবে নিমন্ত্রিতও হয়েছিলেন, এসেওছিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারেননি। রাত দশটা নাগাদ চলে গিয়েছিলেন।

নির্বাণীতোষ নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা করে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছিল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন মুহূর্তের জন্য যেন বীরেন মুখার্জী। এই সুন্দর স্নিগ্ধ পরিবেশে এমন একটি উৎসবের রাত, তারই মধ্যে নিষ্ঠুর মৃত্যু রক্তক্ষরণ করেছে।

পুলিস অফিসার হিসাবে বহুবার তাঁকে এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু আজ যেন ঐ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ কেমন বিব্রত বোধ করেন।

শিখেন্দুর মুখের দিকে তাকালেন বীরেন মুখার্জী, শিখেন্দু বাথরুমের খোলা দরজার দিকে তাকাল।

বীরেন মুখার্জী এগিয়ে গেলেন বাথরুমের দিকে, একটা জল পড়ার শব্দ শোনা গেল।

নির্বাণীতোষের মৃতদেহটা ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে ছিল। উপুড় হয়ে পড়ে আছে

মৃতদেহটা, মুখটা বাঁদিকে কাত করা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মৃতদেহটার দিকে বীরেন মুখার্জী।

ছোরা প্রায় আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে বাঁ দিকের পৃষ্ঠদেশে ঠিক স্ক্যাপ্‌লার বর্ডার ঘেঁষে। ছোরাটার বাঁটটা কাঠের।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ছোরার বাঁটটা ধরে শক্ত করে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছোরাটা বের করে আনলেন বীরেন মুখার্জী।

ধারাল ছোরার ফলাটা তীক্ষ্ণ।

ছোরাটা টেনে বের করতে গিয়েই বুঝলেন বীরেন মুখার্জী, কত জোরে ছোরাটা বেচারীর পৃষ্ঠদেশে বেঁধানো হয়েছিল—যার ফলে ফলাটার সবটাই প্রায় ঢুকে গিয়েছিল দেহের মধ্যে, হয়ত আঘাতের প্রচণ্ডতার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও হয়েছে।

কিন্তু যে-ই ছোরাটা মেরে থাকুক, তার হাতের কব্জীর জোর নিশ্চয়ই আছে। ছোরাটা খুব ছোট নয়—একেবারে ফলাটা ছ ইঞ্চি মত হবে, বাঁটটা চার ইঞ্চির মত। সর্বমোট বারো ইঞ্চি মত লম্বা। তীক্ষ্ণ ধার, ইস্পাতের তৈরী ছোরাটা, ফলাটা ঝক্‌ঝক্ করছে।

বেসিনের ঠিক সামনাসামনিই হাতদেড়েক ব্যবধানে মৃতদেহটা পড়ে আছে। বেসিনের দিকে তাকালেন বীরেন মুখার্জী।

বেসিনের কলটা খোলা, জল পড়ে যাচ্ছে। বেসিনের মধ্যে শূন্য একটা কাঁচের গ্লাস, গ্লাসটা তুলে পাশে রাখলেন বীরেন মুখার্জী। বীরেন মুখার্জী কলের প্যাচটা ঘুরিয়ে কলটা বন্ধ করে দিলেন।

বড় সাইজের বাথরুম। বাথরুমের দেয়ালে চারপাশে একমানুষ সমান উঁচু ইটালীয়ান টাইল্‌স্ বসানো, মেঝেটা মোজাইক করা, বেসিনের সামনে একটা আর্শী লাগানো দেয়ালে। তারই নীচে একটা শেল্‌ফে নানাবিধ পুরুষের প্রসাধন দ্রব্য ও সেভিং সেট সাজানো।

দুটি দরজা বাথরুমের। একটা ঘরের সঙ্গে, অন্যটা বোধ হয় মেথরদের যাতায়াতের জন্য। দরজাটা লক করা ছিল ভিতর থেকে। খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলেন বীরেন মুখার্জী একবার। তাঁর অনুমান মিথ্যে নয়, দরজার বাইরেই সরু বারান্দা এবং ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

নীচে তাকালেন বীরেন মুখার্জী, বাড়ির পশ্চাৎ দিক সেটা, উৎসবের জন্য সেখানেও প্যাণ্ডেল করা হয়েছিল। নীচের প্যাণ্ডেলে তখনও আলো জ্বলছে।

আবার বাথরুমের মধ্যে এসে ঢুকলেন বীরেন মুখার্জী। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

তাং ঐ সময় তাঁর নজরে পড়ল ছোট একটা সেলোফেন কাগজের টুকরোর মত —বসিনের নীচেই পড়ে আছে।

কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাগজটা তুলতেই দেখলেন, ছুটো কোস্তোপাইরিনের —াড়ির একটা ছেঁড়া স্ত্রীপ। স্ত্রীপটা পকেটে রেখে দিলেন বীরেন মুখার্জী।

বীরেন মুখার্জী বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে নিষ্ঠুর একটা হত্যাই। আততায়ী যে-ই হোক, আজ রাত্রে বাড়িতে উৎসব ছিল, বহু লোকের সমাগম ঘটেছিল, যাওয়া আসার দ্বারও অবারিত ছিল—আততায়ীর পক্ষে কোনই অসুবিধা হয়নি। হয়ত কোন এক ফাঁকে সুযোগমত ঐ বাথরুমের মধ্যে এসে আত্মগোপন করে থাকতে পারে, তারপর যেই নির্বাণীতোষ বাথরুমে ঢুকেছে, তাকে পিছন থেকে ছোরা মেরে খতম করে আবার এক ফাঁকে ভিড়ের মধ্যে অনায়াসেই সরে পড়েছে।

কাজেই আততায়ীকে খুঁজে বের করা তত সহজ হবে না। তাহলে কানুন অনুযায়ী একটা অনুসন্ধান ও এ-বাড়ির সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে।

তবে এটা ঠিক হত্যাকারী যে-ই হোক, এ-বাড়ি সম্পর্কে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সে জানত এ-বাড়ির সব কিছু। শুধু তাই নয়, আরও একটা কথা মনে হয় বীরেন মুখার্জীর, সম্ভবতঃ আততায়ী বা হত্যাকারী হয়ত এ-বাড়ির বিশেষ একজন পরিচিত জনই। অনুসন্ধান সেদিক দিয়েও শুরু করা যেতে পারে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে এলেন বীরেন মুখার্জী। শিখেন্দু তখনও ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। শিখেন্দু বীরেন মুখার্জীর মুখের দিকে তাকাল।

শিখেন্দুবাবু ?

বলুন !

এ-বাড়ির সঙ্গে যখন বিশেষ আপনার পরিচয় অনেক দিন থেকেই আছে এবং আপনি যখন নির্বাণীতোষবাবুর ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন, ঘটনার সময়ও এখানে উপস্থিত ছিলেন—আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কি জানতে চান বলুন।

যতদূর জানি শিবতোষবাবুর তো ঐ একমাত্রই ছেলে ?

লোকে অবিশ্যি তাই জানে, তবে ব্যাপারটা ঠিক তা নয় কিন্তু—

কি রকম ? আর কোন ছেলে আছে নাকি শিবতোষবাবুর ?

শিবতোষবাবুর ছুই বিয়ে। অবিশ্যি অনেকেই তা জানে না এবং যারা জানত তারাও হয়ত ভুলে গিয়েছে আজ।

সত্যি নাকি !

হ্যাঁ—তাঁর প্রথমা স্ত্রী অবিশ্যি বহুদিন আগেই গত হয়েছেন, এবং শুনেছি, তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক পরেই নির্বাণীর মাকে কাকাবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

প্রথমা স্ত্রী তাহলে নেই?

না। শুনেছি কাকাবাবুর এক সহপাঠীর বোন সান্ত্বনা দেবীকে লুকিয়ে বাবা রায়-বাহাদুরকে না জানিয়ে বিবাহ করেছিলেন।

কার কাছে শুনেছেন কথাটা?

নির্বাণীই একদিন কথায় কথায় বলেছিল।

হুঁ, তারপর?

তারা ছিল অত্যন্ত গরীব মধ্যবিত্ত ছাপোষা গৃহস্থ, কিন্তু সান্ত্বনা দেবী নাকি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই—

বুঝেছি—

তাঁর একটি ছেলে হয়—

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

তা সে ছেলেটি জীবিত আছে?

আছে—তবে—

তবে?

সে লেখাপড়া কিছুই করেনি—

কি নাম তার?

আশুতোষ। শুনেছি কাকাবাবু তাকে পড়াবার, মানুষ করবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে কাকাবাবুর কোন সাহায্যই গ্রহণ করেনি। কাকাবাবুর কাছে আসেওনি কখনও। বরাবর সে তার মামাদের কাছেই থাকত।

কি করে আশুতোষ?

শুনেছি জগদ্দলের জুট মিলে কাজ করে এবং সেখানেই মিলের একটা কোয়ার্টারে থাকে বর্তমানে।

তা আশুবাবুর—তার বাপ শিবতোষবাবুর ওপরে এত বিরাগের কারণই বা কি?

বলতে পারব না।

এ উৎসবে নিশ্চয়ই সে আসেনি?

না।

তাকে দেখেছেন কখনও আপনি?

না।

আপনার বন্ধু নির্বাণীতোষবাবু কখনও দেখেছিলেন তাকে ?

সম্ভবতঃ না।

আশুবাবুর প্রতি তার মনোভাব কেমন ছিল জানেন কিছু ?

নির্বাণীর মত ছেলে হয় না মিঃ মুখার্জী! যেমন নিরহঙ্কার, তেমনি সরল, তেমনি মিশুকে প্রকৃতির মানুষ ছিল সে।

তার মানে, বলতে চান কারুর সঙ্গে কোন শত্রুতারও সম্ভাবনা ছিল না।

না। ঝগড়াঝাঁটি সে কারুর সঙ্গে করেনি। করতে কখনও দেখিনি। তাইতো বুঝে উঠতে পারছি না এখনো মিঃ মুখার্জী, তার মত মানুষের এমন কে শত্রু থাকতে পারে যে তাকে এমন করে খুন করে গেল!

আচ্ছা এ-বাড়ির চাকরবাকররা নিশ্চয়ই সন্দেহের বাইরে ?

গোকুল আর রাজেন—না, ওদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। তাছাড়া এ বাড়িতে অনেক কালই ওরা আছে।

তাঁর বন্ধুবান্ধব তো ছিল ?

তা ছিল।

তাদের মধ্যে বেশী ঘনিষ্ঠতা কার কার সঙ্গে ছিল নির্বাণীতোষবাবুর বলতে পারেন ?

সকলের সঙ্গেই ও মিশত, সকলেই ওকে লাইক করত। তবে ঘনিষ্ঠতার কথা যদি বলেন, সঞ্জীব, পরেশ আর নির্মলকান্তির সঙ্গে একটু বেশীই ঘনিষ্ঠতা ছিল বোধ হয়। তারা সবাই আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড। তবে ওদের মধ্যে নির্মল আমাদের সিনিয়র ছিল, এখনও ফাইন্যাল এম. বি. পাস করতে পারেনি। শিখেন্দু বললে।

আর সঞ্জীব ও পরেশবাবু ?

তারাও পাস করতে পারেনি।

তারা আজ আসেনি উৎসবে ?

সঞ্জীব ও পরেশ এসেছিল, নির্মলকান্তি আসেনি বোধ হয়। কারণ তাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

কেন ? আসেননি কেন নির্মলবাবু ?

তা বলতে পারব না।

ঠিক আছে, নীচে চলুন। দীপিকা দেবীকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

জ্ঞান হওয়া অবধি সে তো কোন কথাই বলছে না।

কিছুই বলেননি ?

কে? কে এমন করে তাকে হত্যা করে গেল? নিঃসন্দেহে তার কোন শত্রু কিন্তু নির্বাণীতোষের কোন শত্রু ছিল, কথাটা যেন আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ছেলেকে আর শিবতোষ ফিরে পাবেন না ঠিকই, কিন্তু যেমন করেই হোক তা খুঁজে বের করতেই হবে—এ কাজ কার! কে হত্যা করেছে নির্বাণীতোষকে!

কথাটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একসময় একজনের কথা মনের মধ্যে উদয় হয় শিবতোষের। পুলিস হয়ত কোনদিনই হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে পারবে না, তারা হয়ত নিয়মমাফিক খানিকটা অনুসন্ধান চালাবে, তারপর সাধারণত যা ঘটে থাকে তাই ঘটবে, সমস্ত ব্যাপারটাই ফাইল-চাপা পড়ে যাবে।

কিন্তু শিবতোষের তা হলে তো চলবে না। তাকে জানতেই হবে হত্যাকারী কে? কেন সে হত্যা করল? কি অপরাধ করেছিল নির্বাণীতোষ যে তাকে নিহত হতে হল?

কিন্তু কেমন করে হত্যাকারীকে তিনি খুঁজে বের করবেন। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সেই মানুষটির কথা মনে পড়ে। বছর দুই পূর্বে পরিচয় হয়েছিল মানুষটির সঙ্গে ঘটনা-চক্রে শিবতোষের। তাঁরই এক কর্মচারী তাঁর চেকের সই জাল করে অনেকগুলো টাকা তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছিল। একবার নয়, চার-পাঁচ মাস ধরে থোকে থোকে প্রায় হাজার ত্রিশেক টাকা তুলে নিয়েছিল।

যে ব্যাঙ্ক থেকে দ্বিজেন অর্থাৎ সেই কর্মচারীটি টাকা তুলেছিল তাঁর সই জাল করে, সেই ব্যাঙ্ক থেকে বড় একটা টাকা তুলতেন না শিবতোষ। মধ্যে মধ্যেই জমাই দিতেন কেবল টাকা। শিবতোষের বিশেষ এক পরিচিত ভদ্রলোকের ছেলে ঐ দ্বিজেন দত্ত। সেই ভদ্রলোক হঠাৎ হাইপারটেনশনে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং শিবতোষকে অনুরোধ করায় তিনি দ্বিজেনকে নিজের অফিসে চাকরি দিয়েছিলেন, বছর দেড়েক অত্যন্ত সততার পরিচয় দিয়েছিল দ্বিজেন, যাতে করে শিবতোষের বিশ্বাস জন্মায় দ্বিজেনের ওপর।

দ্বিজেনের হাত দিয়ে অনেক সময় টাকা জমা দিয়েছেন এবং ব্যাঙ্ক থেকেও টাকা তুলেছেন চেক দিয়ে, হঠাৎই ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন শিবতোষ সেই ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে, অনেক টাকা থোকে থোকে তোলা হয়েছে ঐ ব্যাঙ্ক থেকে—অথচ গত আট-ন মাসের মধ্যে ঐ ব্যাঙ্ক থেকে কোন টাকাই তিনি তোলেননি, সবই ছিল বেয়ারার চেক, এবং খোঁজ নিতে গিয়ে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ যখন চেকগুলো পেশ করল, তখন তিনি তো হতবাক। অবিকল তাঁরই সই।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন শিবতোষ। কে তাঁর সই জাল করে টাকা তুলল!

সময়ই এক পরিচিত ভদ্রলোক তাঁকে কিরীটী রায়ের সন্ধান দেন। এবং কিরীটী য়েই শেষ পর্যন্ত জালিয়াতকে ধরে দেয়।

সেই থেকেই আনা-শোনা ও পরিচয়। মানুষটির অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় হয়েছিলেন শিবতোষ। হঠাৎ তাঁরই কথা মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন এবং র ঘরে যে নিজস্ব ফোন ছিল, তার রিসিভার তুলে ডায়েল করলেন।

রাত তখন প্রায় তিনটে।

কিছুক্ষণ রিং হবার পরই অপর প্রান্ত থেকে সাড়া এল, কিরীটী রায় কথা বলছি।

কিরীটীবাবু, আমি শিবতোষ মল্লিক—

এত রাত্রে কি ব্যাপার মল্লিক মশাই!

একবার এখুনি দয়া করে আমার বেলতলার বাড়িতে আসবেন?

ব্যাপার কি? হঠাৎ কি হল এখন? আজ রাত্রে তো আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম আপনার একমাত্র ছেলের বৌভাতের—

সেই ছেলে—

কি হয়েছে!

তাকে কেউ খুন করে গেছে।

সে কি!

হ্যাঁ, একবার দয়া করে আসুন, পুলিসও এসেছে—

ঐ সময়ই বীরেন মুখার্জী ও শিখেন্দু ঘরে প্রবেশ করে।

দেরি করবেন না মিঃ রায, যদি বলেন তো গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বললেন শিবতোষ ল্লিক।

না না, তার কোন প্রয়োজনই নেই, আমি আসছি।

শিবতোষ ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। এবং ঘুরে দাঁড়াতেই বীরেন খার্জী ও শিখেন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হল।

বীরেনবাবু দেখলেন? শিবতোষ প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ।

কিছু বুঝতে পারলেন?

আজ তো এ বাড়িতে উৎসব ছিল, অপরিচিত অনেক লোক আসা-যাওয়া করেছে, ত্যাকারী তাদেরই মধ্যে কেউ—

সেটা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় বীরেনবাবু, কিন্তু কে—কখন ওকে খুন করে গেল? বাড়ির সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে এবং আরও অনুসন্ধান না করে এই মুহূর্তে সেটা

বলা তো সম্ভব নয় শিবতোষবাবু। বীরেন মুখার্জী বললেন।

শুনুন বীরেনবাবু, ছেলেকে আর আমি ফিরে পাব না কোনদিনই জানি, কিন্তু কে কাজ করল সেটা আমাকে যেমন করে যে উপায়ে হোক জানতেই হবে।

আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করব শিবতোষবাবু, কিন্তু একটু আগে ফোনে আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন ?

করীটি রায়।

তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি ?

আছে। তাই তাঁকে আসতে বললাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত যদিও হয়নি, কিন্তু ওঁর নাম আমি শুনেছি, শুনে খুব খুশি হলাম তিনি আসবেন।

এ বাড়িতে যাকে যা জিজ্ঞাসা করবার আপনি করতে পারেন বীরেনবাবু, শিখেন্দু আপনার সঙ্গে থাকবে, ঐ আপনাকে সাহায্য করবে। শিখেন্দু আমার বন্ধু-পুত্রই নয় কেবল, ও এ-বাড়ির ছেলের মত, আমার ছেলের ক্লাস-ফ্রেণ্ড। এ বাড়ির কোন কিছুই ওর অজানা নেই। কোন কিছু যদি জানবার দরকার হয় আপনার, ওকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

হ্যাঁ, উনি যে আপনার বন্ধু-পুত্র এবং এ-বাড়ির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, আপনার ছেলের ক্লাস-ফ্রেণ্ড, সবই ওঁর কাছ থেকে আমি জেনেছি। বীরেন মুখার্জী বললেন। তার পর একটু থেমে বীরেন আবার বললেন, আপনাকেও আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—

বলুন কি জানতে চান ?

আপনার আর এক স্ত্রী ছিলেন, তিনি আজ মৃত—

একটু যেন চমকে উঠলেন শিবতোষ। বললেন, কার কাছে শুনলেন ?

কথায় কথায় শিখেন্দুবাবুই বলছিলেন একটু আগে, আগের স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তানও আছে আপনার।

শিবতোষ শিখেন্দুর মুখের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে বেশ বিরক্তি স্পষ্টই হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে যেন সামলে নিয়ে বীরেন মুখার্জীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু সে ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে বলে আপনার মনে হচ্ছে নাকি ?

কোন্ ঘটনার সঙ্গে কোন্ ঘটনার যে কি সম্পর্ক থাকে বা থাকতে পারে, সে কি কেউ বলতে পারে শিবতোষবাবু ?

শিবতোষ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বিয়ের পর সে স্ত্রী আমার বছর কয়েক মাত্র বেঁচেছিল,

"র তার একটি ছেলেও আছে। নির্বাণীর চেয়ে সে বছর চারেকের বড়, কিন্তু সে ছেলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কেন?

ছেলে যদি বাপের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চায়—তো বাপ কি করতে পারে?

তা ঠিক, কিন্তু তার কি কোন কারণ আছে?

আমার দিক্ দিয়ে অন্ততঃ জানি কিছু নেই, তার দিক থেকে থাকতে পারে।

কিছু অনুমান করতে পারেন না?

না।

একটা কথা—

বলুন?

সে যখন আপনারই ছেলে, আপনার সম্পত্তিতে নিশ্চয়ই তার অধিকার আছে?

সে-সব কথা আমি আজ পর্যন্ত ভাবিনি।

কেন?

ভাববার প্রয়োজন হয়নি বলে। কিন্তু এ-সব অবান্তর প্রশ্ন কেন ব ঝতে পারছি না।

এনকোয়ারীর ব্যাপারে আমাদের সব কিছুই জানা দরকার।

ঠিক আছে। আপনার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন?

আপনার প্রথম পক্ষের সেই ছেলে কখনও এ বাড়িতে আসেনি?

সে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি, একটু আগেই তো সে কথা আপনাকে বললাম।

সে না এলেও আপনি তার কোন খোঁজখবর রাখেন না?

না।

বড় হবার পর তাকে দেখেছেন? মানে কখনও আপনাদের পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

না না, যেন একটু ইতস্ততঃ করেই কথাটা উচ্চারণ করলেন শিবতোষবাবু।

তারপরই যেন একটু রূঢ় অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয়ই আর কিছু আপনার জিজ্ঞাসা করবার নেই দারোগাবাবু আমার অতীত জীবন সম্পর্কে! প্লিজ, আমাকে যদি একটু একা থাকতে দেন—

স্পষ্টভাবে না বললেও একপ্রকার যেন বললেনই শিবতোষবাবু বীরেন মুখার্জীকে অতঃপর ঘর ছেড়ে যাবার জন্য।

বীরেন মুখার্জী শিখেন্দুকে চোখের ইশারা করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। শিখেন্দু তাঁকে অনুসরণ করল।

বারান্দায় পা দিয়ে বীরেন মুখার্জী বললেন, মিঃ মল্লিক আমাদের—পুলিসকে যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না।

না না, সে-রকম কিছু নয়, বুঝতে পারছেন পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে উনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন!

তা হয়ত পেয়েছেন শিখেন্দুবাবু, কিন্তু উনি ওঁর ব্যালেন্স হারাননি, যা এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক।

বরাবরই লক্ষ্য করেছি, অতি বড় বিপর্যয়েও উনি যতই বিচলিত হোন না কেন, ধৈর্য ও বিচারবুদ্ধি উনি হারান না। অদ্ভুত স্ট্রেংথ্ অব মাইণ্ড!

তাই মনে হল। যাক গে, বাড়ির সকলকেই আমি কিছু কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

তাহলে নীচে চলুন, নীচের পারলারে বসেই আপনি যাকে যা জিজ্ঞাসা করবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।

তাই চলুন।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওরা এসে পারলারে বসল।

বেশ প্রকাণ্ড আকারের একটি হলঘর। দামী সোফা সেট, মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো। উৎসবের জন্য বোধ হয় আরও অনেক চেয়ার পাতা হয়েছিল পারলারে; সেগুলো সরানো হয়নি। যেমন ছিল তেমনি আছে।

আলোও জ্বলছিল ঘরের। গোটা দুই সিলিং ফ্যান তখনও বন্‌বন্ করে ঘুরছিল।

ঘরের এক কোণে একটা বিরাট গ্রাণ্ডফাদার ক্লক, সেকেলে।

রাত সাড়ে তিনটে।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়টা, এখনও রাত্রি-শেষের দিকে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগে।

একটা সোফায় বসলেন বীরেন মুখার্জী।

কাকে কাকে ডাকব বলুন? শিখেন্দু শুধাল।

সবাইকেই, তবে একসঙ্গে নয়, এক এক করে—

বেশ, বলুন কাকে প্রথমে ডাকব?

স্বাতী দেবীকে আগে ডাকুন, তারপর তাঁর দিদি স্মৃতি দেবীকে ডাকবেন।

আপনি বসুন, আমি ডেকে নিয়ে আসছি স্বাতীকে। শিখেন্দু ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং একটু পরেই স্বাতীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

বসুন স্বাতী দেবী, বীরেন মুখার্জী বললেন।

আমি দাঁড়িয়েই আছি, আপনি কি জানতে চান? স্বাতীর কণ্ঠস্বর অসহিষ্ণু ও বিরক্ত শোনে হল।

আজ রাত্রে বৌকে কোথায় বসানো হয়েছিল?

দোতলার একটা ঘরে। স্বাতী বললে।

সেখান থেকে কখন বৌকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়?

বোধ হয় রাত পৌনে বারটা কি বারটা হবে তখন।

কে নিয়ে গিয়েছিল বৌকে ওপরে?

আমিই দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে আসি নীচে নেমে।

সে-সময় বারান্দার তিনতলায় কাউকে দেখেছিলেন?

স্বাতী জবাব দেবার আগেই কিরীটী এসে পারলারে ঢুকল। সকলেই কিরীটীর দিকে তাকাল একসঙ্গে।

কিরীটী ঘরের মধ্যে উপস্থিত তিনজনের মুখের দিকেই পর্যায়ক্রমে একবার তাকিয়ে নিল। তারপর শিখেন্দুর দিকেই তাকিয়ে বললে, শিবতোষবাবুকে একটা খবর দিতে পারেন?

চলুন ওপরে, কাকাবাবু ওপরে তাঁর ঘরের মধ্যেই আছেন। শিখেন্দু বললে কিরীটীর কথাটা শেষ করার আগেই। বীরেন মুখার্জীর পরনে ইউনিফর্ম ছিল, তাই তাঁর সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও কিরীটী অনুমানেই বুঝতে পারে তিনি একজন পুলিসেরই অফিসার। এবং সেই অনুমানের ওপরেই নির্ভর করে বীরেনের দিকে তাকিয়ে বললে, মনে হচ্ছে আপনিই এ এলাকার থানা-অফিসার!

জবাব দিল শিখেন্দুই, হ্যাঁ মিঃ রায়, উনিই এখানকার থানা-অফিসার বীরেন মুখার্জী।

নমস্কার, আমি কিরীটী রায়। কিরীটী বললে।

নমস্কার। বীরেন বললেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি বটে, তাহলেও আপনার নাম আমি অনেকই শুনেছি—আমাদের ডি. সি. চাটুয্যে সাহেব তো আপনার প্রশংসায় একেবারে উচ্ছ্বসিত—

শিবতোষবাবু আমার বিশেষ পরিচিত, তাঁর ছেলে ডাঃ নির্বাণীতোষ মল্লিককেও আমি চিনতাম—আজ এখানে আমি নিমন্ত্রণে এসেছিলামও।

আমিও এসেছিলাম কিরীটীবাবু।

আপনিও এসেছিলেন?

হ্যাঁ—বসুন না।

কিরীটী বীরেন মুখার্জীর আহ্বানে তাঁর সামনেই একটা সোফায় উপবেশন করল।

তারপর প্রশ্ন করল, মৃতদেহ দেখেছেন ?

হ্যাঁ—মোটামুটি যা দেখবার দেখেছি, ভাবছিলাম এবারে এ-বাড়ির লোকদের জবাঃ বন্দি নেব। বীরেন মুখার্জী অতঃপর যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন. সংক্ষেপে ব-, গেলেন।

সব শুনে কিরীটী কেবল একটা কথাই বললে, শিবতোষবাবুর দুই বিয়ে ? আগে স্ত্রীর একটি সন্তানও আছে ?

তাই তো শুনেছি। প্রথমা স্ত্রী সান্ত্বনা দেবীর মৃত্যুর বছরখানেক বাদে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

প্রথমা স্ত্রী কি এ বাড়িতে কখনও আসেননি ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

জবাব দিল শিখেন্দু, না, আসেননি।

চার বছর তো বেঁচেছিলেন—

তা ছিলেন, তবে রায়বাহাদুর প্রিয়তোষ মল্লিক কাকাবাবুর প্রথমা স্ত্রীকে কোনদিনই স্বীকার করেননি।

স্বাভাবিক। তাঁকে যতটুকু আমি দেখেছিলাম, আভিজাত্য ও অর্থের অহঙ্কার একটু বেশী মাত্রাতেই ছিল। কাজেই তাঁর পক্ষে তাঁর পুত্রের—তাঁর জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে বিশেষ করে, এক সাধারণ গরীবের ঘরের মেয়েকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নেওয়া একটু কষ্টকর বৈকি।

আপনি তাঁকে দেখেছিলেন কিরীটীবাবু ? বীরেন মুখার্জী প্রশ্ন করলেন।

দেখেছি, মাত্র বছর কয়েক আগেই তো তিনি মারা গেছেন। কিরীটী বললে।

আমার মনে হয়, শিবতোষবাবুর অতীত জীবনের ব্যাপারে কোথায়ও একটা জট পাকিয়ে ছিল—নচেৎ তাঁর ছেলে জীবনে কখনও এ-বাড়িতে পদার্পণ করল না কেন ? বীরেন মুখার্জী বললেন।

থাকাটা কিছু অসম্ভব নয় বীরেনবাবু ! যাক, আপনি তাহলে আপনার কাজ করুন। আমি এবার শিবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করে তিনতলায় মৃতদেহটা দেখে আসি।

ঠিক আছে, আপনি যান। আপনি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।

না না—আমার জন্য আপনাকে বসে থাকতে হবে না। আমি না হয় কাল দিনের বেলা কোন একসময়ে আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। শিবতোষবাবু আমার বিশেষ পরিচিত, তাছাড়া আপনার সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করাই সম্ভবপর নয়।

বীরেন মুখার্জীর মুখের ভাব দেখে মনে হল কিরীটীর শেষের কথায় তিনি যেন একটু খুশিই হয়েছেন। আমি তাহলে ওপর থেকে ঘুরে আসি !

আসুন।

চলুন শিখেন্দুবাবু, কিরীটী বললে।

চলুন।

বাড়িটা তেমনি স্তব্ধ। সর্বত্র তেমনি তখনও আলো জ্বলছে।

নির্বাণীতোষের মা কল্যাণী দেবীর কান্নার শব্দটা তখন আর শোনা যাচ্ছে না। বারান্দা অতিক্রম করে কিরীটী শিখেন্দুর পেছনে পেছনে এসে শিবতোষবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। শিবতোষ তখনো তেমনি করেই তাঁর ঘরের মধ্যে আরামকেদারাটার ওপর বসে আছেন মুহ্যমানের মত।

সমস্ত মুখে একটা অসহায় বেদনার ক্লান্তি। পদশব্দে মুখ তুলে তাকালেন শিবতোষ, আসুন কিরীটীবাবু—

আপনি উঠবেন না। বসুন মল্লিক মশাই।

শিবতোষ উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন কিন্তু কিরীটীর কথায় আর উঠলেন না, বসেই রইলেন।

আমি জানি কিরীটীবাবু, আপনি ঠিক বের করতে পারবেন—কে অমন নিষ্ঠুরভাবে খোকাকে খুন করে গিয়েছে। শিখেন্দু—শিবতোষের গলাটা যেন কান্নায় বুজে এল।

আজ্ঞে? শিখেন্দু তাকাল শিবতোষের মুখের দিকে।

দারোগাবাবু চলে গেছেন?

না। নীচে এখন সকলের জবানবন্দি নেবেন। স্বাতীর জবানবন্দি নিচ্ছেন।

তুমি তাহলে নীচেই যাও।

শিখেন্দু নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং শিখেন্দু ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবতোষ বললেন, ভদ্রলোক একটু বেশি মাত্রায়ই যেন ইনকুইজিটিভ। যেটা আমার একেবারেই ভাল লাগেনি কিরীটীবাবু।

পুলিস তো সব কিছুই একটু সন্দেহের চোখে দেখবে—প্রশ্ন করবে শিবতোষবাবু।

তা করে করুক না, তাই বলে আমার ব্যক্তিগত জীবনে অতীতে কার কি ঘটেছে—সে ব্যাপারে এত অনাবশ্যক কৌতূহল কেন? আর আমার নিজের অতীতের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে খোকার খুনের সম্পর্কই বা কি! আর ঐ শিখেন্দুই বা যে কেন বলতে গেল আমি আমার বাড়ির অমতে এবং বাবাকে না জানিয়ে প্রথমবার বিয়ে করেছিলাম, সে স্ত্রী নেই—

হয়ত কিছু ভেবেই দারোগাবাবু প্রশ্নটা করেছেন। তারই উত্তর দিয়েছেন শিখেন্দু-বাবু। কিরীটী শান্ত গলায় জবাব দিল।

তবু বলব—অহেতুক, অনাবশ্যক কৌতূহল। আমি আমার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করব,

সে-বিষয়ে কিছু কখনও ভেবেছি কিনা—

সেটাও হয়তো আপনার আর একটি সন্তান আছে জেনেই করেছিলেন তিনি।

সে আমাকে তার বাপ বলেই জীবনে কখনও স্বীকার করেনি, কোন সম্পর্কই আমার সঙ্গে রাখেনি—কাজেই সে থাকা না-থাকা দুই সমান—

তাহলেও আইনের দিক দিয়ে আপনার দুই ছেলে যখন, তখন আপনার সমস্ত সম্পত্তির সমান অংশীদার দু'জনে।

আপনি জানেন না কিরীটীবাবু যে দিলেও একটি সম্পদও সে আমার কখনও স্পর্শ করবে না, আমি খুব ভাল করেই জানি সে আমাকে ঘৃণা করে। তার মামারা, তার মামাদের মধ্যে যেমন সে বড় হয়েছে, একটু একটু করে একটা ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে তার মায়ের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। অবহেলা করে তার মাকে আমি মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে দিয়েছি। হ্যাঁ, এটা ঠিক, বাবা তাকে কখনও স্বীকার করে নেবেন না বলে, এ-বাড়ির বধূর যোগ্য মর্যাদা দিয়ে, এখানে তার নিজস্ব গৌরবে, তাকে বিয়ে করা সত্ত্বেও, এনে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি—কিন্তু তার মৃত্যু—

কিরীটী বাধা দেয় না—কোনরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করে না। কারণ সে বুঝতেই পেরেছিল, সম্পূর্ণ ঝোঁকের মাথাতেই জীবনের এক গভীরতম শোকের মুহূর্তে বিহ্বল বিমূঢ় শিবতোষ মল্লিক তাঁর অতীত জীবনের দুঃখের কথা বলে চলেছেন। যে ব্যথাটা হয়ত নিরুপায়, এত বছর ধরে তাঁর বুকের নিভৃতে গুমরোচ্ছে—আজ জীবনের এক চরম শোকের বিহ্বলতায় সেটা আপনা থেকেই বের হয়ে আসছে।

এ তো কান্নারই নামান্তর ছাড়া কিছুই নয়।

অসাধারণ মনের বল ও সংযম ভদ্রলোকের, তাই এখনও হাউ হাউ করে না চেঁচিয়ে ..র হয়ে আছেন, যদিও প্রথম মুহূর্তে ঘটনার আকস্মিক আঘাতে সহসা জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

শিবতোষ যেমন বলছিলেন তেমনি বলতে লাগলেন, সান্ত্বনার মৃত্যুটা—মানে একটু একটু করে তাকে নিঃশেষ হয়ে যেতে, সেদিন আমাকে একপ্রকার যেন নিরুপায় বসে বসেই দেখতে হয়েছিল।

কি হয়েছিল তাঁর?

সারকোমা—বাঁ হাতের হাড়ে সারকোমা। জানি সে রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না, তবু টাকা হাতে থাকলে তাকে আমি বিদেশে নিয়ে গিয়ে শেষ চিকিৎসাটুকু অন্ততঃ করাতে পারতাম, কিন্তু বাবা তখন বেঁচে, সব তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। সামান্য মাসোহারা ছাড়া তখন আর কিছুই আমি পাই না। কিন্তু সে আর কত, চার-পাঁচশো টাকা মাত্র!

তারপরই বোধ হয় অতীত স্মৃতির বেদনায় কয়েকটা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার উদাস কণ্ঠে বলতে লাগলেন শিবতোষ, তবু যাকে দিয়ে আমি বাবাকে বলিয়ে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু লোহার মত কঠিন মন তাঁর কিছুতেই গলল না।

আপনার স্ত্রীও তো নিজে আসতে পারতেন এ-বাড়িতে, তাঁর অধিকারকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য!

যেমন ভীরু তেমনি কোমল প্রকৃতির ছিল সান্ত্বনা, তা সত্ত্বেও সে দু-দুবার এসে বাবার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছে আমাকে না জানিয়েই, প্রথমবার তার ভাইয়েদের সঙ্গে, কিন্তু বাবা দূর-দূর করে সান্ত্বনাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, শেষবারও অসুস্থ অবস্থাতেই মরার মাস দুই আগে এসেছিল এবং সেবারে আমিও সঙ্গে ছিলাম, ঢুকতে দিলেন না বাড়িতে। সান্ত্বনার ছেলের বয়স, মানে আমার সেই বড় ছেলে, তার বয়স তখন আড়াই বৎসর। তার মামাদেরও আমি দোষ দিই না কিরীটীবাবু। সান্ত্বনার বড় ভাই শশী, আমারই ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল, সেও আমাকে বুঝল না।

একটু থেমে শিবতোষ আবার বলতে লাগলেন, সান্ত্বনার মৃত্যুর পর আমি আমার কর্তব্য করতে পারিনি কয়েক বছর। বাবাকে অনেক বলেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার প্রথম সন্তানকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। শেষটায় একবার বলেছিলেন, বেশ কিছু অর্থসাহায্য তাকে করতে পারি, কিন্তু এ বাড়িতে তার স্থান হবে না।

আশ্চর্য কঠিন মন তো ছিল রায়বাহাদুরের!

সে যে কি কঠিন আমিই জানি। তারপর নিজের ইচ্ছেমত যখন খরচ করবার সুযোগ এল আমার জীবনে, ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, কিন্তু সে দেখাও করল না। ভাবতে পারেন কিরীটীবাবু, লক্ষপতি শিবতোষ মল্লিকের ছেলে লেখাপড়া করল না, কিছু না, সাধারণ একটা জুট মিলের শ্রমিক, অর্ডিনারী লেবারার—শিবতোষের গলার স্বর যেন বুজে এল।

চোখে জল নেই, কিন্তু কিরীটীর মনে হচ্ছিল, কান্নায় যেন ভদ্রলোকের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে।

বাবা!

শিবতোষের বড় মেয়ে স্মৃতি এসে ঘরে ঢুকল।

ডাক্তার চৌধুরীকে একবার ফোন করলে হতো না—

কেন?

বৌদি যে জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে বোবা হয়ে বসে আছে, এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলল না। এক ফোঁটা চোখের জলও নেই, আমার যেন কেমন ভাল লাগছে না বাবা।

বেশ ফোন করে দাও।

কি বলব ফোনে ?

আমি ডেকেছি তাই বল। তোমার মা ?

মার তো ঘন ঘন ফিট হচ্ছে।

আমিই ফোন করছি, শিবতোষ উঠে গিয়ে ফোন করতে লাগলেন।

ফোন করে আবার ফিরে এসে বললেন, তোমার মার কাছে গিয়ে বসে থাক।

স্মৃতি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি একবার তিনতলাটা ঘুরে আসি শিবতোষবাবু।

যান।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নির্বাণীতোষের ঘরের সামনে যে পুলিসটি প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, সে চিনত কিরীটীকে, ওকে দেখে বললে, সাব—আপ !

ব্রিজনন্দন তোমারা ডিউটি হ্যায় হিঁয়া ?

জী সাব—আপ অন্দর যায়েঙ্গে ?

হ্যাঁ।

যাইয়ে সাব।

কিরীটী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। দুটি নরনারীর জীবনে প্রথম মিলন-উৎসব রাত্রি, আয়োজনের কোন ত্রুটিই রাখেননি শিবতোষ। দুটি হৃদয়ও উন্মুখ হয়ে ছিল পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করবার জন্য, কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু এসে সে মিলনে ছেদ টেনে দিয়েছে। পরস্পর পরস্পরের দীর্ঘদিনের পরিচিত, তবে তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষিত রাতটি এমন করে ব্যর্থ হয়ে গেল কেন ?

নির্বাণীতোষ আর দীপিকা, তারা কি একবারও টের পায় নি তাদের পেছনে পেছনে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলে এগিয়ে আসছে।

ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করল কিরীটী। শুধু শয্যাই নয়, সমস্ত ঘরটাই ফুলে ফুলে সাজানো। এখনও ফুল ও ফুলের মালাগুলো বাসি হয়নি। শুকিয়ে যায়নি। এখনও রজনীগন্ধার, গন্ধ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে আছে। ঘরের দক্ষিণ দিকে মহার্ঘ্য একটি পালঙ্ক, তার ওপরে দামী শয্যা বিস্তৃত। অন্যদিকে একটি তিন আয়নাওয়ালা ড্রেসিং টেবিল, নানা প্রসাধন দ্রব্য তার ওপর সাজানো। একপাশে একটি সোফা-কাম-বেড। দু'দিককার দেয়ালে সুদৃশ্য ব্র্যাকেট আলো বসানো, টিউব আলো। উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা যেন ঝলমল করছে। ঘরের দেওয়াল হালকা ক্রিম কালারের প্লাস্টিক ইমালশন করা,

দেওয়ালে গোটা দুই ল্যাণ্ডস্কেপ। আর বাঁদিককার দেওয়ালে একটি যুগল ফটো। দুটি হাসিভরা মুখ পাশাপাশি।

নির্বাণীতোষ আর দীপিকা।

খোলা জানলাপথে রাত্রিশেষের হাওয়া ঝিরঝির করে এসে ঢুকছে। বাথরুমের দিকে তাকাল কিরীটী—দরজাটা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে তখনও। আলোটা নেভানো হয়নি। নেভানোর কথা হয়ত কারও মনেও হয়নি।

বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল কিরীটী। ভিতরে পা দিতেই নজর পড়ল, নির্বাণীতোষের নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত দেহটা। পাঞ্জাবির উপর থেকেই একটা ক্ষতস্থান নজরে পড়ে।

কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিরীটী ভূলুণ্ঠিত নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে।

বেসিনের ঠিক সামনেই দেহটা একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বেসিনের ট্যাপটার মুখটা খোলা ছিল, বীরেন মুখার্জী বন্ধ করে দেন, কাঁচের গ্লাসটা বেসিনের ওপরেই রয়েছে। একবার বেসিন ও একবার ভূলুণ্ঠিত দেহটার দিকে তাকাল কিরীটী। গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে নজরে পড়ল গ্লাসটার গায়ে চিড় খেয়ে ফেটে গেছে, গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আবার সামনে তাকাল কিরীটী।

বেসিনের ওপরে একটা আয়না বসানো। কিন্তু বেসিনটা ঘরের দেওয়ালে এমনভাবে বসানো যে শয়নঘর থেকে কেউ বাথরুমে প্রবেশ করলেও বেসিনের সামনের আয়নায় কোন প্রতিচ্ছবি পড়বে না, মেথরদের যাতায়াতের দরজাটার দিকে তাকাল একবার কিরীটী, দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। সে দরজাপথে কেউ এলেও আয়নায় প্রতিচ্ছবি পড়বে না।

মৃতদেহের অবস্থান দেখে মনে হয়, এই বাথরুমের মধ্যেই কেউ নির্বাণীতোষকে পশ্চাৎদিক থেকে ছোরার সাহায্যে চরম আঘাত হেনেছে।

বাথরুমের মেঝেতে একটা কোডোপাইরিন ট্যাবলেটের স্ট্রিপ পাওয়া গিয়েছে। বেসিনের ওপরে একটা কাঁচের গ্লাসও আছে, মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে বন্ধুদের শেষ ব্যাচ খাবার পর নির্বাণীতোষ ওপরে চলে এসেছিল। রাত তখন পৌনে এগারটা। অন্ততঃ শিখেন্দুর কথা যদি ঠিক হয়, ঐ ঘরে তখন কেউ ছিল না, মানে বাড়ির কেউ ছিল না, নতুন বৌ নিচের তলায় তখনও ছিল এবং সেখানেই নতুন বৌকে ঘিরে ছিল ভিড়।

নতুন বৌকে স্বাতী ওপরে ঘরের সামনে যখন ছেড়ে দিয়ে যায়, রাত তখন পৌনে বারোটা কি বারোটা। তার মানে প্রায় একঘণ্টা সময়, পৌনে এগারটা থেকে পৌনে বারোটা, যা কিছু ঘটবার ঘটেছিল, ঐ একঘণ্টা সময়ের মধ্যে কেউ ওপরে এসেছিল কিনা! যদি কেউ এসে থাকে তো সে কে? তারপর শিখেন্দু কখন ওপরে আসে সম্ভবতঃ বারোটার কয়েক মিনিট পরে ও ওপর থেকে চিৎকারের শব্দটা শোনার পর। শিখেন্দু ওপরে

এসেও জানায়নি কিছু। চেঁচামেচি বা ডাকাডাকি করেনি কাউকে। শিবতোষ ওপরে এসে দেখেন শিখেন্দু দাঁড়িয়ে আর মেঝেতে পড়ে আছে জ্ঞান হারিয়ে দীপিকা।

। তিন ।

শিখেন্দু কেন চেঁচিয়ে সকলকে ডাকল না!

হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল? স্বাভাবিক, হওয়াটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। দীপিকাকে ঐভাবে অচৈতন্য অবস্থায় ঘরের কার্পেটের ওপরে পড়ে থাকতে দেখে তার হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়াটা এমন কিছু বিচিত্র নয়।

তবু একটা প্রশ্ন যেন কিরীটীর মনের মধ্যে উঁকি দেয়। শিবতোষের সঙ্গে একত্রে বাথরুমে প্রবেশ করার আগে শিখেন্দু বাথরুমে ঢুকেছিল কিনা, সে আগেই দুর্ঘটনাটা আবিষ্কার করতে পেরেছিল কিনা। যদি পেরে থাকে, পারাটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। এমনও হতে পারে, হয়ত ঘরে ঢুকে মেঝের ওপরে অচৈতন্য দীপিকাকে পড়ে থাকতে. দেখে, সে বাথরুমে আলো জ্বলতে দেখে (?) ঢুকেছিল, তারপর সেখানে বন্ধুর মৃতদেহটা আবিষ্কার করবার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্য।

বুঝে উঠতে পারেনি হয়ত, কি করবে এখন সে? কি করা উচিত? মনেও হয়ত পড়েনি কথাটা ঐ মুহূর্তে। কিংবা এও হতে পারে, ঘরে ঢুকে কাউকে সে দেখতে পায়নি। তখন ওদের খোঁজে বাথরুমে এসে ঢোকে। ঐ বাথরুমের মধ্যেই দুজনকে পড়ে থাকতে দেখে—একজন মৃত, অন্যজন অচৈতন্য। তখন সে দীপিকার অজ্ঞান দেহটা তুলে এনে সবে যখন ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখেছে, শিবতোষ ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকেন।

তাই যদি হয় তো দীপিকার অচৈতন্য দেহটা বাথরুম থেকে বয়ে নিয়ে এল কেন? কি এমন প্রয়োজন ছিল তার? কেনই বা আনতে গেল? বাথরুমে দীপিকা পড়ে থাকলেই বা কি এমন ক্ষতি ছিল? সেটাই তো বরং সকলের চোখে স্বাভাবিক ঠেকত।

দ্রুত একটার পর একটা প্রশ্ন যেন কিরীটীর মনের মধ্যে আসা যাওয়া করতে থাকে। আসে আর যায়, যায় আর আসে।

জানা দরকার কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর। তার অবশ্যই জানা দরকার।

(১) রাত এগারটা থেকে পৌনে বারোটা, এই একঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনতলায় নির্বাণীতোষের শয়নঘরে কেউ এসেছিল কিনা? কিংবা ঐ সময়ে কেউ কাউকে তিনতলায় আসতে দেখেছিল কিনা?

(২) শিখেন্দু বীরেন মুখার্জীর কাছে যা বলেছে, তা একেবারে নিভূল সত্য কিনা ?

(৩) শিখেন্দুও দীপিকার সহপাঠী, সেও কি ভালবাসত মনে মনে দীপিকাকে! কিংবা দীপিকা সম্পর্কে তার মনের মধ্যে কোথাও কোন দুর্বলতা ছিল কিনা ? অসম্ভব নয় ব্যাপারটা।

(৪) দীপিকা তার স্বামীর হত্যার ব্যাপার সম্পর্কে কিছু জানে কিনা ? সে ঘরে ঢুকে কাউকে দেখেছিল কিনা ?

(৫) সে যদি ঘরে ঢুকে তার স্বামীকে না দেখে বাথরুমেই গিয়ে তার খোঁজে ঢুকে থাকে এবং তখুনি সে মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছিল, না তার চোখের সামনেই হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হয়েছে ? যদি তা না হয়ে থাকে, অর্থাৎ সে বাথরুমে ঢুকেই আবিষ্কার করে থাকে তার স্বামীর মৃতদেহটা, তবে চিৎকার করে উঠে ও সেইখানেই তার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়াটা সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক, ছুটে এসে ঘরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বে কেন ? প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে মনে, এখনও একটা কথাও বলেনি, সেক্ষেত্রে তার ঘরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে ঐ ভাবে পড়ে থাকাটা যেন মন মেনে নিতে চাইছে না!

(৬) স্বামীর মৃত্যুই ঐ আঘাতের কারণ, না অন্য কোন কারণ আছে ঐভাবে মূক হয়ে যাওয়ার ?

(৭) দীপিকাকে কথা বলতেই হবে। সহজে হয়ত সে মুখ খুলবে না, কিন্তু মুখ তাকে খুলতেই হবে!

(৮) হত্যাকারীর পক্ষে আজ রাত্রে এই বাড়িতে আসাটা এমন কিছু কঠিন ছিল না। উৎসবের বাড়িতে অগণিত অতিথি এসেছে, তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে হয়ত সেও এসেছিল কোন এক সময়। তারপর কোন এক ফাঁকে তিনতলায় চলে যাওয়াও তার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। তারপর বাথরুমে হয়ত সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়েছিল। কিন্তু তারপর হত্যা করার পর কোন্ পথে সে গেল ? নিশ্চয়ই বাথরুমের মেথরদের যাতায়াতের দরজার পথে—এখানেও মনের মধ্যে একটা দ্বিধা জাগছে কিরীটীর। কিসের দ্বিধা ? কেন দ্বিধা ? ঘুরে ফিরে আবার শিখেন্দুর কথাই মনে আসছে। শিখেন্দু-দীপিকা-নির্বাণীতোষ। পরস্পরের সহপাঠী। অনেক বছর একসঙ্গে কেটেছে। যার ফলে নির্বাণীতোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বিয়ে। ত্রিকোণ কোন প্রেমের মর্মন্তুদ শেষ দৃশ্য নয়ত নির্বাণীতোষের হত্যার ব্যাপারটা!

(৯) শেষ কথা যেটা কিরীটীর মনে হয়, ঐ হত্যার ব্যাপার, শিবতোষ মল্লিকের প্রথম পক্ষের মৃত স্ত্রীর সন্তান আশুতোষ মল্লিক। যে মানুষটা তার জন্মদাতার প্রতি একটা প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ বরাবর পোষণ করে এসেছে। বাপের সাহায্য কখনও এক

কপর্দকও নেয়নি। চেষ্টা করেও তাকে শিবতোষ তার গৃহে আনতে পারেননি। বাপে
মুখ পর্যন্ত দেখতেও নারাজ। কেন? কিসের এ ঘৃণা, কিসের এ আক্রোশ—যা এত
বছরেও বাপ ও ছেলের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটাকে সহজ হতে দিল না? নিজে সামান্য
চটকলের একজন মজুর, হয়ত লক্ষপতি বাপকে স্বীকার করল না। তার মাকে তা
পিতামহ এ বাড়িতে প্রবেশাধিকার দেয়নি, স্বীকার করেনি কখনও পুত্রবধূ বলে। কিন্তু
বাপ তো তার স্ত্রীকে বরাবরই স্বীকার করেছে! তবে এত ঘৃণা ও এত আক্রোশের কারণ
কী আশুতোষের তার বাপের প্রতি?

(১০) তিনতলায় নির্বাণীতোষের শয়নঘরের দরজাটাও বন্ধ থাকাই তো স্বাভাবিক
ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে খোলা ছিল। কেন?

কথাগুলো প্রশ্নের আকারে কিরীটীর মনের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকলেও, তা
দু'চোখের দৃষ্টি কিন্তু তখনও বাথরুমের সর্বত্র তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে ঘোরা-ফেরা করছিল।

হঠাৎ দেওয়াল ঘেঁষে কিরীটীর চোখ পড়ে। বাথরুমে ঢোকার দরজাটার একটা
পাল্লার ঠিক নিচেই কি যেন ঝিকমিক করছে!

কৌতূহলে এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে জিনিসটা তুলে নিল কিরীটী। ছোট্ট একটি
সোনার ফুলের নাভিদেশে মটরদানার মত একটি হীরকখণ্ড।

আসল এবং দামী হীরে দেখলেই বোঝা যায়। বস্তুটা পরীক্ষা করতে করতে কিরীটীর
মনে হয়, ওটা কোন অলঙ্কারের অংশবিশেষ।

কম করেও হাজার পাঁচ-ছয় টাকা মূল্য হবে হীরকখণ্ডটির। এটা বাথরুমের মধ্যে
কি করে এল!

চিন্তিত মনে সেটি পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল কিরীটী।

বাথরুমে আর কিছু দ্রষ্টব্য আপাততঃ নেই। মৃতদেহটার দিকে শেষবারের মত
তাকিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এল কিরীটী।

শয়নকক্ষটি আর একবার ভাল করে দেখল কিরীটী। শয্যাটি আদৌ ব্যবহৃত হয়নি
বুঝতে কষ্ট হয় না।

মধুরাত্রে মিলনের আগেই মৃত্যু এসে ছোবল হেনেছে। সব কিছুর উপরে সমাপ্তির
রেখা টেনে দিয়েছে।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে এল।

শিবতোষবাবু তখনও বসে আছেন মূহ্যমানের মত।

শিবতোষবাবু!

কে? রায়মশাই, আসুন।

আপনার বৌমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

শিবতোষের খাসভৃত্য গোকুল দরজার বাইরেই ছিল। তাকে ডেকে শিবতোষ বললেন, দেখ তো ছোড়দি কোথায়?

স্বাতীর জবানবন্দি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বড় বোন স্মৃতিকে নিচে পাঠিয়ে দিয়ে সে আবার দীপিকার পাশে গিয়ে বসেছিল। গোকুল তাকে ডেকে নিয়ে এল।

ডাকছ বাবা!

হ্যাঁ। কিরীটীবাবুকে একবার বৌমার কাছে নিয়ে যা।

বৌদি তো এখনও তেমনি বোবা হয়ে আছে বাবা। স্বাতী বললে। কথাটা বলে স্বাতী যেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী সম্মতভাবে বললে, আপনার ভয় বা চিন্তার কোন কারণ নেই স্বাতী দেবী, ওঁকে আমি কোনরকম বিরক্ত করব না।

স্বাতী নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, আসুন।

দুখানা ঘরের পরের ঘরটার মধ্যেই দীপিকা ছিল। কিরীটী স্বাতীর সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। বিবাহের পূর্বে স্বাতী এই ঘরটাতেই থাকত, বিবাহের পর যখন এখানে আসে এই ঘরেই থাকে।

দীপিকার জ্ঞান হবার পর সকলে দীপিকাকে স্বাতীর ঘরেই নিয়ে এসেছিল। বীরেন মুখার্জী যেমন দেখে এসেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই বসেছিল তখনও দীপিকা, মাথাটা নিচু করে। দৃষ্টি ভূমির ওপরে নিবদ্ধ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটী একবার দীপিকাকে দেখে নিল। এবং তার অভিজ্ঞ দৃষ্টি তাকে বুঝিয়ে দেয়, দীপিকার জ্ঞান ফিরে এলেও সে তার স্বাভাবিক চেতনা ফিরে পায়নি। এও বুঝতে পারে কিরীটী, নিদারুণ কোন মানসিক আঘাতেই তার মানসিক চেতনা লুপ্ত হয়েছে। তাকে প্রশ্ন করে কোন লাভই হবে না। কিরীটী লক্ষ্য করে আরও, দীপিকার কপালের বাঁদিকে একটা কালসিটা।

সামনের কিছু চূর্ণ বিপর্যস্ত কুন্তল স্থানভ্রষ্ট হয়ে কপালের ওপর এসে পড়েছে।

কিরীটী পকেট থেকে হীরকখণ্ডটি বের করে স্বাতীর দিকে এগিয়ে ধরে বললে, স্বাতী দেবী, দেখুন তো এটা চিনতে পারেন কিনা?

স্বাতী সোনায় বসানো হীরকখণ্ডটি হাতে নিয়ে দেখেই বলল, কোথায় পেলেন এটা?

জানেন এটা কার?

এটা তো বৌদির সিঁথি-মৌরের সঙ্গে ছিল। মা দিয়েছিলেন এটা বিয়ের পর আশীর্বাদে।

সিঁথি-মৌরটা কোথায় ?

খুলে রেখেছি।

কোথায় দেখি ?

স্বাতী এগিয়ে গিয়ে আলমারি থেকে সিঁথি-মৌরটি বের করে আনল। দেখা গেল স্বাতীর ধারণা মিথ্যে নয়। সিঁথি-মৌরের সঙ্গে যে ছোট্ট সোনার 'এস্' দিয়ে এটা লাগানো ছিল, সেই 'এস্'টা আছে তখনও।

স্বাতী আবার বলল, হ্যাঁ, এটার সঙ্গেই লাগানো ছিল হীরেটা। কোথায় পেলেন এটা ? ওপরের ঘরে ?

কিরীটী স্বাতীর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কেবল বলল, এটা রেখে দিন। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি স্বাতী দেবী ?

কি ?

আপনিই তো আজ রাত্রে আপনার বৌদিকে ওপরে পৌঁছে দিয়ে আসেন ?

হ্যাঁ।

ঘরে ঢুকেছিলেন ?

না। সিঁড়ি থেকেই আমি চলে এসেছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কোন শব্দ বা চিৎকার শুনেছিলেন

না।

কতক্ষণ বাদে চিৎকার শোনেন ?

মিনিট পনের-কুড়ি বাদে বোধ হয়।

কি রকম চিৎকার ?

ভয় পেলে যেমন চিৎকার করে।

বিয়ের আগে দীপিকা দেবী এ বাড়িতে আসেননি ?

কতবার এসেছে—দাদার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল তো বৌদি।

জানি। আচ্ছা আপনাদের এক সৎভাই আছেন, জানেন ?

জানি।

দেখেছেন তাঁকে কখনও ?

না। তিনি কখনও এখানে আসেননি।

ঐ সময় শিবতোষের বড় মেয়ে স্মৃতি এসে ঘরে ঢুকল।

ইনি ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আমার দিদি, স্মৃতি।

যামার নাম কিরীটী রায়।

কিরীটী কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতি কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। একটু যেন য়ামিশ্রিত তার দৃষ্টি। কিরীটী রায় নামটা স্মৃতির অপরিচিত নয়। তার বাপের মুখে নছে এবং শুনেছে ভদ্রলোকের প্রতি তাদের বাবার কি অগাধ শ্রদ্ধা।

আপনি কোন্ ঘরে থাকেন স্মৃতি দেবী?

পাশের ঘরেই।

আপনার দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বোধ হয় আপনি সকলকেই চেনেন?

যাঁরা এ বাড়িতে আসতেন তাঁদেরই কেবল চিনি। আর ঘনিষ্ঠতা দাদার কার সঙ্গে ন—একমাত্র শিখেন্দুদা ছাড়া বলতে পারব না।

এ বাড়িতে আপনার দাদার কাছে আর কে কে আসত?

নির্মলবাবু আর সঞ্জীববাবু।

তারা আপনার দাদারই সমবয়সী ছিল বোধ হয়?

নির্মলবাবু বোধ হয় একটু বয়সে বড় হবেন দাদার চাইতে, কারণ শুনেছিলাম—

কি শুনেছিলেন?

অনেকবার নাকি ফেল করেছেন নির্মলবাবু। মানুষটা যেমন হাসিখুশি, তেমনি ামুদে।

আচ্ছা তাঁরা এসেছিলেন নিশ্চয়ই উৎসবে?

স্বাতী বলতে পারে। কারণ যে-ঘরে বৌদিকে বসানো হয়েছিল,—দাদার বন্ধুরা ক কে প্রেজেনটেশন দিতে এসেছিলেন, ওই বলতে পারে। স্মৃতি বলল।

স্বাতী দেবী!

নির্মলবাবুকে দেখেছি, তাঁকে চিনতামও। কিন্তু আর যাঁরা এসেছিলেন, অনেকেই তা এসেছিলেন, কাউকেই আমি চিনতে পারিনি।

সঞ্জীববাবুকে দেখেননি?

মনে পড়ছে না।

ঠিক আছে, আপনাদের আর বিরক্ত করব না। আমি নিচে যাচ্ছি।

নিচের পার্লারে যখন এসে কিরীটী প্রবেশ করল, বীরেন মুখার্জী তখন গোকুল ভৃত্যকে প্রশ্ন করছেন।

তাহলে গোকুল, তুমি বরাবরই দোতলায় ছিলে?

আজ্ঞে কর্তাবাবুর হুকুম ছিল দোতলায় যেন সর্বক্ষণ আমি থাকি।

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী প্রশ্ন করল, গোকুল, তোমার দাদাবাবুর বন্ধু যারা এ বাড়ি আসত, তাদের নিশ্চয়ই তুমি চেন?

সকলকে তো চিনি না আজ্ঞে,—গোকুল বলল, তবে দু'-একজনকে চিনি।

তারা কে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করল।

নির্মলবাবু, সঞ্জীববাবু, পরেশবাবু—আর শিখেন্দুবাবু তো এ বাড়ির লোক একরকম

নির্মলবাবু, পরেশবাবু, সঞ্জীববাবু এসেছিলেন আজ?

আজ্ঞে নির্মলবাবু আর পরেশবাবু এসেছিলেন।

আর সঞ্জীববাবু আসেননি?

কই, তাঁকে তো দেখিনি।

পরেশবাবু আর নির্মলবাবু—বৌকে যে-ঘরে বসানো হয়েছিল, সে ঘরে যাননি?

গিয়েছিলেন তো আজ্ঞে।

দেখেছ তাঁদের—বৌ যে-ঘরে ছিল সে-ঘরে ঢুকতে দুজনকেই?

দেখেছি বইকি বাবু।

কখন কে এসেছিলেন—একসঙ্গেই কি?

আজ্ঞে না। রাত আটটা সোয়া আটটা নাগাদ পরেশবাবুকে দেখেছি। আর নির্মলবাবু এসেছিলেন রাত তখন সাড়ে ন'টা কি পৌনে দশটা হবে।

নির্মলবাবুকে বের হয়ে যেতে দেখেছ?

ঠিক লক্ষ্য করিনি বাবু, মিথ্যে বলব কেন।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করল, রাত্রে কাকে তুমি তিনতলায় যেতে দেখেছ—মনে করে বলতে পার গোকুল?

বড়দিদিমণি বার দুই, ছোটদিদিমণি একবার উপরে গিয়েছিলেন। তাছাড়া শিখেন্দু-দাদাবাবুও একবার গিয়েছিলেন। আর একজন বৌ, নীল রঙের দামী শাড়ি পরনে, মাথায় ঘোমটা ছিল উপরে যেতে দেখেছি।

শিখেন্দুদাদাবাবু কখন তিনতলায় গিয়েছিলেন গোকুল?

রাত দশটা হবে তখন—কি তার দু-চার মিনিট পরেও হতে পারে।

তাঁকে নেমে আসতে দেখেছিলে?

না। কখন আবার নেমে এসেছেন দেখিনি।

আর সেই বৌটি?

শিখেন্দুদাদাবাবুর উপরে যাবার বোধ হয় আধ ঘণ্টাখানেক পরে।

ঠিক সময়টা তোমার মনে আছে?

আজ্ঞে না। তবে ঐরকমই মনে হয়।

তাঁকে নেমে আসতে আবার দেখেছিলে?

না।

দেখনি?

না।

দাদাবাবু ওপরে যাবার পরেও নেমে আসতে দেখনি?

না।

দাদাবাবু কখন ওপরে গিয়েছিলেন?

ঐ বৌটি ওপরে যাবার কিছু আগেই।

রাত পৌনে এগারোটা—তারও আগে?

ঐরকমই হবে বোধ হয়, ঠিক আমার মনে নেই।

হুঁ। আচ্ছা গোকুল, যে বৌটি ওপরে গিয়েছিল, তাকে দেখলে চিনতে পারবে?

আজ্ঞে না। মাথায় ঘোমটা ছিল। ওপরে উঠবার সময় পিছন থেকে দেখেছি, ঠিক দেখতে পাইনি।

এ বাড়িতে উৎসবে যোগ দিতে বাবুর আত্মীয়-পরিজন যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কি?

বলতে পারব না, তাঁদের তো আমি সকলকে চিনি না—একমাত্র প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন তাঁদের ছাড়া। গতকাল আর আজ তো অনেকেই এসেছেন গিয়েছেন।

একপাশে দাঁড়িয়েছিল শিবতোষের সরকার বা প্রাইভেট সেক্রেটারী যতীশ সামন্ত।

কিরীটী তার দিকে তাকাল, যতীশবাবু!

কিছু বলছিলেন?

এ-বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে অল্পবয়সী বৌ অনেক আছেন, তাই না?

সে-রকম কেউ আছেন বলে তো আমি জানি না—যাঁরা সাধারণতঃ এসে থাকেন মধ্যে মধ্যে তাঁদের মধ্যে; তবে আজ তো অনেক আত্মীয়-পরিজনই এসেছিলেন উৎসবে, তাঁদের মধ্যে কেউ হতে পারেন।

কিরীটী যেন কি ভাবছিল, অন্যমনস্কভাবে মৃদু কণ্ঠে বললে, তা অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু সে বৌটি যে-ই হোক, সে তিনতলায় গিয়েছিল কেন? তিনতলায় তো যাবার কথা নয় কারো। ঠিক আছে মিঃ মুখার্জী, অ্যাম সরি টু ডিসটার্ব ইউ, আপনি আপনার কাজ করুন।

বীরেন মুখার্জী মধ্যখানে কিরীটীর প্রশ্নোত্তরে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন, কিন্তু মুখে

সেটা প্রকাশ করলেন না। আরও কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করে অন্য ভৃত্য রাজেনকে ডেকে দেবার জন্য গোকুলকে বললেন।

গোকুল চলে গেল।

রাজেন একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকল।

গোকুলের চেহারাটা মোটাসোটা বেঁটে। একটু গোলাল এবং রং কালো। রাজেন ঢ্যাঙা, লম্বা, রোগা। শুকনো পাকানো চেহারা। গোকুলের চোখের চাউনি ভাসা-ভাসা, একটু যেন বোকা-বোকা মনে হয় ওকে চোখের দিকে তাকালে, কিন্তু রাজেনের চোখের দৃষ্টিতেই বোঝা যায় লোকটা চালাক-চতুর। গোকুলের মত নিরীহ সরল হাবা-গবা নয়।

তোমার নাম রাজেন? বীরেন মুখার্জী প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে—রাজেন সাধু।

এ-বাড়িতে কতদিন কাজ করছ?

তা আজ্ঞে—দশ বছরের কিছু বেশি হবে।

কিরীটী সোফার উপরে বসে পাইপে অগ্নিসংযোগ করে টানতে থাকে।

তুমিও কি সন্ধ্যে থেকে ওপরেই ছিলে?

আজ্ঞে না—আমি নিচের প্যাণ্ডালে ছিলাম। দাদাবাবু আমাকে সেখানেই থাকতে বলেছিলেন।

রাজেন, নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলারা কি সব এক প্যাণ্ডালে বসেই খেয়েছেন?

আজ্ঞে না। মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। সামনের দিকের প্যাণ্ডালে পুরুষরা খেয়েছেন, পিছনের প্যাণ্ডালে মেয়েরা।

তুমি কোন্ প্যাণ্ডালে ছিলে?

দু' প্যাণ্ডালেই আমি ছুটে ছুটে বেড়িয়েছি দাদাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে।

দাদাবাবু তাহলে দু' প্যাণ্ডালেই যাতায়াত করছিলেন?

আজ্ঞে।

ওই সময় কিরীটী পাইপটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করল, রাজেন, তুমি যখন দাদাবাবুর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে, তখন নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে কখন দাদাবাবু প্যাণ্ডাল ছেড়ে চলে যান?

বোধ হয় রাত এগারটায়, তাঁর বন্ধুদের শেষ ব্যাচ খেয়ে চলে যাবার পর,—রাজেন বললে।

আর শিখেন্দুদাদাবাবু?

আরও আধঘণ্টা পরে।

শিখেন্দুবাবু তখন কোথায় ছিলেন ?

দাদাবাবুর পাশেই।

রাজেন, নীল রঙের দামী শাড়ি পরা কোন অল্পবয়সী বৌকে দেখেছ ?

আজ্ঞে অনেকের পরনেই নীল শাড়ি ছিল, আর অল্পবয়সী বৌও অনেক এসেছিল।

তোমার দাদাবাবুর মাথা ধরেছিল জান ?

আজ্ঞে না।

তোমার দাদাবাবুর মাথা ধরেছিল বলেই তো শিখেন্দুদাদাবাবু তাঁকে ওপরে চলে যেতে বলেছিলেন !

আমি বলতে পারব না বাবু।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছিল ইতিমধ্যে। জানলাপথে প্রথম ভোরের আলো ঘরে এসে প্রবেশ করে।

বীরেনবাবু! কিরীটী বললে, আমি এবার যাব। আমি ওপরে যাচ্ছি। শিবতোষবাবুকে একবার বলে আসি। কিরীটী উঠে পড়ল।

বীরেন মুখার্জী কোন কথা বললেন না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই শিখেন্দুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল কিরীটীর। শিখেন্দু নেমে আসছিল।

আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম শিখেন্দুবাবু। কিরীটী বললে।

আমার সঙ্গে !

হ্যাঁ। কোথাও আমরা বসতে পারি ? কিছু কথা ছিল আমার।

কথা ?

হ্যাঁ। একটু নিরিবিলি হলেই ভাল হয়। কিরীটী বললে।

নিচে কাকাবাবুর অফিসঘরে আমরা বসতে পারি। আর ওপরের কোন ঘরে যদি বসতেন—

না। ওপরে নয়। নিচেই চলুন।

বেশ, চলুন। শিখেন্দু বললে।

নিচের তলায় একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে শিবতোষের অফিসঘর। কিন্তু দরজাটা আটকানো দেখা গেল।

আপনি এখানে একটু দাঁড়ান কিরীটীবাবু, যতীশবাবুর কাছে বোধ হয় ঘরের চাবি আছে—তাঁকে বলছি ঘরটা খুলে দিতে।

কিরীটী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল, শিখেন্দু পার্লারের দিকে চলে গেল। যতীশ সামন্ত তখনও পার্লারেই ছিল, শিখেন্দু তাকে ডেকে এনে শিবতোষের অফিসঘরটা খুলিয়ে নিল।

আসুন!

আগে শিখেন্দু, পশ্চাতে কিরীটী অফিসঘরে প্রবেশ করল এবং শিখেন্দু ঘরের আলোটা জ্বালতে চাইলে, কিরীটী তাকে বাধা দিয়ে বললে, ভোর হয়ে গিয়েছে, শিখেন্দুবাবু, ঘরের জানলাগুলো খুলে দিন বা পর্দাগুলো সরিয়ে দিন—আলো আর জ্বালতে হবে না।

শিখেন্দু আলো আর না জ্বালিয়ে ঘরের জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিতেই জানলার কাঁচের সার্শিপথে দিনের আলো এসে ঘরে প্রবেশ করল। দেখা গেল কিরীটীর অনুমান মিথ্যে নয়। ঘরের মাঝখানে বিরাট একটি সেক্রেটারিয়াট টেবিল, গোটা দুই ফোন, কলমদানী, অ্যাশট্রে, আর ছোট দামী একটা ফটোর ফ্রেমে এক মহাত্মার ফটো, শিবতোষের গুরুদেব। ঘরের চারপাশে গোটাচারেক স্টীলের আলমারি, দেয়ালে গাঁথা একটি আয়রন-সেফ। টেবিলের উপরে কিছু ফাইল-পত্র রয়েছে। গোটাসাতেক চেয়ার—একদিকে ছ'টা চেয়ার ও অন্যদিকে একটি রিভলবিং চেয়ার। বোঝা গেল, শিবতোষ ঐ চেয়ারটাতেই বসেন। ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

বসুন শিখেন্দুবাবু!

শিখেন্দু বসল। কিরীটীও একটা চেয়ারে পাশেই বসল।

পাইপটা কিরীটীর নিভে গিয়েছিল। লাইটারের সাহায্যে পুনরায় পাইপের মাথায় অগ্নিসংযোগ করে মৃদু একটা টান দিয়ে বললে, বুঝতেই পারছেন শিখেন্দুবাবু, ব্যাপারটা ব্যাদার ডেলিকেট, তাই একটু নিরিবিলিতে আপনাকে নিয়ে এলুম।

শিখেন্দু কোন জবাব দিল না।

কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই।

বেশ তো করুন।

কাল রাত্রে ফুলশয্যার ব্যবস্থা তিনতলায় নির্বাণীতোষবাবুর শোবার ঘরে হয়েছিল দেখলাম—

হ্যাঁ। ও তো তিনতলাতেই থাকত, তাই।

তিনতলায় বুঝি কেউ থাকে না?

পাঁচটা ঘরের তিনটে ঘর খালিই পড়ে থাকে তিনতলায়। দুটো ঘর পাশাপাশি নির্বাণীতোষ ব্যবহার করত কেবল।

বৌ বসানো হয়েছিল নিচের সামনের দোতলায় একটি ঘরে ?

হ্যাঁ।

তার মানে তিনতলায় কারো কোন দরকারই ছিল না যাবার ?

কারো বলে কোন কথা নয়, বরাবরই নির্বাণীতোষ তিনতলায় কারো যাওয়া পছন্দ করত না। তাই কেউ বড় একটা যেতও না।

কেন ? পছন্দ করত না কেন ?

ও চিরদিনই একটু নির্জনতাপ্রিয় ছিল। গোলমাল হৈচৈ পছন্দ করত না।

তাহলে তো পছন্দ না হবারই কথা। বলেই হঠাৎ যেন প্রশ্নটা করল কিরীটী, আপনি কাল রাত্রে তিনতলায় ক'বার গিয়েছিলেন ?

আমি—তিনতলায় ?

হ্যাঁ।

একবার মাত্র গিয়েছিলাম।

মনে করে দেখুন তো শিখেন্দুবাবু! একবার নয়, অন্ততঃ দুবার নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন। কিরীটীর গলার স্বর যেন অদ্ভুত শান্ত, অদ্ভুত নির্লিপ্ত। প্রশ্নটা করে কিরীটী তাকিয়ে থাকে শিখেন্দুর মুখের দিকে।

আমি কাল রাত্রে একবারই গিয়েছিলাম তিনতলায়, চিৎকার শোনবার পর মনে আছে আমার। তার আগে আমি তিনতলায় একবারও যাইনি।

যাননি ?

না।

না শিখেন্দুবাবু, মনে পড়ছে না আপনার, আপনি আগেও একবার তিনতলায়, গিয়েছিলেন।

গিয়েছিলাম !

হ্যাঁ।

কখন ? কে বললে ? কেউ বলেছে আপনাকে কথাটা ?

কেউ বলেছে বা ওপরে যেতে কেউ আপনাকে দেখেছে কিনা, সেটাও নিছক সত্যমিথ্যে যাচাইয়ের প্রশ্ন শিখেন্দুবাবু। তার মধ্যে যেতে চাই না। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি, কখন আপনি ওপরে গিয়েছিলেন ?

বলছি তো ওপরে আমি আগে যাই-ই নি। চিৎকার শোনবার পরই গিয়েছিলাম।

রাত সাড়ে নটা নাগাদ একবার যাননি ?

না।

• নির্বাণীতোষবাবু আপনার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন, সেদিক দিয়ে নিশ্চয়ই আপনি চান তাঁর হত্যাকারী ধরা পড়ুক ?

নিশ্চয়ই চাই।

শুধু তাই নয়, দীপিকাও আপনার বান্ধবী—শুধু বন্ধুপত্নীই নয়।

নিশ্চয়ই তাই।

তাহলে তো আমাকে এই নিষ্ঠুর হত্যার তদন্তের ব্যাপারে সাহায্য করা আপনার কেবল কর্তব্যই নয়, আপনার মানবিকতার কাছে সেটা সত্যের একটা দাবিও। কথাগুলো এমন শান্ত গলায় ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল কিরীটী যে স্পষ্টতই শিখেন্দুকে একটু যেন বিমূঢ়ই করে দিয়েছে বলে কিরীটীর মনে হল।

শিখেন্দু বললে, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না।

দীপিকা তো আপনার সহপাঠিনী ? তাঁর প্রতি কি, ক্ষমা করবেন, কথাটা আপাততঃ রূঢ় হলেও না বলে পারছি না, কোনদিন আপনার কোন দুর্বলতাই দেখা দেয়নি ?

শিখেন্দু এবার মাথা নীচু করল।

জবাব দিন আমার প্রশ্নের শিখেন্দুবাবু ? এখানে এই ঘরের মধ্যে আমরা ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই এবং এও আপনাকে কথা দিচ্ছি, কেউ একথা জানবে না, জানতে পারবে না।

শিখেন্দু একেবারে চুপ।

বুঝলাম। জবাব আমি পেলাম।

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, দীপিকা আর নির্বাণীতোষ পরস্পরকে ভালবাসে এ-কথা জানতে পারার পর—

আপনাকে আপনি গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বন্ধুত্বের দুর্লভ পরিচয়ই দিয়েছেন।

আমি চেয়েছিলাম, ওরা পরস্পর পরস্পরকে যখন ভালবাসে ওরা সুখী হোক

কিরীটীর মনে হল, শিখেন্দুর গলার স্বরটা যেন বুজে এল।

শিখেন্দুবাবু !

কিরীটীর ডাকে শিখেন্দু ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

॥ চার ॥

আর একটা প্রশ্নের জবাব আমি চাই।

কিসের জবাব ?

চিৎকার শুনে আপনিই সবার আগে তিনতলায় যান। তাই তো ?

হ্যাঁ।

এবং বোধ হয় নির্বাণীতোষের শয়নঘরের দরজা খোলা দেখে সোজাই গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন ?

হ্যাঁ।

সেটাই আমার কাছে যেন কেমন আশ্চর্য মনে হচ্ছে—

কেন ?

দীপিকা দেবী ঘরে ঢুকেও ঘরের দরজা খুলে রেখে দিয়েছিলেন. সেটা একটু অস্বাভাবি নয় কি !

এতক্ষণে যেন শিখেন্দুর কাছে কিরীটীর কথার তাৎপর্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেও ব ওঠে, সত্যিই তো, ঠিকই তো আপনি বলেছেন কিরীটীবাবু, ঘরের দরজাটা তো খোর থাকার কথা নয়—

অথচ আপনি খোলাই আছে দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ।

যাক সে কথা, তারপর ঘরে ঢুকে আপনি কি দেখেছিলেন ?

দীপিকা সোফার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

না।

কি বলছেন ?

বলছি এই যে, দীপিকা দেবী ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিলেন না।

তবে কোথায় ছিল সে ? কথাটা বলে কেমন যেন একটু বোকার মতই চেয়ে থা শিখেন্দু কিরীটীর মুখের দিকে।

বাথরুমের মধ্যে। সেখান থেকে তাঁর অচৈতন্য দেহটা আপনি বুকে করে তুলে পরে ঘরের মেঝেতে শুইয়ে দিয়েছিলেন, তাই নয় কি ?

কিন্তু—

আমি জানি শিখেন্দুবাবু, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। আমি যা বললাম সেই রব ঘটেছিল।

শিখেন্দু নীরব।

তাহলে মনে হচ্ছে, অবিশ্যি এবারেও আমার অনুমানই—দ্বিতীয় অনুমান, দীপিকা দেবী ঘরে ঢুকবার পর দরজা বন্ধ করে দেন ঘরের, কিন্তু নির্বাণীতোষকে ঘরের মধ্যে দেখতে পান না। খুঁজতে খুঁজতেই তখন গিয়ে বাথরুমে ঢোকেন, আলোটা বাথরুমের জ্বালানো ছিল সম্ভবতঃ, আলোটা জ্বালবার পর তাঁর স্বামীর মৃতদেহটা তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে তিনি মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। আর তাই যদি হয় তো ঘরের দরজাটা খুলে দিয়েছিল কে?

কে? প্রতিধ্বনির মতই যেন শিখেন্দু কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

একজনের পক্ষেই সেটা খুলে দেওয়া সম্ভব ছিল—

কে? কার কথা বলছেন?

হত্যাকারী। শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে কিরীটী কথাটা যেন উচ্চারণ করল।

হত্যাকারী!

হ্যাঁ, অথচ তাকে আপনি দেখেননি—

না।

তাহলে সে কোন্ পথে এ বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল? এবং কখন? শুধু তাই নয় শিখেন্দুবাবু, ঐ সঙ্গে আরও তিনটে প্রশ্ন আসছে—

প্রশ্ন! আরও তিনটে?

তাই-ই। প্রথমতঃ হত্যাকারী তখনও উপরেই ছিল, কিন্তু কেন? কেন সে হত্যা করার পরও চলে গেল না? দ্বিতীয়, হত্যাকারীকে সম্ভবতঃ দীপিকা দেবী দেখেছেন, দেখতে পেয়েছিলেন; কথা হচ্ছে হত্যাকারী দীপিকা দেবীর পরিচিত কেউ, না কোন তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তি? এবং তৃতীয়তঃ, আকস্মিকভাবে স্বামীর মৃতদেহটা আবিষ্কার করা মাত্রই তিনি চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, না হত্যাকারীকে চিনতে পেরেই, চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়েছিলেন?

শিখেন্দু যেন একেবারে বোবা। তার মুখে কোন কথাই নেই।

শুনুন শিখেন্দুবাবু, যতদূর আমি বুঝতে পারছি, অবিশ্যি কোন বিশেষ চিকিৎসকই দীপিকা দেবীকে পরীক্ষা করে বলতে পারবেন, বর্তমানে ঘটনার আকস্মিকতায় বা ভীরুতায় যাই হোক, তাঁর সম্পূর্ণ স্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছে। এবং হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে হলে সর্বাগ্রে ওঁর স্বাভাবিকতা, স্বাভাবিক চেতনা ফিরে আসা একান্ত দরকার এবং আমার মনে হয় সে ব্যাপারে আপনিই সবচাইতে বেশি সাহায্য করতে পারবেন।

আমি?

হ্যাঁ, আপনি।

কিন্তু কেমন করে ?

আপনার ভালবাসা দিয়ে, যে ভালবাসা এতকাল ধরে এবং এখনও নিঃশব্দে ফল্গুর মত আপনার মনের মধ্যে বয়ে চলেছে।

না, না—সহসা যেন অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে শিখেন্দু, পারব না—আমি পারব না কিরীটীবাবু, ক্ষমা করুন, আপনি যা বলছেন সে আমার দ্বারা হবে না।

হবে। হতেই হবে। নির্বাণীতোষ আপনার বন্ধু, আর ফিরে আসবে না কোনদিনই কিন্তু একবার দীপিকার কথা ভাবুন তো, এখন না হয় তিনি বেঁচেও মরে আছেন, কিন্তু যখন তাঁর মনের ঐ বর্তমান কুয়াশা কেটে যাবে, তখন তাঁর অবস্থাটা কি হবে ! আপনার ভালবাসাই যে আজ তাঁর জীবনের একমাত্র আশা। বাঁচবার একটি মাত্র পথ। আপনার ভালবাসা—আপনার স্নেহ দিয়ে ওঁর ঐ অহল্যার ঘুম আপনাকেই ভাঙাতে হবে। যা হবার তা তো হয়েছেই, কিন্তু ওঁকে জানতে দিন, ও যেন জানতে পারে, পৃথিবীটা আজও ওঁর কাছে শুকিয়ে যায়নি। জীবনের সব কিছু নির্বাণীতোষের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়নি ! সমস্ত অর্থ মিথ্যে হয়ে যায়নি।

আপনি জানেন না কিরীটীবাবু, দীপু কি গভীরভাবে ভালবাসত নিবুকে। যে মুহূর্তে ও স্বজ্ঞানে উপলব্ধি করতে পারবে নিবু নেই, ওর কাছে বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।

কিরীটী শান্ত গলায় প্রত্যুত্তর দিল, না, শিখেন্দুবাবু, যাবে না। মানুষই মানুষকে চরম দুঃখ দেয় আর মানুষই চরম দুঃখকে বুক পেতে নেয়। আর তাই আজও জীবন এত দুঃখ এত বিপর্যয় ও এত আঘাতের পরও মিথ্যে হয়ে যায়নি। আজও মানুষ তাই বাঁচার চেষ্টা করে, পৃথিবীতে তারা বেঁচে আছে, শেষ হয়ে যায়নি ! আপনার কাছে তাই আমার অনুরোধ, দীপিকার এত বড় দুর্দিনে আপনি ওঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবেন না।

শিখেন্দুর দুই চোখের কোল বেয়ে তখন নিঃশব্দে দুটি ধারা তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

আমি এবারে উঠব শিখেন্দুবাবু, শিবতোষবাবুকে বলে দেবেন, এ নিষ্ঠুর হত্যারহস্যের মীমাংসা করবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আর আমার বাড়ির ঠিকানা তো আপনি জানেন, ফোন নম্বরটাও গাইড্ থেকে দেখে নেবেন। আমি কিন্তু আপনার পথ চেয়েই থাকলাম।

কিরীটী উঠে ঘরের দরজা ঠেলে বের হয়ে গেল।

পারলারে আর প্রবেশ করল না। সোজা পোর্টিকোতে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে হীরা সিংকে বলল, নিজের কোঠি চল।

বীরেন মুখার্জী তখনও তাঁর জবানবন্দি নেওয়া শেষ করতে পারেননি।

বাড়ির সকলেরই জবানবন্দি দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, সে-সময় তিনি যতীশ সামন্তকে নিয়ে পড়েছিলেন।

কিরীটী ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ শিখেন্দু চেয়ারটার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

কিরীটী রায়ের কথাই সে ভাবছিল, কি করে মানুষটা জানতে পারল যে সে-ই বাথরুম থেকে অচৈতন্য দীপিকাকে বুকে করে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিল!

মুখে স্বীকার না করলেও কথাটা তো মিথ্যা নয়। সে-ই সর্বপ্রথমে তিনতলায় গিয়েছিল, ঘরের দরজাটা খোলা দেখে ভিতরে গিয়ে ঢোকে সোজা। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকলে কি করত সে জানে না, তবে খোলা পেয়েও তার মনে ঐ মুহূর্তে কোন প্রশ্নই জাগেনি, কেন দরজাটা খোলা রয়েছে! ঘরে ঢুকে ঘরের মধ্যে কাউকে না দেখতে পেয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ওর নজরে পড়ে বাথরুমের দরজাটা খোলা, ভিতরে আলো জ্বলছে।

কোন রকম চিন্তা বা ইতস্তত: না করেই সে গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিল। ঢুকতেই যে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ে, নির্বাণীতোষের ছোরাবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহটার পাশেই দীপিকার দেহটা পড়ে আছে অচৈতন্য।

ঘটনার আকস্মিকতায় ও ভয়াবহতায় সে যেন হঠাৎ বিমূঢ় নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই তার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি ফিরে আসে, তখন সে প্রথমে নির্বাণীতোষকে পরীক্ষা করে, সে মৃত দেখে তারপর পরীক্ষা করে দীপিকাকে। সে জ্ঞান হারিয়েছে।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর সে ভেবে পায় না কি করবে। তারপরই নীচু হয়ে গভীর মমতায় দীপিকার অচৈতন্য শিথিল দেহটা বুকের উপর তুলে নিয়ে শোবার ঘরে এসে ঢোকে। সেই সময়ই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পায়, তাড়াতাড়ি তখন সে দীপিকার অচৈতন্য দেহটা মেঝেতেই নামিয়ে দেয়, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শিবতোষবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, বৌমা…

একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল শিখেন্দু প্রথমটায়, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, বুঝতে পারছি না কিছু কাকাবাবু, ঘরে ঢুকে দেখি দীপিকা পড়ে আছে।

কিন্তু কিরীটীবাবু সত্যটা অনুমান করলেন কি করে? আগের একটা কথা যা কিরীটী-বাবু বলে গেলেন, নির্বাণীতোষের শয়নঘরের দরজাটা খোলা ছিল কেন? সত্যিই তো, কেন খোলা ছিল? স্বাভাবিকভাবে তো বন্ধ থাকারই কথা। তবে কি ক্লান্ত দীপিকা দরজাটা ঘরে ঢুকবার পর তাড়াতাড়িতে বা অন্যমনস্কতায় ভিতর থেকে লক্ করতে ভুলে গিয়েছিল! না, সেই সময়ই সন্দেহজনক কিছু তার চোখে পড়ায় বা শব্দ শোনায় সে দরজাটা লক্ করবার কথা ভাববারও সময় পায়নি!

কিন্তু এ সবই তো গেল যুক্তিতর্কের কথা। হত্যারহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে যুক্তিতর্কের কথা—স্বভাবতঃই যা কিরীটীবাবুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকের মনে উদয় হয়েছে, হওয়াটা স্বাভাবিক।

হত্যাকারী কে?

কে হত্যা করল নির্বাণীতোষকে? আর কেনই বা হত্যা করল? নির্বাণী চিরদিনই সাদাসিধে সরল প্রকৃতির মানুষ, কারও সঙ্গেই কখনও মনোমালিন্য হয়নি, ঝগড়াবিবাদও করেনি। সবাই তাকে বরাবরই ভালবেসেছে। তবে তাকে এইভাবে হত্যা করল কেন?

সকাল হয়ে গিয়েছে, প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজল।

অফিসঘর থেকে বেরুতেই যতীশ সামন্ত সামনে এসে দাঁড়াল, শিবেন্দুবাবু!

বলুন।

দারোগাবাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।

কেন?

বোধ হয় আপনার জবানবন্দি নেবেন।

চলুন।

আপনি যান, কর্তাবাবু ডাকছেন, আমি একবার ওপরে যাব। সামন্ত বললে।

কাকাবাবুকে বলে দেবেন কিরীটীবাবু চলে গেছেন।

আচ্ছা।

শিবেন্দু এগিয়ে গিয়ে পারলারে প্রবেশ করল।

শিবেন্দুকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বীরেন মুখার্জী মুখ তুলে তাকালেন, আসুন শিবেন্দুবাবু, বসুন।

শিবেন্দু বসল।

বীরেন মুখার্জী প্রশ্ন করলেন, আপনি আর শিবতোষবাবুই মৃতদেহ প্রথমে আবিষ্কার করেন?

হ্যাঁ।

এঁদের মানে শিবতোষবাবুর ফ্যামিলির সঙ্গে আপনার দীর্ঘদিনের পরিচয়, তাই না?

হ্যাঁ, আমি ওঁর বন্ধুর ছেলে।

আচ্ছা, আপনি তো নির্বাণীতোষবাবুর সহপাঠী ছিলেন, তাঁর কোন শত্রু ছিল বলে জানেন?

না।

কখনও কারও সঙ্গে মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাঁটি বা মারামারি হয়নি তাঁর?

না।

তবে যে কেন লোকটাকে অমন ক্রুয়েলি হত্যা করা হল বুঝতে পারছি না! কাউকে আপনার এ ব্যাপারে সন্দেহও হয় না?

না।

ব্যাপারটা দেখছি যেমন স্তাভ তেমনি জটিল। তারপর একটু থেমে বললেন বীরেন মুখার্জী, মিসেস মল্লিক তো কোন প্রশ্নের জবাবই দিলেন না আর—দীপিকা দেবী তো মনে হচ্ছে প্রচণ্ড শকে মেমারিই হারিয়েছেন! ঠিক আছে ওঁরা সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর এক সময় আসা যাবে। বিশেষ করে দীপিকা দেবীকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। এখন তাহলে আমি উঠব।

একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে মিঃ মুখার্জী। শিখেন্দু বললে।

বলুন?

সংবাদপত্রে যেন ব্যাপারটা না ছাপা হয়। বুঝতেই পারছেন এত বড একটা ফ্যামিলির প্রেস্টিজ—

না না—আমরা কিছু বলব না; কিন্তু পাড়াপড়শীরা তো আছে, সংবাদপত্রের নিউজ-রিপোর্টারদের কি আর কিছু জানতে বাকি থাকবে!

আর একটা কথা—

বলুন?

ডেডবডি কখন পেতে পারি?

বুঝতেই পারছেন তো, ব্যাপারটা মার্ডার কেস—তদন্ত না হলে তো পাবেন না দেহ। একটু পরেই এসে ডেডবডি নিয়ে যাবে। তবে চেষ্টা করব আজই যাতে পান। শিবতোষবাবুর সঙ্গে তো ডি. সি.-র পরিচয় আছে, তাঁকেই একবার বলতে বলুন না ওঁকে ফোনে। আচ্ছা চলি।

শিখেন্দুরও নিজেকে অতিশয় ক্লান্ত লাগছিল।

সারাটা রাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি, চোখ দুটো জ্বালা করছিল, ঘুর থেকে বেরুতেই রাজেনের সঙ্গে দেখা হল।

রাজেন, আমি একবার মেসে যাচ্ছি, ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই ফিরব—কেউ খোঁজ করলে বোলো।

যে আজ্ঞে।

বড় রাস্তায় আসতেই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেল শিখেন্দু। ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললে, শিয়ালদার দিকে চলিয়ে সর্দারজী।

কলেজের কাছাকাছিই সারকুলার রোডের ওপরে একটা মেসে ছাত্রজীবন কাটিয়েছে শিখেন্দু। কলেজ-হোস্টেলে কখনও সে থাকেনি। পাস করার পরও ঐখানেই রয়ে গিয়েছে।

ওরা তিনজনই নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

নির্বাণীতোষ বরাবর বাড়ি থেকেই পড়াশুনা করেছে। দীপিকা থেকেছে কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে, লেডিজ হোস্টেলে।

দিন পনের হল তার বাবা বিয়ের ব্যাপারে সপরিবারে দিল্লী থেকে এসে বালিগঞ্জ অঞ্চলেই বাড়ি ভাড়া করে আছেন, ইদানীং দীপিকা সেখানেই ছিল।

হোস্টেলে পাশাপাশি দুটো ঘরে ওরা চারজন থাকে, ও আর সঞ্জীব একটা ঘরে, পাশের ঘরে নির্মল ও পরেশ।

ঘরে ঢুকে দেখে জানলাপথে রোদ এসে পড়েছে, সঞ্জীব তখনও শয্যায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে পাশবালিশটা জড়িয়ে।

সঞ্জীব—এই সঞ্জীব।

শিখেন্দুর ডাকে সঞ্জীব চোখ মেলে তাকাল, কে?

ওঠ্—ওঠ্—

বিরক্ত করিস না শিখেন্দু, একটু ঘুমোতে দে। সঞ্জীব আবার চোখ বুজল।

এদিকে খবর শুনেছিস?

পরে শুনব, সঞ্জীব ঘুম-জড়ানো গলায় কথাটা বলে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে।

ওঠ্—শোন্—নির্বাণী মারা গেছে, এই—

সঙ্গে সঙ্গে যেন লাফিয়ে উঠে বসল শয্যার উপরে সঞ্জীব, অ্যাঁ! কি বললি? কে মারা গেছে?

নির্বাণী মারা গেছে, নির্বাণীতোষ মল্লিক।

কি যা-তা জোক করছিস এই সকালবেলা! সঞ্জীব বললে।

জোক নয়, সত্যি—হি হ্যাজ বিন ক্রটালি মার্ডারড, সঞ্জীব।

মার্ডারড! সঞ্জীব কথাটি বলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে যেন শিখেন্দুর মুখের দিকে।

হ্যাঁ।

সত্যি—সত্যি বলছিস শিখেন্দু? সঞ্জীব যেন কথাটা তখনও বিশ্বাসই করতে পারছে না।

শিখেন্দু তার খাটের ওপর বসে সঞ্জীবের মুখের দিকেই চেয়ে থাকে। সঞ্জীব চিরকালই পাতলা, রোগা। গায়ের রংটা যেমন টকটকে ফর্সা, মুখখানিও তেমনি সুন্দর, যেন একটা মেয়েলী ছাপ আছে মুখে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি। চোখেমুখে প্রসাধনের চিহ্ন, ঠোঁটে লিপস্টিকের রক্তিমাভা।

কাল তুই বৌভাতের নিমন্ত্রণে যাসনি? শিখেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

কখন যাব! থিয়েটারই তো শেষ হল রাত সাড়ে বারোটায়। বলেই তো ছিলাম, কাল আমাদের পাড়ার ক্লাবে থিয়েটার আছে। বহ্নিশিখা নাটকে আমাকে কল্যাণীর রোল করতে হয়েছে।

পাড়ার ক্লাব মানে পাইকপাড়ায় ওরা দীর্ঘদিন ধরে আছে, মানে ওর বাবা রাধিকা বসু মশাই। ঐ পাড়াতেই সঞ্জীবের জন্ম, পাড়ার ক্লাবের থিয়েটারে ও বরাবর ফিমেল রোল করে এসেছে। মানায়ও ওকে ফিমেল রোলে চমৎকার এবং অভিনয়ও করে খুব ভাল।

সঞ্জীব বলল, অত রাত্রে কেউ কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যায়! তাছাড়া ভীষণ টায়ার্ড লাগছিল, ফিরে এসে দেখ্ না মুখের মেকআপও ভাল করে তুলতে পারিনি, কোনমতে একটু মেকআপ তুলেই শুয়ে পড়েছি। কিন্তু এইমাত্র তুই যা বললি তা সত্যি!

হ্যাঁ, আমাকে এখুনি আবার স্নান করে বেরুতে হবে। দীপা একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে।

হবেই তো, বেচারী! হাউ স্যাড, ফুলশয্যার রাত্রেই!

কি করে মেরেছে বেচারীকে জানিস সঞ্জীব!

কি করে?

একটা ছোরা একেবারে পিঠের বাঁ দিকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে।

বলিস কি! কি করে মারল, বাড়ি ভর্তি লোক ছিল—কে মারল কেউ কিছু জানতেই পারল না!

শিখেন্দু সংক্ষেপে তখন সমস্ত ঘটনাটা বলে গেল।

সঞ্জীব যেন একেবারে হতবাক। বললে, সত্যি আমি যেন এখনও ভাবতেই পারছি না ব্যাপারটা শিখেন্দু।

কেবল তুই কেন, কেউই আমরা ভাবতে পারছি না। নির্মল কোথায়? নির্মলকে ডাক্—

সঞ্জীব নির্মলকে নাম ধরে ডাকতেই সে পাশের ঘর থেকে এসে এদের ঘরে ঢুকল। গালে শেভিং ক্রিম লাগানো, হাতে সেফটি রেজার, অর্ধেক কামাতে কামাতেই ওদের ডাকে ঘরে এসে ঢুকল, কি ব্যাপার? শিখেন্দু কখন ফিরলি?

নির্বাণীতোষ খুন হয়েছে কাল রাত্রে, জানিস? শিখেন্দু বললে আবার।

খুন হয়েছে—নির্বাণী? কি—কি বলছিস তুই শিখেন্দু?

এবারে সঞ্জীবই ব্যাপারটা বললে নির্মলকে।

তুই কাল রাত্রে কখন নির্বাণীদের বাড়ি থেকে চলে এসেছিলি? শিখেন্দুই প্রশ্নটা করল।

আ—আমি তো—মানে আমি তো বোধ হয় দশটার পরই চলে এসেছি, তখন তো নির্বাণী প্যাণ্ডেলেই ছিল। নির্মল বলল।

হ্যাঁ, নির্বাণী আগাগোড়াই প্যাণ্ডেলে ছিল। রাত পৌনে এগারটা নাগাদ আমাকে বলল তার বড় মাথা ধরেছে। তাই আমি বললাম, আমাদের বন্ধুবান্ধবরা তো সবাই এসে গেছে, এক সঞ্জীব বাকি; সে এলে আমি খাইয়ে দেবো'খন, তুই যা, ওপরে চলে যা, শিখেন্দু বলল।

তারপর? সঞ্জীব শুধাল।

নির্বাণী ওপরে চলে যায়।

তারপর?

আর পৌনে বারোটা নাগাদ দীপা ওপরে গিয়েছিল, তারপরেই ব্যাপারটা জানা গেল। শিখেন্দু বলল।

ওঃ! নির্মল বলল।

তাহলে মনে হচ্ছে পৌনে এগারটা থেকে রাত পৌনে বারোটা, ঐ একঘণ্টা সময়ের মধ্যেই কোন এক সময় নির্বাণীকে কেউ খুন করে গিয়েছে। সঞ্জীব বলল।

ইতিমধ্যে পরেশও এসে ঘরে ঢুকেছিল এবং সব শুনেছিল, ওরা তিনজন কেউ লক্ষ্য করেনি; হঠাৎ ঐ সময় পরেশ বলল, নির্মল তো অনেক রাত্রে ফিরেছিল, রাত বোধ হয় সাড়ে বারোটারও বেশী হবে, আমি ফিরে পৌনে বারোটায় প্রায় শুয়েছি, কিন্তু ঘুমোই। দশটার পরই যদি তুই নির্বাণীদের বাড়ি থেকে চলে এসে থাকিস তো তোর ফিরতে

এত দেরি হল কেন রে ?

বাসে যা ভিড় ! নির্মল বলল।

অত রাত্রে বাসে ভিড় ! পরেশ কথাটা বলে নির্মলের মুখের দিকে তাকাল এবং বলল, দেখ বাবা, চালাকি করো না, অতক্ষণ কোথায় ছিলে বল !

॥ পাঁচ ॥

পরেশ চিরদিনই ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা। ইংরাজী বাংলা কোন ডিটেকটিভ বই-ই সে বাদ দেয় না এবং সুযোগ পেলেই সে ডিটেকটিভগিরি করে।

নির্মল কিন্তু চটে যায়। বললে, কি ইয়ার্কি হচ্ছে, এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপার—

সেইজন্যই তো সিরিয়াসলি আমি প্রশ্নটা করেছি। পরেশ গম্ভীর হয়ে বললে।

শিখেন্দু এবারে বললে, নির্বাণীর বাবা কিরীটী রায়কে ডেকেছেন তদন্ত করবার জন্য।

বলিস কি ! পরেশ বললে।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেভাবেই হোক তিনি জানবেনই কে তাঁর ছেলেকে অমন করে খুন করে গেল।

ও আর দেখতে হবে না শিখেন্দু, কিরীটী রায়ের যখন আবির্ভাব ঘটেছে, আততায়ীর আর নিস্তার নেই। ইস্, কাল রাত্রে অমন একটা ব্যাপার ঘটবে যদি জানতাম, তাহলে এত তাড়াতাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে ওখান থেকে চলে আসি !

শিখেন্দু উঠে পড়ল, স্নান সেরেই তাকে বেরুতে হবে। জামা কাপড় খুলে মাথায় তেল মেখে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে শিখেন্দু একতলার দিকে চলে গেল।

নির্মল আর সঞ্জীব দুজনই চুপচাপ বসে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

পরেশ একবার ওদের মুখের দিকে তাকাল, তারপর পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরালো নিঃশব্দে।

সিগারেটে গোটা-দুই টান দিয়ে পরেশ বললে, ব্যাপারটা তোদের কি মনে হয় সঞ্জীব, নির্মল ?

ওরা দুজনেই যুগপৎ পরেশের মুখের দিকে তাকাল। কেউ কোন কথা বললে না।

পরেশ আবার বললে, নির্বাণীকে কে অমন করে খুন করতে পারে বলে মনে হয় তোদের ?

নির্মল ক্ষীণ গলায় বললে, কি করে বলব ?

দেখ্ বাবা, সত্যি কথা বলি, আমরা সবাই অর্থাৎ তুই নির্মল সঞ্জীব শিখেন্দু আমি শ্রীমান পরেশ ইনটারেসটেড পার্টি ছিলাম—

মানে! নির্মল বললে।

মানে, সবাই আমরা মনে মনে চেয়েছি দীপাকে, কিন্তু মাঝখান থেকে দীপা হয়ে গেল নির্বাণীর। দীপা নির্বাণীর গলাতেই শেষ পর্যন্ত মালা দিল।

নির্মল চেঁচিয়ে ওঠে, হোয়াট ননসেন্স! বোকার মত কি সব যা-তা বলছিস পরেশ!

বোকা নয় বন্ধু। গোপন প্রেম, প্রেম থেকেই লালসা, লালসা থেকেই হিংসা এবং হিংসা থেকেই আক্রোশ ও তার পরিণতি হত্যা, দীপাকে না পাওয়ার জন্য—

তুই থামবি পরেশ! নির্মল আবার খিঁচিয়ে ওঠে।

আমি থামলেও কিরীটী রায় থামবে না বন্ধু। পরেশ বললে।

সঞ্জীব বললে, এমন একটা সিরিয়াস মুহূর্তে তোর ওইসব ভণ্ডামি আমার একটুও ভাল লাগছে না পরেশ, সত্যি!

কিন্তু তবু এটা সত্যি সঞ্জীব, তুই আমি নির্মল শিখেন্দু সবাই নির্বাণীর মত দীপাকে মনে মনে কামনা করেছি। দোষ নেই অবিশ্যি তাতে। একটি সুন্দরী আকর্ষণীয়া তরুণীর প্রতি আমাদের মত তরুণদের আকর্ষণ জাগাটা এমন কিছু দোষের নয়, ব্যাপার স্বাভাবিক। তাছাড়া আমার কথাটা যে মিথ্যা নয়, সেটা নিশ্চয়ই তোমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

সঞ্জীব বললে, তার মানে পরেশ তুই কি বলতে চাস! সঞ্জীবের গলার স্বরটা যেন একটু কেঁপে গেল।

বলতে চাই যা একটু আগেই তা তোদের বললাম।

ঐ সময় শিখেন্দু তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে পুনরায় প্রবেশ করে বললে, কি বলছি রে পরেশ!

বলছিলাম, পরেশ বললে, তুই আমি নির্মল সঞ্জীব আমরা এই চারজনের মধ্যে—

কি? হাতে চিরুনিটা নিয়ে পরেশের মুখের দিকে তাকাল শিখেন্দু।

যে কেউ একজন, পরেশ বললে, কাল রাত্রে নির্বাণীকে হত্যা করতে পারি।

হাতের চিরুনি থেমে যায় শিখেন্দুর, সে যেন বজ্রাহত, পরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ বোজা গলায় প্রশ্ন করলে, আমরাই কেউ কাল রাত্রে নির্বাণীকে হত্যা করেছি?

করেছি তা তো আমি বলিনি শিখেন্দু, তবে করতে পারতাম।

তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! শিখেন্দু বললে।

মাথা আদৌ খারাপ হয়নি, আমরা সকলেই মনে মনে দীপাকে চেয়েছি, নির্বাণীও চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সে-ই পেল দীপাকে—তাতে করে নির্বাণীর ওপরে একটা আক্রোশ আমাদের হওয়া স্বাভাবিক, যে আক্রোশের বশে হত্যাও করা যায়।

শিখেন্দু চুপ। একেবারে যেন বোবা।

হাতের চিরুনি হাতেই ধরা আছে তখন তার, সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে পরেশের মুখের দিকে, পরেশ যেন হিংস্র নখর দিয়ে ওদের প্রত্যেকের মনের উপর থেকে একটা পর্দা ছিঁড়ে ওদের প্রত্যেককে নিজেদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পরেশ বলতে থাকে, দেখ, একমাত্র সঞ্জীব ছাড়া আমরা সকলেই কাল রাত্রে উৎসবে উপস্থিত ছিলাম। আমরা সকলেই ছিলাম নির্বাণীর বন্ধু, কাজেই আমাদের দ্বার ঐ বাড়িতে অবারিত ছিল। আমরা যদি ইচ্ছা করতাম, অনায়াসেই আমরা যে কেউ একজন আমাদের মধ্যে কোন এক ফাঁকে তিনতলায় গিয়ে বাথরুমের মধ্যে সুযোগের অপেক্ষায় আত্মগোপন করে থাকতে পারতাম।

তারপর? ক্ষীণ গলায় বলে উঠল সঞ্জীব ও শিখেন্দু।

তারপর কাজ শেষ করে, অনায়াসেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম।

কিন্তু শিখেন্দু বললে, গোকুল দোতলার বারান্দায় ছিল, তিনতলায় কাল রাত্রে যে যে গিয়েছে সে বলেছে।

কারো পক্ষেই এটা সম্ভব নয় বন্ধু, সর্বক্ষণ সিঁড়ির দিকে নজর রাখা। আর এও সম্ভব নয়, র‍্যাদার অ্যাবসার্ড—ভাবো যে গোকুল সর্বক্ষণই তিনতলার সিঁড়ির দিকে চেয়ে ছিল! যেতে আসতে প্রত্যেককেই দেখেছে!

কিন্তু সঞ্জীব তো কাল উৎসব-বাড়িতে যায়ইনি।

শিখেন্দু বললে, তবে তাকে কি করে সন্দেহ করা যেতে পারে?

যায়নি সেটা সঞ্জীব বলেছে।

সঞ্জীব ঐ সময় বললে, আমি কি মিথ্যা বলেছি?

মিথ্যা তুমি বলেছ কি না বলেছ সেটাও প্রমাণসাপেক্ষ।

তার মানে? সঞ্জীব বেশ যেন একটু বিরক্তই হয়েছে মনে হল। আমি তো রাত্রে সে-সময় থিয়েটার করছিলাম।

কিরীটীবাবু শুনলে হয়ত বলবেন, ওটা তোমার—মানে, তোমার ঐ সময়ে অনুপস্থিতিটার স্রেফ একটা অ্যালিবি, মানে—

দেখ, পরেশ, তোর ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে মাথাটাই দেখছি বিগড়ে গেছে! নির্মল বললে, এই ধরনের সব লুজ টক্‌স্ সময়বিশেষে কত সাংঘাতিক মারাত্মক হয়ে উঠতে

গায়ে আনিস!

সে তুই যাই বল্ নির্মল, সন্দেহের তালিকা থেকে আমরা তিনজন—বিশেষ করে নির্বাণীর বন্ধুদের মধ্যে বাদ পড়বো না।

ইডিয়ট! নির্মল বললে।

পরেশ কিন্তু নির্মলের গালাগালিটা গায়ে মাখে না। হাসতে থাকে।

মেসের ভৃত্য চরণ এসে ঘরে ঢুকল, আমাকে ডাকছিলেন শিখেন্দুবাবু?

হ্যাঁ, সামনের ব্লু হটার কেবিন থেকে গরম দুটো টোস্ট আর এক কাপ চা নিয়ে এসো তো চরণ।

ঐ সঙ্গে আমার জন্যও এক কাপ চরণদাস, সঞ্জীব বললে।

চরণদাস ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের আবহাওয়াটা যেন হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে গিয়েছে। কারও মুখেই কোন কথা নেই। এমন কি পরেশও যেন চুপচাপ।

আসলে পরেশের কথাগুলো যেন কেউই একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারছে না।

সকলের মনের উপরেই যেন একটা কালো সন্দেহের ছায়া ফেলেছে। ছায়াটা কালো-কালো। শিখেন্দুর একটা কথা মনে পড়ল, কিরীটী তখন বার বার প্রশ্ন করেছিল, একবার নয় দুবার সে গত রাত্রে তিনতলায় গিয়েছিল কিনা। সত্যিই সে যায়নি, তবে কিরীটীবাবু কেন ঐ প্রশ্নটা বার বার করেছিলেন! তবে কি পরেশের কথাই ঠিক!

কিরীটীবাবু তাকেও সন্দেহ করছেন।

শিখেন্দুর ভিতরটা যেন সহসা ঠাণ্ডা হিম হয়ে আসে। একটা অজ্ঞাত ভয় যেন তার মনের ওপর চেপে বসে। সে তার বন্ধুকে হত্যা করতে পারে ভাবতে পারলেন কি করে কিরীটীবাবু!

হ্যাঁ, দীপাকে সে ভালবেসেছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছিল নির্বাণী দীপাকে চায় এবং দীপাও নির্বাণীকে চায় সে তো সরে এসেছিল ওদের মধ্যে থেকে। খুশি মনেই সে বিয়ের উৎসবে যোগ দিয়েছিল।

পরেশই স্তব্ধতা ভঙ্গ করল, বেচারী নির্বাণীতোষ! প্রেমের পূজোয় একেবারে নির্বাণলাভ করে বসে রইল!

নির্মল চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ অস্বাভাবিক গলায়, তুই থামবি পরেশ!

পরেশ বলল, একটা সিগারেট দে, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে, একটু ধোঁয়া দেওয়া দরকার।

গলায় নয়, তোর মনে আগুন দেওয়া দরকার। নির্মল বললে।

সে সকলেরই একদিন দিতে হবে। পরেশ নির্বিকার কণ্ঠে বললে।

শিবতোষ মল্লিকের বেলতলার গৃহে যে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটে তার দিন-দুই পরে।

অর্থাৎ শনিবার রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যার কিছু পরে জগদ্দল মিল ওয়ার্কার্সদের ঘিঞ্জি পাশাপাশি কোয়ার্টার্সগুলোর মধ্যে পনের নম্বরের কোয়ার্টারটা খুঁজতে খুঁজতে একসময় এসে যখন পনের নম্বরের সামনে কিরীটী দাঁড়াল, ধোঁয়ায় ও সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন সেখানে যেন শ্বাসরোধ হবার যোগাড়।

হাত দুই আড়াই প্রস্থে হবে খোয়া-বিছানো কাঁচা রাস্তা এবং রাস্তায় যে আলোর ব্যবস্থা আছে তা এত অপ্রতুল যে চট করে কোন কিছু নজরেই আসে না। ভাগ্যিস একজন ওয়ার্কার পনের নম্বর কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিয়েছিল—ঠিক দেখিয়েও নয়, বলে দিয়েছিল, রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, একটা পোড়ো জমি, তারই সামনে একটা নিম গাছ, সেই নিম গাছের কাছেই শেষ কোয়ার্টারটাই পনের নম্বর কোয়ার্টার, আশুর। অর্থাৎ আশু মল্লিকের।

বিয়ে-থা করেনি লোকটা। দুটো ছোট ছোট ঘর নিয়ে একাই থাকে আশু মল্লিক, সে-ই বলেছিল। যে লোকটি খোঁজ দিয়েছিল আশু মল্লিকের, বিনোদ দফাদার—তার কাছেই মোটামুটি আশু সম্পর্কে জানতে পেরেছিল কথায় কথায় কিরীটী।

লেবার ইউনিয়নের আশু মল্লিক একজন কর্তা-ব্যক্তি। লোকটার গায়েও যেমন শক্তি তেমনি দুর্দান্ত সাহস। মারপিট করতে ওস্তাদ। তবে হ্যাঁ, লোকটার দিল আছে। ইউনিয়নের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। মিলের কর্তাব্যক্তিরা ও বাবুরা সবাই তাকে ভয় করে রীতিমত। রাস্তার পাশেই কাঁচা ড্রেনটা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, তারই কিছু দূরে একটা বারোয়ারী জলের কল, সেখান থেকেই সবাই জল নেয়।

বাড়ির দরজাটা বন্ধ থাকলেও খোলা জানলাপথে কিরীটীর নজরে পড়ে, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

কিরীটী বেশ উঁচু গলাতেই ডাকল, আশুবাবু আছেন—? আশুবাবু!

বার-দুই ডাকতেই সাড়া এল, কে?

একবার বাইরে আসবেন?

আসছি,—বলতে বলতেই প্রায় দরজা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, খোলা দরজাপথে প্যাণ্ট ও শার্ট পরিহিত লম্বা-চওড়া এক ব্যক্তি এসে দাঁড়াল, কে?

আশুবাবু আছেন? আশুতোষ মল্লিক? এটা কি তাঁরই কোয়ার্টার?

আপনি কে ?

আপনিই কি আশুবাবু ?

হ্যাঁ।

আমাকে আপনি চিনবেন না। আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

কি দরকার, কোথা থেকে আসছেন ? দরজার উপর দাঁড়িয়েই পুনরায় প্রশ্ন করল আশু মল্লিক।

আপনি তো নাম বললে বা কোথা থেকে আসছি বললেও আমাকে চিনবেন না!

আসুন।

কিরীটী ভিতরে প্রবেশ করল।

ওয়ার্কার্সদের ছোট ছোট কোয়ার্টার, তবে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা আছে। ছোট ছোট দুটো ঘর পাশাপাশি। মধ্যখানে যাতায়াতের দরজা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে।

ঘরের মধ্যে একটা চৌকি পাতা, খান-দুই বেতের চেয়ারও আছে। দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ও একটি মহিলার এনলার্জ করা ফটো।

এক কোণে ছোট একটা কাঁচের আলমারিতে কিছু বই আছে।

বসুন।

কিরীটী একটা চেয়ারে বসল। বসে আশুতোষের দিকে তাকাল। দক্ষিণার আশুর যেমন বর্ণনা দিয়েছিল ঠিক তেমনিই দেখতে আশুতোষ।

বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, গায়ের রংটা ফর্সাই, একটু যেন বেশীই ফর্সা। বোধ হয় তার মার গায়ের রংই পেয়েছে ছেলে।

পরনে মিস্ত্রেরই প্যাণ্ট ও শার্ট, বোধ হয় ফিরে এসে তখনও জামা কাপড় বদলাবারও সময় পায়নি। শিবতোষের গায়ের বর্ণ বেশ কালোই বলতে হবে, কিন্তু আশুর মুখের গঠন, চোখ মুখ নাক চোয়াল ঠিক যেন তার বাপেরই মত।

কোথা থেকে আসছেন ? কি নাম আপনার—আমার কাছে কি প্রয়োজন বলুন তো ?

কিরীটী হেসে ফেললে, আমি কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি আশুবাবু। আমার নাম কিরীটী রায়। কলকাতা থেকে আসছি।

কলকাতা থেকে—তা আমার কাছে কি প্রয়োজন বলুন তো ? চিনলাম না আপনাকে—

আপনি শিবতোষ মল্লিকের—

কিরীটীকে তার কথা শেষ করতে দিল না আশু, রুক্ষ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলে উঠল,

কে শিবতোষ মল্লিক—আমি চিনি না, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনি আসতে পারেন। গলার স্বরে রুক্ষতা ও রীতিমত বিরক্তিই যেন ঝরে পড়ল।

শিবতোষ মল্লিকের প্রথম পক্ষের সন্তান আপনি। আপনি সেটা স্বীকার না করলেও লোকে তাই বলবে।

লোকে কাকে কি বলল না বলল তা নিয়ে আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই মশাই। আমি জানি সে আমার কেউ নয়, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। বলুন তো সত্যিই কি জন্য আমার কাছে আপনি এসেছেন ?

আমি জানি আশুবাবু, আপনার স্বর্গীয়া জননীর প্রতি অবিচার এবং অত্যাচার হয়েছে—

অবিচার ! অত্যাচার ! কোন ভদ্রলোক যে কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে, বিশেষ করে যিনি সে-বাড়ির বধূ—অমন জঘন্য কুৎসিত ব্যবহার করতে পারে, যা অতিবড় ছোট-লোক, অশিক্ষিতেরাও করে না—

আমি জানি।

কিছুই জানেন না আপনি—

অবিশ্যি লোকের মুখে যা শুনেছি।

কি শুনেছেন ?

তাঁকে তাঁর শ্বশুর রায়বাহাদুর প্রিয়তোষ মল্লিক স্বীকার করে নেননি।

কিন্তু অপরাধটা কোথায় ? তার ছেলেই তো—

জানি পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন আপনার মাকে—

তাই বুঝি ন মাসের আমার গর্ভবতী মা যখন তার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, চার মাস স্বামীর কোন রকম সংবাদ বা চিঠিপত্র না পেয়ে, রায়বাহাদুর বাপ মুখের ওপর তার দরজা বন্ধ করে দিল ! ছেলে—তাঁর স্বামী দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ! আমার মা তো আশ্রয়ভিক্ষা করতে সেখানে যাননি, কেবলমাত্র স্বামীর সংবাদ নিতেই গিয়েছিলেন—

সত্যি বলছেন আপনি আশুবাবু ?

কিরীটী বুঝতে পারছিল, শিবতোষ মল্লিক সব সত্যি কথা বলেননি তাকে।

হ্যাঁ, একবর্ণও মিথ্যা নয়। সেই কাপুরুষ—মহাপুরুষকেই আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, ঐ ভণ্ডটাকে আমি একদিন গলা টিপে হত্যা করব, তারপর ফাঁসি যাব। একটা আগ্নেয়-গিরির মতই যেন ফুঁসতে লাগল আশু।

আপনি বোধ হয় তাই কখনও তাঁকে স্বীকার করেননি এবং তাঁর গৃহেও যাননি!

যে বাড়ির দরজা থেকে আমার নিরপরাধিনী মাকে অপমান আর লজ্জা মাথায় করে নিয়ে আসতে হয়েছে, সে বাড়ির দরজাও আশুতোষ মাড়ায় না।

তবু আইনে বলে, আপনিই তাঁর একমাত্র বংশধর এখন—

কোন্ দুঃখে! তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেই তার বংশধর। আমি তাকে স্বীকারও করি না, আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই।

আপনি জানেন একটা কথা, তাঁর সে ছেলেটি রবিবার খুন হয়েছে?

হয়েছে, ঠিক হয়েছে—এবার ওকেও যেতে হবে। আপনি কি ঐ সংবাদটি দিতেই এখানে এসেছেন কলকাতা থেকে? তাহলে জেনে যান, আমি খুব খুশি হয়েছি।

কিন্তু নির্বাণীতোষবাবু তো আপনার কখনও কোন ক্ষতি করেননি আশুবাবু। তাছাড়া তাঁর বাপের কর্মের জন্যও নিশ্চয়ই তিনি দায়ী নন। এবং শুনলে বিশ্বাস হয়ত করবেন না, তিনি আপনাকে দাদার মতই শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন।

কিরীটীর ঐ কথায়, বিশেষ করে তার শেষের সম্পূর্ণ বানানো কথাগুলিতে হঠাৎ যেন মনে হল আশুতোষ একটু বিমূঢ়ই হয়ে পড়েছে। কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

আরও আপনি হয়ত জানেন না, দুর্ঘটনার মাত্র দু'দিন আগে নির্বাণীতোষবাবু বিয়ে করেছিলেন! রবিবার রাত্রে তিনি খুন হন, সে রাত্রে ছিল বৌভাত ও ফুলসজ্জা তাঁর!

আশুতোষ পূর্ববৎ নির্বাক।

হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করল, আপনাকে নিমন্ত্রণ করেননি?

করেছিল।

করেছিলেন নিমন্ত্রণ?

হ্যাঁ।

কে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?

রায়বাহাদুর প্রিয়তোষ মল্লিকের ছেলে, আপনাদের শিবতোষ মল্লিক নন—

তবে কে?

নির্বাণীতোষই একটা চিঠি পাঠিয়েছিল।

নির্বাণীতোষবাবু আপনাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন নিজে?

হ্যাঁ।

আছে সে চিঠি?

আছে বোধ হয়।

দেখতে পারি চিঠিটা একবার?

আলমারিটা খুলে—বইয়ের উপরে রাখা ছিল চিঠিটা, সেটা বের করে দিল আশুতোষ কিরীটীর হাতে।

ডাকে এসেছে, খামের চিঠি।

খামটা থেকে চিঠিটা বের করে পড়ল কিরীটী। সংক্ষিপ্ত চিঠি। চিঠির তারিখ দিন-পাঁচেক আগের।

শ্রীচরণেষু দাদা,

আপনি আমাকে কখনও স্বীকার না করলেও চিরদিন আপনাকে আমি আমার জ্যেষ্ঠ বলেই জেনে এসেছি। আর পাঁচদিন পরে—শুক্রবার আমার বিয়ে। আপনি আসবেন না আমি জানি, তাই এই পত্রে আপনার আশীর্বাদ চেয়ে নিচ্ছি। প্রণত—নির্বাণীতোষ।

চিঠিটা পড়া শেষ হলে পুনরায় সেটা খামের মধ্যে ভরতে ভরতে কিরীটী বললে, কবে এ চিঠি পেয়েছেন আপনি?

গত শনিবার।

চিঠির জবাব—

না, দিইনি। তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই।

আপনি তো শুনেছেন আশুবাবু, রায়বাহাদুর প্রিয়তোষ মল্লিক কি প্রকৃতির লোক ছিলেন! আপনার জন্মদাতা হয়ত নিরুপায় হয়েই—

একটি ভদ্রঘরের নিরপরাধ মেয়েকে বিয়ে করবার সময় সেকথা তার মনে ছিল না? মেরুদণ্ডহীন অথর্ব পশু একটা! আবার যেন আশুতোষ আক্রোশে ফেটে পড়ল।

তাহলেও তাঁরও তো কিছু বলবার থাকতে পারে—

থাকুক, তা দিয়ে আমার কোন দরকার নেই।

হঠাৎ ঐ সময় প্রশ্ন করল কিরীটী, তাহলে আপনি সে-রাত্রে কলকাতায় যাননি?

না—না।

তবে কোথায় ছিলেন রবিবার রাত্রে? আপনি তো রবিবার বিকেলেই বের হয়ে গিয়েছিলেন?

কে বললে?

জানি আমি, যার সঙ্গে ট্রেনে আপনার দেখা হয়েছিল রবিবার—

আমি টালিগঞ্জে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

কি নাম তাঁর? ঠিকানা কি তাঁর?

কেন বলুন তো? অত সংবাদে দরকারটা কি আপনার? আপনি কি পুলিসের লোক?

না না, সে-সব কিছু নয়, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্যই কি এসেছেন আজ?

না না।

দেখুন মশাই, আমি ঘাস খাই না। এতক্ষণে আপনার এখানে আগমনের হেতুটা আমি বুঝতে পেরেছি। আশা করি আপনার যা জানবার ছিল জানা হয়ে গিয়েছে। এবারে দয়া করে উঠবেন কি—আমার এটা বিশ্রামের সময়।

কিরীটী বুঝতে পারে, আশু মল্লিক আর মুখ খুলবে না। ঝোঁকের মাথায় যতটুকু বলেছে—আর সে কিছু বলবে না।

আচ্ছা, তাহলে উঠি। নামটা আমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে আপনার, কিরীটী রায়। নমস্কার। কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

বাবা শিবতোষ মল্লিকের প্রতি তাঁর সন্তান আশুতোষ মল্লিকের ঘৃণা ও আক্রোশের সত্যিকারের কারণটা যেন আর অতঃপর অস্পষ্ট থাকে না কিরীটীর কাছে। ঘৃণা আর আক্রোশের মূলে কত বড় যে একটা ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে আশু মল্লিকের বুকের মধ্যে, আজ কিরীটী সেটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছিল বাপ আর ছেলের মধ্যে আবার মিলন ঘটানো সহজসাধ্য হবে না।

শিবতোষ মল্লিকের জন্য কিরীটীর দুঃখই হয়।

গাড়িটা অনেকটা দূরে বড় রাস্তার উপর একটা গাছের নীচে পার্ক করা ছিল। ফিরে এসে গাড়িতে উঠে হীরা সিংকে বললে, চল সর্দারজী।

কোঠি তো যাব?

হ্যাঁ।

চলমান গাড়িতে বসে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী নতুন করে আবার যেন নির্বাণীতোষের হত্যারহস্যের ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করে। নিঃসন্দেহে নির্বাণীতোষের নিষ্ঠুর হত্যার পিছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সেটা বেশ জটিলই—সেই জটিলতারই একটা সূত্র ছিল আশু মল্লিককে ঘিরে জট পাকিয়ে।

আশু মল্লিকের জটটা খুলবার জন্যই আজ সে আশু মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জটটা সবটা না খুললেও কিছুটা খুলেছে। এবং যতটুকু খুলেছে তাতে আপাততঃ কিরীটী অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে।

নির্বাণীতোষের সহপাঠীদের একবার যাচাই করে দেখা দরকার। বিশেষ করে তিনজনকে, শিবেন্দুকে আপাততঃ বাদ দিলে—সজীব, নির্মল ও পরেশ। ওদের মধ্যে একজন উৎসবের রাত্রে বেলতলার বাড়িতে আসেনি—সজীব।

বাকি দুজন এসেছিল। পরেশ ও নির্মল। অবিশ্যি স্বাতী বা স্মৃতি কেউই পরেশের কথা বলেনি। বলেছে সঞ্জীব ও নির্মলের কথাই। তারা নাকি নির্বাণীদের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করত।

কিন্তু গোকুল চিনতে পেরেছে পরেশকে। কেমন করে চিনল? হয়ত আগে না গেলেও, ইদানীং দু-একবার পরেশ নির্বাণীতোষদের বাড়িতে গিয়েছে, নচেৎ গোকুল তাকে চিনবে কি করে?

শিখেন্দুকে একবার গোকুল তিনতলায় যেতে দেখেছিল এবং তা যদি সত্য হয়, তাহলে শিখেন্দু দুবার উপরে গিয়েছিল সে-রাত্রে। অথচ শিখেন্দু অস্বীকার করেছে। সে বলেছে, একবারই নাকি সে উপরে গিয়েছে।

গোকুলের কথাটা কিরীটীর মিথ্যা বলে মনে হয় না। তারও ধারণা, শিখেন্দু দুবারই উপরে গিয়েছিল। কেন তবে অস্বীকার করছে শিখেন্দু প্রথমবার উপরে যাবার কথাটা! গোকুলের জবানবন্দি সত্য হলে, রাত দশটা কি তার দু-চার মিনিট আগে প্রথমবার শিখেন্দু উপরে গিয়েছিল। এবং গোকুল শিখেন্দুকে নেমে আসতে দেখেনি। আরও একটা ব্যাপার, শিখেন্দু উপরে যাবার মিনিট পনের-কুড়ি পরে নটা চল্লিশে সেই নীল শাড়ি পরা বৌটি উপরে গিয়েছিল। গোকুল তার কোন পরিচয় দিতে পারেনি, চিনতেও পারেনি তাকে মাথায় ঘোমটা থাকার দরুন। এবং গোকুল সেই নীল শাড়ি পরা মেয়েটিকে নেমে আসতে দেখেনি। কে সেই নীলবসনা নারী!

দুজনেই—শিখেন্দু ও সেই নারী আগে-পিছে উপরে গিয়েছিল। অথচ তাদের কাউকেই গোকুল নিচে নেমে আসতে আবার দেখেনি।

সেই নীলবসনা নারীর কথা বাদ দিলেও শিখেন্দু নেমে এসেছিলই, কারণ পৌনে এগারটা নাগাদ সে প্যাণ্ডেলে উপস্থিত ছিল ও নির্বাণী তার মাথা ধরেছে বলায় তাকে উপরে চলে যেতে বলেছিল।

শিখেন্দু তাহলে কখন নীচে নেমে এসেছিল এবং কোন্ পথে?

কিরীটীর মনের মধ্যে চিন্তাস্রোত অব্যাহত থাকে।

পৌনে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার কিছু আগেই মনে হচ্ছে নির্বাণীতোষকে হত্যা করা হয়। খুব সম্ভবতঃ এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও সেই রকমই বলেছে। ঐ সময়ের মধ্যেই নাকি নির্বাণীতোষের মৃত্যু হয়েছে বলে তাদের অনুমান। হত্যাকারীর পক্ষে উৎসবের রাত্রে বিশেষ যে সুবিধা দুটি ছিল তা হচ্ছে: প্রথমতঃ সে রাত্রে বাড়িতে উৎসবের জন্য দ্বার ছিল অবারিত। কত লোক যে

সেছিল তার সঠিক বিবরণ কারও পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। এবং সকলকে চেনাও কলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই ভিড়ের মধ্যে হত্যাকারী চেনা হোক বা অচেনা হাক, কারও মনেই কোন সন্দেহ জাগবার হেতু ছিল না। অন্ততঃ সেদিক দিয়ে ত্যাকারী খুবই নিশ্চিন্ত ছিল, কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। অনায়াসেই সে কাজ াসিল করে চোখের সামনে দিয়েই বের হয়ে যেতে পারবে সে জানত আর তাই সে ম্ভবতঃ গিয়েছেও।

দ্বিতীয়তঃ, উৎসবের রাত্রে হত্যা যেখানে সংঘটিত হয়েছে সেই তিনতলায় কেউ বড় াকটা যায়নি। যাবার প্রয়োজনও ছিল না। সেদিক দিয়েও হত্যার স্থানটি নিরিবিলি াবং সবার চোখের আড়ালেই ছিল। কাজেই হত্যাকারীর পক্ষে নিঃশব্দে হত্যাকাণ্ড ংঘটিত করে চলে যাওয়া আদৌ কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

খুব কৌশলে এবং নিশ্চিন্তে হত্যাকারী তার কাজ শেষ করেছে ঠিকই, কিন্তু তথাপি ়টি অসঙ্গতি যেন কিরীটীর প্রথম থেকেই মনের মধ্যে তাকে কেবলই কোন কিছুর ঙ্গিত দিচ্ছে—প্রথমতঃ, শিখেন্দুর জবানবন্দি থেকেই জানা যায়, চিৎকার শুনে গিয়ে ওপরে ওঠবার পর সে নির্বাণীতোষের শয়নঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়েছিল। নিশ্চয়ই রজাটা ঐ সময় খোলা ছিল, নচেৎ সে ভিতরে প্রবেশ করতে পারত না। দ্বিতীয়তঃ, াথরুমের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। একটা অবিশ্যি এর মধ্যে কথা থাকতে পারে, প্রথমটা দ্বিতীয়টার পরিপূরক হতে পারে। কিন্তু তাও তো প্রমাণসাপেক্ষ এবং সে প্রমাণ একমাত্র দিতে পারে দীপিকা দেবী, অর্থাৎ সে ঘরে ঢোকার পর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল কিনা, যদিও সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দীপিকা তার পূর্ণ স্মৃতি হারিয়েছে নিদারুণ মানসিক আঘাতে।

শিবতোষের ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান ডাঃ চৌধুরীরই অনুরোধে সিকায়াট্রিস্ট ডাঃ বর্মণকে আনা হয়েছিল। তিনি দীপিকাকে পরীক্ষা করে সেই অভিমতই নাকি প্রকাশ করেছেন। যদিও বলেছেন ডাঃ বর্মণ, দীপিকার পূর্ণ স্মৃতি আবার ফিরে আসবে, তবে কবে কখন হবে সে সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণীই তিনি করতে পারেননি। সেটা নাকি সম্ভবও নয়।

ডাঃ বর্মণের কথা অবিশ্যি ঠিক, কোন নিদারুণ আকস্মিক মানসিক আঘাতের ফলেই দীপিকার ঐ মনের মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু সেটা কি—তার স্বামীকে আকস্মিক মৃত আবিষ্কার করার জন্যই, না তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল?

কিরীটীর অনুমান আরও কিছু ছিল। এবং সে ব্যাপারটা, ওর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতের মতই অনুরূপ আঘাত হেনেছিল তার মনে, যার ফলে বেচারী আর

তার মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে ও স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়েছে তার। এবং কিরীটীর আরও অনুমান, সবটাই বাথরুমের মধ্যে ঘটেছিল। ঐ বাথরুমের মধ্যেই হত্যারহস্যের মীমাংসার আসল সূত্রটি অন্ধকারে দৃষ্টির অগোচরে জট পাকিয়ে আছে। এবং সে জট খুলতে হলে সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন, কে কে সে রাত্রে তিনতলায় গিয়েছিল? কখন গিয়েছিল? শিখেন্দু, নির্বাণীর বোন স্মৃতি, আর সেই নীলবসনা নারী।

পরের দিন সকালে সারকুলার রোডে শিখেন্দুদের মেসে গিয়ে হাজির কিরীটী। সকাল সাতটার মধ্যেই গিয়েছিল কিরীটী। কারণ সে জানত দেরি করে গেলে তাদের সঙ্গে দেখা হবে না, সবাই হাসপাতালে বের হয়ে যাবে।

শিখেন্দু বরাবরই সকালে ওঠে, তার স্নান পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে ডিউটিতে যেতে হবে বলে তখন সে জামাকাপড় পরছে। সঞ্জীব সদ্য সদ্য ঘুম ভেঙে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক পেয়ালা চা নিয়ে বসেছে।

শিখেন্দুবাবু!

কিরীটীর ডাকে শিখেন্দু চোখ তুলে দরজার ওপরে দেখে বললে, কিরীটীবাবু! আসুন, আসুন। সঞ্জীব, ইনি কিরীটী রায়।

সঞ্জীবও কিরীটীর দিকে তাকাল।

নির্বাণীতোষের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে একটু পরিচিত হতে এলাম।

বসুন। শিখেন্দু বললে।

আপনি সঞ্জীববাবু?

কিরীটীর প্রশ্নে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে সম্মতিসূচক ঘাড় হেলাল সঞ্জীব।

আপনি তো বোধ হয় সে-রাত্রে বেলতলার বাড়িতে উৎসবে যাননি?

না।

বন্ধুর বৌভাতে গেলেন না?

আমাদের ক্লাবে সে রাত্রে থিয়েটার ছিল।

আপনি অভিনয় করেছিলেন?

হ্যাঁ।

শিখেন্দু বললে, ও খুব ভাল অভিনয় করে কিরীটীবাবু।

তাই বুঝি? তা সে-রাত্রে আপনাদের কি নাটক অভিনয় হল?

বহ্নিশিখা। শিখেন্দু বললে।

কল্যাণীর পার্ট করেছি। সঞ্জীব বললে।

শিখেন্দু বললে, ও খুব চমৎকার ফিমেল রোল করে কিরীটীবাবু।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, সে ওঁর গলার স্বর ও চেহারা থেকেই বোঝা যায়। আজকাল তো ফিমেল রোল সর্বত্র মেয়েরাই করে শুনেছি।

আমাদের ক্লাবে এখনও কোন ফিমেল নিয়ে আমরা অভিনয় করিনি।

সঞ্জীবের কথা শেষ হবার আগেই বাইশ-তেইশ বছরের এক তরুণ ছোকরা ঘরে এসে ঢুকল। রোগা পাতলা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল. মুখের গঠনটা যেন ঠিক মেয়েদের মত।

সঞ্জীববাবু!

কে—ও তপনবাবু?

আমার পুরো টাকাটা তো সে-রাত্রের এখনও পেলাম না।

কেন, হিমাংশু দিয়ে দেয়নি?

না। বললেন, আপনার সঙ্গে আগে কথা বলবেন তারপর। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল সেই রাত্রেই টাকাটা মিটিয়ে দেবেন।

ছেলেটির গলার স্বর অবিকল মেয়েদের মত।

সঞ্জীব বললে, কত বাকি আছে?

পঞ্চাশ।

সঞ্জীব উঠে গিয়ে জামার পকেট থেকে পার্সটা বের করে দশ টাকার পাঁচখানা নোট তপনকে দিয়ে বললে, এই নিন, এখন যান, আমরা একটু ব্যস্ত আছি।

ধন্যবাদ, নমস্কার।

তপন চলে গেল। শুধু চেহারা এবং কণ্ঠস্বরই নয়, চলার ভঙ্গীও তপনের ঠিক মেয়েদের মত। কিরীটী নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল তপনের গমনপথের দিকে। তপন ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর কিরীটী সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, ভদ্রলোক কে?

তপন শিকদার। যাত্রা দলের অভিনয় করে। মৃদুকণ্ঠে বললে সঞ্জীব।

কোন্ যাত্রার দলে?

নবীন অপেরায়।

কিরীটী আবার শিখেন্দুর মুখের দিকে তাকাল, শিখেন্দুবাবু, পরেশবাবু আর নির্মলবাবু কোন্ ঘরে থাকেন?

পাশের ঘরেই, ডাকছি তাদের। শিখেন্দু গলা তুলে ডাকল, নির্মল পরেশ একবার এ ঘরে আয়। দুজনেই যেন বেরবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল হাসপাতালে, শিখেন্দুর ডাক

শুনে ওদের ঘরে ঢুকল।

কিরীটীবাবু, এর নাম পরেশ আর ও নির্মল—বলে ওদের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করল নির্মল। পরেশ, ইনি কিরীটী রায়।

নির্মল কোন কথা বলল না। পরেশ মৃদু কণ্ঠে বললে, না বললেও ওঁকে ঘরে ঢুকেই আমি চিনতে পেরেছিলাম শিখেন্দু, কাগজে ওঁর ছবি আমি দেখেছি।

কিরীটী কথা বললে, আপনারা তো দুজনেই সে-রাত্রে আপনাদের বন্ধুর বৌভাতে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ। দুজনেই বললে।

দুজনে আপনারা পাশের ঘরেতেই থাকেন ?

হ্যাঁ।

সে রাত্রে দুজনে একসঙ্গেই গিয়েছিলেন, একসঙ্গেই ফিরেছিলেন কি ?

না। পরেশ বললে, আমি রাত নটা নাগাদ গিয়েছিলাম ; কারণ আমার এক পিসিমার বাড়িতে ভবানীপুরে যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে যাই বেলতলায়, তারপর দশটার দু-চার মিনিট পরেই চলে এসেছি, নির্বাণী তখনও প্যাণ্ডেলে ছিল।.

কি করে বুঝলেন রাত তখন দশটা বা দশটা বেজে দু-চার মিনিট হবে ? আপনার হাতে কি ঘড়ি ছিল ? ঘড়ি দেখেছিলেন ?

সঞ্জীব বললে, ওর তো হাতঘড়িটা কিছুদিন আগে হাসপাতালে খুলে রেখে টেবিলে কাজ করছিল, চুরি গেছে। তার পর তো তুই ঘড়ি কিনিসনি পরেশ !

না, কিনিনি। কেমন যেন বোজা গলায় কথাটা উচ্চারণ করল পরেশ।

তবে ? তবে সময়টা বুঝলেন কি করে ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

মানে আন্দাজ, ঐ রকমই হবে ভেবেছিলাম। পরেশ বললে আবার পূর্ববৎ নিস্তেজ গলাতেই।

তারপর আপনি কোথায় যান ? কিরীটীর প্রশ্ন।

কোথায় আর যাবো, এখানেই ফিরে আসি।

আপনাদের এ ঘরে টেবিলের ওপরে তো দেখছি একটা ছোট ক্লক রয়েছে। কার ওটা ?

শিখেন্দুর।

ফিরে এসে ঘড়িটা দেখেছিলেন ?

দেখেছি।

রাত তখন কটা ?

পৌনে বারোটা, মানে—

দশটা বাজার দু-চার মিনিট পরেই যদি বের হয়ে থাকেন তো ফিরতে আপনার প্রায় দু'ঘণ্টার মতো সময় লাগল কেন? হেঁটে নিশ্চয়ই আসেননি?

না, বাসে।

বাসে! ঐ সময় রাত্রে এই পথটুকু আসতে অত সময় লাগতে পারে না পরেশ-বাবু। পারে কি?

না না।

তবে? রাস্তায় 'জ্যাম' ছিল?

জ্যাম!

হ্যাঁ। তাহলে অবিশ্যি দেরি হতে পারে কিছুটা,—তাহলেও প্রায় দু'ঘণ্টা।

হঠাৎ পরেশ যেন একটু চটে ওঠে, বললে, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?

কেন করব না! কিরীটী মৃদু হাসল।

তবে?

সত্যি বললে, বিশ্বাসযোগ্য হলে নিশ্চয়ই আপনার সব কথাই বিশ্বাস করব, পরেশবাবু।

মানে?

মানে আপনি সত্যি বলছেন না!

আমি মিথ্যা বলছি? মিথ্যা বলে আমার লাভ?

লাভ যদি সত্যিই কিছু থাকে, সেটা তো আমার চাইতে আপনারই বেশী জানার কথা পরেশবাবু! কিরীটীর গলার স্বর যেমন ঠাণ্ডা তেমনি শান্ত।

আপনার তাহলে কি ধারণা নির্বাণীকে আমিই হত্যা করেছি?

পরেশবাবু, উত্তেজিত হবেন না। নির্বাণীতোষবাবু আপনাদের সকলেরই বন্ধু ছিলেন, এবং আপনাদের পাঁচজনের মধ্যে একটু বেশীই ঘনিষ্ঠতা ছিল। শুধু তাই নয়, দীপিকাও আপনাদের বান্ধবী। আপনারা সকলেই তাঁকে ভালবাসেন, তাঁর এত বড় দুর্দিনে আপনাদের প্রত্যেকেরই কি কর্তব্য নয় সেক্ষেত্রে নির্বাণীতোষের হত্যাকারীকে যাতে আমরা খুঁজে বের করতে পারি সে ব্যাপারে সাহায্য করা!

কেন করব না। নিশ্চয়ই করব। পরেশ বললে।

নির্মলবাবু আপনি? সহসা কিরীটী নির্মলের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, আপনি কি বলেন?

নিশ্চয়ই তো, পরেশ ঠিকই বলেছে।

আপনি কখন ফিরেছেন সে-রাত্রে নির্মলবাবু? কখন সেখান থেকে বের হয়েছিলেন?

কিরীটীর প্রশ্নে সকলেরই চোখের দৃষ্টি একই সঙ্গে যেন নির্মলের মুখের উপরে গিয়ে স্থির হল। এবারও সঞ্জীবই বললে, ও ফিরেছে রাত তখন বোধ হয় সোয়া বারোটা হবে।

বেলতলার বাড়ি থেকে আপনি বের হয়েছিলেন কখন সে-রাত্রে নির্মলবাবু? কিরীটীর প্রশ্ন।

ও সেদিন বলছিল রাত দশটার পরেই নাকি বের হয়ে এসেছিল বেলতলার বাড়ি থেকে। আবার সঞ্জীব বললে।

তার মানে আপনারও প্রায় দু'ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ই লেগেছিল ফিরতে সে-রাত্রে। কিরীটী বলে।

নির্মল কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

শিখেন্দুবাবু আপনি জানেন, উনি কখন বের হয়ে এসেছিলেন বেলতলার বাড়ি থেকে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করল।

না। দেখিনি।

আপনি তো পৌনে এগারোটা পর্যন্ত প্যাণ্ডেলেই ছিলেন শিখেন্দুবাবু, আপনি তবু জানেন না?

শিখেন্দু ম্লান গলায় জবাব দিল, লক্ষ্য করিনি কখন নির্মল বের হয়ে এসেছে!

আর আমি যদি বলি শিখেন্দুবাবু, দশটার কিছু আগে থাকতেই, সাড়ে দশটা পর্যন্ত আপনি প্যাণ্ডেলে ছিলেন না বলেই ব্যাপারটা জানতে পারেননি!

না না। আমি তো তখন প্যাণ্ডেলেই ছিলাম।

না, ছিলেন না। কিরীটীর গলার স্বর ঋজু ও কঠিন শোনাল।

তবে কোথায় ছিলাম?

সেটা আপনিই ভাল জানেন। আমার পক্ষে সেটা তো জানা সম্ভব নয়।

সবাই চুপ। সবাই যেন বিব্রত কেমন।

সঞ্জীববাবু!

কিরীটীর ডাকে এবার সঞ্জীব ওর দিকে তাকাল।

আপনি তো থিয়েটার করছিলেন?

হ্যাঁ।

কখন থিয়েটার শুরু হয়েছিল?

একটু দেরি হয়েছিল, রাত পৌনে আটটায়—

কখন শেষ হল ?

রাত সোয়া এগারোটায়।

তারপরেই আপনি বোধ হয় চলে আসেন ?

হ্যাঁ।

মাঝখানে—মানে থিয়েটার চলাকালীন সময়ে আপনি কোথাও যাননি ?

না।

আপনাদের ক্লাবের নাম কি ?

পাইকপাড়া স্পোর্টস ইউনিয়ন।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে শান্ত গলায় বললে, শিখেন্দুবাবু নির্মলবাবু পরেশবাবু সঞ্জীববাবু—আমার মনে হয় আপনাদের সকলেরই দুর্বলতা ছিল দীপিকার ওপরে!

কি বলছেন আপনি ? সঞ্জীব প্রতিবাদ জানায়।

কথাটা যে মিথ্যা নয়, আমার অনুমান হলেও সেটা আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। আর এও আমি বলছি, আপনাদের মধ্যে কেউ একজনও এও জানেন—নির্বাণীতোষের হত্যাকারী কে।

সঞ্জীব আবার প্রতিবাদ জানায়, আমরা জানি ?

হ্যাঁ। তার প্রমাণ, কেউ আপনারা সত্যি কথা বলতে নারাজ। এবং কতকটা ইচ্ছা করেই সত্যি কথা প্রকাশ করছেন না। রাত দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আপনারা কে কোথায় ছিলেন ? আজ আমি উঠছি, আপনাদের আর ডিটেন করব না, কিন্তু আবার আমাদের দেখা হবে। নমস্কার।

কিরীটী কথাগুলো বলে সহসা কতকটা যেন নাটকীয় ভাবেই চেয়ার থেকে উঠে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর ওরা চারটি প্রাণী স্তব্ধ অনড় হয়ে যেমন বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই রইল।

হঠাৎ একসময় ঘরের অসহনীয় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরেশই বলে উঠল, ফ্যানটাসটিক্—রিডিকুলাস! ভদ্রলোকের ওপরে আমার সত্যিই কিছুটা শ্রদ্ধা ছিল, এখন দেখছি মানুষটা একটা পুরোপুরি হামবাগ! শেষ পর্যন্ত কিনা ধারণা হল তার—আমরাই, মানে, আমাদের মধ্যে কেউ একজন সে-রাত্রে নির্বাণীকে হত্যা করেছি আর আমাদের মধ্যে কেউ একজন তাকে চেনে বা দেখেছে।

ক্ষীণ গলায় শিখেন্দু বললে, কিন্তু এটা তো ঠিক, কেউ আমরা সত্যি স্টেটমেণ্ট

দিইনি!

মানে? আমরা মিথ্যা বলেছি? পরেশ রাগত কণ্ঠে শুধাল।

তোমরা বলেছ কিনা তোমরাই জান, তবে আমি বলেছি—

কি?

দশটার আগে একবার আমি ওপরে গিয়েছিলাম।

ওপরে মানে? পরেশ শুধাল।

তিনতলায় নির্বাণীর ঘরে—

সে কি? কেন?

নির্বাণী বরাবর স্পেশাল ব্রাণ্ড স্টেট্ এক্সপ্রেস ৫৫ খেত তোরা তো জানিস। ওর সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, অথচ সঞ্জীব তখনও যায়নি, তাই নির্বাণী আমাকে বলেছিল তিনতলায় গিয়ে তার ঘর থেকে দু প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসতে, নির্বাণী প্যাণ্ডেল ছেড়ে যেতে চায়নি।

তারপর?

হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চমকে সকলেই ফিরে তাকাল দরজার দিকে। কিরীটী চলে যায়নি ঘর থেকে, বের হয়ে দরজার আড়ালেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল—কারণ সে অনুমান করেছিল তার ঐ কথাগুলো বলে ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর চার বন্ধু ব্যাপারটা নিয়ে কোন-না-কোন মন্তব্য হয়তো করবেই। এবং তার অনুমানটা যে মিথ্যা নয় সেটা একটু পরেই প্রমাণিত হওয়ায় সে কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছিল।

শিখেন্দুর শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে সাড়া দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

কিরীটীর অভাবিত অতর্কিত আবির্ভাবে চারজনেই যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা মুহূর্তের জন্য।

পরেশই বলে, কিরীটীবাবু আপনি তাহলে যাননি?

না, পরেশবাবু। 'হামবাগ' হলে অবিশ্যি চলেই যেতাম, কিন্তু শিখেন্দুবাবু—আপনি থামলেন কেন? একটু আগে যা বলছিলেন শেষ করুন! তারপর কখন কোন্ পথে আপনি আবার নীচের প্যাণ্ডেলে ফিরে আসেন সে-রাত্রে! প্লিজ—বলুন, চুপ করে থাকবেন না!

শিখেন্দু যেন কেমন বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

বলুন!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলাম। আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথাগুলো বলল শিখেন্দু।

কতক্ষণ পরে?

মিনিট দশ-বারো পরেই—

তবে গোকুল আপনাকে নেমে আসবার সময় দেখতে পেল না কেন ?

বলতে পারব না—

কখন গিয়েছিলেন ওপরে ?

রাত দশটা বোধ হয় তখন।

তাহলে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে সেই নীলবসনা রহস্যময়ী নারীর দেখা হয়েছিল ?

নীলবসনা রহস্যময়ী নারী! সে আবার কে ? পরেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল।

নিৰ্বাণীতোষবাবুর হত্যাকারী।

কি বলছেন আপনি কিরীটীবাবু ? নির্মল বলল, তাহলে কোন মহিলাই খুনী ?

আপাতদৃষ্টিতে তাই বলতে পারেন।…কি, শিখেন্দুবাবু কোন স্ত্রীলোককে দেখেননি তিনতলায়, সে তো আপনার পরে-পরেই ওপরে গিয়েছিল, দেখেননি ?

না—না তো—বলে শিখেন্দু সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাল।

না। সত্যি বলছি মিঃ রায়, সে-সময় তিনতলায় কাউকে আমি দেখিনি।

তবে কেন আপনি ওপরে আরো একবার গিয়েছিলেন, আমার বার বার জিজ্ঞাস করা সত্ত্বেও স্বীকার করেননি ? কেন ?

ভয়ে—

ভয়—কিসের ভয় ?

যদি আপনি—

আপনাকে সন্দেহ করি তাই ?

হ্যাঁ।

কিরীটী কিছুক্ষণ অতঃপর তাকিয়ে রইলো শিখেন্দুর মুখের দিকে। তারপর বলল চলুন—আপনি তো বেরুবেন, হাসপাতালে যাবেন

হ্যাঁ।

চলুন আপনাকে আমি হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে যাব।

শিখেন্দু আর প্রতিবাদ জানাতে পারল না। কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বে হয়ে গেল।

গাড়িতে বসে যেতে যেতে কিরীটী শিখেন্দুকে কতকগুলো কথা বলল।

শিখেন্দু শুনে গেল।

হাসপাতালের গেটের সামনে নামিয়ে দেবার সময় কিরীটী বললে, সংবাদগুলো আমার চাই—যত তাড়াতাড়ি পারেন দেবেন। সোজা আমার বাড়িতে চলে আসবেন

শিখেন্দু তখন অনেকটা আবার স্বাভাবিক বোধ করছে নিজেকে। বললে, যাব।

কিরীটীর গাড়ি চলে গেল।

ফেরার পথে কিরীটী ভবানীপুর থানায় নেমে বীরেন মুখার্জীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। বাড়িতে এসে যখন পৌঁছল, বেলা তখন সাড়ে দশটা।

ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে কৃষ্ণা শুধাল, কি ব্যাপার, সকাল বেলাতেই কিছু না খেয়েই কোথায় বের হয়েছিলে?

সারকুলার রোডে শিখেন্দুদের মেসে—

কিছু খাবে তো এখন?

না, এক কাপ কফি নিয়ে এস।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই কিরীটী সোফা-কাম-বেডটার উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল। দীপিকার কথাই মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল কিরীটীর। এই সময় কিন্তু দীপিকার কাছে গিয়ে কোন লাভই নেই। অতীতের সমস্ত স্মৃতি বর্তমানে তার মন থেকে মুছে গিয়েছে। ডাঃ বর্মণ যেমন বলেছেন, দীপিকার পূর্ণ স্মৃতি আবার ফিরে আসবে, কিন্তু কবে কেমন করে আসবে, তা তিনি বলতে পারেন না; তার ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে কিরীটীর চলবে না, তাই সে মনে মনে গাড়িতে আসতে আসতেই সংকল্প করেছিল, দীপিকার পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে কিনা সে-সম্পর্কে সে একবার চেষ্টা করে দেখবে।

কারণ কিরীটীর মন কেন যেন প্রথম থেকেই বলছে, দীপিকা হয় হত্যাকারীকে দেখেছিল বা সে বাথরুমে এমন কিছু দেখেছিল যেটা তার মানসিক ভারসাম্য হারাবার কারণ হয়েছিল।

হত্যাকারী কি তখনো বাথরুমের মধ্যেই ছিল? তাই যদি হয় তো, ময়না তদন্ত রিপোর্টে যেমন নির্বাণীতোষের মৃত্যুর সময় বলছে—সেটা ঠিক নয়, হয়তো দীপিকা ঘরে ঢোকার পরই হত্যাকারী নির্বাণীতোষকে হত্যা করেছে। কিন্তু তাহলে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, হত্যাকারী বাথরুমের মেথরদের যাতায়াতের দরজাটা খুলে পালাল না কেন? আর তা যদি না পালিয়ে থাকে তো কোন্ রাস্তা দিয়ে সে পালাল? সিঁড়িপথ দিয়ে নিশ্চয়ই নয়?

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল, হাতে কফির কাপ।

কফির কাপটা কিরীটীর হাতে তুলে দিয়ে সামনের সোফাটার উপরে বসতে বসতে কৃষ্ণা বলল, দেখ, আমার একটা কথা কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল—

কি কথা? কিরীটী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

হত্যাকারীকে দীপিকা বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল, শুধু তাই নয় চিনতেও পেরেছিল তাকে।

তার মানে তুমি বলতে চাও কৃষ্ণা, হত্যাকারী দীপিকার কোন পরিচিত জন?

মনে হয় তাই।

হওয়াটা অসম্ভব নয়। তবে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট যদি সত্যি বলে ধরে নিই, তাহলে হত্যাকারীর তখন সেখানে উপস্থিত থাকাটা কোন যুক্তিবিচারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কেন?

কারণ দীপিকা ওপরে গিয়েছিল পৌনে বারোটা নাগাদ, তারপর ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হয় এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে পৌনে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটা ঐ এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই কোন এক সময়ে নির্বাণীতোষকে হত্যা করা হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। তাই যদি হয়, তবে হত্যার পর আধঘণ্টা পনের কুড়ি মিনিট হত্যাকারী বাথরুমে থাকবে কেন? কাজ শেষ হবার পর তো তার চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক!

তা স্বাভাবিক, তবে এমনও তো হতে পারে—

কোন্ পথে পালাবে, কোন্ পথে পালালে সে কারো নজরে পড়বে না সেটা ভাবতে তার কিছু সময় গেছে।

তারপর? পালাল কোন্ পথে? বাথরুমের মেথরদের যাবার দরজা তো বন্ধ ছিল, আর সিঁড়ি দিয়ে পালালে সবার চোখে পড়ে যেত তখন।

পাশের ঘরের সংলগ্ন বাথরুম নেই?

কিরীটী যেন কৃষ্ণার কথায় চমকে উঠে বললে, ঠিক বলেছ! সে ঘরটা তো দেখিনি! বলেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে কিরীটী শিবতোষের বাড়িতে ফোন করল।

শিবতোষ বাড়িতে ছিলেন না। ফোন ধরল তাঁর ছোট মেয়ে স্বাতী, কে?

আমি কিরীটী রায়, আপনি কে?

স্বাতী।

স্বাতী দেবী, আমাকে একটা সংবাদ দিতে পারেন?

কি বলুন?

আপনার দাদা তিনতলায় যে পাশাপাশি দুটি ঘর ব্যবহার করতেন, তার দুটো ঘরেই কি সংলগ্ন বাথরুম আছে?

আছে। ওপরের সব ঘরেই সংলগ্ন বাথরুম আছে, একটা ঘর বাদে।

সে বাথরুমেও নিশ্চয়ই মেথরদের যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে?

পেছনের দিকে একটা সরু ফালি বারান্দা আছে, সেই বারান্দা দিয়েই প্রত্যেকে বাথরুমে ঢোকে, মেথরের সিঁড়িটা লোহার ঘোরানো।

ওপরে গিয়ে চট্‌ করে একবার দেখে আসবেন, সেই পাশের ঘরের বাথরুমের দরজাটা খোলা না বন্ধ?

ধরুন, দেখে এসে বলছি।

মিনিট দশেক বাদেই স্বাতী এসে বলল, দরজাটা বন্ধ আছে।

আর একটা কথা, সে রাতের পর কেউ কি তিনতলায় আর গিয়েছে?

না। কেউ যায় না আর ওপরে।

মেথররাও না?

না।

কেন?

বাবা বারণ করে দিয়েছেন। ওপরের সব ঘরেই এখন তালা দেওয়া

বৌদি কেমন আছেন?

সেই রকম।

কিছুই মনে করতে পারছেন না?

না।

ধন্যবাদ। কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

উঃ কৃষ্ণা, তোমার জন্যই রহস্যের রীতিমত শক্ত জট খুলে গেল। কেবল সেদিন থেকে অন্ধকারে হাতড়ে মরছিলাম অথচ একবারও দ্বিতীয় ঘটনার কথা মনে হয়নি, আশ্চর্য! এতবড় একটা ভুল হল কেন আমার? মাথার বস্তুগুলো বোধ হয় সব ফসিল হয়ে গিয়েছে আমার কৃষ্ণা—I must retire now, কিরীটীর ছুটি এবারে—

না, কিছুই হয়নি—সব ঠিক আছে।

তবে কথাটা মনে পড়ল না কেন? বুড়ো হয়ে গিয়েছি কৃষ্ণা—বুড়ো হয়ে গিয়েছি, সকলকে প্রণাম জানিয়ে এবারে ছুটি নেব।

হয়ত পরে মনে পড়ত, কৃষ্ণা মৃদু হেসে বলে।

স্বামীকে স্তোক দিচ্ছ?

না গো না। কিরীটী রায় তার জীবনের [illegible] মুহূর্ত পর্যন্ত কিরীটী রায়ই থাকবে, কিন্তু কফিটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

যাক। জটটাও খুলেছে, আর সেই সঙ্গে এখন যেন অন্ধকারে একটু একটু করে

আলোও ফুটে উঠছে।

ঐদিনই বিকেলের দিকে।

খোলা জানলাপথে মৃদু মৃদু প্রথম বসন্তের হাওয়া আসছে।

কৃষ্ণা আর কিরীটী তাদের বসবার ঘরে বসে গল্প করছিল। জংলী এসে ঘরে ঢুকল, বাবুজী!

কিরে?

একজন ভদ্রমহিলা আর একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কোথা থেকে এসেছে? নাম কি?

বললেন বলতে শিবতোষবাবুর মেয়ে।

যা, এই ঘরে নিয়ে আয়।

একটু পরে ঢুকল স্বাতী ও দামী সিল্কের সুট-পরিহিত সুদর্শন এক ভদ্রলোক, বয়স আটাশ-উনত্রিশ হবে।

আসুন।

নমস্কার। আমার নাম পরেশ ভৌমিক, স্বাতী আমার স্ত্রী, কলকাতা হাইকোর্টে আমি প্র্যাকটিস করি। বার-এট-ল। আপনিই তো মিঃ রায়!

হ্যাঁ বসুন, নমস্কার।

ওঁরা দুজন বসলেন। তারপর পরেশ ভৌমিক বললেন, দেখুন মিঃ রায়, আপনি হয়ত আমাদের দুজনের এভাবে আসায় একটু অবাকই হয়েছেন, ভাবছেন কেন এলাম—

না না, তা কেন—

এসেছি এইজন্য যে, আমার স্ত্রী স্বাতী সেদিন আপনার কাছে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিল তার মধ্যে একটা মিথ্যা ছিল, শুনে আমি ওকে নিয়ে এলাম, মিথ্যাটা সংশোধন করে নেবার জন্য।

মিথ্যা স্টেটমেণ্ট! কিরীটী তাকাল পরেশ ভৌমিকের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, স্বাতী যে বলেছিল, ওদের বৈমাত্রেয় ভাই, ঐদিন উৎসবের রাত্রে—

কিরীটী বাধা দিয়ে বললে, হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন ওঁদের বৈমাত্রেয় ভাই আশু মল্লিককে কখনও উনি বেলতলার বাড়িতে আসতে দেখেননি। উনি যে সত্য গোপন করেছিলেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি পরে।

পেরেছেন বুঝতে?

হ্যাঁ, আগের কথা বলতে পারি না, তবে উৎসবের রাত্রে যে আশু মল্লিক এসেছিলেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আর এও বুঝেছিলাম, অন্য কোনদিন না দেখলেও সে-রাত্রে উনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐ অচেনা আগন্তুকই ওঁর বৈমাত্রেয় ভাই। আপনার যদি আপত্তি না থাকে স্বাতী দেবী, এবার বলুন সে-রাত্রে কখন কোথায় দেখেছিলেন তাঁকে আর চিনতেই বা পারলেন কি করে তাঁকে যে তিনি আপনাদের বৈমাত্রেয় ভাই?

বল স্বাতী, আমাকে যা বলেছ তা ওঁকে বল। ব্যাপারটা একটা জঘন্য মার্ডার কেস, প্রত্যেক সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরই কর্তব্য দেশের আইনকানুনকে সাহায্য করা নিজ নিজ সাধ্যমত। ইট ইজ ইওর ডিউটি, স্পিক আউট!

স্বাতী তখন যা বললে—

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সে একবার উপরে গিয়েছিল, দু-চার-পাঁচ মিনিট হয়ত আগেই। দীপিকার চশমাটা আনতে ওপরের ঘর থেকে। বৌ সাজাবার পর দীপিকা চশমাটা পরতে ভুলে গিয়েছিল। পরে তাকে ঘরে এনে বসিয়ে দেবার ঘণ্টা-তিনেক পরে কষ্ট হতে থাকায় শেষ পর্যন্ত স্বাতীকে বলে ওপরে গিয়ে চশমাটা নিয়ে আসার জন্য। সেই চশমাটা আনতেই স্বাতী ওপরে গিয়েছিল। ঘরের দরজা খোলা এবং ঘরে আলো জ্বলতে দেখে স্বাতী একটু অবাকই হয়। হঠাৎ ওর কানে আসে ঘরের মধ্যে তার দাদা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে।

দাদার কথা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন আপনি? কিরীটীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ, দাদা যেন কাকে বলছিল, নিশ্চয়ই দেব দাদা, তোমার আশীর্বাদ দীপাকে আমি নিজেই পরিয়ে দেব। কিন্তু তুমিও তো নিজের হাতে তাকে দিতে পার, সে সব জানে—তাকে ডেকে আনব নীচে থেকে?

তারপর?

জবাব এল ভারী গম্ভীর গলায়, না না—তার কোন দরকার নেই ভাই। তুমি তাকে দিও আমার নাম করে। এ বাড়িতে কোনদিনও আমি আসতাম না, আসব না-ই ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার চিঠি পেয়ে আসতেই হল।

এবারে আমি যাব। বড়দা বললেন শুনতে পেলাম।

দাদা?

বল? বড়দার গলা।

বাবাকে তুমি ত্যাগ করেছ বড়মার ওপরে অন্যায় করেছিলেন বলে। সে ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে চাই না, কিন্তু আমরা ভাইবোনেরা তো কোন অপরাধ করিনি তোমার কাছে? আমাদের কেন ত্যাগ করলে?

বড়দার গলা শোনা গেল আবার, তোমাদের তো আমি ত্যাগ করিনি ভাই। ত্যাগ করলে কি আসতাম আজ তোমার চিঠি পেয়ে। কিন্তু, আর নয় ভাই, এবারে আমি যাব।

স্বাতী বললে, তখনি দরজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে বড়দাকে আমি দেখি। দাদা বড়দাকে প্রণাম করল। বড়দা দাদার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর ?

বড়দা বললেন দাদাকে, আমার কথা যেন কেউ না জানতে পারে নির্বাণী।

কেউ জানবে না দাদা।

না। বোনেদেরও বলো না।

না, বলব না। আমি—তুমি আসবে ফোনে সেদিন হাসপাতালে বলার পরই এই ঘরের বাথরুমের দরজাটা খুলে রেখে দিয়েছিলাম আজ সন্ধ্যাবেলাতেই। চল ঐ পথ দিয়েই তোমায় বের করে দেব। স্বাতী তার কথা শেষ করে একটু থামল, তারপর আবার বললে, আর একটা কথাও আপনার জানা দরকার কিরীটীবাবু।

বলুন ?

বড়দা বৌদিকে দেবার জন্য দাদার হাতে যে প্রেজেনটেশনটা দিয়ে গিয়েছিলেন, একটা সোনার হার, সেটা আমার কাছেই আছে।

আপনার কাছে ?

হ্যাঁ, দাদা বড়দাকে নিয়ে বের হয়ে যাবার পর ঘরে ঢুকে আমি একটা ভেলভেটের কেস বিছানার ওপর পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলে নিই।

তারপর ?

নীচে নিয়ে এসেছিলাম বৌদির গলায় পরিয়ে দেব বলে, কিন্তু লোকজনের আসা-যাওয়ার জন্য সুযোগ পাইনি। সেটা আমার কাছেই আছে। কথাগুলো বলে স্বাতী কেমন যেন ইতস্তত: করতে থাকে। মনে হয় কিরীটীর, স্বাতীর যেন আরো কিছু বলার আছে কিন্তু বলতে পারছে না।

আর কিছু বলবেন স্বাতী দেবী ?

কিরীটীবাবু!

বলুন ?

দাদাকে বড়দা খুন করতে পারে বলে আপনার বিশ্বাস হয় ?

না। আপনার দাদাকে আশুবাবু খুন করেননি।

আঃ, আপনি আমাকে বাঁচালেন কিরীটীবাবু। আমার স্বামীর ধারণা বিষয়ের লোভে

বড়দাই দাদাকে—

না পরেশবাবু, নির্বাণীবাবুর হত্যাকারী আশু মল্লিক নন।

আপনি বুঝতে পেরেছেন কে হত্যাকারী? পরেশ ভৌমিক জিজ্ঞাসা করলেন।

পেরেছিলাম গতকালই, এখন নিঃসন্দেহ হলাম।

কে—কে হত্যাকারী?

ক্ষমা করবেন মিঃ ভৌমিক, সবটাই আমার অনুমান এখনও। অনুমানের ওপর নির্ভর করে তো একজনের হাতে হাতকড়া পরানো যায় না। প্রমাণ—প্রমাণের দরকার, কাজেই যতক্ষণ না সেই প্রমাণ আমার হাতে আসছে কিছুই বলতে পারব না।

অতঃপর স্বাতী ও পরেশ ভৌমিক বিদায় নিল। একটু পরে কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে দেখল, কিরীটী ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে।

ওরা কি বলতে এসেছিল গো? কৃষ্ণা শুধাল।

ওরা যা বলে গেল, মানে স্বাতী দেবী, অর্থ হচ্ছে হতভাগ্য নির্বাণীতোষ নিজেই তার হত্যাকারীর আসবার পথটা খুলে রেখেছিল।

সে কি!

হ্যাঁ। সত্যিই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। জান সে রাত্রে আশু মল্লিক তার ভ্রাতৃ-বধূকে আশীর্বাদ করতে এসেছিল।

আশু মল্লিক সত্যি-সত্যিই এসেছিল তাহলে?

হ্যাঁ, কিন্তু—

কি?

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। বাপ ও ছেলের মধ্যে পুনর্মিলনের যে ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু ছিল, নির্বাণীতোষের মৃত্যুতে তাও আর রইল না। বাপ ও ছেলের মধ্যে যে সেতুটা গড়ে উঠছিল, সেটা বোধ হয় চিরদিনের মতই ভেঙে গেল।

তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন আরও কিছু সংবাদ আছে! কৃষ্ণা বলল।

হ্যাঁ কৃষ্ণা, হত্যাকারী আর অস্পষ্ট নেই—সে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার সামনে এতক্ষণে। সন্দেহটা আমার গোড়া থেকেই হয়েছিল—কিন্তু ঐ নীলবসনা নারী, সে-ই সব যেন কেমন গোলমাল করে দিচ্ছিল।

নীলবসনা নারী কে ছিল বুঝতে পেরেছ?

অনুমান করতে পেরেছি বৈকি, এবং তার আইডেনটিফিকেশানেরও সব ব্যবস্থা করেছি। অহল্যার ঘুম ভাঙানোর জন্য কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—

কি গো?

অহল্যার ঘুম ভাঙা মানেই তো নিদারুণ আর এক আঘাত তার বুক পেতে নিতে হবে।

তোমার কি মনে হয় হত্যাকারীকে সে চিনতে পেরেছিল?

সম্ভবতঃ নয়। কারণ হত্যাকারী সে-সময় তার ধারেকাছেও ছিল না।

তবে?

ঐ ভাবে আকস্মিক স্বামীর রক্তাক্ত ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহটাই তাকে এমন আঘাত হেনেছিল যে সেটা সে সহ্য করতে পারেনি। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় ও মনের ভারসাম্য হারায়।

ঐ সময় ঘরের কোণে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, কিরীটী রায়—

আমি শিখেন্দু বলছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন! সংবাদ পেয়েছেন?

হ্যাঁ।

নবীন অপেরাতেই দেখা পেলেন?

না। সেখান-থেকে তার ঠিকানা যোগাড় করে কুমোরটুলিতে তার বাসায় গিয়ে দেখা করি। পাইকপাড়া স্পোর্টস ইউনিয়ন ক্লাবের এক সময় মেম্বার ছিল তপন শিকদার। সে-সময় ওদের ক্লাবে বরাবরই রোল করেছে। তারপর বছর দুই হল তপন নবীন অপেরায় জয়েন করেছে—

আপনি সে-রাত্রির কথা বলুন।

সে-রাত্রে সঞ্জীব তাদের ক্লাবের বহ্নিশিখা বইতে আদৌ নামেনি—

তাই নাকি!

হ্যাঁ। অথচ প্লের দিন স্থির হয়ে গিয়েছে, তাই তখন সে তপন শিকদারকে গিয়ে ধরে রোলটা করে দেবার জন্য।

তারপর?

তপন একশো পঁচিশ ডিমাণ্ড করে। শেষটায় একশোতে রাজী করায় সঞ্জীব তাকে, পঞ্চাশ টাকা অ্যাডভান্স করে দেয়, কথা ছিল বাকি টাকা সে প্লে শেষ হবার পর পাবে। ওদের ক্লাবের সেক্রেটারী সেকথা জানত না। তিনি ভেবেছিলেন, তপন শিকদার ক্লাবের একসময় মেম্বার ছিল, বিনি পয়সাতেই একটা রাত্রি প্লে করে দিচ্ছে—তাই প্লের পর টাকা চাওয়ায় সেক্রেটারী তাকে টাকা দেয়নি। বলেছিল, সঞ্জীবের সঙ্গে কথা বলে টাকা দেবে—

ঠিক আছে, বাকি যা বলেছিলাম তার ব্যবস্থা করেছেন?

হ্যাঁ।

নীল শাড়ি যোগাড় হয়েছে?

সে হয়ে যাবে।

তা হলে মনে থাকে যেন, কাল রাত দশটায় যেমন যেমন বলেছি, তপনবাবুকে নীল শাড়ি পরিয়ে নিয়ে আসবেন শিবতোষবাবুর বেলতলার বাড়িতে।

বেশ।

শুধু আপনি একা নয় কিন্তু—

তবে?

সঞ্জীববাবু, নির্মলবাবু ও পরেশবাবুকেও সঙ্গে আনবেন।

তাদের কি বলব?

বলবেন আমি আসতে বলেছি, কাল রাত দশটায় নির্বাণীবাবুদের বেলতলার বাড়িতে। আরও একটা কথা, সদর দিয়ে কিন্তু বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবেন না।

তবে? কোথা দিয়ে ঢুকব?

বাড়ির পেছনে যে গোপন লোহার সিঁড়িটা আছে, সেই সিঁড়ি দিয়ে সোজা আপনারা নির্বাণীবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকবেন তিনতলায়। বাথরুমের দরজা খোলা থাকবে, বারান্দার ভেতর দিয়ে ঢুকবেন।

শিখেন্দু কোন সাড়া দেয় না।

শিখেন্দুবাবু, বুঝতে পেরেছেন প্ল্যানটা আমার?

পেরেছি। কিন্তু এসব কেন করছেন তা তো বললেন না!

আমার স্থির বিশ্বাস—

কি?

যে আয়োজন আমরা করেছি, তাতে করে অহল্যার ঘুমও ভাঙবে—হত্যাকারীর মুখোশটাও তার মুখ থেকে খুলে যাবে।

আপনি সত্যিই তাই মনে করেন কিরীটীবাবু?

এখন আর কথা নয় শিখেন্দুবাবু, আমার কিন্তু কাজ এখনো বাকি আছে। সেগুলো আমায় শেষ করতে হবে। কাল দেখা হবে—রাত দশটায়।

পরের দিন রাত্রে।

দশটা বাজতে তখনও কিছু সময় বাকি আছে।

বেলতলার শিবতোষের বাড়ির তিনতলার সেই ঘর। আসবাবপত্র যেমন যেখানে

ছিল তেমনি আছে। কেবল সে-রাত্রের মত ফুলের সমারোহ নেই। ঘরের মধ্যে যেন একটা করুণ স্তব্ধতা বিরাজ করছে। ঘরের মধ্যস্থলে একটি চেয়ারের উপরে দীপিকা উপবিষ্ট। এবং সে-রাত্রে ঘরে ছিল উজ্জ্বল আলো—আজ একটি মাত্র আলো ঘরের কোণে জ্বলছে। দীপিকার পূর্বস্মৃতি এখনো ফিরে আসেনি। সে এখনো নির্জীব। নিজের থেকে কোন কথা বলে না, হাসে না, কাঁদে না, এমন কি ক্ষুধা পেলে খাওয়ার কথাও বলতে পারে না। ডাঃ বর্মণ শিবতোষকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, দীপিকাকে কোন নার্সিং হোমে ভর্তি করে দেবার জন্য। শিবতোষও অসম্মত ছিলেন না, কিন্তু কিরীটী তাঁকে বলেছিল, কটা দিন অপেক্ষা করুন, তারপর ডাঃ বর্মণ যেমন বলেছেন তাই করা যাবে। তাছাড়া দীপিকাও সর্বক্ষণ শান্ত চুপচাপই রয়েছে, বরং কিছুদিনের জন্য কিরীটীর পরামর্শে দীপিকার দেখাশোনার জন্য দুজন নার্স রাখা হয়েছিল রাত্রি ও দিনের জন্য। আর স্বাতীকেও যেতে দেয়নি কিরীটী। স্মৃতি দিল্লীতে থাকে, সে তার স্বামীর সঙ্গে দিল্লী চলে গিয়েছে।

পরেশ ভৌমিক নিজেও বলেছেন, কিরীটীবাবু যতদিন বলবেন তুমি বরং তোমার বৌদির সঙ্গে এই বাড়িতে থাক।

ঘরের মধ্যে চেয়ারে উপবিষ্ট দীপিকার পাশেই দাঁড়িয়েছিল রাত্রির নার্স ও স্বাতী। কিরীটী ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল আর ঘন ঘন নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল।

বাথরুমের মধ্যে আলো জ্বলছে—মেথরের যাতায়াতের দরজাটা বাথরুমের মধ্যে খোলাই রাখা হয়েছে—কিরীটীর নির্দেশমত।

বাথরুমের মধ্যে মৃদু পদশব্দ শোনা গেল।

কিরীটী বাথরুমের দরজার দিকে তাকাল, শিখেন্দু এসে ঘরে প্রবেশ করল।

আসুন, শিখেন্দুবাবু! পরেশবাবু নির্মলবাবু সঞ্জীববাবু—তাঁরা আসেননি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

বলে দিয়েছি, সবাই তো বলেছে আসবে ঠিক দশটাতেই। শিখেন্দু মৃদু গলায় জবাব দিল। ঘরের কোণে রক্ষিত স্ট্যাণ্ডের একটিমাত্র আলোর জন্য অত বড় ঘরটা যেন ঠিক ভালভাবে আলোকিত হয়ে উঠতে পারেনি। দীপিকা যেখানে বসেছিল, তারই অল্প দূরে চারটি চেয়ার রাখা ছিল। কিরীটী শিখেন্দুকে বলল, ঐ যে শিখেন্দুবাবু, চেয়ার রয়েছে, বসুন।

শিখেন্দু একবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ডান-দিককার শেষ চেয়ারটায় বসল।

বাথরুমের আলোটা কিন্তু উজ্জ্বল।

শিখেন্দু আসবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পরেশ আর নির্মল এসে ঘরে ঢুকল। তা ঘরে ঢুকেই যেন থমকে দাঁড়াল। দুজনেই চারদিকে তাকাল।

বসুন। পরেশবাবু নির্মলবাবু শিখেন্দুবাবুর পাশেই বসুন। সঞ্জীববাবু কই? তিনি এলেন না?

জবাব দিল পরেশ, সে তো আমাদের আগেই বের হয়েছে। এখনও এল না কেন বুঝতে পারছি না তো। কিন্তু আমাদের আজ রাত্রে এভাবে সকলকে আসতে বলেছেন কেন কিরীটীবাবু?

আজ এখানে এই ঘরে সনাক্তকরণ করব।

নির্মল শুধাল যেন প্রায় বোজা গলায়, সনাক্ত করবেন!

হ্যাঁ।

কাকে?

হত্যাকারীকে—

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্ত হতে শব্দটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সঞ্জীব এসে ঘরে প্রবেশ করল। কথাটা তারও কানে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বসুন, সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব চারদিকে একবার তাকাল, তারপরই নজরে পড়ল অর্ধবৃত্তে চারটি চেয়ার। তার তিনটিতে পাশাপাশি বসে শিখেন্দু, পরেশ ও নির্মল। নির্মলের পাশের চেয়ারটা খালি।

সঞ্জীব বসে না, কেমন যেন ইতস্তত: করে।

কি হল সঞ্জীববাবু, বসুন! নির্মলবাবুর পাশের চেয়ারটায় বসুন। ওটা আপনার জন্যই রাখা আছে।

সঞ্জীব কেমন যেন শিথিল পায়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটার উপর বসে পড়ল।

শিখেন্দুবাবু পরেশবাবু নির্মলবাবু সঞ্জীববাবু, আপনারা চারজন নির্বাণীতোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কিরীটী বলতে থাকে, আর আপনাদের পাঁচজনেরই সঙ্গে পরিচয় ছিল ঐ যে সামনে বসা দীপিকা দেবী—আজ যিনি নির্মম এক নিষ্ঠুরতায় অতীতের স্মৃতি হারিয়ে একেবারে বলতে পারেন বোবা হয়ে গিয়েছেন, বেঁচে নেই—জীবন্মৃত—

সবাই চুপ, কারো মুখেই কথা নেই।

কিরীটী আবার বলল, আমি আশা করেছিলাম হত্যাকারীকে আপনারা ধরিয়ে দেবেন, কারণ দীপিকাকে আপনারা সকলেই মনে মনে একসময় কামনা করেছেন—

না, না। সঞ্জীব বলে ওঠে।

পরেশ প্রতিবাদ জানায়, মিথ্যা বলিব না সঞ্জীব, আমরা পাঁচজনেই মনে মনে দীপাকে চেয়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীপা নির্বাণীর গলাতেই মালা দিয়েছিল, কারণ দীপা ভালবাসত একমাত্র নির্বাণীকেই।

কিরীটী বলল, ঠিক। এবং সহজ ভাবেই ব্যাপারটা নেওয়া উচিত ছিল আপনাদের, কিন্তু তা নিতে পারলেন না—

সঞ্জীব বলে ওঠে বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, সহজ ভাবেই নিয়েছিলাম অন্ততঃ আমি ব্যাপারটা—

তাই যদি হবে সঞ্জীববাবু, আপনি আমার কাছে মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিলেন কেন?

মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছি!

হ্যাঁ, দিয়েছেন।

না না। সত্যিই বলেছি।

কিন্তু সঞ্জীবের কথা শেষ হল না, এক নীলবসনা নারী খোলা দরজাপথে ঘরে এসে ঢুকল।

সঞ্জীব থেমে গিয়েছে ততক্ষণে। বাকি তিনজনের মুখেও কোন কথা নেই। কেবল দীপিকা মাথা নীচু করে বসে আছে।

নীলবসনা নারী সোজা বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকল, তারপরই হঠাৎ দপ দপ করে ঘরের সব কটা আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দীপিকা মুখ তুলল।

কিরীটী বললে, আসুন, বের হয়ে আসুন!

সেই নীলবসনা নারী একপ্রকার ছুটেই বাথরুম থেকে বের হয়ে দীপিকার সামনে দিয়ে দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল—আর সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল দীপিকা, ধর—ধর ওকে, ধর—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

কিরীটী দীপিকাকে পরীক্ষা করে বললে, নার্স, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, আসুন, ধরুন ওকে, তুলে বিছানায় শুইয়ে দিই।

কিরীটী মাথার দিকটা ধরল, নার্স ও স্বাতী পায়ের দিক ধরে দীপিকাকে তুলে শয্যায় শুইয়ে দিল।

যান, পাশের ঘরে ডাঃ বর্মণ আছেন—তাঁকে ডেকে আনুন।

সবাই চুপ, সবাই যেন বোবা। ডাঃ বর্মণকে ডাকতে হল না, তিনি নিজেই এসে ঢুকলেন।

আপনার পেসেন্টকে পরীক্ষা করে দেখুন ডাক্তার!

ডাঃ বর্মণ দীপিকার পাল্‌স্‌টা একবার পরীক্ষা করলেন, তারপর শান্ত গলায় বললেন, She is alright—মনে হচ্ছে মিঃ রায়, আপনার experiment successful ! জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর পূর্বস্মৃতি আবার ফিরে পাবেন। নার্স, সোডিয়াম গার্ডিনল ইনজেকশনটা ওঁকে দিয়ে দাও। রেডি করাই আছে পাশের ঘরে ট্রের ওপরে। নার্স চলে গেল পাশের ঘরে এবং সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে এসে ইনজেকশনটা দিয়ে দিল। ঠিক আছে, ডাঃ বর্মণ বললেন, now let her sleep for 2/3 hours ! ঘুম ভাঙবার পর নিশ্চয়ই দেখতে পাব আমরা উনি পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। আমি কি চলে যাব এবারে, মিঃ রায় ? আমার কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যটা দেখতে ইচ্ছে করছে—If you allow me please !

থাকুন আপনি। তপনবাবু ? বলে উচ্চকণ্ঠে ডাকল কিরীটী।

নীলবসনা নারী ঘরে এসে ঢুকল।

আপনি ঐ মেয়ের পোশাক ছেড়ে নিজের জামাকাপড় পরতে পারেন এবারে।

তপন চলে গেল আবার পাশের ঘরে।

সবাই নির্বাক, সবাই বোবা। যেন পাথর চার বন্ধু—শিখেন্দু, পরেশ, নির্মল, সঞ্জীব।

এবারে সঞ্জীববাবু বলুন, সে রাত্রে কেন নারীর বেশ ধরে এখানে এসেছিলেন ?

একটু কৌতুক করবার জন্য—ক্ষীণ গলায় বললে সঞ্জীব।

কৌতুক !

হ্যাঁ, কথা ছিল আমি বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে থাকব—নির্বাণী ও দীপা ঘরে এসে খিল দিলে আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে আসব। এসে—

বলুন, থামলেন কেন ?

নির্বাণীর সঙ্গে অভিনয় করে চলব, এই তোমার যদি মনে ছিল নির্বাণী, আমাকে ভালবেসে মজাতে গিয়েছিলে কেন ? Just a fun—কিরীটীবাবু, just a fun !

আপনার ঐ fun বা কৌতুকের পরিকল্পনাটা আপনার অন্যান্য বন্ধুরা জানতেন ? বলেছিলেন তাঁদের ?

জানত—সবাই জানত, পরামর্শ করেই আমরা পরিকল্পনাটা করেছিলাম।

সে-রাত্রে কখন এসেছিলেন আপনি ?

রাত তখন সাড়ে এগারোটার পরই হবে, সঞ্জীব বললে, বোধ হয় পৌনে বারোটা।

কোন্ পথ দিয়ে আপনি ওপরে গিয়েছিলেন ?

বাগানের দিকে বাড়ির পিছনের মেথরদের যাতায়াতের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে।

কি—কি বললেন ? ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে পিছন দিককার ?

হ্যাঁ।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠে যদি দেখতেন বাথরুমের দরজা বন্ধ, তবে বাথরুমে ঢুকতেন কি করে ?

শিখেন্দু বলেছিল, দরজাটা সে খুলে রেখে দেবে—

কিন্তু আমি—আমি দরজাটা খুলে রাখবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মনেই ছিল না কিরীটীবাবু কথাটা। বিশ্বাস করুন, আমি দরজা খুলে রাখিনি।

জানি আপনি রাখেননি, নির্বাণীতোষ নিজেই খুলে রেখেছিলেন সন্ধ্যা থেকে—কিরীটী বললে।

পরেশ বলল, নির্বাণী খুলে রেখেছিল !

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ? সে তো জানত না আমাদের প্ল্যানটা ?

বলতে পারেন তাঁর নির্মম ভাগ্যই তাঁকে দিয়ে দরজাটা খুলিয়ে রেখেছিল সে-রাত্রে। কিন্তু সঞ্জীববাবু, আপনি বাথরুমে ঢুকে কি দেখেছিলেন ? বলুন, গোপন করবেন না—কারণ আমি জানি আপনি কি দেখেছিলেন। কিরীটীর স্বর স্পষ্ট ও কঠিন।

সঞ্জীবের সমস্ত মুখ যেন রক্তহীন ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে কেমন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। সে কথা বলতে পারছে না। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে, আমি—আমি—

আমি বলছি, আপনি কি দেখেছিলেন, সঞ্জীববাবু, আপনার বন্ধু রক্তাক্ত অবস্থায় বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছেন—বলুন ! তাই দেখেননি ?

হ্যাঁ। সেই দৃশ্য দেখে আমি এমন ঘাবড়ে যাই যে—

যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই পালিয়ে যান আবার পরমুহূর্তেই ?

হ্যাঁ।

কোথায়, কোথায় যান সোজা বেলতলার বাড়ি থেকে ?

ক্লাবে। সেখান থেকে বেশ বদলে মেসে যাই।

তাই ফিরতে আপনার মেসে সে-রাত্রে এত দেরি হয়েছিল, তাই না ?

হ্যাঁ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৌনে এগারোটায় যদি নির্বাণীতোষ ওপরে গিয়ে থাকেন, তিনি খুন হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। বাথরুমে ঢুকে মাথা ধরার জন্য যখন কোডোপাইরিন ট্যাবলেট হাতে জলের গ্লাস নিয়ে বেসিনের সামনে গিয়ে বেসিনের ট্যাপ থেকে জল ভরছিলেন,

ঠিক সেই সময়েই অতর্কিতে পিছন থেকে ছোরার আঘাতে—

পরেশ বললে, তবে কি—

হ্যাঁ পরেশবাবু, বাথটবের স্ক্রিনের আড়ালে হত্যাকারী যেন ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল, কারণ সে জানত নির্বাণীতোষ ওপরে আসবে এবং বাথরুমেও আসাটা তার স্বাভাবিক শোবার আগে—

কে—কে সেই হত্যাকারী! শিখেন্দু ভাঙা গলায় যেন চেঁচিয়ে উঠল।

এখনও—এখনও বুঝতে পারলেন না শিখেন্দুবাবু, নির্বাণীতোষের হত্যাকারী কে?

কে?

যে জানত নির্বাণীতোষের শয়নঘরের দরজা বন্ধ, তাই পিছনের বারান্দা দিয়ে বাথরুমের খোলা দরজাপথে ঘরে ঢুকে শয়নঘরের দরজাটা খুলে দিয়েছিল এবং বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল! আপনি—শিখেন্দুবাবু, ইট ওয়াজ ইউ! অ্যাণ্ড ইট ওয়াজ দি মোস্ট আনকাইণ্ডেস্ট অফ ইউ!

অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে যেন একটা মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

পালাবার চেষ্টা করবেন না শিখেন্দুবাবু, কারণ বাড়ি ঘিরে রেখেছে পুলিসে। সন্দেহটা প্রথম থেকেই আপনাকে ঘিরেই আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। সে-রাত্রে ফোনে সংবাদ পেয়ে এখানে এসে সব দেখেশুনে—কিন্তু একটা—একটা ব্যাপার সব কিছুকে যেন জট পাকিয়ে দিচ্ছিল, ঐ জটটা আমি কিছুতেই খুলতে পারছিলাম না—

কিন্তু জটটা খুলে গেল গত সন্ধ্যায় স্বাতী দেবীর স্বীকারোক্তির পরে এবং জটটা হচ্ছে—আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না বাথরুমের দরজাটা বন্ধ ছিল কেন, ওটা তো—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, শিখেন্দুর দেহটা চেয়ার থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল সশব্দে হঠাৎ।

কি হল, কি হল! সকলেই বলে ওঠে।

ছুটে গেল সবাই শিখেন্দুর ভূলুণ্ঠিত দেহটার কাছে। শিখেন্দুর দেহটা শেষবারের মত আক্ষেপ করে তখন একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে।

বীরেন মুখার্জী পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছেন ততক্ষণে। ডাঃ বর্মণই পরীক্ষা করে বললেন, হি ইজ ডেড—

বীরেন মুখার্জী বললেন, ডেড!

হ্যাঁ, খুব সম্ভবতঃ পটাশিয়াম সায়ানাইড—ডাঃ বর্মণ বললেন।

কিরীটী ক্লান্ত গলায় বললে, এ একপক্ষে ভালই হল। নিদারুণ অপমান আর লজ্জা হাত থেকে উনি নিজেই নিজেকে সরিয়ে দিলেন।

বীরেন মুখার্জী বললেন, কিন্তু আসামী ফাঁকি দিল—

ধরলেও আপনারা প্রমাণ করতে পারতেন না মিঃ মুখার্জী যে শিখেন্দুই নির্বাণীতোষকে সে-রাত্রে হত্যা করেছিল!

কেন?

প্রমাণ—প্রমাণ পেতেন কোথায়? কারণ হত্যার আগে বা পরে কেউ ওকে বাথরুমের মধ্যে দেখেছে, এমন কথা তো বলতে পারত না হলফ করে। ইট ওয়াজ এ মাস্টার প্ল্যান। নিজের দীর্ঘদিনের বন্ধু নির্বাণীতোষকে নিজের পথ থেকে সরাবার জন্য শিখেন্দুবাবু যে প্ল্যান করেছিলেন সেটা ছিল একেবারে নিখুঁত। কিন্তু হত্যা করবার পর মতিভ্রংশ দীপিকার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল তার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। দীপিকাকে লাভ করা তার কোন দিনই সম্ভব হবে না। যোগ-বিয়োগে প্রকাণ্ড ভুল হয়ে গিয়েছে—আর সেই হতাশার বেদনা, আশাভঙ্গের দুঃখটাই যেন আমি সে-রাত্রে এখানে এসে ওর চোখেমুখে দেখেছিলাম। যেটা মনে হয়েছিল তখুনি আমার, বন্ধু-বিচ্ছেদ বা বন্ধুর মৃত্যুজনিত দুঃখ নয় সেটা। অন্য কিছু—সামথিং এল্‌স্‌! আমার মনে সন্দেহও তখুনি উঁকি দেয় ওকে ঘিরে—কিন্তু এ ঘরে আর নয়, চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক। বীরেনবাবু ডেড্‌ বডিটা এ ঘর থেকে সরাবার ব্যবস্থা করুন।

পাশের ঘরে বসেই কিরীটী তার কাহিনী বলে যেতে লাগল। কাহিনীর শেষাংশ—

বলছিলাম না, ইট ওয়াজ এ মাস্টার প্ল্যান—দীপিকাকে না পাওয়ার দুঃখে শিখেন্দু ভেতরে ভেতরে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, তার ভালবাসা, চাওয়া ব্যর্থ হল—নির্বাণীতোষ তার ঈপ্সিতাকে তার চোখের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল! কোন কোন ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষের বিশেষ কোন পুরুষ বা নারীকে ঘিরে ভালবাসা বা কামনা কতখানি স্বার্থপর কতখানি তীব্র হতে পারে এবং তার ফলে তারা যে কতখানি হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে তারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিয়ে গেল আমাদের শিখেন্দু।

দীপিকা তার হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় শিখেন্দুর মনের অবস্থাটাও ঠিক তাই হয়েছিল। সে মনে মনে নির্বাণীকে পথ থেকে সরাবার প্ল্যান করে। প্ল্যানটা একেবারে নিখুঁত। নির্বাণীতোষকে প্যান্ডেল থেকে উপরে চলে যেতে বলে, তাঁর মাথার যন্ত্রণা বলায়। নির্বাণীতোষ ভিতরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেও পিছনের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা ওপরে চলে যায় এবং বাথরুমে নির্বাণীর আগেই গিয়ে পৌঁছয়।

নির্বাণী কোডোপাইরিন খাবার জন্য বাথরুমে গ্লাস হাতে এসে ঢুকল এবং যখন সে ট্যাপ থেকে গ্লাসে জল ভরছে, শিখেন্দু পেছন থেকে তাকে ছোরা মারল। নির্বাণী পড়ে গেল। হাতের গ্লাসটা বেসিনের মধ্যে পড়ে চিড় খেয়ে গেল, ট্যাপটা খোলাই রইল।

শিখেন্দু পালাল আবার ঐ লোহার সিঁড়ি দিয়েই। নির্বাণীর রক্তাক্ত ছোরাবিদ্ধ মৃতদেহটা পড়ে রইল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ওপরে এলো দীপিকা। সে সম্ভবতঃ ঘরে ঢুকে ঘরে আলো জ্বলছে দেখে—অথচ তার স্বামীকে ঘরের কোথাও না দেখে তাকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। আমার মনে হয়েছে শিখেন্দু হত্যা করে চলে যাবার আগে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে বাথরুমের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যায়, অবিশ্যি এটাও অনুমান। যাই হোক, স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে বাথরুমের দরজা খোলা দেখে দীপিকা বাথরুমেই ঢোকে এবং আলো জ্বালায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুমে পূর্ব প্ল্যান মত নীল শাড়ি পরে সঞ্জীববাবু ঢোকেন। তার পরেও আমার অনুমান, হয়তো দীপিকা দেবীর দুটো ব্যাপারই একই সঙ্গে চোখে পড়ে, শাড়ি পরা সঞ্জীববাবু ও তাঁর স্বামীর রক্তাক্ত ছোরাবিদ্ধ ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহটা। স্বামীর মৃতদেহ ও শাড়ি পরা সঞ্জীববাবুকে চিনতে পেরে এবং দুটোকে একই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে তাঁর মনে হয়—অ্যাণ্ড শী ফেনটেড, ড্রপড অন দি ফ্লোর! সঞ্জীববাবু নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, তাই ঘটেছিল কিনা।

সঞ্জীব মৃদু কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ। প্রথমেই বাথরুমে ঢুকে দীপার সঙ্গে আমার চোখাচোখি ও তার পরই দুজনেরই আমাদের একসঙ্গে নজরে পড়ে মৃতদেহটা। দীপিকা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় আর আমি সঙ্গে সঙ্গে যে পথে বাথরুমে এসেছিলাম সেই পথেই পালাই তাড়াতাড়ি।

আপনার পালাবার সময় কেউ আপনাকে দেখেছিল?

বোধ হয় শিখেন্দু দেখতে পেয়েছিল, সে তখন নীচে প্যাণ্ডেলেই ছিল। সে ও দীপিকা দুজনেই যদি ভাবে যে আমিই নির্বাণীকে হত্যা করেছি—তাই আমি সেদিন রাত্রে আদৌ আসিনি এখানে আপনাকে বলেছিলাম।

কিরীটী বললে, এখন বুঝতে পারছি আমার আর একটি অনুমানও ঠিক, নীলবসনা কোন নারীই সে-রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠেনি।

তবে গোকুল যে তার জবানবন্দিতে বলেছিল—বীরেন মুখার্জী বললেন।

গোকুলকে ডাকুন তো!

গোকুলকে ডাকা হল। কিরীটী বললে, গোকুল তুমি মিথ্যা বলেছ।

কি মিথ্যা বলেছি বাবু? গোকুল যেন রীতিমত ভয় পেয়ে গেল।

সে-রাত্রে ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় নীল শাড়ি পরা বৌ ওঠেনি, তাই নয় কি? তবে তুমি ঐ কথা বলেছিলে কেন?

আজ্ঞে আমি দেখিনি। শিখেন্দুদাদাবাবু আমায় বলতে বলেছিলেন তাই—পরে ভেবেছিলাম, সত্যি কথাটা বলব কিন্তু ভয়ে বলতে পারিনি। শিখেন্দুদাদাবাবুও

বলেছিলেন, সত্যি কথা বলতে গেলে আবার পুলিস আমাকে সন্দেহ করবে—

এখন বলুন তো সঞ্জীববাবু, নারীর বেশে সে-রাত্রে নির্বাণীতোষের ঘরে হানা দেবার প্ল্যানটা কার?

জবাব দিল পরেশ, শিখেন্দুর। সে-ই প্ল্যানটা করেছিল।

এখন তো বুঝতে পারছেন আপনারা, আসলে কোন কৌতুক সৃষ্টির জন্যই নয়—সঞ্জীববাবুর ঘাড়ে হত্যার অপরাধটা চাপানোর জন্যই শিখেন্দু ঐ প্ল্যানটা করেছিল, সত্যিই মাস্টার প্ল্যান! কিন্তু সেদিন যদি ব্যাপারটা একবারও আপনারা কেউ আমাকে খুলে বলতেন তবে হয়ত সেইদিনই মীমাংসায় আমি পৌঁছতে পারতাম। শিখেন্দুর মনেও সন্দেহ জাগত না, সে পটাশিয়াম সায়ানাইড খাবারও সুযোগ পেত না।

সঞ্জীবকে বাঁচানোর জন্য আমরা মুখ খুলিনি—শিখেন্দুই পরামর্শ দিয়েছিল। নির্মল ও পরেশ বললে।

কিন্তু তবু দেখলেন তো, পাপ কখনো চাপা থাকে না। শিখেন্দুর দুটি মাত্র মারাত্মক ভুলের জন্যই তার অমন নিখুঁত চতুর প্ল্যানটাও ভেস্তে গেল, পাপ প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বীরেন মুখার্জী বললেন, দুটি মারাত্মক ভুল!

হ্যাঁ, কিরীটী বললে, প্রথম ভুল—চিৎকার শোনার পর ওপরে এসে শিখেন্দু বাথরুম দিয়ে ঘরে ঢুকে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে শোবার ঘরের দরজাটা খুলে দেওয়া এবং দ্বিতীয়, দীপিকার অচৈতন্য দেহটা বাথরুম থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া। বাথরুমের দরজাটা যদি সে না বন্ধ করে দিত, আমাদের অন্ধকারেই হাতড়াতে হত কোন্ পথ দিয়ে হত্যাকারী পালালো সে ব্যাপারে এবং সেই সঙ্গে নীলবসনা নারীর ব্যাপারটাও একটা সত্যের আবরণ নিয়ে থেকে যেত। কিন্তু হত্যাকারী নিজের ভুলের জালে নিজেই জড়িয়ে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে দিল। অর্থাৎ ঐ বাথরুমের বন্ধ দরজা ও দীপিকার শোবার ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা দীপিকার অচৈতন্য দেহটা দেখে। শিখেন্দুর মনের দীর্ঘদিনের লালসা তাকে ঘিরে হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে, সে নিজেকে আর দীপিকাকে স্পর্শ করার লোভটা থেকে সামলাতে পারে না। তাকে বাথরুমের মেঝে থেকে তুলে বুকে করে পাশের ঘরে নিয়ে যায়, এবং প্রমাণ করে দিয়েছিল সেটাই আমার কাছে দীপিকার প্রতি শিখেন্দুর গোপন তীব্র আকর্ষণটা। তাছাড়া ভেবে দেখুন মিঃ মুখার্জী, নির্বাণীতোষকে ঐ ভাবে হত্যা করার সুযোগ ঐ রাত্রে সকলের সন্দেহ বাঁচিয়ে একমাত্র নির্বাণীর বন্ধুদের মধ্যে শিখেন্দুরই বেশী ছিল, কারণ সে ছিল এ-বাড়ির সকলের পরিচিত, স্নেহের জন—বিশ্বাসের জন, একপ্রকার ছেলের মত এবং এ-বাড়ির গলিঘুঁজি সব তার নখদর্পণে। প্যাণ্ডেলের ভেতরই ছিল লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা মেথরদের দোতলা-

তিনতলায় যাতায়াতের এবং প্যাণ্ডেলে উপস্থিত থেকে শিখেন্দু সব কিছুর ওপরেই নজর রাখতে পেরেছিল সর্বক্ষণ।

নির্বাণীতোষের নিজের শিখেন্দুর প্রতি ভালবাসা, স্নেহ ও বিশ্বাস এবং সর্বোপরি এ-বাড়ির প্রত্যেকের তার প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় বর্মটা গায়ে দিয়ে অনায়াসেই সে সকলের সন্দেহ থেকে দূরে যেতে পারত, ঘটনাচক্রে সে-রাত্রে আমি এখানে শিবতোষ-বাবুর আহ্বানে না এসে পড়লে—হয়ত নির্বাণীতোষের হত্যাকারী চিরদিন অন্ধকারেই থেকে যেত।

বীরেন মুখার্জী বললেন, কিন্তু দীপিকা দেবী জ্ঞান ফিরে পাবার পর?

তখনো তিনি বলতেন কিনা সন্দেহ। এবং আজ যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাঁর ঘুমনো মনের ওপরে একটা শক-এর আলোর ঝাপটা ফেলার, সেরকম কিছু না ঘটলে কবে যে তার অহল্যার ঘুম ভাঙত তাই বা কে জানে! অবিশ্যি জেগে উঠে সব যখন তিনি জানতে পারবেন, নতুন করে আঘাত পাবেন এবং প্রচণ্ড আঘাতই পাবেন। সে কথা জেনেও আমি এই ব্যবস্থা করেছি, কারণ যতই আঘাত লাগুক তিনি তাঁর স্বামীর হত্যাকারীকে তো অন্ততঃ চিনতে পারবেন।

ঐ ঘরে এসে কাহিনীর শেষাংশ শুরু করবার আগে কিরীটী নীচের তলা থেকে শিবতোষবাবুকে ডাকিয়ে আনিয়েছিল। তিনিও সব শুনে যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিরীটীর বলা শেষ হবার পর মৃদু কণ্ঠে কেবল বললেন, আশ্চর্য, শিখেন্দু—!

শিবতোষবাবুর চোখে জল।

কারো মুখেই কোন কথা নেই। ভোরের আলো জানলাপথে তখন ঘরে এসে পড়েছে। কিন্তু পাশের ঘরে শয্যায় তখনো ওষুধের প্রভাবে দীপিকা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পরম নিশ্চিন্তেই যেন ঘুমোচ্ছে।

হীরকাঙ্গুরীয়

॥ এক ॥

বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কাল মধ্যরাত্রি থেকে বৃষ্টি নেমেছে। বিরামহীন বৃষ্টি। একটানা ঝরছে তো ঝরছেই।

রাস্তাঘাট জলমগ্ন। জলে চারিদিক থৈ থৈ করছে। রাস্তায় কোথাও গোড়ালী জল, কোথাও তার চাইতেও বেশী। সমস্ত আকাশটা মেঘে মেঘে একেবারে মসীবর্ণ। মসীবর্ণ আকাশ মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকে ঝলসে ঝলসে উঠছিল। শুধু তো বৃষ্টি নয়, সেই বৃষ্টির সঙ্গে সোঁ সোঁ হাওয়া। এলোমেলো হাওয়া।

বেলা প্রায় দশটা হবে।

অবিশ্রান্ত জল হলেও যানবাহন ও মানুষজনের কিন্তু বিশ্রাম ছিল না—একমাত্র ট্রাম ব্যতীত অন্য সর্বপ্রকার যানই চলাচল করছিল ঐ প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই। ছাতি মাথায় মানুষ-জনও পথে চলছিল।

এই দুর্যোগের মধ্যে কিরীটীর বাড়ি থেকে বাইরে বেরুবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার ডি. সি. মানিক চাটুয্যে তাকে নিষ্কৃতি দেয়নি। আসতেই হবে বলে তাকে বাড়ি থেকে টেনে বের করেছিল। কিরীটী তার গাড়ির পিছনের সীটে চারদিককার কাঁচ তুলে দিয়ে বসেছিল।

হীরা সিং গাড়ি চালাচ্ছিল। রাস্তাঘাট জলমগ্ন—তার মধ্যে দিয়ে সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছিল হীরা সিং। সারকুলার রোডে ক্রিমেটোরিয়াম ছাড়িয়ে জোড়া গীর্জার পিছন দিকে একটা বাড়িতে তাকে যেতে হবে। মানিক চাটুয্যে তাকে বলেছে বড় রাস্তার উপরেই পুলিসের জীপ থাকবে, সে তাকে পথ দেখিয়ে আনবে।

কে এক নবাব সাহেবের বাড়িতে তার তৃতীয়া বেগমসাহেব নাকি নিহত হয়েছে, কেন কি বৃত্তান্ত, কিছুই ফোনে জানায়নি মানিকবাবু আর কিছুই। কেবল বলেছে, আসুন, এলেই সব জানতে পারবেন, আপনার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

কিরীটী এড়াবার চেষ্টায় ছিল। বলেছিল, হত্যা, না আত্মহত্যা?

আত্মহত্যা নয়, a pure and simple case of murder. আসুন একবার দয়া করে। আপনি কিছু ভাববেন না। ক্রিমেটোরিয়ামটা ছাড়ালেই জোড়া গীর্জার আগে বড় রাস্তার উপরেই পুলিসের জীপ দেখতে পাবেন।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কিরীটী ঐ মানিক ছেলেটিকে একটু স্নেহ করে। বয়স বেশী নয়। এখনো ত্রিশ হয়নি। কয়েক বছর মাত্র পুলিসের কাজে ঢুকেছে এবং ইতিমধ্যে ডি. এস. পি-র পদে উন্নীত হয়েছে। বেঁটেখাটো মানুষটা। রোগা পাতলা গড়ন।

বছরখানেক পূর্বে একটা বিচিত্র হত্যা-মামলার ব্যাপারে প্রথম ঐ মানিক চাটুয্যের সঙ্গে কিরীটীর পরিচয় হয়। সেই সময়ই কিরীটী ছেলেটির বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দেখে চমৎকৃত হয়েছিল।

সেই মানিক চাটুয্যে যখন ডেকেছে ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্যের বৈচিত্র্য কিছু আছে। নচেৎ এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এমন করে জরুরী তলব দিয়ে বিরক্ত করত না।

সারকুলার রোডের একটা বিশেষত্ব আছে। যত জলই হোক না কেন—কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট যতই জলে ডুবে যাক না কেন—এ রাস্তায় কখনো তেমন জল জমে না। ক্রিমেটোরিয়াম ছাড়াবার পরই জোড়া গীর্জার অল্প দূরে দেখা গেল একটা ক্যালকাটা পুলিসের জীপ দাঁড়িয়ে আছে।

কিরীটী আগে থাকতেই হীরা সিংকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল। হীরা সিং সোজা গিয়ে জীপটার পাশে গাড়ির ব্রেক কষল। অতঃপর সেই জীপ গাড়িই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

পুবমুখো রাস্তাটা ধরে কিছু দূরে এগুবার পর একটা বাগান ও গেটওয়ালা পুরাতন বাড়ির মধ্যে ওরা পর পর এসে প্রবেশ করল। অনেকটা জুড়ে বাগান। মধ্যে মধ্যে তার বড় বড় দেবদারু গাছ। বৃষ্টি ও হাওয়ায় ওলটপালট করছিল গাছগুলো।

তিনতলা একটা বিরাট পুরাতন বাড়ি। গাড়ি-বারান্দার নীচে এসে গাড়ি দুটো আগে পিছে থামল। গাড়ি-বারান্দায় দুজন লাল পাগড়ি দাঁড়িয়েছিল।

কিরীটী গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই তাদের মধ্যে একজন কিরীটীকে সেলাম দিয়ে বললে, ডি. সি. সাহেব ভিতরে আছেন, যান।

যে সার্জেন্টটি জীপে অপেক্ষা করছিল কিরীটীর জন্ত সেই-ই কিরীটীর গাড়ি দেখে জীপ থেকে নেমে বর্ষাতি গায়ে এগিয়ে আসে।

কিরীটী প্রশ্ন করে, কতদূর ?

এই কাছেই, চলুন।

অনেককালের পুরনো বাড়ি বলেই মনে হয়। এখানে-ওখানে দেওয়ালের

প্লাস্টার খসে পড়েছে। প্রথমেই একটা হলঘর। বিরাট আকারের হলঘর। মাথার উপরে সিলিং অনেক উঁচুতে।

সিলিং থেকে দুটি বড় বড় ঝাড়-বাতি ঝুলছে। ইলেকট্রিক আলো ও দুটো ফ্যানও আছে। দেওয়ালে বিরাট বিরাট কয়েকটি অয়েল পেনটিং টাঙানো ছিল। জাঁকজমক পোশাক পরা ছবির মানুষগুলোর।

মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো—কয়েকটি পুরাতন আমলের গদী-মোড়া ভেলভেটের সোফা-সেটও আছে।

হলঘরের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অন্দরের দরজাপথে মানিক চাটুয্যে এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

এসেছেন মিঃ রায়! আসুন।

মানিক চাটুয্যের পরনে পুলিসের ইউনিফর্ম।

কি ব্যাপার মানিকবাবু?

একটি সুন্দরী মেয়ে নিহত হয়েছে।

কিরীটী মৃদু হাসল। তারপর বললে, খুব সুন্দর বুঝি—

না দেখলে ঠিক বুঝতে পারবেন না মিঃ রায়, চলুন আগে দেখবেন—

মানিক চাটুয্যে আগে আগে এগিয়ে যায়, কিরীটী তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়।

হলঘরের পরেই একটা টানা বারান্দা। চারদিক ঘেরা বারান্দাটা।

॥ দুই ॥

বারান্দার শেষ প্রান্তে পূর্বদিকে বিরাট চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে। সাদা কালো পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি। অদ্ভুত স্তব্ধ যেন বাড়িটা। মনে হয় যেন একটা কবরখানা বুঝি!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কিরীটী প্রশ্ন করে, এ বাড়ির মালিক কে?

বৃদ্ধ নবাব আসগর আলী সাহেব।

আসগর আলী!

হ্যাঁ—এরা লক্ষ্মৌর নবাব বংশেরই একটা শাখা। মানিক চাটুয্যে বলে

কি রকম?

তিন পুরুষ আগে লক্ষ্ণৌ থেকে এরা চলে এসে প্রথমে মেটেবুরুজে বসবাস করছিল কিছুদিন ; তারপর এসে এই মতিমঞ্জিল তৈরী করে—মানে ঐ আলী সাহেবের ঠাকুর্দা—অবশ্য তারও তখন প্রৌঢ় বয়স।

অনেক বছর আগে নিশ্চয়ই ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—লর্ড ক্যানিং-এর আমল সেটা।

হুঁ—তা ঐ নবাব আলী সাহেবের কে কে আছেন ?

আপনার বলতে এক ভাগ্নে—আর তিন বেগম—

কোন ছেলেপিলে কিছু নেই ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

ছেলে এক ছিল।

বেঁচে নেই বুঝি ?

আছে তবে বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক নেই মানে ?

হ্যাঁ—সে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বহুদিন পৃথক হয়ে গিয়েছে।

কোথায় থাকে সে ? এই শহরেই কি ?

হ্যাঁ—এই শহরেই—মেটেবুরুজে।

বয়স কত তার ?

তা শুনেছিলাম ত্রিশ-বত্রিশ হবে—রোশন আলী নাম—নামটা হয়ত আপনি শুনে থাকবেন—বিখ্যাত সেতারিয়া রোশন আলী।

কিরীটী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আরে রোশন আলীকে তো আমি খুব ভালভাবে চিনি, অতি চমৎকার সজ্জন ব্যক্তি—যেমন চেহারা তেমনি ব্যবহার।

আমি অবিশ্যি তাকে চিনি না।

পরিচয় কোরো—চমৎকার সেতারিয়া। কিরীটী বললে, রোশন সাহেব যাকে বিয়ে করেছেন সেও তো নামকরা শিল্পী—

আলী সাহেবের এক বেগমও তো এককালে নামকরা নৃত্যশিল্পী ছিল।

নৃত্যশিল্পী ?

হ্যাঁ। নৃত্যশিল্পী মণিকাদেবীর নাম শোননি ?

হ্যাঁ শুনেছি কিন্তু সে তো ছিল ব্রাহ্মণের মেয়ে। কিরীটী বলে।

সেই—

ভাল কথা—মণিকাদেবী হঠাৎ বছর কয়েক আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন না ?

নিখোঁজ আর কি—বম্বেতে পালিয়ে গিয়ে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে ঐ আলী

সাহেবকে বিয়ে করে।

বটে! তা বয়সের তো অনেক তফাৎ হবে দুজনের মধ্যে?

তা তো হবেই—তা সেই বেগমও কি—

এখানেই আছে।

আর কে আছে এখানে?

কে আর—তিন বেগম, নবাব সাহেব ও তস্য ভাগ্নে ছাড়া আর কেউ নেই এ বাড়িতে আপনার জন বলতে। আছে চাকর-বাকর ড্রাইভার—ভাল কথা, ভুলে গিয়েছিলাম আরো একজন আছে—দাস-দাসী অবিশ্যি।

আরো একজন?

হ্যাঁ। সৌমেন কুণ্ডু নামে এক ভদ্রলোক—ইয়ং ম্যান—বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে হবে।

তিনি এখানে কি করেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

বলতে পারেন আলী সাহেবের সেই-ই সব দেখা শোনা করে—সেক্রেটারী—পরামর্শদাতা—সব কিছু।

ইতিমধ্যে ওরা কথা বলতে বলতে দীর্ঘ সিঁড়ি অতিক্রম করে দোতলায় পৌঁছে গিয়েছিল।

নীচের তলার মত উপরের তলাতেও একটি প্রশস্ত টানা বারান্দা। একটা দিকে ঘর পর পর—অন্য দিকে কাঠের ঝিলিমিলি—বাতাস ও আলো আসার বলতে গেলে কোন পথই নেই। বোধ করি নবাবী আব্রুর জন্যই ঐ সাবধানতা।

বারান্দায় কিছু কিছু শ্বেতপাথরের মূর্তি এখানে-ওখানে দাঁড় করানো।

॥ তিন ॥

বাইরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকায় আলোর অভাবে বারান্দাটায় আবছা আলো-ছায়া যেন কি এক রহস্যে থমথম করছে। বারান্দায় কোন জনপ্রাণীকে দেখা গেল না।

কিরীটী মাণিকের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে চলে।

পর পর সব ঘর। ঘরের দরজায় দরজায় সব পুঁতির পর্দা ঝুলছে।

তৃতীয় দ্বারপথে মানিক চাটুয্যেকে অনুসরণ করে পুঁতির পর্দা সরিয়ে কিরীটী

একটা হলঘরের মতই প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছানো। পুরনো আমলের ভারী দামী আসবাব। আর বিরাট একটা আরশি—সুদৃশ্য চওড়া সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো—ঘরের পুব ও পশ্চিম দেওয়ালে একেবারে মুখোমুখি টাঙানো।

যে দরজা-পথে ওরা ঘরে প্রবেশ করেছিল সে দরজা ছাড়াও একটি পশ্চিমমুখী দরজা দেখা গেল ঘরে। তাতেও ঐ একই ধরনের পর্দা ঝুলছে। গোটাচারেক জানলা। সবই দক্ষিণমুখী। জানলাগুলো বন্ধই ছিল একটি বাদে।

কিরীটী প্রশ্ন করে, ডেড্ বডি কোথায় ?

ঐ পূব দিককার ঘরে, আসুন না।

কিরীটী মানিক চাটুয্যেকে অনুসরণ করে।

কয়েক পা অগ্রসর হয়েই সহসা ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আরশির মসৃণ গাত্রে ওর নজর পড়তেই ও যেন নিজের অজ্ঞাতেই থমকে দাঁড়িয়ে যায় মুহূর্তের জন্য।

একটি নারীর মুখ চকিতে ভেসে উঠেছিল আরশির মসৃণ গাত্রে। বোরখায় আবৃত মুখখানা। কিন্তু মুহূর্তের জন্য বোরখা মুখের উপর থেকে অপসারিত হয়েছিল।

কি সুন্দর কি কমনীয় একখানি নারীর মুখ। টানা ভ্রূ। টানা টানা দুটি চোখ। আর সেই চোখের তারায় যেন একটা ভীতি একটা সংশয়।

কিরীটী থমকে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আরশির গা থেকে সে মুখের প্রতিচ্ছবি মিলিয়ে যায়। কিরীটীকে থামতে দেখে মানিক চাটুয্যে শুধাল, কি হল ?

না—কিছু না—চলুন।

কিরীটীর কথা শেষ হল না। সহসা নারীকণ্ঠের একটা হাসির তরঙ্গ যেন সেই স্তব্ধ গৃহের দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়ল।

খিলখিল করে কে হাসছে। হাসির শব্দটা যেন হঠাৎ উঠে হঠাৎই আবার মিলিয়ে গেল।

মিলিয়ে গেল নবাব আলী আসগর সাহেবের জীর্ণ অট্টালিকার দেওয়ালে দেওয়ালে যেন শুষে নিল সেই হাসির শব্দটা।

বাইরে ঝড় বৃষ্টি তেমনি চলছে। সোঁ সোঁ হাওয়ায় ঝাউগাছের কান্না তেমনি শোনা যায়।

কিরীটী মানিক চাটুয্যের দিকে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

মানিক চাটুয্যেও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেই হাসির শব্দে।

কে হাসল যেন মনে হল? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ শুনলাম · মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় মানিক চাটুয্যে, দেখব খোঁজ নিয়ে?

না থাক, চলুন।

কিরীটী কথাটা বলে মানিক চাটুয্যেকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে।

কয়েক পা অগ্রসর হতেই দুজনে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

এই ঘরে—

মানিক চাটুয্যে বলে।

চলুন…

অন্যান্য ঘরের দরজার মত এ ঘরেও পুঁতির পর্দা ঝুলছিল—সেই পুঁতির পর্দা সরিয়ে সেই দরজার কবাট ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

বোঝা গেল দরজাটা ভেজানো ছিল মাত্র।

প্রথমে মানিক চাটুয্যে ও তার পশ্চাতে কিরীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে যায় কিরীটী।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হচ্ছিল থেকে থেকে, সেই সঙ্গে মৃদু একটা টুং টুং শব্দ ঘরের মধ্যে।

কিরীটী তাকিয়ে দেখল ঘরের একটা জানলা খোলা।

বাতাসের ঝাপটায় সেই জানলার কাঁচের পুরাতন পাল্লা দুটো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে—ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলছে তাতেই। হাওয়ায় বৃষ্টির ঝাপটা এসে ঘরে ঢুকছে। মাথার উপর শিলিং থেকে ঝুলন্ত বিরাট ঝাড়-বাতির বেলোয়ারী কাঁচগুলো হাওয়ায় পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে টুং টুং শব্দ করছে, সঙ্গীতের একটা বিলম্বিত স্বর যেন।

ঘরের মধ্যে ঝাপসা ঝাপসা আলো। রহস্যময় একটা অস্পষ্টতা যেন।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে কক্ষটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করে উঠল। কিরীটী তাকিয়ে দেখল ঝাড়ের মধ্যে ইলেকট্রিক বাল্বগুলো এক সঙ্গে সব জ্বলে উঠেছে।

সুইচটা টিপে মানিক চাটুয্যেই আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রখর আলোয় ঘরটা যেন এতক্ষণে চোখের সামনে দেখা দিল।

কারো শয়ন বা বসবার ঘর নয় এটা। জলসাঘর। মেঝেতে পুরু গালিচা বিছানো—বড় বড় তাকিয়া—তাতে রেশমী ঝালর দেওয়া—চারদিকে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ছড়ানো। সেতার সারেঙ্গী বীণ সরোদ তানপুরা বাঁয়া তবলা

ইত্যাদি—আর তারই মাঝখানে একটি নারীদেহ এলিয়ে পড়ে আছে। শুধুমাত্র সুন্দর বললেই বোধ হয় বলা হয় না—অতুলনীয় সুন্দর—এবং শুধু সুন্দর নয়, যেন আশ্চর্য!

কিরীটীর মনে হয় এমনটি বুঝি আর সে ইতিপূর্বে দেখেনি।

বয়স কতই বা হবে—কুড়ির বেশী হবে না। পরনে দামী রেশমের শালোয়ার ও কাঁচুলী—তার উপর একটা সূক্ষ্ম ওড়না—ডানদিকের বুকে একটা ছোরা আমূল বিদ্ধ।

কাঁচুলীটা রক্তে লাল হয়ে রয়েছে—

কানে হীরের কর্ণাভরণ। হাতে দুগাছি করে প্ল্যাটিনামের উপরে হীরের চুড়ি। পায়ে ও হাতের পাতায় মেহেদীর রঙ। মাথায় চুল বেণীবদ্ধ—তাতে একটি সোনালী ফিতে জড়ানো—এক পাশে বেণীটা সাপের মত এলিয়ে পড়ে আছে।

টানা ভ্রূ। নিমীলিত আঁখিপক্ষ। একটা হাত ছড়ানো—অন্য হাতটা দেহের সঙ্গে লেগে আছে।

ছোরার বাঁটটা সাদা—কারুকার্য করা। তরুণীর বক্ষে যদি ছোরাটা আমূল না বিদ্ধ থাকত মনে হত বুঝি সে ঘুমিয়ে আছে।

কিরীটী কয়েকটা মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ভূলুণ্ঠিত প্রাণহীন দেহটার দিকে চেয়ে থাকে।

॥ চার ॥

মানিক চাটুয্যেই প্রথমে কথা বলে।

আলী স্যাহেবের সর্বকনিষ্ঠা বেগম—জাহানারা।

জাহানারা?

হ্যাঁ।

বয়স বেশী বলে তো মনে হচ্ছে না!

না।

হুঁ। ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছেন? কখন ব্যাপারটা ঘটেছে বা কে প্রথম জানতে পারল—

মোটামুটি যা জানতে পেরেছি—নাসির হোসেনের কাছে—

নাসির হোসেন ?

হ্যাঁ—আলী সাহেবের ভাগ্নে। ওঁর বোনের—সুলতানা বেগমের একমাত্র ছেলে—

নাসির হোসেন সাহেব এখানেই থাকেন তো ?

হ্যাঁ।

নাসির হোসেন যা বলেছিল মানিক চাটুয্যেকে, অতঃপর সেই কাহিনী বিবৃত করে মানিক চাটুয্যে।

আলী সাহেবের তিন বেগম।

রৌশনারা বেগম—মাণিক বেগম ও সর্বকনিষ্ঠা জাহানারা বেগম।

বড় বেগম রৌশনারার বয়স বাহান্ন-পঞ্চান্নর উর্ধ্বেই হবে—

মধ্যমা মাণিক বেগম—মুসলমানের ঘরের মেয়ে নয়—হিন্দুর কন্যা আগেই বলা হয়েছে।

মুসলিম ধর্ম গ্রহণের পর মণিকার নাম বদলে আলী সাহেব তার নাম রাখেন মাণিক। মাণিক আলী সাহেবের দেওয়া আদরের নাম।

নবাব আলী সাহেবের এক হিন্দু কর্মচারী ছিল যতীন চাটুয্যে—তারই কন্যা ঐ মণিকা।

সর্বকনিষ্ঠা জাহানারাকে আলী সাহেব মাত্র বছর দুই আগে সাদী করেছিলেন।

আসগর আলী সাহেবের বয়স এখন প্রায় বাহাত্তর-তিয়াত্তর হবে। বৃদ্ধ হলেও কিন্তু দেখে সেটা বুঝবার উপায় নেই। দীর্ঘ লম্বা পাতলা চেহারা। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ। এখনো সোজা হয়ে হাঁটা-চলা করেন। মাথার চুল ও দাড়ি পেকে অবশ্য সাদা হয়ে গিয়েছে। খুব আমুদে—রাশভারী মানুষ।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, শুধু তাই—বলুন শক্তিমান পুরুষও—

মানিক চাটুয্যে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, নচেৎ তৃতীয়বার বেগম সংগ্রহ করেন ঐ বয়সে !

মানিক চাটুয্যেও হাসে।

বলুন তারপর—

জাহানারা গরিবের ঘরের মেয়ে হলেও অত্যন্ত মেধাবী ছিল বলে বি. এ. পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিল নিজের চেষ্টায়। এবং সেই সঙ্গে গানবাজনাও। সংগীতে

অপূর্ব মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ ছিল তার।

নিজের চেষ্টাতেই গান শিখেছিলো লেখাপড়ার মতই।

জাহানারার সঙ্গে আসগর আলী সাহেবের বিবাহের ব্যাপারটাও নাকি বিচিত্র—জাহানারা নাকি ইচ্ছে করেই আসগর আলী সাহেবকে সাদী করেছে।

অনেকেই ব্যাপারটায় যে বিস্মিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

আসগর আলী সাহেব চিরদিনই একজন সংগীত রসগ্রাহী। সংগীতকে তিনি বরাবরই ভালবাসতেন বলে প্রায়ই তাঁর গৃহের জলসাঘরে গানের জলসা বসত। বহু গুণী জ্ঞানী সংগীতশিল্পীরা ঐ জলসাঘরে এসে মাইফেলে যোগ দিয়ে গিয়েছেন। তা ছাড়াও মধ্যে মধ্যে জাহানারা একাই সংগীতের আসর বসাত। এবং সে আসরে শ্রোতা থাকতেন তার স্বামীই—আসগর আলী সাহেব।

গত রাত্রেও তেমনি সংগীতের আসর বসেছিল ঐ জলসাঘরে। দুটি মাত্র

জাহানারা বেগম ও নবাব আসগর আলী সাহেব।

আলী সাহেবের শরীরটা নাকি গত রাত্রে তেমন ভাল ছিল না—তাই রাত দশটার পর তিনি উঠে চলে যান জলসাঘর থেকে।

তারপর একাই নাকি জাহানারা বেগম বসে বসে জলসাঘরে গান গাইছিল।

জাহানারার নিজস্ব দাসী মোতি—জলসাঘরের দরজার বাইরে বসেছিল— অন্যান্য রাত্রে রাত বারোটার বেশী থাকত না জাহানারা জলসাঘরে।

কিন্তু গত রাত্রে সাড়ে বারোটা বেজে গেল তখনো সংগীতের বিরাম নেই—তা ছাড়া বাইরে ঝড়জল—বসে থাকতে থাকতে দাসী মোতি এক সময় নাকি ঘুমিয়ে পড়ে। এবং কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিল বলতে পারে না।

হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে যায়।

সংগীত তখন আর শোনা যাচ্ছে না—কেবল ঝড়জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর ঝাউগাছগুলোর সোঁ সোঁ করুণ কান্না।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মোতি।

জলসাঘরের দরজা খোলা—পুঁতির ভারী পর্দাটা হাওয়ায় দুলছে আর মৃদু ঝিন্ ঝিন্ শব্দ তুলছে।

বেগম সাহেবা কি চলে গেলেন নাকি? কিন্তু তাকে ডাকেনি কেন? জলসাঘরে আলো জ্বলছে না তো—তবে কি সত্যি চলে গিয়েছেন শয়নঘরে বেগম সাহেবা?

পুঁতির পর্দা সরিয়ে মোতি ঘরের মধ্যে পা দেয়।

ঘরটা অন্ধকার।

একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা—সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

কেমন যেন আতঙ্কে সর্বাঙ্গ সিরসির করে ওঠে মোতির।

কয়েকটা মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

তারপর সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই তার ঐ বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে মোতি চিৎকার করে চেঁচিয়ে ওঠে।

ঘর থেকে পাগলের মত ছুটে বের হয়ে যায়।

॥ পাঁচ ॥

খুন—খুন!

মোতির চিৎকারে বাড়ির সবাই জেগে উঠে এল। মধ্যরাত্রে বাড়িটার মধ্যে যেন একটা চকিত সাড়া পড়ে যায়। আলী সাহেব—অন্যান্য দুই বেগম ঘুম ভেঙে উঠে আসে। নাসির হোসেন ঐ সময় ফিরে আসে বাড়িতে।

কেন—সে কি বাড়িতে ছিল না? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না। মানিক চাটুয্যে বলে।

কোথায় ছিল তবে?

বেলগাছিয়ায় তার এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল—বিকেলেই চলে গিয়েছিল।

তারপর?

সবাই বিহ্বল—সবাই বিমূঢ়—অতঃপর কি কর্তব্য—ঐ সময় নীচ থেকে সৌমেন কুণ্ডুকে আলী সাহেব ডেকে পাঠান।

সৌমেন ঘুমোচ্ছিল, উঠে এসে সব শুনে সে তো বোবা।

অবশেষে সৌমেন কুণ্ডুই থানায় খবর দেয়। থানার ও. সি. সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দেয়—দিয়েই সে চলে আসে।

এ তল্লাটের ও. সি. কে?

সুশীলবাবু—সুশীল মুখার্জি—

তাঁকে দেখছি না যে?

আছে সে।

কোথায়?

আলী সাহেবের ঘরে বসে বোধ হয় জবানবন্দি নিচ্ছে।

কিরীটী আর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে মৃতদেহের সামনে এগিয়ে যায়।

শব স্পর্শ করে। ঠাণ্ডা—হিম। অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা আগে যে 'মৃত্যু হয়েছে' সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

চেয়ে থাকে মৃতদেহের দিকে কিরীটী। সহসা ডান হাতের অনামিকার প্রতি নজর পড়ে—আঙুলে সুস্পষ্ট অঙ্গুরীয় দাগ—অথচ আঙুলে কোন অঙ্গুরী নেই—

কিরীটী অতঃপর মৃতদেহের কাছ থেকে সরে এসে ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল।

খোলা জানলাপথে ঠাণ্ডা জলো হাওয়া আসছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্নই ছিল—আবার বোধ হয় বৃষ্টি নামল। এ বৃষ্টি সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। কিরীটী খোলা জানলাটার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দেখেছে জানলাটা খোলা ছিল—জানলাটা দিয়ে সারাটা রাত ধরে বেশ বৃষ্টির ছাট এসেছে বোঝা যায়। মেঝের গালিচার অনেকটা পর্যন্ত সেই ছাটে ভিজে গিয়েছে—জানলাপথে বাড়ির পশ্চাৎ দিকটা দেখা যায়। ঐটাই দক্ষিণ দিক।

অনেকখানি খোলা জায়গা—বাগান—গাছপালা নানা জাতের—জানলাটার একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে হাত দুই মাত্র ব্যবধানে একটা স্বর্ণচাঁপা ফুলের গাছ।

বিরাট উঁচু লম্বা গাছটা। হাওয়ায় ডালপালা ও পাতাগুলো যেন ওলটপালট করছে। জানলার হাত তিনেক নীচে চওড়া কার্নিশ। বরাবর আছে কার্নিশটা—অনায়াসেই ঐ কার্নিশপথে এই জানলার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে জানলাটা ধরে এই ঘরে উঠে আসা যেতে পারে।

মানিকবাবু—

কিছু বলবেন? মানিক চাটুয্যে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

এই জানলাটা কি খোলাই ছিল?

তা তো বলতে পারি না।

জাহানারার দাসী মোতিকে জিজ্ঞাসা করেননি কথাটা?

না তো—

হুঁ—খুব সম্ভবতঃ জানলাটা খোলাই ছিল—ঐ দরজাটা তো খোলাই ছিল তাই না ?

হ্যাঁ—ভেজানো ছিল। ও. সি.কে সংবাদ দেন থানায় সৌমেন কুণ্ডুই—

হুঁ। কিরীটী যেন কেমন অন্যমনস্ক—হস্তধৃত জ্বলন্ত চুরুটটা ঠোঁটে চেপে ধরে ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে গোটা চারেক জানলা—সবই বাইরের—মানে দক্ষিণমুখী বাগানের দিকে—তিনটি জানলা বন্ধ, একটি মাত্র খোলা। দরজা তিনটে—মনে হচ্ছে ওরা একটা দরজা-পথে ঐ ঘরে ঢুকেছে—অন্য দুটো বন্ধ—এবং দরজার গায়ে ভারি পুঁতির পর্দা ঝুলছে। নানা রংয়ের নানা আকারের পুঁতি।

ঐ দরজাটা বন্ধ দেখছি ? কিরীটী মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে একটা দরজার দিকে তাকিয়ে—

হ্যাঁ—ওটা নাকি বন্ধই থাকে।

ব্যবহার করা হয় না বুঝি ?

না—ওটা পাশের ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

পাশের ঘরটায় কে থাকে ?

কেউ থাকে না—ও ঘরটার মধ্যে পুরাতন জিনিসপত্র থাকে এখন—আগে অবিশ্যি নবাব সাহেবের বৃদ্ধা ফুপু থাকতেন।

ফুপু—মানে পিসি ?

হ্যাঁ।

আর ঐ দরজাটা ?

ওটা বাথরুমে যাবার দরজা।

ঘরের সঙ্গে বাথরুম আছে ?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য—এতদিনকার পুরাতন আমলের বাড়িতে—

কিরীটী কতকটা স্বগতোক্তির মতই মৃদুকণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে।

মানিক চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করে, কিছু বলবেন ?

না। আচ্ছা চাটুয্যে সাহেব—

বলুন।

আচ্ছা, আলী সাহেবের বেগমদের কার কত বয়েস জানেন—মানে অনুমান

আপনার—আপনি তো সকলেরই জবানবন্দি নিয়েছেন—

হ্যাঁ—রৌশনারার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্নর কম হবে না—

দ্বিতীয়া—হিন্দু নারী মাণিক বেগমের—তারও বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে তো হবেই—

দেখতে কেমন ? Don't mind—বেগম সাহেবানরা ?

রৌশনারা এককালে সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়—তবে দেহে এখন বার্ধক্যের ছাপ পড়ায়—

বুঝেছি—আর মাণিক বেগম সাহেবা ?

রূপের দিক থেকে তিনিও যে খুব একটা—তা কিছু নয়—কালো রোগা চেহারা, তবে চোখে মুখে প্রখর একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে দেখলেই বোঝা যায়।

আপনি তো বলছিলেন নবাব সাহেব ও তাঁর বেগম সাহেবেরা ছাড়াও এখানে আমীর কে একজন আত্মীয় আছেন—

হ্যাঁ—নাসির হোসেন সাহেব—

কে সে ?

একটু আগে যে বললাম, নবাব সাহেবের ভাগ্নে—

হ্যাঁ মনে পড়েছে।

একটু থেমে আবার কিরীটী প্রশ্ন করে, দাসদাসী এখানে কজন আছে ?

পাঁচজন দাসী ও চারজন ভৃত্য—

মোতি তো জাহানারার খাস দাসী ছিল তাই না ?

হ্যাঁ।

বয়স কত, দেখতে কেমন ?

বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে—দেখতে তেমন ভাল নয়—তবে মনে হয় খুব চালাক-চতুর আর—

বলুন, থামলেন কেন ?

আর একটি দাসী আছে এ বাড়িতে—নাম কুলসম—

কুলসম ?

হ্যাঁ।

কার দাসী ?

মাণিক বেগমের খাস দাসী। অল্প বয়স—কুড়ি-পঁচিশের বেশী হবে না—দেখতে বেশ কুলসম।

সুন্দর বলুন।

তা বলতে পারেন।

হুঁ—দেখেই মনে হয়েছিল—

কাকে—কাকে দেখে মনে হয়েছিল?

সে কথার জবাব না দিয়ে কিরীটী বলে, চলুন—এ ঘরে যা দেখবার দেখা হয়ে গিয়েছে—অন্য একটা ঘরে গিয়ে বসা যাক—

বেশ, আলী সাহেবের বসবার ঘরে গিয়ে বসা যাক চলুন—

চলুন—ঐ ঘরে বসেই এ বাড়ির মানুষগুলোকে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন না?

॥ ছয় ॥

প্রয়োজন বুঝলে সবার সঙ্গেই দেখা করব—শুধু আলী কেন?

সকলে এসে দোতলাতেই আলী সাহেবের শোবার ঘরের পাশে বসবার ঘরে ঢুকল।

এ ঘরটি কিন্তু আধুনিক আসবাবপত্রে সজ্জিত। রুচি ও পরিচ্ছন্নতার প্রকাশ সর্বত্র যেন।

মানিকবাবু—

কিরীটীর ডাকে মানিক চাটুয্যে ওর মুখের দিকে তাকাল।

কিছু বলছেন?

হ্যাঁ!

কি বলুন?

একবার আপনাদের দাসী কুলসমকে ডাকবেন?

কুলসম?

হ্যাঁ।

মানিক চাটুয্যে বাইরে গিয়ে ঘরের একজনকে ডেকে কুলসমকে ঐ ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে দিয়ে এল।

একটা বড় সোফায় কিরীটী বসে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল।

এ বাড়ি—এর ঐতিহ্য ও সব কিছুর সঙ্গে যেন এ ঘরের কিছুরই খাপ খায়

না—যেন স্বতন্ত্র—রীতিমত একটা পার্থক্য আছে।

মিঃ রায়—

বলুন।

আমার কিন্তু মনে হয়—এ হত্যার ব্যাপারটা বাইরের কারোর দ্বারা সংঘটিত হয়নি।

আপনি বলতে চান বাড়ির মধ্যেই কেউ—

হ্যাঁ—আপনার কি মনে হয়?

সম্ভবতঃ তাই। মৃদুকণ্ঠে কিরীটি কথাটা বলে।

নচেৎ কাল সারাটা রাত ধরে যে ঝড় চলেছে—ঐ দুর্যোগের মধ্যে কারও—মানে কোন বাইরের কারও এখানে এসে—

কিরীটী কথাটা শেষ করে, হত্যা করে যাওয়াটা তো অসুবিধা নয় বরং আরো সুবিধাই ছিল। মনে করুন—ঐ দুর্যোগের মধ্যে কেউ এসে হত্যা করে গেলে তার আসা-যাওয়ার সময় চট্ করে কারো নজরে পড়ত না।

কিন্তু—

তাছাড়া বাইরে থেকে জলসাঘরের যে জানলাটা খোলা আছে দেখে এলাম—সেই জানলাপথে ভেতরে প্রবেশ করাটাও খুব সহজ নয়।

বাইরে ঐ সময় পদশব্দ শোনা গেল।

বৃদ্ধ ভৃত্য দেলোয়ারের সঙ্গে কুলসম এসেছে।

মানিক চাটুয্যে ঘরের বাইরে গিয়ে কুলসমকে ভিতরে নিয়ে এল সঙ্গে করে।

কিরীটী তাকাল।

বোরখা নেই মুখে।

মেয়েটি সুন্দরী সন্দেহ নেই—কিন্তু আরশিতে দেখা চকিত সেই মুখখানি নয়। চোখের তারা দুটোতে বুদ্ধির দীপ্তি।

তোমার নাম কুলসম? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জী হাঁ।

মাণিক বেগমের দাসী তুমি?

জী হাঁ।

জাহানারা বেগমের ফাইফরমাস কখনো তুমি খাটতে না?

জী না তো!

কেন?

ছোট বেগম সাহেবারও খাস দাসী আছে একজন—

কে সে—কি নাম তার ?

কেন মোতি !

হুঁ—আচ্ছা কুলসম, এ বাড়িতে তুমি কতদিন কাজ করছ ?

কমসে কম দশ সাল তো হবেই।

তবে তো অনেক দিন !!

জী হাঁ—

তোমার মনিবান মানে মাণিক বেগম সাহেবাকে ছাড়া এ বাড়িতে সব চাইতে বেশী কাকে তোমার ভাল লাগত ?

সে যদি বলেন তো—জাহানারা বেগম সাহেবাকেই—

কথাটা বলতে বলতে গলার স্বরটা যেন কুলসমের রুদ্ধ হয়ে আসে।

খুব ভাল ছিলেন বুঝি বেগম সাহেবা ?

জী—অমন দিলদরিয়া মানুষ বড় একটা চোখে পড়ে না—তাকে যে কোন্ শমন এমন করে খুন করল !

এ বাড়ির সবাই তাকে ভালবাসত তাই না ?

জী, তাকে ভাল না বেসে কেউ থাকতে পারত না। যেমন দিলদরিয়া তেমনি হাসিখুশি ছিল মানুষটা। কাউকে কখনো একটা চোখ রাঙিয়ে কথাও বলেনি—হাসি যেন সর্বক্ষণ বেগম সাহেবার মুখে লেগেই থাকত।

কতদিন হল আলী সাহেব তাঁকে সাদী করেছেন ?

সেও তো দুই সাল হয়ে গেল।

বেগম সাহেবার বাপের বাড়িতে কে কে আছেন জান ?

এক বুড়ী মা—আর একটা মাতাল ভাই—গরীব—ভীষণ গরীব—নবাব সাহেবই তো বরাবর তাদের সাহায্য করে আসছেন।

কোথায় তারা থাকে ?

শুনেছি মেটিয়াবুরুজ।

আচ্ছা কুলসম ?

জী—

এ বাসায় বেশ সুন্দর দেখতে অল্পবয়েসী আর কোন মেয়েছেলে আছে ?

জী—মনে হল কুলসম কী বলতে গিয়েও নিজেকে যেন সামলে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বললে, না—আর কে থাকবে—নবাব সাহেবের তিন বেগম সাহেবা আর

আমরা দাস-দাসী—আর—

আর—আর কে আছে ?

কুণ্ডু বাবু—সিক্রিটারী বাবু—

তাহলে আর কেউ নেই ?

না।

কিরীটির মনে হল কুলসম যেন 'না' কথাটা বলতে গিয়ে একটু কেমন দ্বিধা করল।

আচ্ছা, তুমি যেতে পার—মোতিকে একবার পাঠিয়ে দাও—

সেলাম সাব্—

কুলসম চলে গেল।

অতঃপর জাহানারা বেগমের খাস দাসী মোতি এল।

মোতির বয়স ত্রিশের নীচে নয়। রোগা পাতলা চেহারা—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চোখে মুখে একটা বোকা বোকা ভাব।

॥ সাত ॥

তোমার নাম মোতি ?

জী—

তুমি তো কাল রাত্রে জলসাঘরের বাইরেই ছিলে ?

জী—

নবাব সাহেবকে বাজনা বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন ছোট বেগম সাহেবা তাই না ?

জী—

নবাব সাহেব কাল রাত্রে কখন জলসাঘর থেকে চলে যান জান তুমি ?

জানি—আমার সামনে দিয়েই তো রাত্রে এক সময় বের হয়ে গেলেন।

কটা রাত হবে ?

তা রাত বারোটার পরে।

কি করে বুঝলে ?

দালানের ঘড়িতে রাত বারোটা তার আগে ঢং ঢং করে বেজে গিয়েছিল।

হুঁ—আচ্ছা, নবাব সাহেব চলে যাবার পর তো একাই বেগম সাহেবা

জলসাঘরে ছিলেন ?

জী—আর কে থাকবে ! একা একাই বেগম সাহেবা বাজাচ্ছিলেন।

ঘরে আর কেউ ঢোকেনি তুমি ঠিক জান ?

জানি—আর কে ঢুকবে !

অত রাত হয়ে গিয়েছিল, তুমি তো ঘুমিয়েও পড়তে পার সেই সময়—

ঘুমিয়ে—

হ্যাঁ—তুমি ঘুমিয়ে পড়নি ? একটু ঘুমিয়েছিলে তাই না ?

বোধ হয় একটু ঘুমিয়েছিলাম।

একটু নয়—মনে হচ্ছে বেশ ঘুমিয়েছিলে কিছুক্ষণ—অনেক রাত—বাদলা—তাও পড়েছিল তাই না ?

মোতি মাথা নীচু করে থাকে।

কিরীটী বলে চলে মোতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

সেই সময় জলসাঘরে কেউ যেতেও পারে—বের হয়েও আসতে পারে—তাছাড়া তুমি-যে কেবল ঘুমিয়েছিলে তাই নয়—খুব গভীর ঘুম ঘুমিয়েছ।

না না—

হ্যাঁ—নচেৎ তুমি তোমার বেগম সাহেবার মৃত্যু-চিৎকারটা ঘরের দরজায় বসে নিশ্চয়ই শুনতে পারতে—খুব ঘুমিয়েছিলে তুমি।

মোতি চুপ।

বল, জবাব দাও।

জী—

কিছু পিয়েছিলে কাল সন্ধ্যায় ?

জী—মোতি ভয়ে ভয়ে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করে। জিজ্ঞাসা করে, কাল সন্ধ্যায় সময় বা তারপর মানে প্রথম রাত্রের দিকে কিছু খেয়েছিলে ?

কি জিজ্ঞাসা করছি বুঝতে পারছ না মোতি ?

জী—

কিছু খেয়েছিলে বা কেউ কিছু এই যেমন ধর সরবৎ বা ঐ জাতীয় কিছু তোমাকে খাইয়েছিল বা তুমিই ইচ্ছা করে খেয়েছিলে ?

না।

খাওনি ?

নেহি—

ভাল করে মনে করে দেখ মোতি—নচেৎ অমন গভীর ঘুম তুমি ঘুমোতে পারতে না।

মোতি চুপ করে থাকে—

শোন মোতি, তুমি তো বুঝতে পারছ তোমার মনিবান বেগম সাহেবাকে কাল রাত্রে কেউ ছোরা মেরে নৃশংস ভাবে খুন করেছে এবং তুমি তাকে খুব ভালবাসতে এবং সেও তোমাকে বাসত।

জী—

তুমি কি চাও না হত্যাকারী ধরা পড়ুক ?

জী—

আচ্ছা মোতি—

বলুন।

নবাব সাহেব সুরা পান করেন—তাই না ?

জী—

বেগম সাহেবা পান করতেন না ?

আমার মনিবানও পান করতেন মধ্যে মধ্যে—

আর অন্যান্য বেগমরা ?

বড় বেগম সাহেবা রোজ সিদ্ধি খান—

সিদ্ধি ?

জী—

কে তৈরী করে দিত ?

কুলসম—

কেবল বড় বেগম সাহেবাই খান আর কেউ এ বাড়িতে সিদ্ধি খায় না ? কুলসমও নিশ্চয়ই খায়—তাই না ?

জী—

তুমিও মধ্যে মধ্যে খাও—তাই না ?

জী—

কথাটা হঠাৎ বলেই সঙ্গে সঙ্গে মোতি যেন নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে, না, না—আমি—

কিরীটী তাকে সামলাবার সময় দেয় না—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, া—মধ্যে মধ্যে তুমিও খাও আর কাল সন্ধ্যায় তুমি একটু বেশীই সিদ্ধি খেয়েছিলে।

মোতি যেন কেমন থতমত খেয়ে চুপ করে থাকে।

খেয়েছিলে কি না বল?

জী—খুব মৃদু কণ্ঠে সাড়া এলো।

অনেকটা?

না—এক গ্লাস—

জলসা ঘরের বাইরে থাকতে থাকতে বাদলার ঠাণ্ডায় সিদ্ধির নেশায় ঘুম রেছিল তোমার—তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। এখন ঠিক করে বল, কখন তোমার ম ভেঙ্গেছিল—কখন প্রথম তুমি তোমার মনিবকে ডাকতে জলসা ঘরে ঢুকেছিলে?

রাত তখন—

বল—কত রাত তখন?

রাত দুটো হবে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল?

জী—একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।

কি রকম শব্দ শুনেছিলে?

একটা কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ—কেউ যেন পড়ে গেল।

তারপর?

চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই—বারান্দাটা খালি—তবু মনে কেমন সন্দেহ হলো, উঠে সিঁড়ির দিকে যাই—

বল থামলে কেন—তারপর?

সিঁড়ির কাছাকাছি যেতে আমার নজরে পড়ে কয়েকটা ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি—

কাঁচের চুড়ি?

জী—আমি সেগুলি রেখে দিয়েছি।

তারপর?

আমি তারপর জলসা ঘরে এসে ঢুকি।

কেন—জলসা ঘরে ঢুকলে কেন?

কেমন যেন চারিদিক একেবারে চুপচাপ, কোন শব্দ নেই—আগে দুবার ঘুম ভেঙ্গেছে—সেতার বাজানোর শব্দ কানে এসেছে—ভাবলাম তাই, বেগম সাহেব চলে গেছেন হয়ত শোবার ঘরে—

বল—তারপর ?

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি বেগম সাহেবা—

বল কি—

মুখে একটা রেশমী রুমাল বাঁধা—আর বুকে তার একটা ছোরা বিঁধান—তিনি যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করছেন—

তাহলে তখনো তোমার বেগম সাহেবা বেঁচে ছিলেন—

জী—

সঙ্গে সঙ্গে তুমি লোক ডাকলে না কেন ?

কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম প্রথমটায়, তারপর তাড়াতাড়ি বেগম সাহেবার মুখের রুমালটা কোন মতে খুলে ফেলে দিতেই—

কি ?

সেই মুহূর্তেই বেগম সাহেবার শরীরটা দুবার কেঁপে উঠলো—মুখ হাঁ করে কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না—মাথাটা কাত হয়ে পড়লো—বুঝলাম বেগম সাহেবা মারা গেছেন—হঠাৎ ঐ সময় চোখে পড়ল—আমার জামা-কাপড়ে রক্ত—

রক্ত !

হ্যাঁ, বেগম সাহেবার রক্ত।

আচ্ছা মোতি, তখন তুমি সকলকে ডাকলে না কেন ?

না বাবুজী ডাকিনি—ভয়ে—

ভয় কিসের।

যদি আমার জামা কাপড়ে রক্ত দেখে সবাই আমাকে সন্দেহ করে।

হুঁ, তারপর তুমি কি করলে ?

তাড়াতাড়ি ঘর হতে বের হয়ে নিজের ঘরে চলে যাই। বুকটার মধ্যে তখনো আমার ধড়াস ধড়াস করছে—গলা শুকিয়ে গিয়েছে—

আর সেই রক্ত মাখা জামা কাপড়গুলো কি করলে ?

সেই রাত্রেই খুলে পরিষ্কার করে—সোজা নীচে বাবুর্চিখানায় চলে যাই, চুল্লির আগুনে সেঁকে সেঁকে সেগুলো শুকিয়ে উপরে চলে আসি—তারপর আরো খানিকক্ষণ বাদে সকলকে ডাকি।

তাহলে সকলকে তুমি ডাক রাত তিনটার পর নিশ্চয়ই কোন এক সময় !

ঐ রকমই হবে বাবুজী।

॥ আট ॥

আচ্ছা, তুমি যে বলছিলে ঘরে ঢুকে যখন তুমি বেগম সাহেবাকে মৃত দেখ তখন রাত দুটো—ঠিক রাত দুটো তা কি করে বুঝলে?

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বেজেছিল।

ঐ সময় বারান্দায় জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ শোনা গেল। কিরীটী চোখ তুলে তাকায় দরজার দিকে।

মানিকবাবু, দেখুন তো কে এলো!—কিরীটী শুধায়।

মানিকবাবুকে আর দেখতে হলো না। সুদর্শন একটি যুবা পুরুষ কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

ইনি?—কিরীটী প্রশ্ন করে।

মানিক চাটুয্যে বলে, নাসির হোসেন, নবাব সাহেবের বোন সুলতানা বেগমের ছেলে।

কিরীটী তাকাল।

নাসির হোসেন। আলী সাহেবের একমাত্র ভগিনী সুলতানা বেগম সাহেবার একমাত্র সন্তান। নাসির হোসেনের বয়স বেশী হবে না। ত্রিশের নীচে বলেই মনে হয়। দোহারা চেহারা। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। চোখে মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। চোখে চশমা—দামী সোনার ফ্রেম। পরনে টেরিলিনের আমেরিকান কাটের প্যাণ্ট ও বুশ শার্ট। পায়ে চপ্পল।

একা নাসির হোসেনই নয়, তার পিছন পিছন ঘরে এসে প্রবেশ করেন নবাব সাহেবের সরকার বা সেক্রেটারী সৌরীন কুণ্ডু মশাইও। শেষোক্ত ব্যক্তির বয়স ত্রিশের উর্ধ্বে বলেই মনে হয়। রোগা পাকানো চেহারা। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। মুখে ছোট ছোট কাঁচা পাকা দাড়ি। বোধ হয় ভদ্রলোক নিয়মিত ক্ষৌর-কর্ম করেন না।

কথা বললেন প্রথমে সৌরীন কুণ্ডুই, চাটুয্যে সাহেব—নাসির সাহেব বলছিলেন—

নাসির হোসেনই এবার কুণ্ডু মশাইয়ের অর্ধসমাপ্ত কথাটা শেষ করলো, আমার বিশেষ কাজ আছে চাটুয্যে সাহেব, আমাকে একবার অনুমতি দিতে হবে আমি

বাইরে যাবো।

মানিক চাটুয্যে নিঃশব্দে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আপনিই নাসির হোসেন সাহেব?

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

মিঃ কুণ্ডু, আপনি একটু বাইরে যাবেন—আমার নাসির হোসেন সাহেবের সঙ্গে কিছু কথা আছে।

সৌরীন কুণ্ডু তখুনি বাইরে চলে গেলেন। এবার কিরীটী নাসির হোসেনের দিকে তাকাল।

কিছু মনে করবেন না হোসেন সাহেব, আপনি কি ফিল্মের—মানে ছবির কোন বিজনেস করেন?

হ্যাঁ, আমার একটি নিজস্ব চিত্র-প্রতিষ্ঠান আছে।—নাসির হোসেন জবাব দিলেন।

তাই আপনার ছবি আমি সিনেমা কাগজে দেখেছি। রিসেণ্টলি কি একটা হিন্দি সিনেমা কাগজ আপনার কি সব ছবি নিয়ে লিখেছে। তাতে প্রথমেই আপনার ছবি আছে। একটা পাইপ হাতে—

মৃদু হাসলো নাসির হোসেন, হ্যাঁ, বের হয়েছে আমার নতুন ছবি 'ইয়ে জিন্দিগী কিতনী পিয়ারা হ্যায়'।

বেশ সুন্দর নামটা তো ছবির।—কিরীটী বলে।

আমারই গল্প—আমারই সিনারি ও ডাইরেকশন।

তাই বুঝি?

কিরীটী আবার নাসির হোসেনের মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ।

আপনি তো তাহলে দেখছি অসাধারণ গুণী ব্যক্তি। তা মিউজিকটাও দিলেন না কেন আপনার ঐ ছবিতে ঐ সঙ্গে?

পরের ছবিতে দিচ্ছি।

হ্যাঁ দেবেন। সবই এক হাতে—এক ব্রেন থেকে এলে জিনিষটা একটা সত্যিকারের ক্রিয়েশন হয়।

হ্যাঁ—আজকাল কেউ কেউ তাই করছেনও।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, তা আপনার অফিস কোথায়?

বোম্বেতেও আছে, এখানেও আছে। বম্বেতে মহালক্ষ্মীতে, আর কলকাতায় য়াটারলু স্ট্রীটে—

শুটিং কোথায় হয়?

বোম্বে কলকাতা দু জায়গাতেই। যখন যেমন প্রয়োজন হয়।

আপনার শেষ বই কি ছিল হোসেন সাহেব?

'ইয়ে দুনিয়া গোল হ্যায়'।

বাঃ বেশ সুন্দর নাম ত!

হ্যাঁ, একদল মিল ওয়ার্কার্সদের নিয়ে গল্প—

হুঁ—আচ্ছা হোসেন সাহেব—আপনাদের ত শুনেছি এক একটা ছবি—বিশেষ রে হিন্দি ছবি—করতে প্রচুর টাকা লাগে, মানে লাখ লাখ টাকার ব্যাপার— াই না?

নাসির হোসেন হেসে বলে, তা ত লাগেই।

তা কি ভাবে টাকাটা আপনি যোগাড় করেন?

ডিস্ট্রিবিউটাররা দেয় অগ্রিম।

তাহলেও ইনিসিয়ালি ত একটা মোটা টাকা লাগেই?

তা লাগে।

আপনার মামা মানে নবাব সাহেবই বোধহয় সে টাকাটা আপনাকে দেন?

একবার দিয়েছেন।

আর দেননি?

না, তবে—

তবে?

এবার দেবেন বলেছেন—যে নতুন ছবিটা ইস্টম্যান কালারে করবো ঠিক করেছি, সেটায় ফিনান্স্ করবেন। হয়তো—

হয়তো কেন বলছেন? সন্দেহ আছে নাকি কিছু?

মানে বাধা দিয়েছিলেন আমার ছোট মামী।

মানে জাহানারা বেগম—যিনি—

হ্যাঁ।

॥ নয় ॥

কিরীটী একটু থেমে নাসির হোসেন সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এবার বোধহয় আর বাধা থাকল না—কি বলেন ?

য়্যা—যেন নাসির হোসেন সাহেব হঠাৎ কেমন চমকে ওঠেন।

বলছিলাম এখন যখন তিনি আর রইলেন না—আপনার বাধাও আর থাকল না, বিশেষ করে তিনিই যখন বাধা দিচ্ছিলেন—কি বলেন ?

নাসির হোসেন সাহেব কোন কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

আপনার তিন মামীর মধ্যে বোধহয় ঐ মামীরই বেশী আধিপত্য ছিল নবাব সাহেবের উপরে—তাই না ?

ঠিকই ধরেছেন।

যাক—কাল রাত্রে আপনি ত এই বাড়ীতেই ছিলেন ?

না।

ছিলেন না ?

না, আমি রাত তিনটার পর ফিরেছি।

অত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন কাল রাত্রে ?

দমদমে আমার এক বন্ধুর ওখানে ছিলাম। মানে বৃষ্টির জন্য সেখানে বিকেলের দিকে গিয়ে আটকে পড়েছিলাম।

তাহলে আপনি রাত তিনটার পর এসেছেন ?

হ্যা, এসেই ত শুনলাম ব্যাপারটা কিছুক্ষণ আগে।

আচ্ছা, আপনি যে কাল রাত্রে ফিরতে পারেন নি কেউ জানতো এ বাড়িতে কথাটা ?

কাল আসতে পারব না বলে ফোনে এখানে জানিয়েও দিয়েছিলাম।

ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন ?

হ্যা।

হঠাৎ ঐ সময় মানিক চাটুয্যে বলে ওঠেন, কাল রাত্রে কখন ফোন করেছিলেন ?

কেন, রাত তখন সাড়ে সাতটা আটটা হবে—বৃষ্টি নামার কিছুক্ষণ পরেই।

মানিক চাটুয্যেই আবার প্রশ্ন করেন, ফোন কে ধরেছিল ?

কেন বলুন তো ?

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

অবিশ্যি ব্যাপারটা সত্যি স্যাড্।—মৃদু কণ্ঠে বলে নাসির হোসেন সাহেব।

কেন, স্যাড্ কেন?

কারণ ছোট মামীই ফোন ধরেছিলেন।

ছোট মামী, কিন্তু কুণ্ডু মশাই যে বলছিলেন—

কি?

কাল বিকেল থেকেই এ বাড়ীর ফোনটা আউট অফ্ অর্ডার হয়ে আছে।

নাসির হোসেন সাহেব হেসে উঠলেন। বললেন, কোন এ বাড়ির আউট অফ অর্ডার হয়ে ছিল?

হ্যাঁ।

কে বলেছে আপনাদের?

সৌরীন কুণ্ডু মশাই।

মানিক চাটুয্যে বললেন।

ননসেন্স—ঐ লোকটা কখনো কোনো খবর রাখে না কিছু না, দুম্ করে একটা কথা এক এক সময় বলে বসে—আমি নিজে ফোনে ছোট মামীর সঙ্গে প্রায় দশ মিনিট ধরে কথা বললাম! আর ফোন আউট অফ অর্ডার হয়েছিল বলে বসলেন!

কিরীটী মানিক চাটুয্যের দিকে তাকিয়ে বললে, মানিকবাবু, সৌরীনবাবুকে একবার ডাকবেন এ ঘরে।

নিশ্চয়ই।

মানিক চাটুয্যে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

নাসির হোসেন সাহেব!

কিরীটীর ডাকে নাসির হোসেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল আবার।

কাল রাত্রে কখন আপনি দমদমে আপনার বন্ধুর বাড়ি থেকে বের হয়েছেন?

পৌনে তিনটে নাগাদ হবে।

কিসে এলেন?

কেন আমার নিজের গাড়িতে।

আপনার গাড়ি আছে?

আছে বৈকি।

কি গাড়ি?

অস্টিন অক্সফোর্ড—

নিজেই চালান, না ড্রাইভার আছে?

না না, ড্রাইভার নেই, নিজেই চালাই নিজের গাড়ি।

আপনি সাধারণত কেমন speedয়ে গাড়ী চালান?

সে যদি বলেন মশাই, আমি একটু জোরে—মানে speedয়েই গাড়ি চালাই।

Speedয়ে—তবু সাধারণত কত মাইল?

মিনিমাম চল্লিশ ত বটেই, তার কমে গরুর গাড়ি চলে, সে মটোর নয়—

তা বটে!

মানিক চাটুয্যে কুণ্ডুকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন ঐ সময়।

আসুন কুণ্ডু মশাই, এ বাড়ির ফোনটা কি ঠিক আছে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে না।

ঠিক নেই?

না।

কখন থেকে আউট অফ্ অর্ডার?

কাল বিকেল থেকে।

কোন্ ঘরে ফোন আছে?

এই তো বাইরের বারান্দায়।

কই, চলুন তো দেখি।

কিরীটী বের হয়ে গেল ঘর থেকে বারান্দায়।

বারান্দার এক কোণে ফোনটা এবং এমন ভাবে এমন জায়গায় রাখা যে চট্ করে কারো চোখে পড়ে না।

ফোনটা কিরীটী পরীক্ষা করে দেখলো—একেবারে ডেড্, কোন শব্দই নেই তখনো।

কিরীটী সৌরীন কুণ্ডুর দিকে ফিরে তাকাল, কখন আপনি প্রথম জানতে পারেন সৌরীন বাবু যে ফোনটা আউট অফ অর্ডার?

কাল বিকালেই ছোট বেগম সাহেবা আমাকে জানান এবং বলেন, অফিসে একটা কমপ্লেন করতে।

মানে জাহানারা বেগম ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা সৌরীনবাবু, এ বাড়িতে পর্দার ব্যাপারটা কি রকম মানা হয়, সবাই পর্দানশিন কি ?

সবাই, তবে—

তবে ?

ছোট বেগম সাহেবা পর্দার ব্যাপারটা তেমন মানতেন না।

সকলের সঙ্গেই বুঝি তিনি কথা বলতেন ?

সকলের সঙ্গেই।

খুব স্বাধীনচেতা ছিলেন বোধ হয় ?

তাই—হুট হাট করে যখন যেখানে খুশি বেরুতেন, যা এবাড়ীর অন্যান্য বেগমরা আদৌ করেন না।

নবাব সাহেব নিশ্চয়ই খুব রক্ষণশীল মানুষ ?

খুবই—তাহলেও ছোট বেগম সাহেবার ব্যাপারে তাঁর খুব একটা কনট্রোল ছিল বলে মনে হয় না।

আচ্ছা কুণ্ডু মশাই, একটা কথা—

বলুন।

নবাব সাহেবের ঐ ভাগ্নে—মানে আমাদের নাসির হোসেন সাহেব—ওঁর প্রতি নবাব সাহেবের মনোভাবটা ঠিক কেমন জানেন কিছু ?

খুব প্রীতির বলবো না, তবে—

তবে ?

সুলতানা বেগম সাহেবার যে কারণেই হোক তাঁর ভাইয়ের প্রতি একটা হোল্ড আছে যে জন্য ঐ ভাগ্নেটির এ গৃহে বিশেষ একটা প্রতিপত্তি আছে।

হোল্ড্ থাকার কারণ তাহলে আপনার জানা নেই ?

না, তবে মনে হয় নবাব সাহেব তাঁর বোনকে যেন একটু ভয় ও সমীহ করেন।

হুঁ—আচ্ছা নাসির হোসেন সাহেবের সিনেমার ছবি তৈরীর ব্যাপারে নবাব সাহেবের—

সহযোগিতার কথা বলছেন ত—খুব বেশীই আছে—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

তার কারণ নবাব সাহেবের এ বয়সেও একটা ব্যাধি আছে।

স্ত্রীলোকের উপরে দুর্বলতা বোধহয়?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে কথাটা।

আপনি ধরেছেন ঠিক।

কিরীটী মৃদু হাসল।

ভাল কথা, নবাব সাহেব ত তাঁর ঘরেই আছেন?

হ্যাঁ।

এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে খুব upset হয়ে পড়েছেন নাকি?

স্বাভাবিক, কারণ জাহানারা বেগম বলতে তো নবাব সাহেব একেবারে পাগল ছিলেন।

হুঁ—চলুন ঘরে যাওয়া যাক।

দুজনে এসে আগের ঘরে আবার প্রবেশ করল।

মানিক চাটুয্যে একাই ঘরে ছিলেন।

নাসির হোসেন সাহেব কই? কিরীটী প্রশ্ন করে।

তাঁর ঘরে গেছেন?

চলুন, তাহলে একবার নবাব সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।

কিরীটীকে সঙ্গে নিয়ে অতঃপর মানিক চাটুয্যে নবাব সাহেবের ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

দোতলারই একটা অংশে দুখানা বড় বড় ঘর নিয়ে নবাব সাহেব থাকেন। নবাব সাহেবের ঘরের একদিকে লাইব্রেরী-ঘর, অন্যদিকে যে দুখানা পর পর ঘর সেখানেই তিনি থাকেন।

ঘরের সংলগ্ন দুদিকে দুটি বাথরুম।

বড় বেগম সাহেবা নবাব সাহেবের পাশের ঘরেই থাকেন।

॥ এগারো ॥

।থরুম দু'টির মধ্যে একটি বড় বেগম সাহেবা রৌশেনারা বেগম সাহেবার ্যবহারের জন্য, অন্যটি তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের।

নবাব সাহেব লোকটি যে কেবল সংগীতপিপাসুই তা নয়—রীতিমত শিক্ষিতও।

মানিক চাটুয্যেই বলছিল কিরীটীকে—নবাব সাহেবের ঘরের দিকে যেতে যেতে। বলছিল, স্কুল কলেজে লেখাপড়া যদিও বেশী করেন নি, তাহলেও পড়াশুনা যথেষ্ট করেছেন এবং এখনো করেন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, এবং সেই নেশাতেই নিজস্ব একটি লাইব্রেরী গড়ে তুলেছেন।

লাইব্রেরী!

হ্যাঁ—ইংরাজী—বাংলা—হিন্দি—উর্দু—সব ভাষাতেই তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। কাজে কাজেই সব রকম বইয়েরই সংগ্রহ রয়েছে ঐ লাইব্রেরীতে।

লম্বা টানা বারান্দা। পর পর দশটি ঘর ঐ বারান্দায়।

লাইব্রেরী-ঘরের পাশে যে ছোট ঘরটি অর্থাৎ ৬নং ঘর—সেই ঘরের মধ্যে বসেই এতক্ষণ ওরা কথাবার্তা চালিয়েছিল।

১ নং ঘর ছিল নিহত জাহানারা বেগমের—২ নং ঘর ভাগ্নে নাসির হোসেন সাহেবের—এবং ৩ নং হলঘর, যে ঘরের মধ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে।

৪ নং ঘরই ইদানীং নবাব সাহেবের বৃদ্ধা পিসি অর্থাৎ ফুপুর মৃত্যুর পর খালিই পড়ে আছে।

৫ নং ঘরে মানিক বেগম থাকেন—তাঁরই ঘর।

৭ নং ঘর হচ্ছে লাইব্রেরী।

৮ ও ৯ নং ঘর দুটো নিয়ে থাকেন নবাব সাহেব।

১০ নং ঘর প্রধানা ও জ্যেষ্ঠা বেগম রৌশেনারা বেগম সাহেবার ঘর।

দুজনে এসে নবাব সাহেবের বসবার ঘরে প্রবেশ করল—কিরীটী ও মানিক চাটুয্যে।

ঘরের মধ্যে একটা আবছা আলোছায়া। সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ—তার উপরে ভারী পর্দা টাঙানো—এবং জানলা দরজা সব বন্ধ বলেই ঘরের মধ্যে বদ্ধ

শক্তির নীলাভ গোটা দুই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছিল। সেই নীলাভ আলোই ঘরের মধ্যে একটা আলো-ছায়ার সৃষ্টি করছিল।

ঘরের মেঝেতে পুরু দামী কার্পেট বিছান। ঘরের মধ্যে গোটা কয়েক পুরাতন আমলের ভারী ও কারুকার্য্য করা সোফা কৌচ ছিল।

ওদের সাড়া পেয়ে সুশীল মুখার্জী থানার অফিসার ইন্‌চার্জ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়—ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসে নবাব সাহেবের জবানবন্দী নিচ্ছিল বোধ হয়।

সুশীল মুখার্জী বলে, আসুন স্যার—

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই প্রথম কথা কিরীটী বললে, ঘরে এ ছাড়া আর আলো নেই?

আছে—

ভরাট পুরুষ গলায় শোনা গেল।

তারপর সেই কণ্ঠস্বরই বললে, মেহের—বড় আলোটা জ্বালিয়ে দাও।

ঘুট করে একটু পরে একটা শব্দ হলো ও সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত কক্ষটা উদ্ভাসিত ও দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আর আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েই এক বোরখা-পরিহিতা নারীমূর্তি ঘর ছেড়ে মধ্যবর্তী দরজা-পথে পর্দা ঠেলে অন্তর্হিত হয়ে গেল নিঃশব্দে। নারীমূর্তিকে যেন ভাল করে দেখা গেল না।

তারপর চোখ ফেরাতেই দেখা গেল—সামনে সোফায় আর একজন পুরুষ বসে আছেন। বয়েস হয়েছে—পরণে তাঁর পায়জামা ও চুড়িদার পাঞ্জাবি। উঁচু লম্বা—বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। গায়ের রঙ একেবারে টক্‌টকে গৌর। চোখে কালো কাঁচের চশমা। মাথার চুল লালচে—কোঁকড়া কোঁকড়া।

মানিক চাটুয্যে বলে, মিঃ রায়, ইনিই নবাব সাহেব—

কিরীটী হাত তুলে নমস্কার জানাল নবাব সাহেবকে, নবাব সাহেব প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, বসুন।

পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন নবাব সাহেব।

কিরীটী সামনেই একটা খালি কৌচের উপর উপবেশন করে।

তার দু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু তখন নবাব সাহবের উপরেই স্থির-নিবদ্ধ।

মানিক চাটুয্যে বলেছিল, নবাব সাহেবের বয়স সত্তর বাহাত্তরের নীচে নয়—কিন্তু শরীরের বাঁধুনী এবং মুখের চামড়ার মসৃণতা দেখলে মনে হবে বুঝি বয়স এখনো ষাটের কোঠায় যায়নি।

মোটা মোটা হাতের আঙুল। দু'হাতের আঙুলে গোটা চারেক আংটি—তার মধ্যে বাম হাতের অনামিকার আংটিটা হীরার বোধ হয়। ঘরের আলোয় হীরাটা ঝিলমিল করছিল। বেশ বড় আকারের হীরাটা। একটা বড় কাবুলী মটরের চাইতেও আকারে বড় হবে।

নবাব সাহেব কিরীটীকে 'বসুন' বলে আহ্বান জানানোর পর হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে আকস্মিক স্তব্ধতা নেমে এসেছিল।

সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ হলো আবার নবাব সাহেবেরই সেই ভরাট পুরুষ-গলায়।

চ্যাটার্জী সাহেব, মৃতদেহটা আর কতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে ফেলে রাখবেন—নিয়ে গিয়ে আপনাদের যা করণীয় করা হয়ে গেলে জাহানের শেষ কাজটা আমি শেষ করে ফেলতে চাই—

কথাগুলো বলতে বলতে নবাব সাহেবের চোখের দৃষ্টি মনে হলো যেন তাঁর চোখের চশমার কালো কাঁচ ভেদ করে কিরীটীর উপরে গিয়ে মুহূর্তের জন্য পতিত হলো—তারপরই যেন একটু অস্বোয়াস্তি ভাব—

ডান হাতটা কোলের উপর তুলে নিয়ে প্রথমে পরিধেয় জামার ভাঁজটা ঠিক করতে লাগলেন, তারপর পকেটে হাতটা চালিয়ে যেন কি খুঁজতে লাগলেন।

আর ঠিক ঐ সময় ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা—যেখানে একটা ভারী দামী পর্দা ঝুলছিল সেই পর্দাটা ঠেলে বোরখা-পরিহিতা এক নারীমূর্তি হাতে রূপার ট্রে—তার উপরে একটা কাঁচের গ্লাস বসান—ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

॥ বার ॥

নবাব সাহেব সেই পদশব্দে দরজার দিকে তাকালেন।

কিরীটী চিনতে পারে এ সেই বোরখা-পরিহিতা নারীমূর্তি যে কিছুক্ষণ আগে আলো জ্বেলে দিয়ে ঐ ঘর থেকে চলে গিয়েছিল। বোরখা-পরিহিতা নারী ট্রে হাতে নবাব সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল।

রূপার ট্রের উপরে একটা দামী ইটালীয়ান কাট-গ্লাসের গ্লাস—তার মধ্যে অর্ধেকটা সোনালী রঙের তরল পদার্থ টল টল করছে। নবাব সাহেব ডান হাতটা বাড়িয়ে গ্লাসটা তুলে নিলেন—একেবারে সোজা ওষ্ঠের সামনে। তারপর এক চুমুকে সমস্তটুকু তরল পদার্থ নিঃশেষে পান করে গ্লাসটা ট্রের উপরে নামিয়ে

রাখলেন।

কিরীটী তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বোরখা-পরিহিতা নারীর দুটি সুডৌল—গৌর কোমল অনাবৃত বাহুর দিকে। অমন সুঠাম পেলব বাহু সচরাচর বড় একটা নজরে পড়ে না। চাঁপার কলির মত যেন সরু সরু আঙুল—মেহেদী রসে রাঙানো হাতের পাতা ও আঙুল।

বোরখার দুটি ছিদ্র পথে দুজোড়া কালো চোখ দেখা যায় স্পষ্ট।

কিরীটীর দৃষ্টির সঙ্গে যেন মিলিত হলো মুহূর্তের জন্য—তারপরই বোরখা-পরিহিতা নারীমূর্তি ধীর শান্ত পায়ে ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চলে গেল পর্দার অন্তরালে ট্রেটা হাতে।

কিরীটী ঘুরে তাকাল নবাব সাহেবের দিকে।

প্রশ্ন করল, নবাব সাহেব—ও কি আপনার দাসী?

হ্যাঁ—

বলছিলাম ঐ মেয়েটি কে—বাড়ীর দাসী?

দাসী—না না—হ্যাঁ, মানে দাসী—না ঠিক তা নয়—

তবে মেয়েটি কে?

মেহের—মেহেরুন্নিসা—আসলে কি জানেন—ওকে আমার এ্যাটেনডেণ্ট্ও বলতে পারেন। ইদানীং ও এখানে আসবার পর থেকে আমাকে দেখা শোনা সবই ও করে।

খুব বেশী দিন বোধহয় এখানে উনি আসেননি? কারণ কুলসম ও মোতির কাছে ওর সম্পর্কে কিছু শুনলাম না।

কিরীটী নবাব সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে আবার।

না, না—ও তো সব সময় এখানে থাকে না—মধ্যে মধ্যে আসে। এবারে কয়েকদিন আগে এসেছে আর যায়নি—বুঝলেন কিনা যেতে দিই নি—মেয়েটা আমার habits—কখন কি দরকার না দরকার এসব বুঝে ফেলেছে। ও চলে গেলে আমার ভারী অসুবিধা হয়।

তা তো হবারই কথা—কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

হ্যাঁ—মেহের ভারী বুদ্ধিমতী—চালাক চতুর—

আপনার সঙ্গে ওর কোন রকম আত্মীয়তা আছে?

আত্মীয়তা—না, না—সে রকম কিছু নেই—তবে—

তবে?

এই সামান্ত পরিচয় আর কি!

হুঁ—

কিরীটী মৃদু হাসলো।

হাসিটা এত মৃদু—এত ক্ষণস্থায়ী যে কারো নজরে পড়ে না।

নবাব সাহেব!—কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে।

বলুন—

ছোট বেগম সাহেবা অর্থাৎ—জাহানারা বেগমের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?

সন্দেহ—

হ্যাঁ—কারণ—আমাদের মনে হচ্ছে—

কি—কি মনে হচ্ছে?

এই বাড়ির মধ্যেই কেউ তাঁকে হত্যা করেছে। বাইরের কেউ নয়।

বাড়ির মধ্যে কেউ! কি বলছেন আপনি—কে তাকে হত্যা করবে, কেনই বা করবে?

তা জানি না, তবে আমাদের ধারণা তাই। কিরীটী বলে শান্ত কণ্ঠে।

না না—তা কি করে হবে?

আচ্ছা, আপনার ভাগ্নে নাসির হোসেন সাহেব—

নাসির!

হ্যাঁ—তাঁর সঙ্গে জাহানারা বেগমের সম্পর্কটা কেমন ছিল বলে আপনার মনে হয়?

অবিশ্যি জাহানের সঙ্গে নাসিরের এ বাড়ির মধ্যে সব চাইতে বেশী ভাব ও হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তাই বলে—না না, সে রকম কিছু থাকলে—

আপনি টের পেতেন—স্বাভাবিক। আচ্ছা, নাসির হোসেন সাহেবকে তাঁর সিনেমার ব্যাপারে যে বেগম সাহেবা মধ্যে মধ্যে ওঁকে অর্থ সাহায্য করতেন আপনি তা জানেন?

কি—কি বললেন? জাহান—নাসিরকে সাহায্য করত—টাকা দিত তার সিনেমার ব্যাপারে!

আমার তাই মনে হয়।

অর্থ সাহায্য করত জাহান—অথচ ঘুণাক্ষরে আমি তা জানতে পারিনি!

কথা বলতে বলতে মনে হলো যেন নবাব সাহেব রীতিমত উত্তেজিত হয়ে

উঠেছেন।

কিরীটী নবাব সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নবাব সাহেব বলতে থাকেন, শয়তান—একটা শয়তান—দুমুখো সাপ—দুদিক দিয়ে শুষেছে।

॥ তের ॥

এখন বুঝতে পারছি, কিরীটী বলে, বেগম সাহেবা তো তাঁকে অর্থ সাহায করতেনই এবং আপনিও করতেন।

দিয়েছি, নিশ্চয়ই দিয়েছি—কিন্তু ও যে জাহানের কাছ থেকেও টাকা নিয়েছে বা নিচ্ছে, যদি একবারও জানতাম—এখন বুঝতে পারছি—

কি বলুন তো!

ও আমার সর্বনাশ করবার জন্য সব দিক দিয়ে বদ্ধপরিকর হয়েছিল—

নবাব সাহেবের কথাটা শেষ হলো না।

বাধা পড়লো—বোরখায় আবৃতা মেহের পুনরায় ঘরে এসে প্রবেশ করে নবাব সাহেবের সামনে ট্রে ধরল।

ট্রেতে কাঁচের গ্লাসে পূর্বের মত সোনালী তরল পদার্থ।

কিরীটীর মনে হলো যেন ঠিক ঐ সময়—ঐ মুহূর্তে ঐ পানীয়ের জন্য নবাব সাহেব প্রস্তুত ছিলেন না। ঐ সময় ঐ পানীয় যেন অপ্রত্যাশিত—একটু যেন থতমতও খেয়ে গেলেন।

পানীয়টা গ্রহণ করবেন কি করবেন না সে কারণে যেন খানিকটা দ্বিধাও প্রকাশ পায়। তারপরই মনে হলো মেহের যেন চাপা স্বরে নবাব সাহেবকে কি ফিস ফিস করে বললে।

নবাব সাহেব বারেকের জন্য একবার আড়চোখে—যেন মনে হলো ঘরের মধ্যে বিশেষ করে প্রশ্নকারী কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে পানীয়টা নিঃশেষ করে গ্লাসটা আবার ট্রের উপরে নামিয়ে রাখলেন।

মেহের পুনরায় ধীর পদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা।

মিঃ চ্যাটার্জী—মানিকবাবু—

নবাব সাহেবের ডাকে চ্যাটার্জী মুখ তুলে তাকালো।

আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন—এবারে যদি আপনারা এ ঘর থেকে যান তো আমি একটু বিশ্রাম নিতে পারি—

নিশ্চয়ই। আপনাকে আমরা আর বেশীক্ষণ বিরক্ত করব না নবাব সাহেব—আর দু-চারটে কথা আমাদের জানবার আছে, জানা হলেই আপাততঃ আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন হবে না।

কিরীটী কথাগুলো বললে।

নবাব সাহেব কিরীটীর মুখের দিকে পুনরায় তাকালেন।

কাল রাত্রে কখন আপনি হলঘর থেকে বের হয়ে আসেন ?

আমি ?

হ্যাঁ।

তাড়াতাড়িই চলে এসেছিলাম—বোধ হয় তখন রাত দশটা হবে—

আপনি যখন হলঘর থেকে উঠে আসেন ছোট বেগম সাহেবা তখন সে ঘরে তাহলে একাই বসে গান গাইছিলেন ?

হ্যাঁ।

গানের মাঝখানে উঠে চলে এলেন বেগম সাহেবা, কিছু বলেননি ?

না—সেই তো বলেছিল উঠে আসতে—

হুঁ—আচ্ছা বাইরে দাসী মোতিকে আপনি বসে থাকতে দেখেছিলেন কি ঐ সময় ?

ঠিক লক্ষ্য করিনি।

ফিরে এসে আপনি কি করলেন ?

শুয়ে পড়ি।

সঙ্গে সঙ্গেই ?

হ্যাঁ।

মেহের তখন কোথায় ছিল ?

মেহের—মেহের আমার ঘরেই ছিল।

রাত্রে বুঝি মেহের আপনার ঘরেই থাকত ?

হ্যাঁ—মানে—না,—মেহের আমার ঘরে থাকবে কেন

তবে সে কোথায় থাকত ?

মেহের তো নীচের মহলেই একটা ঘরে থাকে।

আচ্ছা নবাব সাহেব—বেগম সাহেবাদের কোন মাসোহারার ব্যবস্থা নেই?

আছে বৈকি।

কত করে পেতেন তাঁরা?

সবাই মাসে হাত-খরচ পাঁচশো টাকা করে পায়—তাছাড়া প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট একটা করে আছে।

জাহানারা বেগমের সেই অ্যাকাউন্টে বোধ হয় সবার চাইতে বেশী টাকা ছিল?

হ্যাঁ।

কত আন্দাজ হবে?

তা লাখ খানেক হবে।

অত টাকা আপনি দিয়েছিলেন?

না—দিয়েছিল আমার ফুপু—আসগরী বেগম—তার ব্যক্তিগত বহু টাকা ছিল পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। মরবার আগে সাত মাস ফুপু প্যারালিসিস হয়ে পড়ে ছিল সেই সময় জাহান তাকে সেবা করেছিল।

তাইতেই বুঝি তিনি ঐ টাকা তাঁকে দিয়ে যান?

হ্যাঁ—তাই তো শুনেছি।

আপনার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে কত টাকা হবে?

কত আর, দশ বিশ হাজার থাকে তো যথেষ্ট—ব্যবসায় টাকা খাটে—আসে যায়—

কিসের ব্যবসা আপনার?

প্রধানত—কয়লার খনি—

আপনার কয়লার খনি আছে?

হ্যাঁ—দুটো।

॥ চোদ্দ ॥

রোশন আলী আপনার একমাত্র ছেলে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

তিনি তো এখানে থাকেন না?

না—তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি—একটা স্কাউনড্রেল।—রীতিমত আক্রোশ যেন ফুটে ওঠে কথা বলতে বলতে নবাব সাহেবের কণ্ঠস্বরে।

তিনি কখনো আসেন না এখানে?

না।

কিছু যদি মনে না করেন—তাঁর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হল কেন?

তাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করেছি—তার কথা আর বলবেন না।

আমি কিন্তু আপনার ছেলে রোশন আলী সাহেবকে চিনি।

আপনি চেনেন তাকে?

হ্যাঁ—অনেক দিন থেকেই।

আপনি চেনেন রোশেনকে? আবার প্রশ্ন করেন নবাব সাহেব।

হাঁ—তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বও আছে।

ও:।

আচ্ছা নবাব সাহেব, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছি, যদি অনুগ্রহ করে পাশের ঘরে মেহেরকে একটিবার পাঠিয়ে দেন—

নবাব সাহেব কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর প্রশ্ন করলেন মেহেরকে?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আপনাদের কি প্রয়োজন? নবাব সাহেব আবার প্রশ্ন করেন।

তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

প্রশ্ন?

হ্যাঁ।

কি প্রশ্ন?

সে তাকেই করব।

ও—বেশ আমি তাকে ডাকছি।

নবাব সাহেব অতঃপর মেহেরকে ডাকলেন। এবং নবাব সাহেবের ডাকে মেহের একটু পরে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

মেহের, এঁরা তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে চান—

মেহের হাঁ বা না কোন সাড়া দিল না। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

আপনার নাম তো মেহেরউন্নিসা? কিরীটী প্রশ্ন করে।

মেহের পূর্ববৎ নীরব। কোন সাড়া নেই।

আপনি কাল রাত্রে আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

মেহের পূর্ববৎ নীরব।

চুপ করে থাকলে চলবে না মেহেরউন্নিসা—জবাব দিতে হবে। বলুন—কিরীটী বলে।

কোথায় আর থাকবে, বললেন নবাব সাহেব, নীচের মহলে ছিল।

না।

কিরীটীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চকিতে ফিরে তাকান নবাব সাহেব ওর মুখের দিকে।

উনি ছিলেন আপনার ঘরে।

আমার ঘরে!

হ্যাঁ, আপনার ঘরে।

কিন্তু—

হ্যাঁ, শুধু আপনার ঘরেই নয়। কাল রাত্রে কোন এক সময় উনি হলঘরেও গিয়েছিলেন আপনি হলঘর থেকে চলে আসবার পর।

হলঘরে গিয়েছিল মেহের—কাল রাত্রে আমি চলে আসবার পর! কি বলছেন আপনি যা-তা! ও আগাগোড়া আমার ঘরেই ছিল।

নবাব সাহেব প্রতিবাদ জানান জোরালো গলায়।

না, সব সময় ছিলেন না, আমি বলছি।

আপনি—

এই যে দেখুন—বলতে বলতে কিরীটী একটুখানি কালো রেশমী কাপড়ের অংশ পকেট থেকে বের করে নবাব সাহেবের চোখের সামনে তুলে ধরল।

॥ পনেরো ॥

এটা—এটা কি? নবাব সাহেব প্রশ্ন করেন।

এটা কি বুঝতে পারছেন না নবাব সাহেব—এটা মেহেরউন্নিসার বোরখার একটি ছেঁড়া অংশ। এটা কোথায় পেয়েছি জানেন? হলঘরের মধ্যে ক্ষুপুর ঘরের দরজার গায়ে একটা ছোট পেরেক উঠে আছে, সেই পেরেকে লেগে ছিল। সম্ভবতঃ বাথরুম পথে আসবার বা যাবার সময় তাড়াতাড়িতে বোরখাটা পেরেকে লেগে ছিঁড়ে যায়। আর সেই সময়—

মেহেরের বোরখা? নবাব সাহেব যেন বোকার মতই প্রশ্নটা করেন।

হ্যাঁ, দেখুন না—পরীক্ষা করে। ওঁর হাতের কাছে বোরখাটা—উনি হাত তুললেই চোখে পড়বে।

কেমন যেন বোকার মতই নবাব সাহেব মেহেরের দিকে তাকালেন আবার।

উনি দু-দুবার ট্রে হাতে করে এ ঘরে যখন এসে ঢোকেন তখনই আমার দৃষ্টিতে ব্যাপারটা পড়েছে।

না! এতক্ষণে মেহেরউন্নিসা কথা বলে।

সকলেই যুগপৎ ওর দিকে তাকায়।

আমার বোরখা ছেঁড়াই ছিল, তা ছাড়া এটা আমার বোরখা নয়।

আপনার নয়?

না।

তবে কার বোরখা?

মোতির।

মোতির—মানে জাহানারা বেগমের খাস দাসীর?

হ্যাঁ।

মোতির বোরখা আপনি পরেছেন?

হ্যাঁ।

দয়া করে বোরখাখানা খুলবেন কি—

কথাটা শেষ হলো না কিরীটীর। সহসা মেহের তার মুখ থেকে বোরখাখানা খুলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী যেন চমকে ওঠে।

এ সেই মুখ—চকিতে আরশিতে দেখা সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি।

কিরীটী যেন বোবা। সত্যিই অপরূপ সুন্দরী মেহেরউন্নিসা।

বয়স খুব বেশী হবে না। চব্বিশ কি পঁচিশ—তার চাইতেও কম হতে পারে। কিন্তু—ঐ মুখ—ঐ মুখখানি না হলেও ঠিক অমনি একখানি মুখ কিরীটী যেন কোথায় দেখেছে।

কোথায়—কোথায় দেখেছে! হঠাৎ কি যেন একটা মনে পড়ে কিরীটীর। সে বলে, এক্সকিউজ মি—এক—সেকেণ্ড আমি আসছি।

কিরীটী দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সোজা গেল হলঘরে। ঢুকে দেখল মৃতদেহটা তখনো সেখানে তেমনিই পড়ে আছে।

মৃতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে কিরীটী পুনরায় নবাব সাহেবের ঘরে ফিরে এল।

ঘরের মধ্যে তখনো ঠিক তেমনিই সব দাঁড়িয়ে।

মানিক চাটুয্যে, সুশীল মুখার্জী, মেহেরউন্নিসা, আর বসে নবাব আসগর আলী সাহেব।

॥ ষোল ॥

মেহেরউন্নিসার দিকে তাকিয়ে কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন শুরু করে।

দেখুন আপনি কি কখনো সিনেমায় নেমেছেন, কোন ছবিতে?

মেহেরউন্নিসা কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ।

এখন মনে পড়েছে। কোন একটা কাগজে আপনার ছবি কয়েকদিন আগেই মাত্র দেখেছি। কিরীটী বলে।

চিত্রালীতে—চিত্রালী আমার ছবি ছেপেছে কিছুদিন আগে।

মেহেরউন্নিসা মৃদুকণ্ঠে বলে।

জাহানারার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

সে—

বলুন কি সম্পর্ক? আপনাদের সঙ্গে যে রক্তের তাঁর সম্পর্ক আছে বুঝতে পেরেছি, অতএব ঢাকবার চেষ্টা করবেন না।

সে আমার দিদি।

দিদি! মায়ের পেটের বোন আপনার?

হ্যাঁ।

কতদূর লেখাপড়া করেছেন আপনি?

আমি গত বৎসর বি. এ. পাশ করেছি।

কোন্ কলেজ থেকে?

বহরমপুর থেকে।

সেখানেই বরাবর থাকতেন?

হ্যাঁ, আমাদের কাকার কাছেই সেখানে থাকতাম।

কলকাতায় এসে অবধি এখানে, কলকাতায় কতদিন এসেছেন?

মাস ছয়েক হল।

এখানেই, মানে এই বাড়িতেই নিশ্চয়ই আছেন।

না, মধ্যে মধ্যে আসি। থাকি আমি শ্যামবাজার—আমার এক মাসীর কাছে।

কটা বইতে অভিনয় করেছেন?

খান তিনেক বইতে।

সবটাতেই নায়িকা?

না, শেষটায় নায়িকা।

হুঁ—আচ্ছা বোরখা ব্যবহার করা আপনার অভ্যাস নয়—তাই না

আমি বোরখা ব্যবহার করি না।

তবে যে বোরখা এখন পরেছিলেন?

মেহেরউন্নিসা চুপ। বোবা।

আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে চাননি তাই কি?

মেহেরউন্নিসা নীরব।

মানিকবাবু!

আজ্ঞে?

মোতি দাসীকে ডাকুন তো একবার।

মানিক চাটুয্যে তখুনি বের হয়ে গেল।

মেহেরের দিকে অতঃপর তাকিয়ে কিরীটী বলে, একটা কথার সত্যি জবাব দিন—আপনার এখানে এ ভাবে আসা—আপনার দিদি নিশ্চয়ই পছন্দ করছিলেন না—

মেহেরউন্নিসা পূর্ববৎ নীরব।

অবিশ্যি পছন্দ না করারই কথা—বিশেষ করে যখন তিনি চোখের উপরে নবাব সাহেবের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা—

এসব আপনি কি বলছেন? কিরীটীকে বাধা দিলেন নবাব সাহেব।

কথাটা কি মিথ্যা বলেছি নবাব সাহেব?

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল কিরীটী। কণ্ঠস্বর তার তীক্ষ্ণ, আপনার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা একটা নেই বলতে চান—অস্বীকার করতে চান আপনি কথাটা এখনো?

অত স্পষ্ট করে কিরীটী মুখের উপর কথাটা বলবে হয়ত ভাবতে পারেননি নবাব সাহেব।

মোতি এসে ঘরে ঢুকল ঐ সময়।

নবাব সাহেব তখন চুপ করে আছেন।

মোতি!

বাবুজী?

ঐ বোরখাটা তোমার?

হঠাৎ যেন কেমন থতমত খেয়ে যায় মোতি—ফ্যাল ফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে তাকায়।

কি—চুপ করে আছ কেন, জবাব দাও?

কিরীটী ধমকে ওঠে মোতিকে।

বল—তোমার কি না?

জী।

তোমার?

জী।

কখন দিয়েছ ওঁকে?

আপনার আসবার পর।

মানে আজই সকালে—কিছুক্ষণ আগে?

জী।

মোতি!

বাবুজী?

তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ। ঝুট্ বলেছ—

মিথ্যা—ঝুট্ বলেছি?

হ্যাঁ—তুমি বলনি কাল রাত্রে—রাত বারোটার পর নবাব সাহেব হলঘর থেকে বের হয়ে যান?

জী—ঠিকই তো বলেছি।

কিন্তু নবাব সাহেব বলছেন রাত দশটায় তিনি বের হয়ে গিয়েছিলেন হলঘর থেকে।

নেহি বাবুজী নেহি—ঝুট্—নবাব সাহেব রাত বারোটায়ই—

॥ সতেরো ॥

মোতির কথাটা শেষ হল না—হঠাৎ যেন বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন নবাব সাহেব, এই হারামজাদী—আবার মিথ্যা কথা বলছিস—

মিথ্যে ওকে শাসিয়ে কোন লাভ হবে না নবাব সাহেব—যা সত্য তা ওর মুখ দিয়ে আগেই বের হয়ে গিয়েছে—

না, না—ও ঝুট্ বলছে।

ঝুট্ ও বলেনি কারণ রাত দশটায় আপনি হলঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন সত্য—এবং আপনি ভেবেছিলেন সে সময়—ও আপনাকে হলঘর থেকে বের হতে দেখতে পেয়েছে—আপনার গতরাত্রে হলঘর থেকে রাত দশটায় বের হয়ে যাবার সাক্ষীও রইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনার মোতি সেটা দেখতে পায়নি—কারণ দেখবার মত অবস্থা তখন তার ছিল না। সিদ্ধির নেশায়—জল-বৃষ্টির ঠাণ্ডায় তখন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল—তারপর আবার আপনি ঐ হলঘরে গিয়ে যখন দ্বিতীয় বার ঢোকেন—রাত বারোটার কিছু আগে কোন এক সময় ঝুপুর ঘর থেকে—এবং যে সময় আপনার গায়ে ছিল ঐ বোরখাটা—

কি—কি সব বলছেন—পাগলের মত—

নবাব সাহেব প্রতিবাদ জানালেন বটে কিন্তু তাঁর গলার স্বর যেন কেমন

নিস্তেজ—কেমন ঠাণ্ডা—প্রতিবাদের তীব্রতা নেই সে কণ্ঠস্বরে তেমন যেন।

আমি যে মিথ্যা কিছু বা পাগলের মত কিছু এলোমেলো বকছি না—তা আপনার চাইতে বেশী কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় নবাব সাহেব। শুনুন—হলঘরে ঢুকতে গিয়েই বোরখাটা আপনার পেরেকে বেঁধে ছিঁড়ে যায়—এবং তারপর যে কোন কারণেই হোক বোরখা খুলে রেখে আপনি যখন পরে নিশ্চিন্তে ঘর থেকে বের হয়ে যান মোতি ঘুমিয়ে আছে ভেবে অত রাত্রে—দুর্ভাগ্য আপনার সেই মুহূর্তে মোতির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এবং সে আপনাকে দেখতে পায়—

কিরীটীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ—ঋজু।

সে বলতে থাকে, ধর্মের কল এমনি করেই বাতাসে নড়ে নবাব সাহেব, এমনি করেই আমাদের গুণাহের মাশুল খোদাতালার কাছে তামাম শোধ করতে হয়, নচেৎ আপনিই বা বোরখাটা রেখে পরম নিশ্চিন্তে হলঘর থেকে বের হয়ে আসবেন কেন, আর ঠিক ঐ সময়টিতে অতিরিক্ত পরিমাণ সিদ্ধি খাওয়া সত্বেও মোতির ঘুমটা ভেঙে যাবে কেন এবং আপনি ওর চোখে পড়ে যাবেনই বা কেন—আবার মেহেরউন্নিসাই বা আপনাকে বাঁচাতে কোন এক সময় আপনার ফেলে আসা বোরখাটা হলঘর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন কেন?

নবাব সাহেব হঠাৎ যেন স্থান কাল পাত্র ভুলে সম্বিৎ হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে—get out—উঠে দাঁড়ান বলতে বলতে নবাব সাহেব।

বেরিয়ে আমি যাচ্ছি, কিন্তু মানিকবাবু আপনাকে নিষ্কৃতি দেবেন না, জাহানারা বেগমের হত্যাপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করবেন।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

নবাব সাহেব হঠাৎ ধপ্ করে আবার বসে পড়লেন সোফার উপ

মানিকবাবু—জাহানারার হত্যাকারী উনি। কিরীটী বলে ওঠে।

হঠাৎ পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠলেন নবাব সাহেব।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি—আমিই হত্যা করেছি জাহানকে।

॥ আঠেরো ॥

ফেরার পথে কিরীটী মানিক চাটুয্যেকে বলছিল।

দুটো—দুটো মারাত্মক ভুল করেছিলেন নবাব সাহেব—এক ঐ মোতির বোরখা ব্যবহার করে তার ঘাড়ে দোষটা চাপাবার চেষ্টা করে—দ্বিতীয়—জাহানারার হাতের আঙুল থেকে হীরার আংটিটা খুলে নিয়ে এসে—লোভের বশে।

কিন্তু কি করে আপনি বুঝলেন মিঃ রায় যে নবাব সাহেবই—

হত্যাকারী—তাই না, ছোরাটা যে ভাবে আমূল বুকের মধ্যে বিঁধে ছিল সেটা কোন স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কোন শক্তিমান পুরুষেরই কাজ। এ বাড়িতে এক পারবেন নবাব সাহেব—দুই নাসির হোসেন, কিন্তু নাসির হোসেন স্বর্ণডিম্বপ্রসূ জাহানারাকে হত্যা করতে যাবে কেন, জাহানারা তাকে অর্থ জোগাত আর তার সঙ্গে নাসিরের পীরিতও ছিল।

কিন্তু কেন—কেন হত্যা করলেন নবাব সাহেব তাঁর প্রিয় বেগমকে?

এখনো সেটা বুঝতে পারেননি—

না।

মেহেরের জন্য।

মেহের?

হ্যাঁ—ঐ মেহেরের জন্যই। অতিরিক্ত নারীলোভী নবাব সাহেবের যখনই মেহেরের উপর নজর পড়েছিল জাহানারা সম্ভবতঃ প্রতিবাদ জানিয়েছিল—সংঘর্ষ বেধেছিল সেই মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে—যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে অমন করে প্রাণ দিতে হল ··

কিন্তু কি ভাবে হত্যা সংঘটিত হয়েছিল বুঝলেন কি করে?

ঐ বাড়ির দোতলায় একটা নকসা মনে মনে ছকে নিন, তাহলেই ব্যাপারটা আপনার কাছে সহজ হয়ে আসবে। অবশ্য আমি ব্যাপারটা নবাব সাহেবকে সন্দেহ করে মোটামুটি অনুমান করেছিলাম—কারণ ঐ ভাবে ছাড়া হত্যা করা সম্ভবপর ছিল না।

কিরীটী চুপ করল।

ঘুম ভাঙার রাত

সেই বেলা একটা থেকে কিরীটী যে কি এক ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজল্‌ নিয়ে পড়েছে, তা ওই জানে !

ইদানীং দেখছি, কিছুদিন ধরে ঐ এক খেয়াল ওর মাথায় চেপেছে। দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘুমনো আর খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা যেন ওর আর কোন কাজ নেই। এমন কি—অত সাধের বাগান ও পাখীর দিকেও ওর নজর নেই আজকাল। চিরদিনের খেয়ালী তো, এক-এক সময় এক-এক খেয়াল মাথায় চাপে।

একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, কি রে ! রাতারাতি ধনী হবার মতলব করেছিস নাকি—ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজল্‌ সল্‌ভ করে ?

মৃদু কণ্ঠে কিরীটী জবাব দিয়েছিল, না। কমন-সেন্সটা ঠিক আছে কিনা তাই ঝালিয়ে দেখি মাঝে মাঝে।

ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজল্‌ নিয়ে কমন-সেন্স ঝালানো—অভিনব বটে ! হেসে জবাব দিয়েছিলাম।

চেষ্টা করে দেখিস সুব্রত, ব্রেনের গ্রে সেলগুলো বেশ ঝরঝরে হয়ে ওঠে ক্রসওয়ার্ড পাজল্‌ সল্‌ভ করতে করতে।

ঘাঁটিয়ে কোন লাভ নেই দেখে আমিও কথা বাড়াইনি।

আজও দ্বিপ্রহরে ওর বাসায় গিয়ে দেখি, যথারীতি ও ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজল্‌ নিয়েই মশগুল ; আমি কটা মাসিক নিয়ে মনঃসংযোগের চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু তারও সাধ্য কি ! ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ, মাথার উপরে প্রচণ্ড বেগে ফ্যান ঘুরছে, তবু মনে হচ্ছিল যেন ঘর জুড়ে একটা তপ্ত আগুনের হল্‌কা বইছে। দিনের বেলায় ঘরের জানলা-দরজা এঁটে রাখায় ঘরটা অন্ধকার হয়ে পড়ায় ফ্লোরোসেন্ট টিউব ল্যাম্পটা জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল।

কৃষ্ণা এসে ঘরে প্রবেশ করল—জংলীর হাতে চায়ের ট্রে ও প্লেট ভর্তি প্লাম কেক নিজের হাতে নিয়ে। সত্যি, বসে বসে মুখ বুজে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

সানন্দে কৃষ্ণাকে আহ্বান জানালাম, এস বৌদি ভাই। Just in time.

চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপরে গোছাতে গোছাতে কৃষ্ণা বললে, এবার আলোটা নিভিয়ে জানলাগুলো খুলে দাও তো ঠাকুরপো। বাইরে চমৎকার মেঘ করেছে।

সত্যি ! বলতে বলতে উঠে গিয়ে জানলা খুলে দিতেই ঠাণ্ডা একটা হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে যেন চোখে মুখে একটা স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপ দিয়ে গেল। আঃ !

সত্যিই সমস্ত আকাশটা ইতিমধ্যে কখন এক সময় মেঘে মেঘে একেবারে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। আকাশ জুড়ে অপরূপ মেঘপুঞ্জের কি মনোরম দৃশ্য।

দূরে কোথাও নিশ্চয় বৃষ্টি নেমেছে, তারই আর্দ্রতা বাতাসে

হঠাৎ কৃষ্ণার উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে এল, দেখ, সত্যি বলছি, তোমার ঐ ভূতুড়ে ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজল্‌ যদি না থামাও, একসময় সমস্ত নিয়ে গিয়ে আমি ডাস্টবিনে ফেলে আসব !

রুষ্টা কেন দেবি ! এ তো নীরস শুষ্ক কতকগুলো কাগজ মাত্র !—কিরীটী জবাব দেয় হাত গুটোতে গুটোতে।

ঠিক বলেছ বৌদি, আমিও তোমার সঙ্গে একমত। বলতে বলতে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

বাবাঃ, এ যে একেবারে সাঁড়াশী-আক্রমণ ! কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, একেবারে একযোগে দু'দিক থেকে !

বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমেছে।

কয়েকদিন একটানা অসহ্য গুমোট গ্রীষ্মের পর বাইরের বৃষ্টি ও জলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘরের মধ্যে আমাদের চায়ের আসরটা জমে উঠতে দেরি হয় না। জংলী এসে এমন সময় ঘরে ঢুকল।

একজন বাবু এসেছেন। বলছেন বিশেষ জরুরী দরকার। দেখা করতে চান।

এই বৃষ্টিতে আবার কে 'বাবু' এল ? সুব্রত, যা দেখে আয়, বোধ হয় তোরই কোন বন্ধুজন—আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটী কথাগুলো বলে।

এবারেই ঠিক বলেছিস। কিরীটী রায়ের বাড়িতে এই অসময়ে বৃষ্টি মাথায় করে আমায় খুঁজতে এসেছে। যেতে হয় বাবা তুমিই যাও, আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি। বলতে বলতে তৃতীয় চায়ের পেয়ালায় আমি চুমুক দিই।

কোথা থেকে এসেছেন, কি চান, কাকে চান—জিজ্ঞাসা করেছিলি ভৃত্য ? কিরীটী এবারে জংলীকে জিজ্ঞাসা করে।

না তো।

তবে ?

আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চান। বললেন তো।

যা, এই ঘরেই পাঠিয়ে দে গিয়ে।

জংলী চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাও উঠে দাঁড়ায়, ঠাকুরপো, তুমি কিন্তু ভাই রাত্রে একেবারে খেয়ে যাবে।

যাব অবশ্যই। কিন্তু কেবল মুখে খাওয়ালেই চলবে না। কর্ণেও সুধা বর্ষণ করাতে হবে।

কি, মধু ঢেলে?

না গো না! তোমার ঐ মধুকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-সঙ্গীত!

আচ্ছা সে দেখা যাবে। বলে হাসতে হাসতে কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সিঁড়িতে পদশব্দ পাওয়া গেল। এবং জংলীর পিছনে পিছনে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

নমস্কার।

নমস্কার। আসুন, বসুন—কিরীটী আহ্বান জানাল।

কিরীটীর আহ্বানে ভদ্রলোক সম্মুখের খালি সোফাটার উপরে উপবেশন করলেন।

মিঃ কিরীটী রায়—

আমি। কিন্তু আপনি—আপনাকে তো—

আমার নাম সচ্চিদানন্দ সান্যাল।—ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে বললেন।

ভদ্রলোককে আমি লক্ষ্য করছিলাম।

খড়্গের মত তীক্ষ্ণ ধারালো নাসিকা। ছোট কপাল। গালের মাংস চুপসে গিয়ে দু পাশে হনু দুটো 'ব'-এর মত জেগে উঠেছে। বড় বড় চোখ। চোখের পাতার কোলে একটা কালো ছাপ। মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় দীর্ঘ অত্যাচারের যেন সুস্পষ্ট একটি স্বাক্ষর। বয়স বোধ করি পঞ্চাশের নীচে নয়। এবং সে অনুপাতে চুলে যে রকম পাক ধরা উচিত, তা দেখা যাচ্ছে না। বরং একটু বেশী কালোই। বুঝতে কষ্ট হয় না, কলপের সদ্ব্যবহার করা হয়েছে—সযত্নে পক্ক কেশকে ঢাকা দেবার জন্য। মাথায় পরিপাটি অ্যালবার্ট টেরি। পরিধেয়র মধ্যে একটা নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা যেন স্পষ্ট, বোঝা যায় তাকালেই।

ভদ্রলোক যে একজন বনেদী সৌখীন প্রকৃতির, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। গায়ে ফিনফিনে শ্বেত-শুভ্র আদ্দির পাঞ্জাবি। পরিধানে সরু কালোপাড় চুড়িদার কাচির মিহি ধুতি, গিলে করে কোঁচানো। পায়ে একজোড়া কালো রঙের অ্যালবার্ট শু। ঝকঝকে ব্রাস করা।

গলার অ্যাডামস্ অ্যাপেলটা বিশ্রী ভাবে যেন ঠেলে আছে। হাড়-জাগানো শিরা-বহুল লম্বা লম্বা হাতের আঙুল। দু হাতে গোটা চারেক সোনার আংটি। গায়ের রং প্রথম যৌবনে একদা হয়ত গৌরই ছিল, এখন তামাটে মনে হয়। যেন প্রখর রৌদ্র-তাপে পুড়ে ঝলসে গিয়েছে।

আমার কাছে কি কোন প্রয়োজন ছিল সান্যাল মশাই?—কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। মানে—প্রত্যুত্তরে কথাটা বলে একটু যেন ইতস্ততঃ করেন সচ্চিদানন্দ; তাকান আমার দিকে আড় চোখে।

ওর কাছে আপনার কোন কিন্তুর কারণ নেই সান্যাল মশাই। সুব্রত আমার বন্ধু।

ও, উনিই সুব্রত রায়! নমস্কার।

নমস্কার।

সচ্চিদানন্দ এবারে গলাটা ঝেড়ে যেন একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, দেখুন মিঃ রায়, বিশেষ প্রয়োজনীয় অথচ একটা গোপন ব্যাপারে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।

বলুন।

আমার একটি বিশেষ পরিচিতা—শুধু পরিচিতা বলি কেন, আত্মীয়াও বলতে পারেন—গত আট বছর ধরে তার কোন সন্ধানই করতে পারছি না। অথচ তাকে যেমন করেই হোক খুঁজে বের করা আমার বিশেষ প্রয়োজন। তাই, মানে, আপনার কাছে এসেছি।

কিরীটী বললে, গত আট বছর ধরে যিনি নিরুদ্দিষ্টা, কোন সন্ধান পাননি, তাঁর কি আর কোন সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আপনার মনে হয় সচ্চিদানন্দবাবু?

জানি না, তবে সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। সচ্চিদানন্দ বললেন।

কিন্তু, আপনি তো এ ব্যাপারে পুলিসের সাহায্য নিলেই পারতেন। তারাই—

না। পুলিশের কোন সাহায্যই এ ব্যাপারে আমি নিতে চাই না। তাই ক বছর ধরে নিজেই তাকে সর্বত্র যথাসাধ্য আমরা খুঁজেছি, কিন্তু কিছুতেই তার কোন সন্ধান না করতে পেরে অবশেষে আপনার কাছে এসেছি, কারণ বললাম তো একটু আগে—আমার ধারণা, তাকে আবার খুঁজে পাবই আর আপনি হয়ত তার সন্ধান আমাকে করে দিতে পারবেন।

কিন্তু সান্যাল মশাই—

না—না কিরীটীবাবু, আমার এ উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে। না বললে শুনছি না। অনেকখানি আশা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি। নিরাশ করবেন না দয়া করে।

ভদ্রলোক যেন কাকুতিতে একেবারে ভেঙে পড়লেন।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, শিবানীকে না খুঁজে বের করতে পারলে, মৃত্যুর সময় আমাকে এ জীবনের সব চাইতে বড় দায়িত্বটাই অসমাপ্ত রেখে যেতে হবে। মরেও আমি শান্তি পাব না, কিরীটীবাবু। বলতে বলতে বুক-পকেট থেকে একটা মোটা খাম বের করলেন সচ্চিদানন্দ সান্যাল।

খামের ভিতর থেকে বের করলেন মলিন একটি ফটোগ্রাফ।

ফটোটা খাম থেকে বের করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন। এই সেই শিবানীর ফটো।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে ফটোটি নিয়ে চোখের সামনে ধরল।

সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ের হাফ বাস্ট ফটো।

ফটোটা একটু পরাতন হয়ে লালচে হয়ে গেলেও এখনো বেশ স্পষ্ট। ছড়ানো চুরি রাশ কাঁধের দু পাশ দিয়ে পীনোন্নত বক্ষের উপরে এসে পড়েছে সর্পিল গতিতে। মুখের চেহারার মধ্যে বিশেষ কিছু আকর্ষণীয় না থাকলেও দু চোখে যেন একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। দক্ষিণ ভ্রূর ঠিক নীচে, চোখের পাতার উপর বোধ হয় একটি ছোট্ট কালো তিল।

এই ফটো কতদিন আগেকার তোলা মিঃ সান্যাল?—কিরীটী ফটোটার দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করে।

বছর আষ্টেক আগেকার।

হুঁ। এই ফটো যখনকার, তখন এর—মানে এই মেয়েটির বয়স কত ছিল?

সতেরো-আঠারো হবে।

মনে মনে একটু হিসাব করে কিরীটী বলে, তাহলে বর্তমানে এর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, এই তো?

হ্যাঁ। তাই।

নিরুদ্দিষ্টা হয়েছেন—আপনি বলছেন—ইনি?

হ্যাঁ।

আপনার ধারণা হল কেন যে ইনি নিরুদ্দিষ্টাই হয়েছেন?

মানে—

মানে কেউ হয়ত তাঁকে সরিয়ে ফেলতে পারে বা—

ব্যাপারটা তাহলে গোড়া থেকেই খুলে বলি আপনাকে কিরীটীবাবু।

বলুন।

সচ্চিদানন্দ সান্যাল তখন তাঁর কাহিনী সুরু করলেন :

মেয়েটির নাম শিবানী, সে আপনাকে আগেই বলেছি। বছর বারো আগে শিবানীর মা নারায়ণী পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরী ঐ শিবানীকে নিয়ে হঠাৎ একদিন সকালে ঢাকা থেকে আমার কলকাতার বাড়িতে এসে উঠল। নারায়ণীর বিধবার বেশ। নারায়ণীর স্বামী যতীন আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল। এক গ্রামের স্কুল থেকে দুজনে একসঙ্গে এনট্রান্স পাস করেছি। তারপর আমি কলকাতায় কলেজে এসে ভর্তি হলাম, যতীন ঢাকা কলেজেই পড়তে লাগল। পূজো ও গ্রীষ্মের ছুটিতে দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হত। আই-এ পাস করে আমি বাবার লোহা-লক্কড়ের ব্যবসায় ঢুকি, যতীন কিন্তু পড়াশুনা চালাতে লাগল। বি-এ পাস করে যতীন ওখানেই গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিলে। যতীনের বিবাহের সময় আমি গিয়েছিলাম।

একটা কথা সান্যাল মশাই, আপনি বিয়ে-থা করেননি?

করেছিলাম, দুবার—প্রথমবার যতীনের বিবাহের বছর খানেক আগেই। কিন্তু সে স্ত্রী বেঁচে ছিলেন মাত্র তিন বছর। তারপর আবার—আবার যাকে বিবাহ করি, সে যদিও আজও বেঁচে আছে কিন্তু চিররুগ্না, মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে ভুগছে।

হুঁ। তারপর বলুন।

যতীনের ঐ বিয়ের পর আর একবার মাত্র যতীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; শিবানীর বয়স তখন দু বছর। তারপর আর দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সেই যতীনের বৌকে প্রথমটায় বিধবার বেশ দেখে তাই আমি চিনতে পারিনি।

যতীনের স্ত্রী নারায়ণী বললে, আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না সচ্চিদানন্দবাবু?

বললাম, না—মানে ঠিক চিনতে পারছি না।

আমি নারায়ণী।

নারায়ণী!

তবু চিনতে ঠিক পারি না। আর চিনবই বা কেমন করে, বারো-তেরো

বছর আগেকার কথা তো! বারো-তেরো বছর আগে নারায়ণীর চেহারাটা ছিল প্রথম যৌবনে ঢলঢল বেশ নধর গঠন। গায়ের রংও ছিল টকটকে গৌর। কপালে ছিল সিঁদুরের টিপ। হাতে ছিল শাঁখা ও সোনার চুড়ি। আর এখন সম্পূর্ণ নিরাভরণ, সাদা থান পরিধানে, গায়ের রংও দারিদ্র্য ও অনটনে কেমন যেন জ্বলে গিয়েছে। রোগা কৃশ চেহারা।

এবারে কথা বললে মেয়েই, আমার বাবার নাম যতীন চাটুয্যে। ঢাকা থেকে আসছি আমরা।

কি আশ্চর্য! তাই বল, যতীনের মেয়ে তুমি! বলতে হয় আগে সে কথা! কিন্তু বৌদি—

এবারেও জবাব দিল শিবানী। বললে, তিন বছর হল বাবা মারা গিয়েছেন।

তিন বছর যতীন মারা গিয়েছে! এতদিন তাহলে চলছিল আপনাদের কেমন করে?

নারায়ণী এবারে জবাব দিলেন, কোনমতে চালাচ্ছিলাম সচ্চিদানন্দবাবু। কিন্তু মেয়ে বড় হয়েছে, গ্রামের ব্যাপার জানেনই তো। অতিকষ্টে মা ও মেয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চালালেও মেয়ের বিয়ে দেব এমন সঙ্গতি আমার কোথায়? ত্রি-সংসারে আত্মীয়-স্বজনও এমন কেউ নেই যে, ঐ সোমথ মেয়ে নিয়ে তার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়াব। শেষে মনে পড়ল আপনার কথা। অবশ্য মরবার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন, এ দুনিয়ায় কোথাও আমাদের স্থান না হলেও আপনার কাছে এসে দাঁড়ালে স্থান পাবই।

বললাম, তবে মনে করেননি কেন এতদিন বৌদি?

নারায়ণী বললেন, মনে পড়ত সর্বদাই। কিন্তু দাবি যেখানে টিকবে জানি সেখানেই যে সঙ্কোচ বেশী হয় সচ্চিদানন্দবাবু। তাছাড়া, কোনমতে চালিয়ে যখন নিচ্ছিলাম, তখন কেন মিথ্যে আর আপনাকে এসে বিরক্ত করি! কিন্তু শেষটায় না এসে আর চলল না বলেই চলে এলাম শিবুর হাত ধরে।

বললাম, বেশ করেছেন, আমার যদি দু মুঠো অন্নের সংস্থান হয়, আপনার ও শিবানীরও হবে।

নারায়ণী ও শিবানী আমার ওখানেই থেকে গেল। শিবানীর পড়াশুনা গান-বাজনার ব্যবস্থা করে দিলাম।

বেশ চালাক-চতুর ও চটপটে ছিল মেয়েটা। বছর খানেকের মধ্যেই ঘষা মাজায় মেয়েটা যেন ঝকঝকে হয়ে উঠল।

কিন্তু গোলযোগ স্নরু হল আমার রুগ্না বিকৃত-মস্তিষ্কা স্ত্রী রাধারাণীকে নিয়ে।

কিরীটী আবার বাধা দিল, কেন?

সে লজ্জা ও দুঃখের কথা আর বলবেন না কিরীটীবাবু। শিবানী আমার সন্তান তুল্য, কিন্তু রাধারাণীর অসুস্থ বিকৃত-মনের মধ্যে দেখা দিল শিবানীকে নিয়ে আর এক উপসর্গ। তার ধারণা হল, শিবানীর জন্য আমি লালায়িত হয়ে উঠেছি দিবারাত্র সে আমার ও শিবানীর পিছনে ছায়ার মত spying করতে লাগল ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা! কি লজ্জা! শিবানীর সঙ্গে আমাকে কোন সময়ে কথা বলতে শুনলে এমন বিশ্রী ভাবে চেঁচামেচি শুরু করে দিত যে লজ্জায় আমিই পালাতাম তখন। হাতের কাছে যা-কিছু পেত, ছুঁড়ে-ভেঙে একাকার করে সব তচনচ করে ফেলত। সে এক বিশ্রী পরিস্থিতি। সর্বদা তটস্থ হয়ে বেড়াতাম আমরা। পারতপক্ষে কেউ কারো সামনেই যেতাম না। কিন্তু এক বাড়িতে থেকে কাঁহাতক সতর্ক হওয়া যায়। এক-আধ সময় কথা বলতেই হত।

কিন্তু কি আশ্চর্য দৃষ্টি ছিল রাধারাণীর—ঠিক তার নজরে পড়ে যেতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা চরমে উঠল একদিন কি একটা কাজে বের হয়েছিলাম, ফিরতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেল। মস্ত বড় বাড়ি আমার। একতলায় থাকত দুটো ঘর নিয়ে নারায়ণী ও তার মেয়ে শিবানী। আমার নির্দেশ ছিল চাকরবাকরদের ওপরে, রাত দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্দরে যাবার দরজাটা বন্ধ করে দেবার। কাজেই দরজা তখন বন্ধ ছিল। দরজার কড়া নাড়তেই কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিতে এসেছিল শিবানী। শিবানীকে দেখে একটু আশ্চর্যই হলাম।

শিবানী তুমি! পাঁচুর মা কোথায়?

পাঁচুর মা তো নেই। দুপুরেই রাত্রের মত ছুটি নিয়ে গিয়েছে, তার এক ভাইঝি বরানগরে এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে। আপনার জন্যই জেগে বসেছিলাম। ফিরতে এত দেরি হল যে?

একটা কাজ ছিল, সারতে দেরি হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, পিছনে পিছনে শিবানীও সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

দাঁড়ালাম।

কিছু বলবে শিবানী?

না, চলুন আপনাকে খেতে দিয়ে আসি।

ইদানীং নারায়ণী আসবার পর থেকে দিনে ও রাত্রে দু বেলা নারায়ণী নিজেই আমাকে বসিয়ে খাওয়াত।

ফিরতে আমার যতই রাত হোক, নারায়ণী আমার জন্মে জেগে বসে থাকত। তাই শিবানীর কথায় বেশ একটু আশ্চর্যই হলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মা কোথায়?

বিকেল থেকে মার খুব জ্বর। একেবারে বেহুঁশ হয়ে আছেন।

চমকে উঠলাম, সে কি! ডাক্তার ডাকিয়েছিলে?

না। ওরকম জ্বর মার দেশের বাড়িতেও প্রায় হত। দুদিন পরে আবার ঠিক হয়ে যায়—পালা জ্বর।

আহা! এ তো দেশের বাড়ি নয়, কলকাতা। দেশের বাড়িতে তোমরা তোমাদের যা খুশি তাই করে এসেছ, সে তো আর আমাকে দেখতে হয়নি। কিন্তু এখন আমার এখানে যখন, তখন এখানকার মতই সব ব্যবস্থা হবে। চল, তাঁকে একবার দেখে আসি।

ব্যস্ত হবেন না আপনি। চলুন, আগে খেয়ে নেবেন চলুন।

না না, তাই কখনো হয়! চল, দেখে আসি তোমার মাকে একবার।

শিবানী তবু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি শুনলাম না। গিয়ে দেখি, নারায়ণী জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

চিন্তিত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, পাশেই দাঁড়িয়ে শিবানী—এমন সময় হঠাৎ সিঁড়ির উপরে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার স্ত্রী রাধারাণী।

সিঁড়ির আলো রাধারাণীর চোখে-মুখে পড়েছে। সেই আলোতে রাধারাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলাম।

দু চোখে তার জ্বলন্ত অগ্নিদৃষ্টি। অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের চোখ যেমন জ্বলে, তেমনি ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে।

আমি আর শিবানী বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে। কণ্ঠের ভাষা যেন লোপ পেয়েছে।

হঠাৎ বাজের মত তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল রাধারাণী, বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা রাক্ষুসী, এখুনি আমার বাড়ি থেকে।

বলতে বলতে ছুটে এসে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধারাণী শিবানীর উপরে অতর্কিতে।

অবিশ্রাম কিল-চড়-ঘুষি দিয়ে জর্জরিত করতে করতে দরজা খুলে প্রায় গলা-

ধাক্কা দিতে দিতেই শিবানীকে বাড়ির বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা এঁটে দিল সে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পাথরের মত নিশ্চল আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এতটুকু প্রতিবাদের কোন শক্তি যেন আর আমার তখন ছিল না—কেমন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

এদিকে প্রবল উত্তেজনার মুখে শিবানীকে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে টলে পড়ল সিঁড়ির উপরেই রাধারাণী। তারপর গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি দিয়ে পড়তে লাগল।

এতক্ষণে যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। ভূ-পতিত রাধারাণীর কাছে ছুটে গেলাম। দেখি, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে।

রাধারাণীকে উপরে নিয়ে গিয়ে শয্যার উপরে শুইয়ে দিয়েই ডাক্তার ডাকতে ছুটলাম।

শিবানীর কথা আর মনেই ছিল না তখন।

শেষরাত্রির দিকে রাধারাণী একটু সুস্থ হয়ে ঘুমুলে শিবানীর খোঁজ নিতে নীচে গেলাম।

কিন্তু কোথায় শিবানী!

নারায়ণী তার ঘরে শয্যার উপরে তখনও জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ। শিবানী ঘরে বা বাইরে রাস্তায় যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও সে নেই।

সেই যে শিবানী হারিয়ে গেল, আর তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বিনা দোষে চোরের মত মার খেয়ে মেয়েটা অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে রাত্রের অন্ধকারে সেই যে আত্মগোপন করল, তারপর দীর্ঘ আট বছর কেটে গিয়েছে।

একটা কথা সচ্চিদানন্দবাবু, শিবানী দেবীর মা?—প্রশ্ন করলাম আমি।

নারায়ণী আমার কাছেই ছিল সুব্রতবাবু। গত বছর মারা গিয়েছে।—জবাব দিলেন সচ্চিদানন্দ।

নিরুদ্দিষ্টা মেয়ের সঙ্গে তাহলে তাঁর আর এ-জীবনে দেখা হয়নি? —আবার আমি জিজ্ঞাসা করি।

না।

আচ্ছা, আপনার কোন ছেলে মেয়ে?

না। নিঃসন্তান আমি।

আপনার রুগ্না স্ত্রী তো এখনো বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ।

বর্তমানেও তাঁর অবস্থা কি সেই পূর্বের মতই ?

না। পূর্বের সে রোগের উগ্রতা এখন আর নেই। চট্ করে বাইরে থেকে দেখে পাগল বলেও মনে হবে না। কোন একটা কথা—মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, সেটাই হয়ত বার বার repeat করে চলেছে। কখনো হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে আছে তো আছেই, ডাকলে সাড়া দেবে না, স্নান করবে না, খাবেও না। আবার হয়ত কখনো কখনো বিছানায় শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে পড়ে আছে তো আছেই।

ঘুমিয়ে ?—আবার প্রশ্ন করি আমি।

মোটেই না। চোখ বুজে জেগেই পড়ে থাকে।

আর একটা কথা, আপনার বন্ধুর স্ত্রী নারায়ণী দেবীর উপরে আপনার স্ত্রীর কিরূপ মনোভাব ছিল ?

সেও এক বিচিত্র ব্যাপার সুব্রতবাবু। অত্যধিক স্নেহ করত তাকে।

আশ্চর্য তো !

আশ্চর্যই বটে।

তারপর যা বলছিলেন বলুন।

মাত্র মাসখানেক আগে হঠাৎ ডাকে একখানা চিঠি পেলাম দেরাডুন থেকে—বলতে বলতে সচ্চিদানন্দ একটা খামে-ভরা চিঠি কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন, পড়ে দেখুন আগে—এই সেই চিঠি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে কিরীটী বললে, কার চিঠি ?

পড়েই দেখুন আগে—লিখছে শিবানী।

শিবানী—মানে সেই মেয়েটি ?

হ্যাঁ। অন্ততঃ তারই পরিচয় চিঠিতে আছে ও তার নামও চিঠির নীচে সই করা হয়েছে।

তার মানে আপনার মনে হয়, এ চিঠি আসল শিবানীর নয় ?

আগে পড়ুন চিঠিটা, তারপর বলছি।

সচ্চিদানন্দবাবুর একান্ত অনুরোধেই শেষ পর্যন্ত কিরীটী খাম থেকে টেনে বের করে চোখের সামনে আলোয় চিঠিটা মেলে পড়তে শুরু করল।

আমিও পড়তে লাগলাম।

বেশ পরিষ্কার করে গোটা গোটা মেয়েলী হস্তাক্ষরে ব্লু কালিতে লেখা

চিঠিটা।

মনে মনেই পড়তে লাগলাম চিঠিটা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কাকাবাবু! চিঠিটা পড়ে পাছে আপনি বিস্ময়ান্বিত হন বা ভাবেন কার চিঠি, তাই সর্বাগ্রে বলে নিই—আমি আপনাদের সেই নিরুদ্দিষ্টা শিবানী, আপনার বাল্যবন্ধু যতীন চাটুয্যের মেয়ে। সে-রাত্রে কাকিমা আমাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিলেও আমি মরিনি—আজও বেঁচে আছি। কাকিমা সে-রাত্রে আমাকে আচমকা অমন করে বাড়ি থেকে বের করে না দিলেও আমি দু-একদিনের মধ্যেই আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে আসতাম। তাই আচমকা ঐভাবে বিতাড়িত হলেও আমি চমকাইনি বা মুষড়ে পড়িনি। বেরিয়ে তো আসতামই, না হয় দুদিন আগেই নিজের গোপন ইচ্ছেটা অন্যের গলাধাক্কার মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেল। ফলে, আমার কাজও হয়ে গেল। লোকেও জানল, আমি ইচ্ছে করে বের হয়ে আসিনি; আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সে-কথা যাক। যে কারণে এতকাল পরে আবার আপনাকে চিঠি দি... তাই বলি। আমি আবার আপনার গৃহেই ফিরে যেতে চাই। সংবাদ অবশ্য পেয়েছি, আমার মা আর জীবিতা নেই—তা সত্ত্বেও ফিরে যেতে চাই এই জন্যে যে আমি চাই আজ একটি শান্ত নির্জন গৃহকোণ। আপনি হয়ত বলতে পারেন, তা তো আমি নিজে দেখেশুনে মনোমত কাউকে বিবাহ করে সে আশা মেটাতে পারতাম, তার জন্যে আপনার ঘরে ফিরে যেতে চাই কেন? বিশেষ করে যেখান থেকে একদিন আমাকে গলাধাক্কা খেয়ে বের হয়ে আসতে হয়েছিল, সেই গৃহেই? তার জবাবে বলব, আপনি যে একদিন আমাকে নৃত্যগীতে পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন, তারই সুযোগে ও নিজের অভিনয় করবার স্বাভাবিক ক্ষমতায় আজ আর আমার অর্থের কোন অভাব নেই যেমন, তেমনি অভিনেত্রীর জীবনকে বেছে নেওয়ায় সাধারণ সমাজ থেকেও আমি নির্বাসিত। আমরা যে সমাজের ছাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াই সে সমাজের সঙ্গে সাধারণ গৃহস্থ ভদ্র সমাজের কোন যোগাযোগ নেই। আমাদের অভিনয় দেখে তাঁরা তারিফ করেন, বাহবা দেন, ঘরের দেওয়ালে আমাদের ফটো ও ছবি সযত্নে টাঙিয়ে রাখেন, কিন্তু তার চাইতে বেশী কিছুই নয়। এক পংক্তিতে নিয়ে আমাদের তাঁরা তাঁদের সমাজে কোনদিনই বসতে চান না বা বসবেনও না। সেইখানেই আমরা অপাংক্তেয়। আমাদের

জীবনটা তাঁদের কাছে লোভনীয়, কিন্তু সে জীবনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁরা কোনদিনই তাঁদের ঘরে আমাদের তুলবেন না। সেইখানে তাঁরা খুবই সাবধান, অতিমাত্রায় সচেতন। অথচ আমি চাই, তাঁদের সেই ঘরের এক কোণে—সত্যিকারের তাঁদের পাশেই একটু ঠাঁই। এবং সেই ঠাঁই আমাকে পেতে হলে আপনাদের সমাজের পাসপোর্ট নিয়েই এগুতে হবে।

আপনি আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। চিঠিটা একটু দীর্ঘ হল, কিন্তু উপায় ছিল না। আপনার পত্রের জবাবের আশায় রইলাম। হ্যাঁ ভাল কথা—এই পথ বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার ফেলে-আসা জীবনের ওপরে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিলাম। পূর্ব জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো নামটাও বদলে নতুন নাম নিয়েছিলাম অভিনেত্রীরই উপযোগী—মণিকা দেবী। বর্তমানে আমার পরিচয় মণিকা দেবী। কলকাতাতেই আছি আমি বর্তমানে। শরীর খারাপ যাচ্ছে কিছুদিন থেকে, তাই দেরাদুনে এসেছি চেঞ্জে।

প্রণতা

শিবানী

চিঠিটা পড়া হয়ে গিয়েছিল, ভাঁজ করে খামে ভরে পূর্ববৎ কিরীটী সচ্চিদানন্দবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে, পড়লাম।

এই চিঠি পেয়ে—সচ্চিদানন্দবাবু আবার তাঁর পূর্ব-কাহিনীর জের টেনে শুরু করলেন, আমি প্রথমটায় কি যে করব ভেবে পাইনি। কারণ এ শুধু আকস্মিকই নয়, অপ্রত্যাশিত। শিবানী বেঁচে আছে আজও। নিরুদ্দিষ্টা হবার পর দু-দুটো বছর এমন জায়গা নেই যেখানে খোঁজ আমি করিনি। শেষটায় ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে কতকটা বাধ্যই হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই দীর্ঘ আট বছরের ব্যবধানে যাকে ভেবেছিলাম হয়ত আর বেঁচেই নেই এবং যার মৃত্যুর জন্যে বরাবর নিজেকেই নিজে আমি নিমিত্ত মনে করেছি, তার যে এভাবে সন্ধান মিলবে, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর।

এবারে আমিই বাধা দিয়ে বললাম, তবে কি সচ্চিদানন্দবাবু, আপনার ধারণা হয়েছে কোন কারণে যে, অভিনেত্রী মণিকা দেবী আপনার সেই আট বছর আগের নিরুদ্দিষ্টা শিবানী দেবী নন?

আমার কথায় সচ্চিদানন্দবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেই কথাতেই আসছি এবারে। প্রথমটায় মনে আমার কোন সন্দেহই জাগেনি

সুব্রতবাবু। আর বলুন আপনারা, সন্দেহ জাগেই বা কি করে! যে ব্যাপারের জন্যে এই সুদীর্ঘ আট বছর ধরে দিন-রাত্রের প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে দুষেছি, যে জন্যে আমার অনুতাপ ও অনুশোচনার অবধিমাত্র ছিল না, সেই শিবানীর চিঠি যখন পেলাম, মুহূর্তে যেন সব ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম সে পলাতকা, ভুলে গেলাম গত আট বছর সে অভিনেত্রীর জীবন যাপন করেছে, ভুলে গেলাম তাকে ঘরে এনে তুললে অনেক প্রশ্নের উদয় হতে পারে। সব কিছু একপাশে সরিয়ে রেখে তাকে চিঠি দিলাম, চলে এস।

তারপর?

দিন দশেকের মধ্যেই সে চলে এল। এসে একেবারে সোজা আমার বাড়িতেই উঠল। শিবানী ও তার ভৃত্য নন্দন। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স্ক তার ভৃত্য। আট বছর পরে দেখলাম, তবু শিবানীর চেহারাটা যেন আজও স্পষ্ট আমার চোখের সামনে ভাসে। সে সময়টায় ছিল তার যৌবনের সবে শুরু, রোগা ছিপ্‌ছিপে শ্যামল মেয়েটি, মাথাভরা কালো চুলের রাশ। বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমলে মুখখানার মধ্যে ছিল একটা গেঁয়ো সারল্য। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—বিশেষ করে উঠতি বয়সে চেহারা বদলায় এবং এই আট বছরে শিবানীর চেহারা বদলাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবু যেন মনে হল প্রথম দর্শনেই মুখের মধ্যে আট বছর আগেকার একটি পরিচিত মেয়ের আদল থাকলেও পরিবর্তন অনেক হয়েছে। গায়ের রংটা আরও একটু যেন পরিষ্কার—উজ্জ্বল মনে হল চোখে-মুখে শহুরে ঔদ্ধত্য। প্রথম দর্শনের দিন যেমন নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল, সেদিনও তেমনি করে পায়ের ধুলো নিলে আমার। আর সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার কি হল জানেন, আমার স্ত্রী রাধারাণীর পায়ে হাত দিয়ে যখন হাসতে হাসতে শিবানী এসে প্রণাম করল, রাধারাণী কয়েক মুহূর্ত ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সহসা দু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কেঁদে উঠল, এতদিন কোথায় ছিলি মা? আর শিবানীও যেন সেই সঙ্গে নিবিড় স্নেহে ও মমতায় আমার স্ত্রী রাধারাণীকে বহুদিনের অ-দেখা মায়ের মতই আঁকড়ে ধরল। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে না, 'এল আর মুহূর্তে জয় করে নিল'—এও যেন ঘটল ঠিক তেমনটি। আমার বাড়ির চাকর-চাকরাণী, রাঁধুনী, সোফার, মায় আমার এতকালের বিকৃত-মস্তিষ্কা স্ত্রী পর্যন্ত শিবানীকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মেয়ে যেন দীর্ঘদিন পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে তার বাপের বাড়িতে আবার ফিরে এসেছে। এক কথায় বাড়ির সকলে নিঃসংশয়ে

শিবানীকে মেনে নিল, কেবল পারলাম না একা আমিই মানতে।

কেন—কেন পারলেন না?—প্রশ্ন করলাম আবার আমিই সচ্চিদানন্দ সান্যালকে।

কিরীটী পূর্বের মতই তেমনি নির্বিকার। চুপ করে বসে শুনছে।

সচ্চিদানন্দ আবার বলতে লাগলেন একটু থেমে, কেন তা ঠিক বলতে পারব না সুব্রতবাবু। তবে এও সত্যি কেন যেন কেবলই আমার মনে হতে লাগল, দীর্ঘ আট বছর আগেকার নিরুদ্দিষ্টা শিবানীকে যেন আজকের এই শিবানীর মধ্যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। কি যেন তার ছিল, কি যেন এর নেই। অনেক দিন আগেকার একটা চেনা সুর, যা একটু একটু করে সময়ের ব্যবধানে ভুলে গিয়েছিলাম, আজকের এই সুরের মধ্যে যেন সেই চেনা সুরটি ঠিক ধরা দিচ্ছে না। সারগমের মধ্যে কোথায় যেন কেটে যাচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, মেয়েটির মধ্যে কোন খুঁতই ধরতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে, এই তো সে-ই—আবার মনে হয়, এ তো সে নয়। মনে মনে সর্বক্ষণ ছটফট করতে লাগলাম। মনকে কতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম, একে ফিরে পাওয়ার জন্যেই তো আট বছর ধরে তুমি উদ্গ্রীব হয়ে ছিলে, তবে আজ তাকে ফিরে পেয়ে সুখী হতে পারছ না কেন? কিন্তু এ 'কেন'র জবাব খুঁজে পাই না। ফলে হল এই যে শিবানীকে সামনে দেখলেই যেন বুকের মধ্যে কি এক অজানা আশঙ্কায় সির্‌-সির্‌ করে ওঠে আমার। পালাতে পারলে ওর সামনে থেকে যেন বাঁচি। কিন্তু এক বাড়িতে থেকে সদা-সর্বদা পালিয়ে পালিয়েই বা থাকা যায় কি করে! তাছাড়া দেখছি, শিবানী যেন আমার সমস্ত সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বাড়ির মধ্যে কেউ শিবানীকে জোর করে অস্বীকার করবে, এ সাধ্য যেন কারো নেই। তাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করা যায় না। আর কি অদ্ভুত শান্ত ধীর স্বভাব মেয়েটির। সংসারে সকলের জন্যে নিঃশব্দে প্রাণপাত করাই যেন মেয়েটির একমাত্র লক্ষ্য।

বাধা দিলাম আবার আমিই, ভুলে যাচ্ছেন কেন সচ্চিদানন্দবাবু, মেয়েটি আজ একজন নামকরা অভিনেত্রী। হয়ত সবটাই তার অভিনয়—

অভিনয়! না সুব্রতবাবু, জীবনে অভিনয় অনেক দেখেছি, কিন্তু যে যত বড় অভিনেত্রীই হোক, দীর্ঘ দেড় মাস ধরে দিন-রাত্রে, চব্বিশ ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্তে এমনি নিখুঁত অভিনয় করতে পারে না। ভুলে যাবেন না, অভিনেত্রীও মানুষ, অভিনয়ের বাইরেও তার একটা আলাদা সত্তা আছে। কিন্তু যাক সে-কথা,

বলছিলাম—ও যে আসলে শিবানী নয়, সেই সন্দেহটাই শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য একটা কাঁটার মত খচখচ করে আমার মনে বিঁধতে লাগল। ওর ওপরে আমি তীক্ষ্ণ নজর রাখলাম। কিন্তু তবু যেন প্রতি পদেই আমার হার হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দিন কুড়ি আগে হঠাৎ একটা জিনিস আমার নজরে পড়তেই আমি চমকে উঠলাম ও সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সংশয়ের নিরসন ঘটল। বুঝতে পারলাম এতদিনকার সন্দেহ সত্যিই আমার মিথ্যে নয়। ও শিবানী নয়।

কিসে বুঝলেন ?—প্রশ্ন করলাম।

শিবানীর দক্ষিণ ভ্রূর নীচে চোখের পাতায় একটা ছোট কালো তিল ছিল। শিবানী হাসত চোখ বুজে এবং হাসতে গেলেই বোজা চোখের পাতার ঠিক নীচে কালো তিলটা স্পষ্ট হয়ে উঠত। এ শিবানীর চোখের পাতায় তো সে তিলটি নেই। এতদিনে—এতদিনে হারানো সূত্র-চিহ্নটি নিরুদ্দিষ্টা শিবানীর খুঁজে পেয়েছি। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বুকটা আমার কেঁপে উঠল। এ যদি সেই শিবানীই না হয়, তবে এ কে ? কি এর সত্য পরিচয় ? আর কেনই বা শিবানীর পরিচয়ে আমার এখানে এসে উঠল ? কি মতলব ?

তাই যদি বুঝলেন যে এ আপনার সে শিবানী নয়, স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের ওপরে মণিকা দেবীকে সে কথা বললেন না কেন সচ্চিদানন্দবাবু ?—প্রশ্ন করলাম আমিই।

পারলাম না—বলতে পারলাম না মুখের ওপরে সত্য কথাটা। আমার সংশয়টা খুলে বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। মুখ দিয়ে আমার স্বর বেরুল না। পরের দিন ভাবলাম বলব, কিন্তু কি আশ্চর্য ! আপনাকে কি বলব, পরের দিন সে যখন স্নানের পর প্রসাধন শেষে আমাকে চা ও জলখাবার দিতে এল দেখলাম অবাক হয়ে, দক্ষিণ ভ্রূর নীচে চোখের পাতায় একটি কালো তিল।

বলেন কি !

হ্যাঁ, তাই। বিস্ময়ে আমি যেন একেবারে বোবা হয়ে গেলাম। মনে হল, তবে কি গতকাল সকালে আমি ভুল দেখেছি ! তিলটি ছিল, কিন্তু আমার চোখে পড়েনি ! না, ব্যাপারটা আগাগোড়াই আমার চোখের দেখার ভুল ! কেমন যেন সব গুলিয়ে যেতে লাগল।

এতক্ষণে কিরীটী একটি প্রশ্ন করল, প্রথম যেদিন আপনি তিলটি নেই তাঁর চোখের পাতায় লক্ষ্য করেছিলেন, সেদিনও কি প্রসাধন শেষেই শিবানী দেবী আপনার কাছে এসেছিলেন ?

তা তো ঠিক আমার স্মরণ নেই কিরীটীবাবু। তবে আমার ওখানে আসা

অবধি লক্ষ্য করেছি, সে প্রত্যহই খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে সামান্য প্রসাধন করে সংসারের কাজ শুরু করে।

হুঁ। আচ্ছা বলে যান। তারপর?

তারপর আর কি, প্রথম থেকেই মনে সন্দেহ জাগার সঙ্গে সঙ্গেই তলে তলে শিবানী-বেশী মণিকার যাবতীয় খোঁজ-খবর আমি সংগ্রহ করতে থাকি। পরে আরো আগ্রহের সঙ্গে সন্ধান নিতে শুরু করলাম। কিন্তু আট বছরের অভিনেত্রী জীবন মণিকার। গত আট বছর বাদে তার পূর্ব-জীবনের কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারলাম না। সকলেই বললে, মণিকার অতীত জীবন সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। সে যেন অকস্মাৎ একদিন প্রাতে নিয়মিত সূর্যোদয়ের মতই অভিনয়ের আকাশে দেখা দিয়েছে।

তাঁর অভিনেত্রী জীবনের ইতিহাস?—প্রশ্ন করলাম আবার আমিই।

না। সেও সাধারণ অভিনেত্রীদেরই জীবনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কোন আচমকা বিস্ময় বা অঘটন নেই সেখানেও। শুধু যে মণিকা সম্পর্কেই খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম তাই নয়, অনেকদিন পরে আবার নিরুদ্দিষ্টা সেই শিবানীরও নতুন করে অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোন ফল হল না। শেষ পর্যন্ত মনে হল আপনার কথা কিরীটীবাবু। চলে এসেছি আপনার কাছে। এ রহস্যের একটা মীমাংসা আমাকে করে দিন। হয় নিরুদ্দিষ্টা শিবানীর সন্ধান এনে দিন, না হয় মণিকার সমস্ত রহস্য আমাকে সংগ্রহ করে দিন। আপনার যা ন্যায্য ফিজ তার চাইতেও বেশী আপনাকে আমি দেব। বলুন, আমাকে সাহায্য করবেন? —সাগ্রহে তাকিয়ে থাকেন সচ্চিদানন্দ কিরীটীর মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, চেষ্টা করব আমি।

ঘড়িতে এমন সময় ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা ঘোষণা করল।

সচ্চিদানন্দ চমকে উঠলেন, উঃ, রাত দশটা! এবারে তাহলে উঠি কিরীটীবাবু।

হ্যাঁ, আসুন। একটা কথা, কাল সকালে আপনার ওখানে আমি যাব। বাড়ির সকলের সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয় করতে চাই।

বেশ তো, আসবেন—আসবেন—। আচ্ছা আজ তাহলে চলি, নমস্কার।

নমস্কার জানিয়ে সচ্চিদানন্দ বিদায় নিলেন সে রাত্রের মত।

ধীরে ধীরে সচ্চিদানন্দের জুতোর শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল একসময়।

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল, কি, খাওয়া-দাওয়া হবে, না—না? এদিকে সব যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

ওঠ, ওঠ সুব্রত, চল—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।—কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

গরম গরম খিচুড়ী ও ভাজাভুজি সহযোগে সে রাত্রের আহারপর্বটা শেষ হতে হতে রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেল।

তারপর কৃষ্ণা বৌদিকে ধরলাম, খাওয়া হল, এবার গান।

ক্ষেপেছো ঠাকুরপো! এই মধ্যরাত্রে গান।

বাধা দিয়ে আমি বললাম, নিশ্চয়, আলবৎ! জান মধ্যরাত্রেরও রাগ-রাগিণী আছে। সঙ্গীতের আবার সময়-অসময় আছে নাকি?

সুব্রতর যুক্তি বড় কঠিন কৃষ্ণা। গাও, ধর, রেহাই নেই।—হাসতে হাসতে কিরীটী বলে।

কৃষ্ণা অর্গানের সামনে গিয়ে হাসতে হাসতে বললে, এই মাঝরাত্রে গলা ছাড়লে যদি পাশের বাড়ির ভদ্রলোকেরা ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে ঠাকুরপো!

বল কি বৌদি, এমন বেরসিক দুনিয়ায় কেউ আছে নাকি! মধ্যরাত্রে গান—বিশেষ করে তোমার মত সুললিত মধু-কণ্ঠে সে তো ঘুমেরই ওষুধ।

অ্যাঁ—তার মানে, আমার গান শুনতে শুনতে তুমি ঘুমুবে? না, তবে কক্ষণে আমি গাইবো না তো!

এই দেখ! সেটা কি একটা সহজ complement হল নাকি! ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, জীবনে মার বুকে শুয়ে ঘুমপাড়ানী গানই শোনা হল না। এ যে আমার কি দুঃখ, তুমি তা জানবে কি করে?

কৃষ্ণা অতঃপর সত্যিসত্যিই গান ধরল।

গান শেষ হলে বললাম, সত্যিই কিরীটী, ভাগ্যবান যদি কেউ তো তুই—

কাকে বলছ ঠাকুরপো? দেখছ না, এ জগতে কি ও আছে নাকি?

তাই তো! চেয়ে দেখি, সত্যিই কিরীটী ঘরের মধ্যে নেই। গেল কোথায়?

ঘরের সংলগ্ন ব্যালকনিতে এসে দেখি, স্বল্প-পরিসর সেই স্থানটিতে যে আরাম-কেদারাটা সর্বদা পাতা থাকে, সেইটার উপরে বসে ধূমপানের মধ্যে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন সে।

কিরীটী!

কোন সাড়া নেই।

আবার ডাকলাম, কিরীটী—এই—

উঁ!—কিরীটী তার স্বপ্নাচ্ছন্ন অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলে আমার দিকে তাকাল, ও, সুব্রত

কি রে ?

বেশ লোক তো তুই ! ঘরে ও গান করছে, আর তুই এখানে এসে সিগার খাচ্ছিস ?

ভাবছিলাম মণিকা দেবীর কথা।

মণিকা দেবী ?

হ্যাঁ রে, আমাদের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মণিকা দেবী।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় সব কথা। সন্ধ্যার সেই কাহিনী।

কিরীটী বলল, সচ্চিদানন্দের ধারণা যদি নির্ভুল হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, সত্যিকার উঁচুদরের একজন অভিনেত্রী সে। **Really an extraordinary talented girl !**

কিন্তু শুধু অভিনয়ের কথাই বা বলছিস কেন, কি দুর্জয় বুকের পাটা একবার ভেবে দেখ, কিরীটী মেয়েটার ! কথাটা না বলে পারলাম না।

হুঁ। তাই তো ভাবছিলাম কোন্ পথে এগুবো। অবশ্য ভেবে একটা পথ দেখ্তে পেয়েছি।

কি রকম ?

শঠে শাঠ্যং। আমাদেরও অভিনয় করতে হবে।

অভিনয় !

হ্যাঁ রে। যদি সত্যি সত্যিই মেয়েটা আসল শিবানী না হয়—তাহলে ভাবতে বিস্ময় লাগছে, কতটা আটঘাট বেঁধে মেয়েটা ক্ষেত্রে নেমেছে !

কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি ?

উদ্দেশ্যটা অবশ্যই সাধু। আর সেটাই যদি জানতে পারব, তাহলে চিন্তার কি ছিল ?

কৃষ্ণা এসে পাশে দাঁড়াল, ঠাকুরপোও জমে গেলে নাকি !

আর বল কেন, তোমার কর্তাটি—

কিন্তু এদিকে যে রাত কাবার হতে চলল ! আজ রাত্রে কি আর ঘুমের প্রয়োজন নেই তোমাদের কারোর ? না থাকে থাক, আমি কিন্তু চললাম।

কৃষ্ণা চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

শোন, শোন কৃষ্ণা, সুব্রতর শোবার ব্যবস্থা—

আমাদের পাশের ঘরেই জংলী করে রেখেছে—বলতে বলতে আর দাঁড়ায় না কৃষ্ণা, সোজা শয়ন-ঘরের দিকে চলে গেল।

পরের দিন বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ আমি আর কিরীটী শ্যামবাজারে কাঁটাপুকুর অঞ্চলে নির্দিষ্ট ঠিকানায় সচ্চিদানন্দ সান্যালের প্রাসাদোপম ত্রিতল অট্টালিকার সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমেই থমকে দাঁড়ালাম।

সান্যাল-ভবনের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন লাল-পাগড়ী-পরিহিত কনস্টেবল ও পুলিসের একটা কালো তার দেওয়া ভ্যান। আশেপাশে কৌতূহলী প্রতিবেশী দু-চারজন ছোকরা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ব্যাপার কি! কোন অঘটন ঘটল নাকি?

কিরীটীই প্রথমে এগিয়ে গেল সদরের দিকে, আমিও তার পিছু নিই।

সদরে যে কনস্টেবল দুটি ঐ বাড়ির প্রহরায় মোতায়েন ছিল, তাদের মধ্যে একজন—রামপ্রীত্ কিরীটী ও আমার পূর্ব-পরিচিত।

রামপ্রীত্ আমাদের দুজনকেই সেলাম দিয়ে প্রশ্ন করলে, বাবুসাব, আপনারা?

কি ব্যাপার! এ বাড়িতে রামপ্রীত্? আমি প্রশ্ন করলাম।

কে একজন বাবু আত্মহত্যা করেছেন এ বাড়িতে।

আত্মহত্যা করেছেন?

হ্যাঁ। সুশীলবাবু, ইন্সপেক্টর বলীনবাবু, থানা-ইনচার্জ সবাই ভিতরে আছেন, যান না।

তাইতো! ব্যাপার কি! কে আবার বাবু আত্মহত্যা করল এ বাড়িতে?

সেকেলে ধরনের পুরাতন বনেদী বাড়ি।

লোহার গেটের পরেই সামান্য একটু জায়গা, তারপরই বারান্দা, মোটা মোটা কাজ করা থাম। থামের মাথায় খিলানে কবুতরের বাসা। কবুতরের মৃদু বকম-বকম গুঞ্জন শোনা গেল। বারান্দার উপরেই পর পর গোটা দুই ঘরের দরজা চোখে পড়ে। ভারী পাল্লাওয়ালা সেগুন কাঠের তৈরী সেকেলে মজবুত দরজা। দুটো দরজা বন্ধ ভিতর থেকে, সামনেরটি খোলা ছিল।

উন্মুক্ত দ্বারপথে চোখে পড়ল, ঘরের মধ্যে চৌকীর উপরে ফরাস বিছানো এবং একধারে এ যুগের গৃহসজ্জার সরঞ্জাম দু-চারটি সোফাকাউচও আছে।

ভিতরে প্রবেশ করলাম।

ঘরটা খালি। ঘরের মধ্যে কেউ নেই। মাথার উপরে সিলিং থেকে সেকেলে আমলের একটি বেলোয়ারী কাচের ঝাড়বাতি ঝুলছে। দেওয়ালে এ যুগের ইলেকট্রিক আলোরও ব্যবস্থা আছে চোখে পড়ল।

ঘরে ঢুকতেই সামনের দেওয়ালে দেখা যায়, কারুকার্য-করা সেকেলে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একটি মস্ত বড় অয়েল পেন্টিং। ছবিটি হচ্ছে সেকেলে ধনী জমিদারদের পোশাক—চোগা-চাপকান পরিহিত ও মাথায় পাগড়ী-বাঁধা একজন পুরুষের। প্রশস্ত ললাট। উন্নত নাসা। আয়ত চক্ষু। এবং ওষ্ঠোপরি একজোড়া গোঁফ। দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো।

আর আছে ঘরে একটা দামী জার্মান ওয়াল-ক্লক ও একটি পুরাতন ডেট ক্যালেণ্ডার।

দুজনেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সামনের অন্দরের খোলা দরজা-পথের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, আর অগ্রসর হব কি হব না, এমন সময় একটা ভারী জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ কানে এল। শব্দটা এই ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ঘরে এসে ঢুকলেন লালবাজারের পুলিস-ইন্সপেক্টর সুশীল রায়।

সুশীল রায় আমাদের উভয়েরই পূর্ব-পরিচিত এবং কিরীটীকে তিনি বিশেষ রকম শ্রদ্ধা করেন। মোটাসোটা নাদুস-নুদুস চেহারা। মাথায় চকচকে বিস্তীর্ণ খানি টাক। বেশ রসিক লোক।

কিরীটীকে ঘরে দেখেই সুশীল রায় সোল্লাসে বলে উঠলেন, আরে, কিরীটী যে! কি ব্যাপার—তুমি এখানে? তারপরই হঠাৎ বোধ হয় মনে পড়ায় বললেন, কিন্তু আশ্চর্য! কি করে সংবাদ পেলে বল তো যে, এখানে এ বাড়িতে একটা অঘটন ঘটে গিয়েছে? শকুনের মত কি তোমারও ভাগাড়ে গরু পড়তে না পড়তেই নাকে গন্ধ যায় বাতাসে?

কিরীটী হেসে জবাব দিল, না হে না। দৈবাৎ নয়, গন্ধ পেয়েও নয়। আজ সকালে এখানে আমার সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে appointment ছিল যে—

কার সঙ্গে?

এ বাড়ির মালিক সচ্চিদানন্দ সান্যালের সঙ্গে—কথাটার পুনরাবৃত্তি করি আমিই।

Appointment! তাহলে এবারে অন্যলোকে যেতে হবে সে appointment রাখতে হলে।

তার মানে—সচ্চিদানন্দবাবুই—

কথাটা আমার সমাপ্ত করবার পূর্বেই সুশীল রায় বললেন, হ্যাঁ, তিনিই গত হয়েছেন।

বল কি সুশীল! কিরীটী বললে।

হ্যাঁ। চল, দেখবে নাকি?

ঘটনার আকস্মিকতায় দুজনেই আমরা যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছি তখন। সচ্চিদানন্দ সান্যাল মৃত!

ব্যাপারটা বড় আশ্চর্য লাগছে সুশীল! বল তো শুনি?

সুশীল রায় প্রত্যুত্তরে এবার বললেন, এসে পড়েছ যখন, তখন না বললেও শোনাতাম আমি নিজেই। কিন্তু বলবই বা কি ছাই! ব্যাপারটা যেমন মিষ্টিরিয়াস তেমনি অবিশ্বাস্য!

কি রকম? কিরীটী সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

সচ্চিদানন্দবাবুর বাড়ির তিনতলায় যে একটি কাচঘর আছে, তারই মধ্যে ভদ্রলোককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

কিরীটী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কাচঘর?

সুশীল রায় প্রত্যুত্তরে বললেন, হ্যাঁ। ভদ্রলোকের গাছগাছড়ার খুব সখ ছিল। ছাতে একটা বহু টাকা ব্যয় করে কাচের অর্কিড-ঘর তৈরী করিয়েছিলেন।

হুঁ। স্বাভাবিক মৃত্যু নিশ্চয় নয়—কিরীটী বলে।

নিশ্চয়ই না—নচেৎ এখানে আমাদের শুভাগমন হবে কেন? ওঁরা অবিশ্যি বলছেন আত্মহত্যা।

মৃতদেহ তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ সুশীল?

করেছি। আর তাতেই তো বুঝেছি, ঠিক আত্মহত্যা নয়।

কেন?

চল না, মুখে শুনে আর কি হবে! সশরীরে অকুস্থানে যখন এসেই গিয়েছ।

চল। আয় সুব্রত।

দরজা অতিক্রম করে সুশীল রায়কে অনুসরণ করে আমরা যেখানে এসে দাঁড়ালাম, সেটা একটা প্রকাণ্ড দরদালান। চারদিকটা একটু চাপা সেকেলে ধাঁচের বলে আলোর পর্যাপ্ততা একটু কম।

সেই দালান-সংলগ্ন গোটা চার-পাঁচ ঘর। তারই একটা ঘরের মধ্যে ঐ বাড়িরই চাকর-ঠাকুর-ঝি ইত্যাদির দল ফিস্‌ফিস্ করে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে।

আরো এগিয়ে দালানের শেষ প্রান্তে এসে, মস্ত বড় উঁচু ও মজবুত পাল্লাওয়ালা ও পাল্লার গায়ে বিচিত্র নক্সার কাজ করা দরজার সামনে আমরা

দাঁড়ালাম। দোরগোড়ায় একজন পুলিস প্রহরায় নিযুক্ত।

দরজার পাল্লা দুটো ভেজানো ছিল। হাত দিয়ে পাল্লা দুটো ঠেলে প্রথমে সুশীল রায় ও তার পশ্চাতে আমি ও কিরীটী ভিতরে প্রবেশ করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বললে, কে রে সুধা ?

চমকে ফিরে চেয়ে দেখি, দাঁড়ের ওপর বসে প্রকাণ্ড একটি লালমোহন।

গত সন্ধ্যায় সচ্চিদানন্দ সান্যালের মুখে শুনেছিলাম, বাইরের ও অন্দরের মধ্যবর্তী যে দরজার কথা, এইটাই তবে সেই দরজা।

এখানেও অনুরূপ একটি প্রশস্ত দরদালান—ঠিক যেমনটি পশ্চাতে দরজার ওপাশে এইমাত্র ফেলে এলাম।

পর পর চারটি ঘর। এবং দালানের শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে, সোজা উঠে গিয়েছে প্রশস্ত সিঁড়ি দ্বিতলের দিকে। এগিয়ে গেলাম আমরা সিঁড়ির দিকে।

আবার লালমোহনের গলা শোনা গেল, উপরে যাও কেন ? কে গা !

জব্বর পাহারা তো ! চোখ এড়াবার উপায় নেই !

কিন্তু এতক্ষণ এই বাড়িতে এসেছি, একমাত্র ঐ দাঁড়ের উপর উপবিষ্ট মোহনের কণ্ঠস্বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের কণ্ঠস্বর বা কথা এখনও পর্যন্ত শুনতে পাইনি।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে যেন একটা অস্বস্তিকর অদ্ভুত স্তব্ধতা থমথম করছে। মনে হচ্ছে কেউ বুঝি এখানে নেই।

নির্জন এই বাড়িটার মধ্যে যেন একাকী ঐ লালমোহনটিই দাঁড়ের উপর বসে বসে বুড়ো ঠাকুর্দার মত পাহারা দিচ্ছে।

সিঁড়িতে পা দিলাম আমরা। সঙ্গে সঙ্গে আবার লালমোহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে গা ! কথা শুনছ না কেন ?

ফিরে তাকালাম, দেখি লালমোহনটা একদৃষ্টে ঘাড় বেঁকিয়ে আমাদের দেখছে।

সুশীল রায় বললেন, এস, এস সুব্রত। পাখীটা অমনিই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কিরীটী সুশীল রায়কে প্রশ্ন করে, কিন্তু এ বাড়ির লোকজন কোথায় ? কাউকে দেখছি না !

এস না, দোতলাতেই সব আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই সুশীল রায় বললেন।

দোতলায় পৌঁছেই কিন্তু মনে হল, এ যেন অন্য কোন বাড়িতে আমরা এলাম।

একটি টানা বারান্দা কিছুদূর গিয়ে চন্দ্রের মত বাঁয়ে বেঁকে গিয়েছে। চোখের সামনেই দেখা যায় উন্মুক্ত দক্ষিণ। নীচে বাগান। নানা প্রকারের ফল-ফুল পাতা-বাহারের গাছ সেখানে দেখা গেল। সযত্ন-রক্ষিত উদ্যান। বুঝলাম বাড়িটা রাস্তার দিকে উত্তর চাপা হলেও অবারিত দক্ষিণ দিকটায় এ বাড়ির ঐশ্বর্য।

নীচের বাগানে বোধ হয় অনেক বেল ফুল ফুটেছে। তারই মিষ্টি গন্ধের একটা ঝাপ্‌টা বায়ুতরঙ্গে ভেসে এল।

বারান্দায় পর পর ঘর।

চন্দ্রাকৃতি বারান্দার ওপ্রান্ত হতে দুটি মনুষ্যমূর্তি এগিয়ে এল। একজনের বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে, কালো আঁটসাঁট গড়ন। পরিধানে একটি পরিষ্কার ধুতি, গায়ে একটি অনুরূপ পরিষ্কার গেঞ্জি। খালি পা। দেখলে ভৃত্যশ্রেণীর বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় জন আটাশ-উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক। পরিধানে সরু কালো পাড় কাঁচির মিহি ধুতি। গায়ে একটা সাদা সিল্ক-টুইলের আমেরিকান কলারের হাফ সার্ট। চোখে কালো সেলুলয়েডের চওড়া ফ্রেমের চশমা। লেন্সের মধ্য হতে একজোড়া কালো চোখ বুদ্ধির দীপ্তিতে যেন ঝকঝক করছে। মাথার কোঁকড়ানো চুল রুক্ষ বিস্রস্ত। ছোট কপাল, নাকটা একটু চাপা।

ইন্সপেক্টর সুশীল রায়ের সঙ্গে আমাদের দুজনকে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কিরীটী সুশীল রায়কে চোখের ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে, এঁরা কে?

একজন শিবানী দেবীর সঙ্গে যে ভৃত্যটি এসেছে সেই নন্দন, আর উনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দবাবুর বড় ভাইয়ের ছেলে আনন্দ সান্যাল। সুশীল রায় বললেন।

আনন্দ সান্যাল! কিন্তু গতকাল সচ্চিদানন্দবাবুর মুখে যতদূর শুনেছিলাম, এ-বাড়িতে তিনি, তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী, শিবানী দেবী ও তার ভৃত্য নন্দন এবং এ বাড়ির দাস-দাসী, সোফার ব্যতীত আর কেউ নেই? কিরীটী বললে।

না। আনন্দবাবু তো আছেনই, আরো আছেন মহিমারঞ্জন, সচ্চিদানন্দের শ্যালক ও তাঁর মেয়ে পারুল দেবী। এবং মহিমারঞ্জন ও তাঁর মেয়ে পারুল দেবী তো শুনলাম এ বাড়িতে গত ছ মাস ধরেই আছেন। আর উনি—আনন্দবাবুও আছেন তা প্রায় গত তিন মাস এখানে। তাই না আনন্দবাবু?

হ্যাঁ। আনন্দ সান্যাল মৃদু কণ্ঠে সায় দিলেন সুশীল রায়ের কথায়।

বলীনবাবু কোথায়? সুশীলবাবু আনন্দ সান্যালকেই আবার প্রশ্ন করলেন।

হলঘরে আছেন।

চল হে কিরীটী, হলঘরেই যাওয়া যাক। কিন্তু আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

আপনাদের জন্য চায়ের যোগাড় দেখতে—আনন্দ সান্যাল বললেন।

বলীনের বুঝি এরই মধ্যে চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল?

আনন্দ সান্যাল ও নন্দন এগিয়ে গেল দোতলারই সিঁড়ির পাশের ঘরটায়। দোতলার সেইটেই পরে জেনেছিলাম কিচেন।

মনে মনে এ বাড়ির লোকগুলোকে চিন্তা করছিলাম।

বাড়ির মালিক সচ্চিদানন্দ সান্যাল, ধনী, নিঃসন্তান। বয়স পঞ্চাশের মধ্যে বা সামান্য বেশী।

সচ্চিদানন্দের স্ত্রী রাধারাণী দেবী, বিকৃত-মস্তিষ্কা। নিষ্ফলা।

আনন্দ সান্যাল সচ্চিদানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র। তরুণ-বয়স্ক, গত তিন মাস ধরে এ বাড়িতে এসে উঠেছেন, কিন্তু সচ্চিদানন্দ গতকাল তাঁর সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি বা এমনও হতে পারে, বলা কোন প্রয়োজন মনে করেননি বা অবকাশ হয়নি। সচ্চিদানন্দ যদি কোন নির্দিষ্ট উইল না করে গিয়ে থাকেন তো ঐ আনন্দ সান্যালই এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছেন ন্যায়তঃ ও আইনতঃ। এখানে আসার আগে উনি কোথায় ছিলেন?

এ বাড়ির চতুর্থজন মহিমারঞ্জন। বয়স কত হবে কে জানে! সম্পর্কে সচ্চিদানন্দের শ্যালক। এখানে আছেন গত ছ মাস ধরে। এখানে আছেন যখন, বুঝতে হবে সচ্চিদানন্দেরই পোষ্য ছিলেন।

পঞ্চমা এ বাড়িতে মহিমারঞ্জনের একমাত্র কন্যা পারুল দেবী।

সর্বশেষে ষষ্ঠজন এ বাড়ির শিবানী দেবীর পরিচয়ে স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মণিকা দেবী। গত দেড় মাস হল এ বাড়িতে এসে আবির্ভূতা হয়েছেন শিবানী দেবী। যে শিবানী দীর্ঘ আট বছর পূর্বে একদা সচ্চিদানন্দের স্ত্রী রাধারাণী কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন। এবং সঙ্গে এসেছে তাঁর ভৃত্য নন্দন।

এরা ছাড়া এ বাড়িতে আছে চাকর-চাকরাণী ও সোফার।

সকলে এসে আমরা নির্দিষ্ট হলঘরটির মধ্যে প্রবেশ করলাম।

বেশ প্রশস্ত হলঘরটি।

মেঝেতে কার্পেট বিছানো, এদিকে-ওদিকে আছে সব সেকেলে মোটা মোটা

ভারী আসবাব-পত্র।

ডানদিককার দেওয়ালে বিলম্বিত প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্রচর্ম। বাঘের মাথাটা উঁচিয়ে আছে, কাচের চক্ষু দুটো ঝকঝক করে যেন দুখণ্ড অঙ্গারের মত জ্বলছে।

চারদিকের দেওয়ালে টাঙানো চারটি তৈলচিত্র। একটি মধ্যবয়সী নারীর চিত্র, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে-সিঁদুর-রেখা। চওড়া লালপাড় শাড়ির অর্ধাবগুণ্ঠন কপালটি ছুঁয়ে আছে।

আর তিনটি চিত্র পুরুষের।

একটি চিত্র শিকারী ব্রিচেস পরিহিত, হাতে ধরা রাইফেল একটি। সম্পূর্ণ চিত্র। পায়ের সামনে লম্বমান একটি মৃত ব্যাঘ্র।

চিনতে কষ্ট হয় না, এ সেই পুরুষের চিত্র, নীচের ঘরে যার চিত্র ইতিপূর্বেই আমরা দেখে এসেছি।

বাকি দুটির মধ্যে একটি আট-দশ বৎসরের বালকের। অন্যটি একটি বৃদ্ধের। মুখে ওমর খৈয়ামের মত সাদা চাপ দাড়ি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই, একটি কেদারার উপরে উপবিষ্ট বলীনবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতেই তিনি সাদর আহ্বান জানালেন কিরীটীকে, আরে কিরীটীবাবু! আসুন, আসুন—

হলঘরের মধ্যে শুধু বলীন সোমই ছিলেন না, আরও একজন প্রৌঢ় সুশ্রী ভদ্রলোক ছিলেন।

পরে জেনেছিলাম, উনিই সচ্চিদানন্দবাবুর শ্যালক মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ় হলেও দেহের মধ্যে একটি বাঁধুনী আছে। মাথার মধ্যস্থলে টাক ও রগের পাশের চুলে সাদার ছোপ পড়লেও বয়স যে পঞ্চাশের উর্ধ্বে নয়, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আমরা ঘরে প্রবেশ করতেই মহিমারঞ্জনের দৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হয়েছিল। ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করে নিঃশব্দ সপ্রশ্ন ইঙ্গিতে যেন জানতে চাইলেন, আমরা আবার কে? কোথা থেকে আমরা এলাম?

কিন্তু তাঁকে বেশীক্ষণ সন্দেহের মধ্যে রাখলেন না বলীন সোম।

তিনি আমাদের উভয়েরই পূর্ব-পরিচিত।

আমাদের অকস্মাৎ ঐ সময় ঐখানে দেখে বিস্মিত হলেও চোখ-মুখের উৎফুল্ল ভাবটা সহজেই প্রকাশ পেল। কলকণ্ঠে সম্বর্ধনা জানালেন, এ কি! কিরীটীবাবু,

স্থব্রতবাবু—আপনারা ?

প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ। যোগাযোগটা একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে :সামবাবু, না ?

সত্যিই ! কিন্তু সংবাদ দিল কে আপনাদের ?

এবারে জবাব দিলেন আমাদের হয়ে সুশীল রায়। বললেন, আজকের র্ঘটনাটা না ঘটলেও ওঁরা আসতেন। সচ্চিদানন্দ সান্যালের আমন্ত্রণেই ওঁরা এসেছেন। এসে আমার মুখে শুনলেন ব্যাপারটা।

কি রকম ? সচ্চিদানন্দ সান্যালের সঙ্গে আপনাদের পূর্ব-পরিচয় ছিল নাকি ?

পূর্ব-পরিচয় বলতে যা বোঝায়, ততটা অবিশ্যি ছিল না বা তার সুযোগও হয়নি। সবেমাত্র কাল সন্ধ্যাতেই পরিচয় ঘটেছে। জবাব দিল কিরীটী।

আশ্চর্য তো ! বললেন বলীন সোম।

কথাটা আপনার জানা প্রয়োজন মিঃ সোম। বলে কিরীটী গতরাত্রে আমাদের সঙ্গে সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ-পর্বটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করে গেল, কেবল ণিকা সম্পর্কে সচ্চিদানন্দের সন্দেহের কথাটা বাদ দিয়ে।

এমন সময় হঠাৎ কথা বললেন মহিমারঞ্জন, হ্যাঁ, সচ্চিদানন্দ আপনার কাছে যাবে পরামর্শের জন্যে, আমায় বলেছিল বটে।

বলীন সোম এবারে মহিমারঞ্জনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, কিরীটীবাবু, ইনি মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী—সচ্চিদানন্দবাবুর শ্যালক।

ওঃ, নমস্কার। কিরীটী নমস্কার জানাল।

প্রতিনমস্কার জানালেন মহিমারঞ্জন।

সুশীল রায় কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে বললেন, কিরীটীবাবু, সোম রইলেন, আমার জরুরী কাজ আজ আছে। আমাকে একবার লালবাজার যেতে হবে। আপনি যখন ঘটনাচক্রে ঘটনাস্থলে এসেই পড়েছেন, আপনার সাহায্য থেকে নিশ্চয় বঞ্চিত হব না আশা করি।

সাহায্য সত্যিকারের কতটুকু আপনাদের করতে পারব জানি না সুশীলবাবু। তবে এ ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করতে বিমুখ হব না জানবেন।

তাহলেই হবে। আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবে।

সুশীল রায় আর দাঁড়ালেন না, ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সুশীল রায়ের প্রস্থানের পর ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই চুপ করে ছিলেন। একটা বিশ্রী থমথমে ভাব ঘরের মধ্যে যেন জমাট হয়ে ওঠে। এমন সময় ক্ষণপূর্বে

ঐ ঘরে আসবার সময় বারান্দায়-দেখা নন্দন চাকরের হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে পিছনে পিছনে আনন্দ সান্যাল এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

নন্দন ভৃত্যই সকলের হাতে এক কাপ করে চা তুলে দিল।

কেবল আনন্দ সান্যাল চা নিলেন না।

চা পরিবেশিত হয়ে যাবার পর আনন্দ সান্যাল বলীন সোমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি ভিতরে কাকীমার ঘরে আছি দারোগাবাবু। দরকার হলে ডাকবেন।

কথাগুলো বলে উত্তরের কোন অপেক্ষামাত্রও না করে আনন্দ সান্যাল নিঃশব্দে ধীর-পদে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

তার পায়ের চলমান চটির শব্দটা বারান্দায় মিলিয়ে গেল।

নিঃশব্দেই চা-পান পর্ব সমাধা হল।

কারো মুখেই বড় একটা কথা নেই।

কিরীটীই কিছুক্ষণ পরে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। বললে, আপনার তদন্ত ও জবানবন্দি নেওয়া কি শেষ হয়েছে সোমবাবু?

প্রায়। সামান্যই বাকি। মৃতদেহ দেখবেন নাকি? কিরীটীকেই প্রশ্ন করলেন সোম।

দেখব বৈকি। তার আগে ঘটনাটা সংক্ষেপে শুনতে পারলে ভাল হত। কিরীটী জবাব দিল।

ঘটনাটা সংক্ষেপে তখন কিরীটীর অনুরোধে বলীন সোম বলে গেলেন: গত রাত্রে প্রায় এগারোটা নাগাদ সচ্চিদানন্দ গৃহে ফিরে আসেন। সচ্চিদানন্দের পাশের ঘরেই থাকেন মহিমারঞ্জন। মহিমারঞ্জন তখনও জেগে ছিলেন। সন্ধ্যা থেকে তাঁর মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল তাই তখনও ঘুমোতে পারেননি।

সচ্চিদানন্দ যে ফিরে এসেছেন, তাঁর পায়ের শব্দে ও মণিকার সঙ্গে কথাবার্তার শব্দেই টের পান মহিমারঞ্জন।

মণিকা অর্থাৎ শিবানী তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, এত রাত হল যে কাকাবাবু আপনার?

একটা জরুরী কাজ ছিল মা।

আপনার খাবার নিয়ে আসছি। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন।

তোমার কাকীমা ঘুমিয়েছেন?

হ্যাঁ।

তুমিও শুতে যাও শিবানী। আজ রাত্রে আর কিছু খাব না।

খাবেন না কেন?

না, ক্ষিধে নেই।

একেবারে কিছু না খেয়ে থাকবেন? এক গ্লাস দুধ এনে দিই—

না, কিছুই খাব না।

তারপর আর কিছুই জানেন না মহিমারঞ্জন। রাত্রে সচ্চিদানন্দ খেয়েছিলেন কিনা তাও জানেন না। কারণ তার কিছু পরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

ঘুম ভাঙে তাঁর খুব ভোরে শিবানীরই ডাকাডাকিতে।

খুব সকালেই শিবানীর শয্যাত্যাগের অভ্যাস। শয্যাত্যাগের পর প্রথম কাজই হচ্ছে এক গ্লাস গরম জল ও একখণ্ড লেবু সচ্চিদানন্দের শিয়রের সামনে টি'পয়ের উপরে রেখে যাওয়া।

ভোরে শয্যাত্যাগ করে খালি পেটে প্রথমেই এক গ্লাস লেবুর জল খাওয়া সচ্চিদানন্দের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ছিল।

শিবানী এ বাড়িতে পা দিয়েই প্রতিদিন সকালের ঐ কর্তব্য-কর্মটির ভার স্বেচ্ছাতেই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে জলের গ্লাস ও লেবু নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে দেখে, সচ্চিদানন্দের শয্যা খালি এবং ঘরে কেউ নেই। ঘরের দরজা অবশ্য খোলাই থাকে বরাবর। আজও সকালে খোলাই ছিল।

শয্যায় সচ্চিদানন্দকে না দেখে শিবানী একটু বিস্মিতই হয়। কারণ চিরদিনই একটু বেলা করে সচ্চিদানন্দের শয্যা ত্যাগ করা অভ্যাস। ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। বাথরুমে যেতে পারেন ভেবে শিবানী সেদিকে তাকিয়ে দেখে, বাথরুমের দরজাটা খোলা। এগিয়ে গিয়ে তবু একবার শিবানী বাথরুমে উঁকি দেয়। বাথরুমও খালি।

তবে এত সকালে গেলেন কোথায় সচ্চিদানন্দ!

নীচে যাননি তো—বাগানে!

কিন্তু বাইরের বারান্দায় বের হয়ে দেখে, দোতলার সিঁড়ির দরজাটা তখনও বন্ধ। নিজের হাতে প্রত্যহ শিবানী ঐ দরজা সকালে খুলে দেয়। সে সেদিন সকালে তখনো ঐ দরজাটা খুলে দেয়নি।

তবে কি সচ্চিদানন্দ ছাতেই গেলেন—অর্কিড-ঘরে প্রায়ই যান।

কে জানে, ছাদে অর্কিড-ঘরে গিয়েছেন কিনা।

ছাদের উপরে একটা কাচের অর্কিড-ঘর আছে। চিরদিন সচ্চিদানন্দের বাগান, গাছপালা, ফুলের অত্যন্ত সখ। শুধু সখ নয়, একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল তাঁর।

স্বহস্তে নীচে বাড়ির পশ্চাৎভাগে যে উদ্যানটি আছে প্রত্যহ চার-পাঁচ ঘণ্টা তার তত্ত্বাবধানে কাটান। অবশ্য তিনজন মালীও আছে উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। আর আছে তিনতলায় ছাদের উপরে বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত বড় সখের কাচের তৈরী একটি অর্কিড-ঘর। বহু দুষ্প্রাপ্য নানা জাতীয় অর্কিডের সমাবেশ সেই কাচের অর্কিড-ঘরে। অর্কিড-ঘরটি সকলেই জানে সচ্চিদানন্দের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু। বাড়িতে যতটুকু সময় থাকেন, তার বেশীর ভাগ সময়টাই হয় নীচের উদ্যানে, না হয় অর্কিড-ঘরে কাটে সচ্চিদানন্দের।

সকালবেলা উঠে হয়ত অর্কিড-ঘরেই গেছেন ভেবে শিবানী তিন-তলার ছাদে যায়। অর্কিড-ঘরের কাচের দরজা বন্ধই ছিল। দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটু এগুতেই শিবানী থমকে দাঁড়ায়। মেঝের উপরে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছেন সচ্চিদানন্দ।

ব্যাপারটা শিবানী প্রথমে বুঝতে পারেনি, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সচ্চিদানন্দকে তোলবার চেষ্টা করতে যেতেই যেন হঠাৎ থেমে যায়। বরফের মত ঠাণ্ডা এবং লোহার মত শক্ত শরীরটা। একটা আর্ত অর্ধস্ফুট চিৎকার করে শিবানী যেন ভূত দেখার মতই পিছিয়ে আসে।

প্রথমটায় শিবানী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা মুহূর্ত সে বুঝতেই পারেনি কি করবে। বাড়ির কেউ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। অত ভোরে এ-বাড়ির কেউই বড় একটা শয্যাত্যাগ করে না—একমাত্র শিবানী ছাড়া।

কি করা উচিত বুঝতে না পেরে নিজে প্রথমেই সে মহিমারঞ্জনের ঘরে ঢুকে তাকে ঠেলে ঘুম থেকে তোলে।

মামাবাবু! মামাবাবু! শীগগির উঠুন—

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে শয্যার উপরে উঠে বসেন মহিমারঞ্জন।

কি! কি শিবানী! কি ব্যাপার?

শিবানীর চোখ-মুখের চেহারা একেবারে মড়ার মত ফ্যাকাশে।

কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে—সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে মামাবাবু!

সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ?

কাকাবাবু—বাকিটা আর শেষ করতে পারে না শিবানী।

কি—কি হয়েছে সচ্চিদার ? কথা বলছ না কেন শিবানী ?

আপনি এখুনি একবার উপরে কাচঘরে চলুন। কোনমতে কথা কটি উচ্চারণ করে শিবানী।

কাচঘরে ! মানে অর্কিড-ঘরে ?

হ্যাঁ। শীগগির চলুন একটিবার—

তারপরেই শিবানীর সঙ্গে সঙ্গে সোজা মহিমারঞ্জন তিনতলায় সচ্চিদানন্দের অর্কিড-ঘরে গিয়ে ঢোকেন এবং তাঁর অসাড় প্রাণহীন দেহটা মেঝের উপর লম্বমান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

তাঁর পরিধানে স্লিপিং পায়জামা ও কিমনো। খালি পা। চটিজোড়া অদূরে পড়ে আছে।

ক্রমে বাড়ির অন্যান্য সকলকেও ডাকা হয়, একমাত্র সচ্চিদানন্দের স্ত্রী রাধারাণীকে বাদে। রাধারাণী তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। বেলা প্রায় নটা পর্যন্ত তাঁর ঘুমনো অভ্যাস। এবং যতক্ষণ না নিজে থেকে তাঁর ঘুম ভাঙে, ডাক্তারের কঠিন নির্দেশ আছে, কেউ যেন কোন কারণেই তাঁর ঘুম না ভাঙান বা কোনভাবে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটান।

কাজেই রাধারাণী যেমন নিজের শয্যায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন তেমনি ঘুমোতে থাকেন।

অতঃপর কি করা কর্তব্য সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করেন। পাড়ার পরিচিত—বিশেষ করে সচ্চিদানন্দের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচিত বৃদ্ধ ডাক্তার হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্যকে কল্ দেওয়া হয়।

তিনি সব দেখে-শুনে বললেন, অনেকক্ষণ মারা গিয়েছেন এবং মৃত্যুর কারণটা ঠিক স্বাভাবিক না মনে হওয়ায় death certificate দিতে রাজী হন না। এবং আরো বলেন, অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় একটা সংবাদ দিতে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার হরপ্রসন্নর পরামর্শ মতই থানায় ফোন করা হয়। বলীন সোম আসেন এবং তিনিই এখানে এসে ফোনে সুশীল রায়কে সংবাদ দিয়ে আনান।

এই সংক্ষেপে ঘটনাটা।

জবানবন্দি সকলেরই নেওয়া হয়েছে, একমাত্র সচ্চিদানন্দের স্ত্রী রাধারাণী দেবীর বাদে। কিন্তু কারো কাছ হতেই উল্লেখযোগ্য এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি

যাতে সচ্চিদানন্দের মৃত্যুর উপরে কোন আলোকসম্পাত হয়।

রাধারাণী দেবী নিশ্চয়ই শুনেছেন ব্যাপারটা? কিরীটী প্রশ্ন করে বলীন সোমকে।

হ্যাঁ। আনন্দবাবু কিছুক্ষণ আগে বলেছেন।

শুনে তাঁর কোন reaction, মানে প্রতিক্রিয়া—কিরীটী জিজ্ঞাসা করে।

না। শুনলাম তাঁর মুখেই—মানে আনন্দবাবুর মুখেই, কোন সাড়া-শব্দই করেননি সংবাদটা শুনে। একেবারে যেন বোবা হয়ে গিয়েছেন।

হুঁ। আচ্ছা চলুন, মৃতদেহটা একবার দেখে আসা যাক। বলীন সোমকে উদ্দেশ্য করেই কিরীটী কথাগুলো বলে।

চলুন।

আমি, কিরীটী, মহিমারঞ্জন ও বলীন সোম ঘর থেকে বের হলাম।

কাচের তৈরী আগাগোড়া অর্কিড-ঘর। কাচঘর।

মস্তবড় ছাদ। ছাদের ঠিক মধ্যস্থলে পটে-আঁকা একটি ছবির মতই যেন সবুজ কার্পেটে চতুর্দিক হতে আচ্ছাদিত অর্কিড-ঘরটি।

সর্বাগ্রে বলীন সোম ও তাঁর পশ্চাতে একে একে আমরা কাচঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বলীন সোমই কাচঘরে প্রবেশের দরজাটা খুলে নিজে সর্বপ্রথম ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমরা সকলে অতঃপর একে একে তাঁকে অনুসরণ করে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

চারদিকে নানা জাতীয় অর্কিডের বিচিত্র সমারোহ। কত জাতের যে অর্কিড, তার নাম-ঠিকানা কিছুই আমার জানা নেই।

মাটির টবে, ঝুলন্ত তারের টবে, বাস্কেটে, নানা আধারে নানা জাতের অর্কিড। অর্কিডে-অর্কিডে ঘরটি যেন একেবারে ভর্তি। মধ্যে মধ্যে যাতায়াতের জন্য সরু পথ।

ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি কাঠের বেঞ্চ—ঠিক তারই সামনে বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে পড়ে আছে সচ্চিদানন্দের মৃতদেহ।

বলীন সোমের নির্দেশেই মৃতদেহটিকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছিল চিৎ করে শুইয়ে। এবং তিনিই এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের উপর থেকে বস্ত্রাচ্ছাদনটা টেনে তুলে নিলেন।

বিস্ফারিত চক্ষু। সমস্ত মুখখানার মধ্যে যেন একটা নীল আভা ছড়িয়ে আছে।

দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠের পাশ দিয়ে ক্ষীণ একটা লালা-মিশ্রিত রক্তধারা শুকিয়ে আছে কালো একটি সুতোর মত। প্রসারিত দুটি বাহু মুষ্টিবদ্ধ।

গতকাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত ঐ ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে কত গল্প করে এসেছেন। স্বপ্নেও ভাবিনি যাঁকে গতরাত্রে দশটার পর বিদায় দিয়েছিলাম সুস্থ সবল, তাঁকে আজ প্রত্যুষে অমনি করে ধূলি-মলিন প্রাণহীন অসাড় অবস্থায় তাঁরই বহু যত্নের বড় আদরের অর্কিড-ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখব!

সেই চিরপুরাতন প্রশ্নটা যেন আবার নতুন করে মনের মধ্যে এসে উদয় হয়। কাল যে ছিল, আজ সে নেই!

কেই বা জানত, তাঁর শেষের মুহূর্তটি এমন করে ঘনিয়ে এসেছে!

মৃত্যু ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাঁর একেবারে পশ্চাতে!

এই তো মানুষের জীবন! কখন যে কোন্ মুহূর্তে তার অবসান ঘটবে কেউ জানতে পারে না। অথচ এরই জন্যে কত না স্বপ্ন রচনা, কত না আস্ফালন, কত না আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা!

মানুষের মন স্বভাবতঃই এমনি। তাই বোধ করি সে বারবার মৃত্যু দেখে ক্ষণেকের জন্য দার্শনিক হয়ে ওঠে, আবার কিছুক্ষণ পরে সব ভুলে গিয়ে মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনের সাজঘরে মুখে চুন-কালি মেখে অভিনয় করে। হাসে, কাঁদে, ভালবাসে, ঘৃণা করে, আক্রোশে অধীর হয়।

হঠাৎ যেন কিরীটীর কণ্ঠস্বরে আমার দার্শনিক চিন্তাধারাটা ছিন্ন হয়ে গেল। চেয়ে দেখি, মৃতদেহ উপুড় করে কিরীটী ঘাড়ের কাছে হস্তধৃত লেন্সের সাহায্যে কি যেন পরীক্ষা করতে করতে বলছে, ঘাডের কাছে মৃতের একটা কালো বিন্দু লক্ষ্য করেছেন সোম?

কালো বিন্দু! সোম এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, দেখুন। একটা pin point blood clot বলে মনে হচ্ছে যেন দেখুন—

আমিও এগিয়ে গিয়ে দেখলাম। শুধু একটা পিন পয়েন্ট ব্লাড ক্লট নয়, তার চারপাশে একটা অস্পষ্ট কালো দাগও আছে।

কোন পোকা-টোকা বিষাক্ত কিছুতে কামড়ায়নি তো? ঘরের মধ্যে চারদিকে যা সব অদ্ভুত অদ্ভুত গাছগাছড়া রয়েছে—সোম বললেন কিরীটীকে লক্ষ্য করে।

বিচিত্র কিছু নয়। এবং সে-রকম বিষাক্ত পোকাও আছে, যার কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ঐ সঙ্গে আমাদের আরো কিছু ভাবতে হবে সোম। কথাগুলো ঠিক জবাবে নয়, যেন কতকটা আত্মগতভাবেই

বলতে বলতে সহসা কিরীটী মৃতের মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভিতর থেকে একটা লাল ও সাদায় মেশানো সুতো অতি যত্নে ধীরে ধীরে টেনে খুলে নিয়ে, হাতের পাতায় রেখে লেন্সের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

কি ওটা? এগিয়ে গেলাম আমি।

একগাছি লাল ও সাদায় মেশানো সুতো। বলতে বলতে কিরীটী সুতোগাছটি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তার মধ্যে রেখে, সযতনে কাগজটি পুনরায় ভাঁজ করে বুক-পকেটে রেখে দিল।

আচ্ছা সোম, ডাক্তার ভট্টাচার্য মৃত্যু সম্পর্কে আর কিছু বলেছেন? কি ভাবে মৃত্যু হল বা কিছু?

না, তেমন কোন কিছু স্পষ্ট করে বলেননি। কেবল বললেন, মৃতদেহ দেখে তাঁর মনে হয় কোন তীব্র বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু ঘটেছে।

মৃত্যু কতক্ষণ আগে হয়েছে বলে তাঁর মনে হয়?

রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে।

আচ্ছা, এবারে চলুন নীচে যাওয়া যাক। এ বাড়ির সকলকেই আমি কিছু কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

বেশ তো, চলুন।

পুনরায় সেই চাদরটি দিয়ে বলীন সোম মৃতদেহটি সন্তর্পণে ঢেকে দিলেন। তারপর সকলে আমরা একে একে কাচঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ছায়ান্ধকার ঘেরা কাচঘর থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রঝলকিত প্রকৃতির মধ্যে এসে আমাদের সকলের চোখে কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল।

সকলে নীচে নেমে এলাম।

প্রথমে দোতলার যে ঘরে এসে আমরা সমবেত হয়েছিলাম, সেই ঘরের মধ্যেই এসে আবার সকলে উপবেশন করলাম।

প্রথমেই সচ্চিদানন্দের শ্যালক মহিমারঞ্জনের ডাক পড়ল।

কিরীটী প্রশ্ন শুরু করল, কতদিন আপনি এ বাড়িতে আছেন মহিমাবাবু?

তা প্রায় মাস ছয়েক তো হবেই।

এখানে আসবার আগে আপনি কোথায় ছিলেন?

আমাদের আদি বাস বর্ধমান জেলায়। আসানসোলের কাছাকাছি মিঠানীতে প্রেমদাসজীর কলিয়ারীতেই আমি কাজ করছিলাম। মতের অমিল হওয়ায় কাজ ছেড়ে দেব-দেব করছিলাম, এই সময় সচিই আমাকে এখানে

ডেকে নিয়ে আসে তার ব্যবসাপত্র দেখবার জন্যে।

সচ্চিদানন্দবাবুর কোন ব্যবসা ছিল নাকি?

হ্যাঁ, কয়লার।

কি রকম লাভ হত তাতে?

বছরে বিশ-ত্রিশ হাজার তো বটেই।

মনে মনে ভাবছিলাম, এ কথাটা গতকাল সচ্চিদানন্দ তো কই একবারও বলেননি! লোকটা তাহলে মোটামুটি ধনীই ছিল বলতে হবে।

আচ্ছা, সচ্চিদানন্দবাবুর ঐ কয়লার ব্যবসা ছাড়া আর কোন আয়ের পথ ছিল কি মহিমাবাবু?

কলকাতার উপরে পাঁচ-ছখানা বাড়ি আছে, তার ভাড়ার আয়ও কম নয়। তাছাড়া এদিক-ওদিকে বেশ কিছু জমিজমাও আছে।—মহিমারঞ্জন জবাব দিলেন।

ব্যাঙ্কে নগদ টাকাকড়ি?

নিশ্চয়ই আছে, তবে সঠিক খবর আমি তো জানি না। তার সলিসিটার অচিন্ত্য বোস বলতে পারেন।

অচিন্ত্য বোস? মানে 'বোস অ্যাণ্ড দত্ত'র সিনিয়ার পার্টনার?

হ্যাঁ।

আপনার নিজের সংসারে কে কে আছেন মহিমাবাবু? মানে আপনার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে—

কিরীটীর প্রশ্নে মহিমারঞ্জন মৃদু হেসে বললেন, স্ত্রী আজ গত হয়েছেন তেরো বছর। তারপর আর ওপথে পা বাড়াবার সাধ হয়নি রায় মশাই। একটি মাত্র পুত্র, সে বর্ধমানেই থাকে তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে।

ছেলের সঙ্গে আপনার বনিবনা কেমন?

ঠিক তা নয়, সদ্ভাবটুকু বজায় রেখে পিতাপুত্র বর্তমানে আমরা দূরে-দূরেই থাকি।

মহিমারঞ্জন ও তাঁর একমাত্র পুত্রের মধ্যে সম্পর্কটা তাঁর ঐ কথার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় কিরীটী বোধ করি ও সম্পর্কে দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্নই করল না। সম্পূর্ণ অন্য কথায় ফিরে গেল সে।

আচ্ছা, রাধারাণী দেবী তো আপনার সহোদরা ভগ্নীই?

না, বৈমাত্রেয় বোন। আমার পিতার দুই সংসার—প্রথম পক্ষের সন্তান আমি, রাধা আমার বিমাতার সন্তান।

সচ্চিদানন্দবাবু সম্পর্কে যতটা পারেন, মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পারেন

মহিমাবাবু?

প্রশ্নের জবাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মহিমারঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, কি জানতে চান বলুন?

প্রশ্নটা তো আমার স্পষ্ট মহিমাবাবু। জবাবটাও স্পষ্ট পেলে সুখী হব।

একটু যেন নিজেকে গুছিয়ে নিয়েই মহিমারঞ্জন বলতে শুরু করলেন:

দেখুন কিরীটীবাবু, যে ভাবেই হোক, লোকটা আজ সাংসারিক সমস্ত নিন্দাস্তুতির বাইরে চলে গিয়েছে। অন্য সময় বা অন্য পরিস্থিতি হলে হয়ত আপনার প্রশ্নের কোন জবাবই দিতাম না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, আমি না বললেও হয়ত নানা জনের মুখে নানা কথা আপনারা শুনবেন। এবং তার কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে, হয়ত জানতেও পারবেন না। সেক্ষেত্রে উচিত ভেবেই যা আমি তার সম্পর্কে জানি, বলছি। দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ নিয়েই মানুষ। তার বাইরে কেউ নয়। তবু আজ বলব, চরিত্রে তার দোষ থাকলেও গুণটাই ছিল বেশী। তাই তো ভেবে অবাক হচ্ছি, যেন দিশে পাচ্ছি না, যদি আপনাদের অনুমানই শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, অর্থাৎ ত কেউ হত্যাই করে থাকে তাহলে কে সে, লোকটাকে এমন করে হত্যা কর আর কেনই বা করল?

বলতে বলতে একটু থেমে মহিমারঞ্জন আবার বলতে লাগলেন, আগে আত্মীয়তার সূত্রে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত ও দেখাশুনার মধ্যে দিয়ে তার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় ছিল, তখন লোকটাকে ততটা না চিনতে পারলেও, গত নয় মাস ঘনিষ্ঠভাবে তার পাশে পাশে থেকে যেটুকু চিনেছি, সেটুকুই, বলতে পারি। সচ্চিদানন্দ মদ্যপান করত, কিন্তু মদ্যপান করে কখনও এই ন মাসে তাকে মাতাল হতে দেখিনি। প্রথম যৌবনে তার নাকি একটা কলঙ্ক ছিল, বিবাহের পর যেটা রাধারাণী জেনেছিল। কিন্তু তারপর আর গত উনিশ-কুড়ি বছর সে সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যই শুনিনি। রাধাকে সে সত্যিই বড় ভালবাসত।

বাধা দিল এই সময় কিরীটী, সচ্চিদানন্দবাবুর বাল্যবন্ধু যতীন চাটুয্যে সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?—যতীনবাবুর স্ত্রী নারায়ণী ও তাঁর কন্যা শিবানী?

একটু ইতস্তত: করেই যেন মহিমারঞ্জন জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তাদের কথা শুনেছিলাম বটে, তবে চাক্ষুষ তাদের কখনও দেখিনি। বন্ধুর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও কন্যা অনেক দিন পরে কোন সংবাদ না দিয়ে এখানে এসে উঠেছিল বলে শুনি। কিন্তু আমি এখানে এসে তাদের কাউকেই দেখিনি। নারায়ণী দেবীর

তখন মৃত্যু হয়েছে, আর শিবানী তখনও নিখোঁজ।

হুঁ। আচ্ছা, ওই মণিকা দেবী সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় মহিমাবাবু?

মেয়েটি সত্যিই বড় ভাল। যেমন শান্ত-শিষ্ট, তেমনি ভদ্র, বিনয়ী ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী।

মণিকা দেবী সম্পর্কে সচ্চিদানন্দবাবুর মনোভাব তো আপনি জানতেন?

জানতাম।

আচ্ছা, আপনার ভগ্নীর যে মস্তিষ্ক-বিকৃতির কথা শুনেছি, সে-কথা কি সত্যি?

সত্যি। বহুদিন ধরেই সে অভাগিনী মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে ভুগছে।

কতদিন হবে বলে মনে হয়?

তা ধরুন বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ তো হবেই। বলতে গেলে বিবাহের বছর তিনেক পরেই রাধারাণীর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটবার মত কোন অসুখ-বিসুখ বা কোন এমন দৈব-দুর্ঘটনা ঘটেছিল কি, যাতে করে—

তা তো কিছু জানি না। তবে এইটুকুই জানি, ঐ সময় রাধারাণী ছ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সে তাদের দেশে ঢাকায় যায়। মাসখানেক বাদেই ফিরে আসে কলকাতায়। কলকাতায় ফিরেই একদিন রাধারাণী দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কেমন বেকায়দায় পড়ে যায়—ফলে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। সেও অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর বহুদিন ধরে চিকিৎসার পর শারীরিক সে সুস্থ হয়ে উঠলেও কিন্তু একটু একটু করে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। এবং সে দোষ এখনও তার সারেনি। তবে ইদানীং মাস দেড়েক শিবানী আসবার পর থেকে দেখছি, হঠাৎ যেন কেমন শান্ত, চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল।

আপনার বোনের মুখে কখনও কোনদিন কিছু আপনি শোনেননি?

না। বরাবরই রাধারাণী একটু স্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির। কোন কথাই কাউকে সে বড় একটা বলত না, বা বলতেও শুনিনি।

সচ্চিদানন্দবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে কাউকে কোনরকম আপনার সন্দেহ হয়?

না।

অতঃপর ডাক পড়ল সচ্চিদানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সান্যালের।

আনন্দ সান্যালের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের এর বেশী হবে না। রোগাটে পাতলা

দেহের গড়ন। কালো চেহারার উপরে মুখখানি তীক্ষ্ণ। চোখ দুটো যেন বুদ্ধির প্রাচুর্যে ঝকঝক করছে।

সচ্চিদানন্দর বড় ভাই নিত্যানন্দ সান্যালের একমাত্র পুত্র।

সচ্চিদানন্দর যা কিছু অর্থ সম্পত্তি, তার মূলে তাঁর মামা। মামা ছিলেন অপুত্রক, প্রচণ্ড অর্থশালী লোক। সচ্চিদানন্দকে তাঁর দশ বছর বয়সের সময় তাঁর কাছে নিয়ে যান, বিহারে। চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সচ্চিদানন্দ তাঁর মামার কাছেই ছিলেন, তারপর মামার মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

কলকাতার এই বাড়িটাও মামার।

অন্য ভাগ্নে নিত্যানন্দ যে মামার সম্পত্তির কোন কিছুই কেন পেলেন না, সেও একটা রহস্য।

যাই হোক, নিত্যানন্দের অবিশ্যি সেজন্যে কোন দুঃখ ছিল না।

তিনি জয়পুর স্টেটে মোটা মাইনেতেই কাজ করতেন। চার মাস আগে নিত্যানন্দর মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যুর পর সচ্চিদানন্দের আহ্বানেই আনন্দ তাঁর কাছে চলে আসে।

আনন্দ লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেনি কলেজে বা স্কুলে। তবে নিত্যানন্দ বাড়িতে তাকে প্রাইভেট টিউটর রেখে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ইদানীং এখানে আসা অবধি আনন্দ কাকার কাছে থেকে কাকার ব্যবসাতেই হাতে-নাতে কাজ শিখছিল।

আনন্দ দোতলার পাঁচখানি ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটিতে থাকে।

সে বললে, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। গতরাত্রেও সে প্রায় বারোটা পর্যন্ত জেগে পড়ছিল। শোবার পর বারান্দায় সে দুবার কারও পায়ের শব্দ শোনে। একবার খুব লঘু পদশব্দ। অন্য বার স্পষ্ট না হলেও মনে হয়েছিল, তার পরিচিত কাকারই ঘাসের চটির শব্দ। আর বিশেষ কিছুই সে বলতে পারে না। কারণ তারপরই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ সকালে মণিকার ভৃত্য নন্দনের ডাকে তার ঘুম ভাঙে।

কাকীমাকে সে-ই কাকার মৃত্যু-সংবাদটা দিয়েছে, কিন্তু সে-সংবাদ শুনে তাঁর মধ্যে কোন চাঞ্চল্যই প্রকাশ পায়নি।

সংবাদটা শুনে তিনি যেমন গুম হয়ে ছিলেন, এখনও তেমনি গুম হয়েই যেন সোফাটার উপরে বসে আছেন।

একটি কথাও কারও সঙ্গে বলেননি।

আনন্দ সেই থেকে তাঁর পাশেই আছে।

আনন্দ সান্যালকে বিদায় দিয়ে ডাকা হল এবারে শিবানীর পরিচয়ে আগতা অভিনেত্রী মণিকা দেবীকে।

আনন্দকেই বলে দেওয়া হয়েছিল, মণিকা দেবীকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিতে।

লঘু পদবিক্ষেপে মণিকা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

পদশব্দে সকলেই আমরা মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। রূপালী পর্দায় বহুবার দেখা পরিচিত মুখ। নামকরা একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হিসাবে মণিকা দেবীর প্রচুর খ্যাতি আছে।

বহু সিনেমা-কাগজে বহুবার ঐ মুখখানি দেখেছি। তবু যেন একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে, রূপ-সজ্জার বাইরে একান্ত সাদাসিধে সেই প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীকে দেখে মনে হল, এমনটি বুঝি পূর্বে দেখিনি।

ছিপছিপে দেহের গঠন। কাঁচা সোনার মত উজ্জ্বল গাত্র-বর্ণ। সামান্য একটু ...াটে ধরনের মুখখানি। উজ্জ্বল ভাসা-ভাসা টানা দুটি চক্ষু। দৃঢ়বদ্ধ পাতলা ...। ধারালো চিবুক। মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই বয়স তার সঠিক কত। মনে হয়, সতেরো-আঠারোর বেশী কিছুতেই নয়। অথচ সচ্চিদানন্দর হিসাব অনুসারে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স তো নিশ্চয় হওয়া উচিত।

অপূর্ব দেহের বাঁধুনী। যৌবনশ্রী যেন দেহের তটে তটে উছলে পড়ছে। কি ঢল ঢল লাবণ্য!. মাথার চুল এলো খোঁপার আকারে কাঁধের উপরে ভেঙে পড়ছে। পরিধানে সাদা একটি ব্লাউজ ও সাধারণ ফিকে নীল একটি দামী তাঁতের শাড়ি। খালি পা। হাতে দুগাছি করে সোনার চুড়ি, দুকানে দুটি হীরার দুল।

আপনার নাম মণিকা দেবী? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। মৃদু শান্ত কণ্ঠ হতে মণিকার জবাব এল।

বসুন। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

মণিকা এগিয়ে গিয়ে সামনের সোফার উপরে বসল।

গতকাল রাত্রে ফেরবার পর একমাত্র আপনার সঙ্গেই শুনলাম সচ্চিদানন্দবাবুর দেখা হয়েছিল। তাই না মণিকা দেবী?

কিরীটীর প্রশ্নে চমকে যেন মণিকা তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

কি কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে আপনার কাল রাত্রে ?

বিশেষ কোন কথাই হয়নি। খাবার কথা বলতে তিনি বললেন, খাবেন না। তখন এক গ্লাস দুধের কথা বললাম, তাও বললেন খাবেন না।

তারপর ?

তারপর আমি চলে যাই নিজের ঘরে।

রাত্রে কাল কটার সময় শুয়েছিলেন আপনার মনে আছে কি

রাত তখন সাড়ে এগারোটা হবে।

সাধারণতঃ কখন আপনি ঘুমোতে যেতেন ?

তা প্রায় ঐ রকম সময়ই হয় রাত্রে আমার শুতে শুতে।

বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় আপনি কাল রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েননি ?

না। বোধ হয় কিছুক্ষণ জেগেই ছিলাম।

কিছুক্ষণ মানে কতক্ষণ ?

মিনিট পনেরো-কুড়ি হবে বোধ হয়।

শোবার পর বাইরের বারান্দায় কোনরকম শব্দ শুনেছেন কি

প্রত্যুত্তরে যেন একটু ইতস্ততঃ করেই মণিকা বললে, না।

ঠিক মনে করে বলছেন ? একটু ভেবে দেখুন।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।

আপনি কোন্ ঘরে থাকেন দোতলায় ?

কাকীমা ও কাকাবাবুর মাঝের ছোট ঘরটায়।

এরপর কিরীটী কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। মনে মনে বোধ হয় কোন একটা মতলব গুছিয়ে নেয়।

মণিকা দেবী !

বলুন ?

আপনার আসল নাম তো শিবানী দেবী, তাই না ?

কিরীটীর কথায় মণিকা আবার চমকে ওর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

আপনি হয়ত আশ্চর্য হচ্ছেন আমার কথা শুনে, তাই না ? আমি জানি আপনার সত্যিকারের পরিচয়।

সত্যিকারের পরিচয় জানেন ? মণিকার প্রশ্নটা যেন তার উত্তেজিত চাপা কণ্ঠ হতে তীক্ষ্ণ শরের মত নির্গত হয়ে এল।

হ্যাঁ জানি।

জানেন? কি জানেন?

আপনার সত্য পরিচয়, অর্থাৎ আপনি যে আসলে শিবানী দেবী—সচ্চিদানন্দ-বাবুর মৃত বন্ধুর কন্যা।

জানেন?

হ্যাঁ।

কিরীটীর প্রত্যুত্তরের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত-পূর্বে মণিকার চোখ মুখে যে একটা চাপা ব্যাকুলতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং যেটা আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি, আবার হঠাৎ-ই সেটা যেন মিলিয়ে গেল।

জানি যে, আট বছর আগে আপনি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর মাত্র মাস দেড়েক আগে ফিরে এসেছেন চিঠি দিয়ে।

মণিকা চুপ করেই থাকে, কোন কথা বলে না। ঘরের মধ্যের অদ্ভুত স্তব্ধতাটা যেন কেবল বড় দেওয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামটার একঘেয়ে টক্‌টক্‌ শব্দে পীড়িত হতে থাকে।

আচ্ছা, সত্যি বলুন তো মণিকা দেবী, আপনি সর্বজন-প্রশংসিত ও আকাঙ্ক্ষিত অভিনেত্রীর জীবন থেকে হঠাৎ এতদিন বাদে আবার ঘরোয়া জীবনের মধ্যে ফিরে এলেন কেন?

আমার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্নটা নিয়েই কি আপনি অযথা অযৌক্তিক-ভাবে টানাটানি করছেন না মিঃ রায়?

অযথা বা অযৌক্তিক নয় বলেই করলাম প্রশ্নটা। যাক সে-কথা। আপনিই তো সর্বাগ্রে আজ সকালে আবিষ্কার করেছেন মৃত সচ্চিদানন্দবাবুকে?

হ্যাঁ।

কখন আপনি উঠেছিলেন আজ সকালে?

ভোর সাড়ে পাঁচটার কিছু আগে।

উঠেই কি আপনি লেবু-জল নিয়ে সচ্চিদানন্দবাবুর ঘরে গিয়েছিলেন?

না। স্নান সেরে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা, এবার আপনি যেতে পারেন।

মণিকা নিঃশব্দে কক্ষ হতে চলে গেল।

কিরীটী এবারে মহিমারঞ্জনকে লক্ষ্য করে বললে, আপনার বোনের সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চাই মহিমাবাবু।

বেশ তো। চলুন।

আমি, কিরীটী ও বলীন সোম মহিমারঞ্জনের পিছনে পিছনে গিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করলাম।

প্রশস্ত ঘরটি বেশ। ঘরের দেওয়াল ও সিলিং ফিকে সবুজ রঙে ডিস্‌টেম্পার করা। ঘরের সব কটি জানলাতেও ফিকে সবুজ রঙের পর্দা দেওয়া দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ম্যাচ করে।

ঘরের মেঝেতে ধূসর রঙের পুরু গালিচা বিছানো। দেওয়ালগুলো নিরাভরণ, কোন ছবি, ক্যালেণ্ডার বা ফটো নেই, মাত্র দক্ষিণ দেওয়ালে একটি পরমহংসদেবের ধ্যানস্থ নিমীলিতচক্ষু প্রতিকৃতি ছাড়া। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে একটি নীচু ধরনের আধুনিক ডিজাইনের খাট। তার উপরের শয্যাটা এখনও এলোমেলো হয়ে আছে—বোধ হয় গতরাত্রে শয্যাধিকারীর ব্যবহারের জন্যে। তারই কিছু দূরে গোটা দুই চওড়া দামী সোফা। ঘরে আর কোন আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই।

একটা সোফার উপরে পাশাপাশি আনন্দ সান্যাল ও একটি মধ্যবয়সী মহিলা মুখ নীচু করে বসেছিলেন। বয়স হলেও দেহের বাঁধুনী যেন এখনও রীতিমত অটুট্‌ই আছে।

আমাদের পদশব্দে আনন্দ সান্যাল মুখ তুলে তাকিয়ে ভ্রূ-দুটো কোঁচকালেন। তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্টা ভদ্রমহিলাটিও মুখ তুলে ঐ সঙ্গে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

ভাসা-ভাসা তাঁর দুটি অসংবদ্ধ চোখের তারায় যেন কেমন এক্‌প্রকার অসহায় দিশেহারা দৃষ্টি। তিনি যেন এ পৃথিবীতে নেই। এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, ভাবনা-চিন্তার স্পর্শেরও বাইরে যেন তিনি। সমস্ত মুখখানা ব্যেপে যেন একটা ক্লান্ত, রুগ্ন, কৃশ ছায়া।

ভদ্রমহিলার চেহারা অন্যথায় মোটামুটি সুন্দরই বলা যেতে পারে। চোখ-মুখের মধ্যে একটা চমৎকার আলগা লক্ষ্মীশ্রী আছে। মাথাভর্তি কুঞ্চিত কেশ এলিয়ে পড়েছে পশ্চাতের দিকে, মাথার অবগুণ্ঠন স্খলিত হয়ে কাঁধের উপরে নেমে এসেছে। সিঁথিতে ক্ষীণ সিঁদুর-রেখা এখনও এয়োতির চিহ্ন ধারণ করে আছে। হাত দুটি কোলের উপরে পড়ে আছে শ্লথভাবে। মণিবন্ধে চারগাছি করে সোনার চুড়ি ও সাদা শাঁখা। পরিধানে চওড়া সাদা-কালো ভেলভেট-পাড়ের শাড়ি। গায়ে সাদা সেমিজ।

আমাদের হয়ে মহিমারঞ্জনই কথা বললেন তাঁর ভগ্নীকে সম্বোধন করে, রাধারাণী, এঁরা পুলিসের লোক, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চান।

কিন্তু সম্বোধিতার নিকট হতে ক্ষীণতম সাড়া বা প্রত্যুত্তরই এল না। তিনি নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত সোফার উপরে যেমন বসেছিলেন, তেমনিভাবেই বসে রইলেন। কোন কথা যে তাঁর কানে গিয়েছে, তাও মনে হল না।

মহিমারঞ্জন আবার ডাকলেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে, রাধারাণী!

কিন্তু এবারেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

রাধারাণী, শুনছ?

তবু সাড়া-শব্দ নেই। নিশ্চুপ হয়ে যেমন বসেছিলেন, তেমনি বসেই রইলেন।

কিরীটী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে কিন্তু চেয়েই ছিল রাধারাণী দেবীর মুখের দিকে। মহিমারঞ্জনের শেষ ডাকে এতক্ষণ পরে আবার রাধারাণী দেবী মুখ তুললেন।

চোখে তাঁর সেই আগের মতই নির্বোধ অসহায় দৃষ্টি।

এঁরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। এঁরা যা জিজ্ঞাসা করেন, তার জবাব ––ও।

রাধারাণী দেবী মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন।

হঠাৎ আনন্দ সান্যালের কণ্ঠস্বরে যেন সকলেই আমরা চমকে উঠি।

বেশ রুক্ষ-কণ্ঠেই আনন্দ সান্যাল বললে, কেন আপনারা কাকীমাকে এ সময়ে বিরক্ত করতে এলেন? দেখছেন উনি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। যা জিজ্ঞাসা করবার, কাল এসে জিজ্ঞাসা করলেও তো পারেন।

জবাব দিলেন আমাদের হয়ে বলীন সোম। বললেন, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আনন্দবাবু। ওঁর এ সময়কার মনের অবস্থা যে বুঝতে পারছি না তা নয়, কিন্তু আমাদেরও উপায় নেই আর। কয়েকটা প্রশ্ন ওঁকে আমাদের করতেই হবে।

কিরীটীই এবার কথা বললে, রাধারাণী দেবী, আপনার কপালের ডান দিকে ঠিক ভ্রূর ওপরে একটা কালো দাগ দেখছি। কোনরকম আঘাত বা চোট লেগেছিল কি আপনার কপালে আজ-কালের মধ্যে?

কিরীটীর প্রশ্নে চমকে আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম অদূরে উপবিষ্টা রাধারাণী দেবীর মুখের দিকে। সত্যিই তো! একটা কালসিটের দাগ রয়েছে কপালে ডান দিককার ভ্রূর ঠিক উপরে। এতক্ষণ তো আমাদের কারুরই ওটার উপরে নজর পড়েনি! মনে হচ্ছে এখন বটে, কোন শক্ত কিছুতে আঘাত লেগে বুঝি থেঁতলেই গিয়েছে। কিরীটীর প্রশ্নে রাধারাণী নিঃশব্দে হাত তুলে কপালের নির্দিষ্ট স্থানটিতে

একবার হাত বুলিয়ে সামান্য একটু মুখটা বিকৃত করলেন। মনে হল যেন যন্ত্রণা বোধেই মুখটা বিকৃত হল। কিন্তু কোন জবাব দিলেন না তিনি।

কোথাও চোট লেগেছিল নিশ্চয়ই, তাই না? কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে।

মনে নেই তো। ক্ষীণ কণ্ঠে এই সর্বপ্রথম কথা বললেন রাধারাণী।

নিশ্চয়ই চোট লেগেছিল। মনে করে দেখুন।

কিরীটীর কথায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বোধ করি কয়েক মুহূর্ত স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন কোন কথা। কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, মনে করতে পারছেন না।

কি, মনে পড়ছে না?

না।

আচ্ছা, কালকের রাত্রের কথা কিছু আপনার মনে আছে রাধারাণী দেবী?

কালকের রাত্রের কথা?

হ্যাঁ। মানে কাল রাত্রে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

আমার স্বামী!

হ্যাঁ। সচ্চিদানন্দবাবু—আপনার স্বামী।

সচ্চিদানন্দবাবু! আমার স্বামী! কথাটা উচ্চারণ করে ভদ্রমহিলা এমনভাবে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন যে, মনে হল তার কথার বিন্দু-বিসর্গও তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি বা পারছেন না।

হ্যাঁ, সচ্চিদানন্দবাবু—আপনার স্বামী। কাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

আমার স্বামী!

হ্যাঁ, আপনার স্বামী।

আমার স্বামী! তিনি কে? এমন অসহায় করুণ কণ্ঠে শেষের কথাগুলো ভদ্রমহিলা উচ্চারণ করলেন যে, মনে হল স্বামী কথাটার মানেও যেন তিনি জানেন না বা বোঝেন না। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত ঐ শব্দটা তাঁর কাছে। কিরীটীর মুখের দিকে আমি তাকালাম। ঘরের মধ্যে অন্যান্য সকলেও পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

কোন কথাই কি আপনার মনে পড়ছে না রাধারাণী দেবী? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

কই না তো!

এই বাড়ি, ঘর, দুয়ার, আপনার স্বামী, আপনার দাদা মহিমাবাবু—

দাদা মহিমাবাবু! অস্পষ্ট ভাবে কেবল উচ্চারণ করলেন কথাগুলো রাধারাণী দেবী।

আমাকেও কি তুই চিনতে পারছিস না রাধারাণী ?

মৃদু ভাবে ঘাড়টা কেবল নাড়লেন রাধারাণী। বোঝা গেল, মহিমারঞ্জনকেও তিনি চিনতে পারছেন না।

কাকীমা! এবারে আনন্দ সান্যাল ডাকল রাধারাণীকে।

রাধারাণী আনন্দের ডাকে মুখ তুলে তাকালেন, কিন্তু তাঁর অসহায় নিরুৎসুক দৃষ্টি থেকে বোঝা গেল স্পষ্টই যে, তাকে তিনি চিনতে পারছেন না।

দু হাতে হঠাৎ রাধারাণীকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে আনন্দ সান্যাল ডাকলে, কাকীমা! কাকীমা! তুমি কি আমাদের কাউকেই চিনতে পারছ না ?

পূর্বের মতই মৃদু ঘাড় নেড়ে রাধারাণী জানালেন, না।

রাধারাণী দেবী কাউকেই চিনতে পারছেন না।

মহিমারঞ্জন ব্যাকুল হয়ে আবার যেন ভগ্নীকে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিরীটী তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, থাক্, ওঁকে আর বিরক্ত করবেন না মহিমাবাবু। সম্ভবতঃ কোন কারণে মনে হচ্ছে ওঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে!

কি বলছেন আপনি!

মহিমারঞ্জনের প্রশ্নটা যেন একটা আর্ত চিৎকারের মতই শোনাল।

অতঃপর কিরীটী বললে, চলুন এ-ঘর থেকে। ওঁকে আর বিরক্ত না করাই ভাল।

সকলে নিঃশব্দে আমরা ঘর হতে বের হয়ে এলাম।

•

সচ্চিদানন্দবাবুর শয়ন-কক্ষটি একবার দেখা প্রয়োজন।

সকলে আমরা মহিমারঞ্জনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের দিকেই এবারে অগ্রসর হলাম।

এ-বাড়ির প্যাটার্নটা একটু অদ্ভুত।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি দোতলার বারান্দাটা বেঁকে গিয়েছে পশ্চিম দিক হতে দক্ষিণকে কেন্দ্র করে পূর্বপ্রান্তে। বেশ চওড়া বারান্দা, আগাগোড়া সাদা-কালো মার্বেল পাথরে মোড়া।

উপরে সর্বসমেত সাতখানি ঘর এবং তিনটি বাথরুম। দুটি বাথরুম দুটি ঘরের সংলগ্ন। তৃতীয়টির সঙ্গে ঘরগুলির কোন নিকট যোগাযোগ নেই। সাতটি

ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘরটিই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত—হলঘরের মত। তার ঘরেই আমরা সমবেত হয়েছিলাম সর্বপ্রথমে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চন্দ্রাকৃতি বারান্দার এধারে দুখানি ঘর, বাকি পাঁচখানি ঘর বারান্দার অন্য অংশে।

প্রথম ঘরটিতে থাকে আনন্দ সান্যাল। দ্বিতীয়টি প্রায় খালি, সচ্চিদানন্দ তাঁর কাজ-কর্ম করতেন ঐ ঘরে বসে। তৃতীয়টি হলঘর। চতুর্থটিই ব্যবহার করতেন মহিমারঞ্জন। পঞ্চমটিতে থাকেন রাধারাণী দেবী, সপ্তম ও সর্বশেষ ঘরটিতে থাকতেন সচ্চিদানন্দ নিজে। রাধারাণী ও সচ্চিদানন্দর ঘরের মধ্যবর্তী সর্বাপেক্ষা ছোট ঘরখানি—যেটা এযাবৎকাল স্টোর-ঘর রূপে ব্যবহৃত হত, মণিকা এ-বাড়িতে আসবার পর থেকে, সেই ঘরখানিই পরিষ্কার করে অধিকার করেছিল।

আমরা সকলে মহিমারঞ্জনকে অনুসরণ করে বারান্দার শেষপ্রান্তে সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম। সেই ঘরেরই অল্প তফাতে তিনতলায় ওঠবার সিঁড়ি।

ঘরখানি আকারে বেশ বড়। সামান্য কিছু মূল্যবান আসবাবপত্রও আছে ঘরের মধ্যে।

একপাশে সিঙ্গল্ খাটে শয্যা বিস্তৃত। নিভাঁজ শয্যাটি দেখলেই বোঝা যায়, গতরাত্রে আদৌ ব্যবহৃত হয়নি।

তার পাশে একটি শ্বেত-পাথরের ত্রিপয়। ত্রিপয়ের উপরে একটি রেডিয়াম-ডায়াল দেওয়া সুদৃশ্য টাইম-পিস্।

টাইম-পিস্‌টির দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল, ঘড়ির কাচটা বিশ্রীভাবে ফাটা। কোন শক্ত কিছুতে আঘাত লেগেই নিশ্চয় ঘড়ির কাচটা চিড় খেয়ে গিয়েছে। তারই পাশে একটি কালো কাচের গায়ে সোনালী ডিজাইন করা সুদৃশ্য ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা রজনীগন্ধা। এখনো শুকিয়ে যায়নি, মৃদু সুরভি দিচ্ছে। এক পাশে প্রমাণ সাইজের আয়না বসানো এক-পাল্লার একটি আলমারি। তার উল্টো দিকে একটি ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলের উপরে দাড়ি কামাবার সাজ-সরঞ্জাম সুন্দরভাবে সাজানো। তারই পাশে একটি আয়রন-সেফ চৌকির উপরে বসানো। তার ধার ঘেঁষে একটি আলনা। আলনায় কয়েকটি ভাঁজ করা ধুতি ও হ্যাঙারে পাঞ্জাবি ঝুলছে। নীচে কয়েক-জোড়া চকচকে জুতো। ঘরের সর্বত্র—সমস্ত জিনিসপত্রের মধ্যেই একটা চমৎকার সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতা ও রুচির প্রকাশ।

ঘরের মেঝেতে কোন কার্পেট নেই। কালো ইটালিয়ান মার্বেল পাথরে তৈরী পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে মসৃণ মেঝে। দেওয়ালে বা মেঝেতে কোথাও এতটুকু ঝুল বা ধুলোর নামগন্ধ নেই।

উত্তর, দক্ষিণ ও পূব—তিন দিকই ঘরের খোলা। জানলা রয়েছে। জানলায় ফিকে নীল রংয়ের দামী নেটের পর্দা খাটানো। খান দুই সোফাও একদিকে রয়েছে। সোফার মধ্যবর্তী জায়গায় ছোট একটি নীচু টেবিলের উপরে একটি টেলিফোন ও টেবিল-ল্যাম্প।

ঘরের মধ্যে সবই রয়েছে প্রয়োজনীয়, কেবল বসে লেখা-পড়া করার জন্যে টেবিল বা ঐ জাতীয় কোন ব্যবস্থা নেই।

ঘড়ির কাচটা ভাঙা দেখছি! ঐরকম ভাঙাই ছিল নাকি মহিমাবাবু?

কিরীটীর প্রশ্নে আকৃষ্ট হয়ে মহিমারঞ্জন ত্রিপয়ের উপরে রক্ষিত কাচ-ভাঙা টাইম-পিস্‌টার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাই তো দেখছি! কিন্তু কালও সকাল বেলা এ-ঘরে এসে সচির সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম—কই, তখন ভাঙা দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!

আপনি একবার অন্যান্য সকলকে জিজ্ঞাসা করে আসুন তো মহিমাবাবু, তারা কেউ জানে কিনা?

মহিমারঞ্জন চলে গেলেন ঘর থেকে বের হয়ে।

কিরীটী ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সর্বত্র দেখতে লাগল। হঠাৎ একসময় নীচু হয়ে খাটের তলায় দৃষ্টিপাত করেই, ভেতরে ঢুকে কি টেনে বের করে আনল।

একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো ফটোগ্রাফ।

কার ফটোগ্রাফ?

এগিয়ে গেলাম।

একটি তরুণীর ফটো। কিন্তু ফটোর তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন মনে হল, মুখটি চেনা-চেনা। কোথায় যেন দেখেছি।

একদৃষ্টে কিরীটী ফটোর মধ্যস্থিত তরুণীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হাফ বাস্ট।

চিনতে পারছিস সুব্রত?

কিরীটীর প্রশ্নে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

চিনতে পারছি, অথচ ঠিক চিনতে পারছি না। কোথায় দেখেছি ঠিক অমনি একখানি মুখ, অথচ মনে করতে পারছি না সঠিক। কোথায়—কোথায় দেখেছি!

কি রে, চিনতে পারছিস না? আবার প্রশ্ন করে কিরীটী।

চুপ করে থাকি।

কিরীটী ফটোটা বলীন সোমের দিকে এগিয়ে বললে, দেখুন তো সোম, মুখটা চিনতে পারেন কিনা?

না তো! দেখতে দেখতে জবাব দিলেন সোম।

দেখুন তো ভাল করে, মণিকা দেবীর মুখের আদল অনেকটা কি পাচ্ছেন না?

তাই তো! সত্যিই, মণিকার মুখের আদলই তো রয়েছে ছবির মধ্যে!

কিন্তু ফটোটা খাটের তলায় এ অবস্থায় গেল কি করে, রায়? সোম প্রশ্ন করলেন।

কেমন করে আবার! কারও হস্ত-তাড়িত হয়ে।

একটু পরে মহিমারঞ্জন ফিরে এলেন।

কি খবর মহিমাবাবু? কেউ জানে?

না, কেউই বলতে পারল না। সকলেই বলছে ঘড়ির কাচটা ভাঙা ছিল না।

মণিকা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

করেছিলাম।

তিনি কি বললেন?

সেও কিছু জানে না বললে।

হুঁ। আচ্ছা চলুন, সচ্চিদানন্দবাবুর বসবার ঘরটা একবার দেখব।

বসবার ঘরটা খোলা থাকে না। দরজায় হ্যাণ্ডেলের সঙ্গেই তালা লাগাবার ব্যবস্থা আছে।

মহিমারঞ্জন তাই বললেন, কিন্তু সে ঘরে তো সব সময় দরজায় তালা দেওয়া থাকে। তালার চাবি বরাবর সচির কাছেই থাকত। চাবিটা কোথায় জানি না তো। চাবি না হলে—

সচ্চিদানন্দের শোবার ঘরের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও তাঁর চাবির গোছাটা পাওয়া গেল না।

বাড়ির সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও চাবির গোছার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউই বাড়ির মধ্যে বলতে পারল না, কোথায় তিনি চাবি রাখতেন।

দরজার তালা ভেঙেই তাহলে না হয় চলুন, ঘরটা দেখা যাক কিরীটীবাবু। বলীন সোম বললেন।

হ্যাঁ। ঘরটা দেখতে হবে বৈকি। চলুন—তাই না হয় করা যাক।

কি আশ্চর্য! দরজার তালাটা আর ভাঙার প্রয়োজন হল না। দরজা ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। বোঝা গেল চাবি দেওয়া ছিল না।

মহিমারঞ্জন কেবল ঠেলতেই ঘরের দরজাটা খুলে যাওয়ায় বললেন, আশ্চর্য! এ ঘরের দরজা তো তাকে ভুলেও কখনো খোলা রাখতে দেখিনি! ঘরের মধ্যে সব প্রয়োজনীয় জরুরী কাগজ-পত্র, ডকুমেণ্ট থাকত বলে—এ ঘরের ব্যাপারে বরাবরই তাকে বিশেষ সতর্ক দেখেছি।

যা হোক, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল।

ঘরের মেঝেতে সর্বত্র কাচের টুকরো ও ছেঁড়া কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে। আর মস্ত বড় কাচের প্লেট দেওয়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপরে একটা কালো রঙ-এর পেট-মোটা বেঁটে Vat 69-এর বোতল। তার পাশেই একটা সোডা সাইফন দাঁড় করানো আছে।

ঘরের চারপাশে চার দেওয়াল ঘেঁষে দুটি কাচের বুক-সেল্‌ফ ও স্টীলের তৈরী আলমারি। একটা বড় সোফা ও খান দুই চেয়ার।

কিরীটী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, নীচু হয়ে মেঝে থেকে সন্তর্পণে কাচের টুকরো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কয়েকটা কাগজের টুক্‌রো তুলে নিয়ে সেগুলো দেখল। তারপর আবার এক এক করে মেঝে থেকে সমস্ত কাগজের টুকরোগুলিই কুড়িয়ে নিল। কাগজের কুড়োনো ছিন্ন অংশগুলো সব কিরীটী জামার পকেটে তুলে রাখল এবং এই সর্বপ্রথম এ ঘরে প্রবেশ করে কতকটা স্বগতোক্তির মতই মৃদুভাবে বললে, একটা ছোটখাটো প্রলয়!

তারপরেই এগিয়ে গিয়ে একে একে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ারগুলো ও আলমারির দরজাগুলো টেনে টেনে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

সবই বন্ধ। কোনটাই খোলা নয়। এবং ঐ ঘরের মধ্যেও সচ্চিদানন্দর চাবির গোছাটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

কিরীটী বলীন সোমের দিকে তাকিয়ে বললে, আনন্দবাবুকে একবার ডাকতে পারেন মিঃ সোম?

মহিমারঞ্জন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, তিনি সোমের নির্দেশে আনন্দ সান্যালকে ডাকতে গেলেন।

অত্যল্পকাল পরেই মহিমারঞ্জনের পিছনে পিছনে আনন্দ সান্যাল আবার ঘরে এসে প্রবেশ করে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

এই যে আনন্দবাবু! আপনাকে আবার কষ্ট দিলাম। আপনি তো এই ঘরের

পাশেই থাকেন, কাল রাত্রে এই গ্লাস ভাঙার কোন শব্দ পাননি? বলে চোখের ইঙ্গিতে ঘরের মধ্যে ইতস্তত: ছড়ানো ভাঙা কাচের গ্লাসের টুকরোগুলো দেখিয়ে দিল।

ভাঙা ছড়ানো কাচের টুকরোগুলোর দিকে ক্ষণকাল নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে আনন্দ সান্যাল জবাব দিল, না। কোন শব্দই পাইনি-তো—

কোন শব্দই পাননি পাশের ঘরে থেকেও? ঘুমটা তাহলে আপনার খুব গাঢ়ই বলতে হবে! শেষের দিকে কিরীটীর কথার মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যঙ্গটা যেন আনন্দকে স্পর্শই করল না।

সে পূর্ববৎ ধীর চাপা কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ। ঘুম আমার সহজে ভাঙে না—

গতরাত্রে কখন শুতে যান?

রাত কটা ঠিক বলতে পারি না। তবে সওয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা হবে। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।

কিরীটী আনন্দ সান্যালের সঙ্গে কথা বলছিল বটে, তবে শ্যেনদৃষ্টিতে যেন তার সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। হঠাৎ আবার সে প্রশ্ন করলে, পায়ে কি আপনার ব্যথা আনন্দবাবু?

ব্যথা!

হ্যাঁ, প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলাম, ডান পা-টা যেন আপনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। কি হয়েছে পায়ে?

শেষের প্রশ্নে মনে হল আনন্দ সান্যালের মুখটা যেন সহসা দপ্ করে কেমন নিভে গিয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল এবার আনন্দ সান্যাল, কাল বাগানে বেড়াতে গিয়ে একটা পেরেক বিঁধেছিল পায়ে, তাই সামান্য একটু ব্যথা।

তবে যে একটু আগে বললেন, কোন ব্যথা নেই পায়ে।

ও এমন কিছু না, তাই—

কিরীটী আর দ্বিরুক্তি না করে বললে, গতকাল দিনে বা রাত্রে শেষবার আপনার দেখা হয় আপনার কাকা সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে, আনন্দবাবু?

অফিস থেকে ফিরে তখন তিনি বের হচ্ছিলেন যেন কোথায়, সিঁড়ির নীচে দেখা হয়েছিল।

আর দেখা হয়নি?

না।

জানেন না গতরাত্রে কখন তিনি ফিরেছেন ?

না।

অতঃপর বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, বাড়ির দরজায় পুলিস প্র   য়েন করে ও বাড়ির সকলকে আপাততঃ পুলিসের বিনা অনুমতিতে কোথাও না যাবার নির্দেশ জানিয়ে আমরা সকলে সচ্চিদানন্দর গৃহ থেকে বের হয়ে এলাম।

সারাটা পথ গাড়িতে আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি কথাও হল না।

কিরীটী গাড়ির ব্যাকে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল। আমহার্স্ট-স্ট্রীটে আমার নিজের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে কিরীটী চলে গেল।

শুধু বললে, সন্ধ্যার দিকে সময় পেলে যেন তার ওখানে একবার যাই।

বললাম, যাব।

আহারাদির পর শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে ঘুমবার চেষ্টা করতে করতে দানন্দের আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটাই আগাগোড়া আর একবার সুশৃঙ্খলভাবে পর প্রথম থেকে ভাববার চেষ্টা করছিলাম।

যতটুকু জানা গিয়েছে এবং বোঝা যাচ্ছে তাতে করে স্পষ্টই মনে হয়, সচ্চিদানন্দকে কেউ না কেউ হত্যাই করেছে। আর এও বুঝতে কষ্ট হয় না, বাইরে থেকে কেউ এসে হত্যা করেনি। করেছে গতরাত্রে বাড়ির মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ না কেউ।

কিন্তু কে ? কে হত্যা করল সচ্চিদানন্দ সান্যালকে ?

মহিমারঞ্জন, আনন্দ সান্যাল, নন্দন, বিজনবিহারী—সচ্চিদানন্দের বাড়ির সরকার, এই চারজন পুরুষের মধ্যে তিনজন উপরেই থাকতেন এবং তাঁদের মধ্যে কারুর পক্ষেই সচ্চিদানন্দকে হত্যা করা অসম্ভব ছিল না। বাকি বিজনবিহারী নীচে থাকেন। মণিকা দেবীর কথা যদি সত্যিই হয়, তাহলে উপরে সিঁড়ির দরজা বন্ধ ছিল যখন, তখন তাঁর পক্ষে উপরে গিয়ে সচ্চিদানন্দকে হত্যা করা অতটা সহজসাধ্য নিশ্চয়ই ছিল না।

পুরুষদের বাদ দিলে বাকি থাকে দুজন নারী। সচ্চিদানন্দর স্ত্রী রাধারাণী ও অভিনেত্রী মণিকা দেবী। তারাও হত্যা করতে পারে।

ডাক্তার হরপ্রসন্ন বলেছেন, কোন তীব্র বিষের ক্রিয়ায় নাকি মৃত্যু ঘটেছে। সেক্ষেত্রে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিষ প্রয়োগের দ্বারাই সচ্চিদানন্দকে হত্যা করা

হয়েছে—তা সে যেই করুক। এবং ময়না তদন্তের দ্বারা সেটা প্রকাশ পাবেও সম্ভবতঃ। সমগ্র ঘটনার মধ্যে কয়েকটি ব্যাপার বিশেষভাবে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে—কাচঘরের মধ্যে সচ্চিদানন্দের মৃত্যু! এবং সম্ভবতঃ তাঁর মৃত্যু ঘটেছে রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে। কিন্তু অতরাত্রে তিনি কাচঘরে গিয়েছিলেন কি করতে? হত্যাকারীই কি তবে তাঁকে অত রাত্রে কাচঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, নিরিবিলিতে হত্যা ব্যাপারটা সম্পন্ন করবার জন্য? দ্বিতীয়তঃ সচ্চিদানন্দর দোতলার অফিস-ঘর—সর্বদা যেটা তালাবন্ধই থাকত, সেটা খোলা ছিল কেন? আর কাচের গ্লাসভাঙা টুকরোগুলোই বা সেখানে ছড়ানো ছিল কেন? টেবিলের উপরে রক্ষিত মদের বোতল ও সোডা সাইফন দেখে মনে হয় গত রাত্রে কিরীটীর ওখান থেকে গৃহে ফিরবার পর নিশ্চয় তিনি মদ্যপান করেছিলেন। এবং সম্ভবতঃ যে গ্লাসটা ভাঙা অবস্থায় ঘরের মধ্যে দেখা গিয়েছে, সেই গ্লাসেই মদ্যপান করেছিলেন। কারণ অন্য কোন গ্লাস ঘরে দেখা যায়নি। গ্লাসটা ভাঙল কি করে? তাঁরই হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙেছে, না নেশার ঝোঁকে ইচ্ছে করে ভেঙেছেন, না অন্য কেউ ভেঙেছে? তৃতীয় ব্যাপার: সচ্চিদানন্দর ঘরের টাইম-পিসটার কাচ, যেটা পূর্বে কেউ ভাঙা দেখেনি, সেটা কি করে ভাঙল? চতুর্থ, সচ্চিদানন্দর খাটের তলায় প্রাপ্ত দোমড়ানো-মোচড়ানো সেই ফটোটা, যার সঙ্গে অভিনেত্রী মণিকা দেবীর অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে। পঞ্চম, রাধারাণী দেবীর পূর্ব-স্মৃতি লোপ। সচ্চিদানন্দর মৃত্যু ও অন্যান্য ব্যাপারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও অদ্ভুত একটা পারম্পর্য আছে যেন। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্রে সব কিছু বাঁধা পরস্পরের সঙ্গে।

সব কিছু যেন একই কেন্দ্রে একাগ্রীভূত হয়ে উঠেছে।

তারপর গত রাত্রে সচ্চিদানন্দ বর্ণিত কাহিনী; তার কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তাও এখন বোঝা যাচ্ছে না। তিনি অনেক কথাই বলেছিলেন গত রাত্রে, আবার অনেক কথাই যেন বলেননি। ইচ্ছে করেই কি প্রকাশ করেননি? তারপর ঐ বাড়ির লোকগুলো—ভাবতে লাগলাম, ঐ বাড়ির লোকগুলোর কথা।

সচ্চিদানন্দর মৃত্যুর ঠিক ছ মাস আগে এ বাড়িতে তাঁর শ্যালক মহিমারঞ্জনের আবির্ভাব ঘটে। তার তিন মাস পরে এলেন ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সান্যাল, তার দেড় মাস বাদে এল শিবানী পরিচয়ে অভিনেত্রী মনিকা দেবী। গৃহে একমাত্র বিকৃত-মস্তিষ্ক রাধারাণী বাদে আপনার বলতে কেউ ছিল না এতদিন। ছ মাসের মধ্যে একে একে তিনজন এসে ভিড় করে দাঁড়াল। সঙ্গে এল

আবার মণিকার ভৃত্য নন্দন।

ধন-প্রাচুর্য যথেষ্টই ছিল সচ্চিদানন্দ সান্যালের।

আচ্ছা, বাড়ির চাকর-বাকরগুলো! তারা অবশ্য নীচেই থাকত। ভৃত্য মাত্র দুজন—সুবল আর রাজু। এবং রাতদিনের একজন ঝি সাবিত্রী। সাবিত্রীও নীচেই থাকত ইদানীং রাত্রে—মণিকা আসবার পর থেকে। মণিকারই ব্যবস্থামত সেটা হয়েছিল।

তিনজনেই পাঁচ-ছ বছর প্রায় এ বাড়িতে আছে। পুরনো লোক। তাদের অবশ্য কিরীটী কোন জিজ্ঞাসাবাদই করেনি।

কেন করেনি, তা সে-ই জানে। হয়তো বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে করেনি—এমনও হতে পারে। বা প্রয়োজন বোধ করেনি বলেই করেনি।

ও-বাড়ি থেকে আসবার মুখে তিনজনই ওরা বাইরের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে। একবার মাত্র কিরীটী তাদের দিকে তাকিয়ে মহিমারঞ্জনকে প্রশ্ন করেছিল, ওরা কে? মহিমারঞ্জন বলেছিলেন, রাজু আর সুবল চাকর, সাবিত্রী ঝি বহুদিন থেকে রাধারাণীর দেখাশুনা করবার জন্যে নিযুক্ত আছে।

রাজু আর সুবলের মধ্যে সুবলের বয়স হয়েছে—প্রৌঢ়। রাজুর বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হবে বলে মনে হল না। বেশ একটু বাবু ও ফিটফাট বলেই মনে হল। সে-ই ছিল নাকি সচ্চিদানন্দর খাস ভৃত্য। ঐ তিনজন ছাড়া মণিকার ভৃত্য নন্দনও। তাকেই একমাত্র উপরে দেখা গিয়েছিল। সে নাকি রাত্রে মধ্যে মধ্যে দোতলার বারান্দায় শুত। অবশ্য গত রাত্রে নীচেই ছিল, পরে উপরে যায়।

এবং ভৃত্য হলেও একমাত্র নন্দনের সঙ্গে অন্যান্য ভৃত্যদের পার্থক্যটা চোখে যে পড়েনি তা নয়।

নবাগত মণিকা ও ভৃত্য নন্দন ও-বাড়িতে যে বেশ একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে—এই মাসের মধ্যেই সেটাও চোখে পড়ল।

সন্ধ্যার দিকে কিরীটীর বাড়ি গিয়ে দেখি, সে ফোনে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। কৃষ্ণা সোফার উপরে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বাংলা উপন্যাস পড়ছে।

আমার পদশব্দে ফোন করতে করতে কিরীটী আমার মুখের দিকে বারেক তাকালেও নিজের ফোন করা নিয়ে ব্যস্ত রইল।

একেবারে সোজা গিয়ে কৃষ্ণার পাশের সোফাটার উপরে বসতেই সে ফিরে তাকাল।

ঠাকুরপো যে, কখন এলে ?

এই মাত্র। এক কাপ চা খাওয়াও না—

চায়ের কথা ও আগেই বলেছে। বস, জংলি এখুনি আনছে।

বলতে বলতেই জংলি চায়ের ট্রে হাতে ঘরে প্রবেশ করল।

কিরীটীরও বোধ হয় ফোন করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেও পাশে এসে বসল ঐ সময়।

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে সচ্চিদানন্দর হত্যা-ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চলতে লাগল।

কথায় কথায় কিরীটী এক সময় বললে, সচ্চিদানন্দর সলিসিটারকে ফোন করছিলাম, সচ্চিদানন্দ উইল কিছু করে গিয়েছেন কিনা জানবার জন্য।

কি বললেন সলিসিটার ?

করেছেন এবং উইলটা একটু interestingই বলতে হবে। অবিশ্যি উইলটা আজকের করা নয়—আজ থেকে ন বছর আগেকার উইল।

তাই নাকি ! এই ন বছরে আর উইল বদলায়নি লোকটা ! আশ্চর্য !

তাই বটে। উইলে আছে, সচ্চিদানন্দর যাবতীয় সম্পত্তির যা valuation হবে, মায় ব্যাঙ্কের জমানো টাকা ও ব্যবসা নিয়ে—তার তিন-এর চার অংশ পাবে তাঁর বন্ধু-কন্যা শিবানী দেবী।

বলিস কি !

হ্যাঁ। বাকি এক-চতুর্থাংশের অর্ধেক পাবেন তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী, বাকি অর্ধেক বর্তাবে ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সান্যালকে। অবশ্য তাঁর স্ত্রী যতদিন জীবিতা থাকবেন, তাঁর মাসোহারার একটা ব্যবস্থা আছে। ব্যবসা থেকে দুশো টাকা করে পাবেন, আর কলকাতার কাঁটাপুকুরের বাড়িতে থাকতে পাবেন।

সত্যিই উইলটা বিচিত্র ! এবং উইল থেকে বোঝা যাচ্ছে, ঢাকা থেকে শিবানীদের আসবার পরই হয়তো উক্ত উইল লেখা হয়েছিল।

সামান্য বন্ধু-কন্যার প্রতি এতখানি প্রীতি কেমন যেন একটু অস্বাভাবিকই লাগছে না ? বিশেষ করে, যে বন্ধুর মৃত্যুর পর সাত-আট বছর তার পরিবারের কি হল না হল জানবারও কোন চেষ্টাও হয়নি ? কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললে।

সব কিছু বাঁকা দেখাই যেন তোমার একটা স্বভাব। কেন, কত লোক তো নিঃস্ব পরকেও সব কিছু দান করে যায় কত সময়! প্রতিবাদ জানায় কৃষ্ণা।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, স্বার্থ টাই যে বাঁকা পথে চলে কৃষ্ণা, মানুষকে তাই তো বাঁকা ভাবে সব দেখতে হয়।

তা নয় গো, তা নয়। খুন, জখম, হত্যা, রাহাজানি, জাল, বাটপাড়ি, চুরি, ডাকাতি এই সব নিয়ে দিনের পর দিন ঘেঁটে ঘেঁটে তোমার মনও ঐ বাঁকা সব কিছুতেই দেখে। কিন্তু জেনো, পৃথিবী কেবল ঐ সব দুষ্কৃতি নিয়েই নয়। এই পৃথিবীর মানুষই নিঃস্ব হয়ে দান করতে পারে, পরস্পরের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।

কৃষ্ণার কথায় সত্যিই যেন চমকে উঠলাম। সত্যিই তো! ও তো একেবারে মিথ্যে বলেনি!

কিরীটীর দিকে কিন্তু তাকিয়ে দেখি, সে মৃদু মৃদু হাসছে।

কুপিতা হচ্ছ কেন প্রিয়ে! আমার যাবতীয় কাজের কেবল একটা দিকই তোমার চোখে পড়ল কিন্তু অন্য একটা দিকও যে আছে, সেটা তো কই তোমার চোখে পড়ল না! পৃথিবীতে মানুষকে যদি বাঁচতেই হয়, তবে সব জেনে শুনে বুঝে বাঁচাই তো ভাল। এই খুন, হত্যা, জখম, রাহাজানি, জাল জুয়াচুরি যে চলেছে—কেন চলেছে? অভাবে না স্বভাবে? কই, একথাটা তো কোনদিন তোমাদের মনে হয়নি! এত ধরপাকড় দেখেও তো কই মানুষ সাবধান হয় না, সৎ পথে চলে না?

কিন্তু এতে লাভ কি সত্যিকারের বলতে পার? কেবল কাদাই তো ঘেঁটে মরছ দিনের পর দিন!

ভুলো না কৃষ্ণা, এই কাদামাখা লোকগুলোর মধ্যেও মানুষ আছে। তারাও তোমাদের মত তথাকথিত সৎ ও সজ্জন। আর কাদা ঘাঁটার কথা যদি বল, তাহলে বলব, অবস্থা বিশেষের কথা কেউ তো জোর করে বলতে পারে না। কাল যে তুমিই কাদা ঘাঁটবে না, কে বলতে পারে? চোর, জুয়াচোর, জালিয়াৎ মাত্রই হয়তো সত্যিকার জন্ম-অপরাধী নয়। জন্ম-পরিবেশ, জীবন-পরিস্থিতি অনেক কিছুই হয়তো দায়ী এদের চোর-ডাকাত-হত্যাকারী প্রভৃতি পরিচয়ের মধ্যে। আমি তাই কাদা ঘাঁটি—যদি এই সব দেখে-শুনে তাদের চোখ খোলে। তারা নিজেদের নিজে চিনতে পারে!

একটানা কথাগুলো বলে বললে, বকবক করে গলা শুকিয়ে গিয়েছে। দেখ,

যদি একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে পার।

কৃষ্ণা আর কোন কথা বললে না, নিঃশব্দে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

উক্ত ঘটনার পর আরো চার-পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে। সচ্চিদানন্দর হত্যা-ব্যাপারের কোন কিছুই আর অগ্রসর হয়নি। কেবল নতুন দুটি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এক নম্বর ময়না-তদন্তের রিপোর্ট। সচ্চিদানন্দর পাকস্থলীতে অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছিল। প্রমাণ হয়েছে তাতে, সে-রাত্রে তিনি মদ্যপান করেছিলেন বাসায় ফেরার পর। দ্বিতীয়তঃ, সচ্চিদানন্দর মৃত্যুর কারণ সম্ভবতঃ দুটি। একটি—বেস অফ দি স্কালের ফ্র্যাকচার, দ্বিতীয়তঃ হাই ডোজে মরফিন। এবং সম্ভবতঃ মরফিনটা তাঁর ঘাড়েই ইনজেকশন করা হয়েছিল। ঘাড়ের টিস্যুতে নাকি খানিকটা একিমোসিস আঘাতের রক্ত জমার চিহ্নও ছিল এবং পুলিস-সার্জনের অভিমত—ঐ আঘাতেই বেস অফ দি স্কালের ফ্র্যাকচার হয়েছিল। অথচ ব্যাপারটা আমাদের কারোরই নজরে পড়েনি প্রথম দিন মৃতদেহ পরীক্ষা করবার সময়। এবং নজরে পড়েনি—সম্ভবতঃ সচ্চিদানন্দর ঘাড়ে ঘন লম্বা চুল থাকায়।

কিরীটী ইতিমধ্যে বার দুই সচ্চিদানন্দর বাড়িতে ঘুরেও এসেছে।

আরো দিন চারেক বাদে কিরীটীর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, সন্ধ্যার দিকে সচ্চিদানন্দর ওখানেই গিয়েছে।

অপেক্ষা করে রইলাম তার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করব বলে।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কিরীটী ফিরে এল। মুখটা যেন কেমন বিমর্ষ ও ক্লান্ত। ঘরে ঢুকে সোফার উপর বসে একটা সিগারে অগ্নি-সংযোগ করে টানতে লাগল সে।

সচ্চিদানন্দর ওখানে গিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

কিরকম বুঝছিস?

বিশেষ কিছুই না। রাধারাণী দেবী পূর্ববৎ। আজও অনেক চেষ্টা করলাম তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরিয়ে আনবার জন্য, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না। আর আর লোকগুলোও যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমার কি মনে হচ্ছে জানিস সুব্রত?

কি? ওর মুখের দিকে তাকালাম।

হয় ওরা সব কজনই খুব চালাক, না হয় আমিই বোকা।

মণিকা দেবীর সংবাদ কি?

সত্যিই যদি তার সবটাই অভিনয় হয় তো বলব, এত বড় অভিনেত্রী জীবনে আর আমি দেখিনি। বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কাগজের বাক্স বের করলে কিরীটী।

প্রশ্ন করলাম, কিরে ওটা ?

একটা 2 & half cc. hypodermic syringe…

সিরিঞ্জ! কোথায় পেলি ?

রাধারাণী দেবীর ঘরে।

রাধারাণী !

হ্যাঁ। ডাক্তারের প্রত্যহ নির্দেশ ছিল ঘুমের জন্য তাঁকে মরফিন ইনজেকশন দেবার।

তা ওটা তুই নিয়ে এলি যে বড় ?

প্রয়োজন আর হচ্ছে না তাই। সেই রাত্রি থেকেই মাথার যাবতীয় গোলমাল যেমন একেবারে নিঃশেষে লোপ পেয়েছে, তেমনি বিনা মরফিনেই অপূর্ব শান্ত হয়ে দিনে-রাত্রে বেশীর ভাগ সময়ই গভীর নিদ্রা দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা। তাই ডাক্তারের নির্দেশে মরফিন বন্ধ রাখা হয়েছে।

ভদ্রমহিলা কতদিন ধরে মরফিন নিচ্ছিলেন ?

মাস চারেক হবে শুনলাম।

কোন addiction হল না ?

হয়েছিল হয়তো—তবে স্মৃতি লোপের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো addictionও লোপ পেয়েছে।

ডাক্তারী শাস্ত্রে এমন হয় নাকি ?

ডাক্তারী শাস্ত্র তো জানি না, তবে অভ্যাস আর ব্যামোর কথাও বলা যায় না ভাই।

তবে বল, সান্যাল-বাড়িতে আপাততঃ বেশ নিরুপদ্রবেই সকলের জীবন-যাত্রা অতিবাহিত হচ্ছে ?

তা হচ্ছে।

তারপর নিঃশব্দে অর্ধ-সমাপ্ত সিগারটায় আরো গোটা দুই টান দিয়ে কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আমাদের অভিনেত্রী মণিকা দেবী সম্পর্কে আরো একটু বিশদভাবে তাঁর অতীত জীবনের খোঁজ-খবর করতে বলেছিলাম, করেছিলি ?

কিরীটী আমাকে মণিকা দেবী সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিল বটে এবং আমিও খোঁজ নিয়েছিলাম। বললাম, হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। গত চার-পাঁচদিন তো সেই ব্যাপার নিয়েই অভিনেত্রী মহলে একটু ঘন ঘন যাতায়াত করছিলাম। কিন্তু সেখানেও বেশ ধোঁয়া।

কি রকম? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হেসে জবাব দিলাম, তাছাড়া আর কি বলব। অকস্মাৎ ধূমকেতুর মতই একদিন পাঁচ বছর আগে অভিনয়-জগতে উদিতা হয়ে, গৌরবের শিখরে উত্তীর্ণা হয়ে আবার গৌরব-শিখর হতেই অকস্মাৎ চার মাস আগে অদৃশ্য হয়ে যান। বাড়িতে তাঁর দিনের বেলায় অনেকের সমাগম হলেও রাত্রে তাঁর দ্বার কারো কাছেই খুলত না। সন্ধ্যা ছটার বেশি কোনদিন কোন প্রডিউসার বা ডিরেকটারই কোন টাকার লোভেই স্যুটিংয়ের জন্য আটকে রাখতে পারেনি। তাঁর কনট্রাক্টই থাকত সন্ধ্যা ছটায় পাঙ্কচুয়ালি তাঁকে ছেড়ে দিতেই হবে। রাত্রে কখনো তিনি স্যুটিং করেননি। বাড়িতে লোকজনের মধ্যে ছিল ঐ ভৃত্য শ্রীমান নন্দন ও এক বুড়ী ঝি সরলা। এখন সরলা যে কোথায়, কেউ তা জানে না। তবে একটা কথা শুনেছি—

কি? কিরীটী প্রশ্ন করে আবার।

অভিনয়ের জগৎ থেকে সরে দাঁড়াবার মাস আষ্টেক আগে বনলতা নামে একটি অল্পবয়স্কা নবাগতা তরুণী অভিনেত্রীর সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হয় মণিকার। এবং সেই মেয়েটি হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। অনেকের ধারণা বনলতার অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে নাকি মণিকার হাত আছে।

কেন?

ডিরেকটার ব্রজেনবাবু নাকি একদিন বনলতা অদৃশ্য হওয়ার পর মণিকা দেবীর বাড়ির মধ্যে বনলতাকে পলকের জন্য দেখেছিলেন। এবং তিনিই বললেন, দুজনের, মানে মণিকা ও বনলতার চেহারার মধ্যে নাকি একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। কোন একটা বইয়ে মা ও মেয়ের পার্ট করবার জন্য ব্রজেনবাবুই সর্বপ্রথম বনলতাকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় interview দিতে তাকে মনোনীত করেছিলেন। দুজনের মধ্যে ঐ ধরনের সাদৃশ্য দেখে।

বনলতার খোঁজ আর কেউ এখন জানে না?

না।

সেই বইটার কি হল?

অন্য মেয়ে পার্ট করেছে।

কিন্তু বনলতার কনট্রাক্ট?

সেটা অবশ্য ব্রজেনবাবু ভাঙলেন না।

উক্ত ঘটনার দিন পাঁচেক পরে কিরীটীর বাসায় গিয়ে শুনলাম, সে নাকি দিন চার-পাঁচেকের জন্যে কোথায় গিয়েছে জরুরী কাজে, কৃষ্ণা নিজেও জানে না।

দিন চার-পাঁচেকের জায়গায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল, কিরীটীর কোন পাত্তা নেই। একটু অবাকই হলাম। কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ কিরীটী কোথায় ডুব দিল! এক-আধ দিন নয়, একটা পুরো সপ্তাহ চলে গেল, অথচ কিরীটীর সংবাদ নেই। এই একটা সপ্তাহ এক ছত্র চিঠি পর্যন্ত কৃষ্ণাকে সে দেয়নি। লোকটার হল কি?

কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে কৃষ্ণা!

কিরীটীর ব্যাপারে যেন তার তিলমাত্র চিন্তাও নেই। পূর্বের মতই সে হাসি-খুশি।

কিরীটীর অবর্তমানে সচ্চিদানন্দের মৃত্যু-রহস্যের উপর যেন একটা কালো যবনিকা নেমে এসেছে।

ভুলেই যেতে বসেছি যেন সে-কথা। রহস্য-উদ্ঘাটনের ব্যাপারে এমন তো কখনো পূর্বে পলাতক হতে দেখিনি বা নিশ্চুপ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে দেখিনি কিরীটীকে! কোন একটা রহস্যের ব্যাপার তার হাতে এলে, যাহোক একটা শেষ নিষ্পত্তি তার না করা পর্যন্ত কি নিদারুণ একটা অস্থিরতা তার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। নিজের মনে কি অদ্ভুত ভাবেই না ছটফট করতে দেখেছি তাকে।

মনের মধ্যে সত্যিই একটা উদ্বেগ অনুভব করছিলাম। হঠাৎ কেন সে নিখোঁজ হয়ে গেল?

প্রত্যহই প্রায় যাই কিরীটীর বাড়িতে তার খোঁজে। টেলিফোনে সংবাদ নিতে পারি, কিন্তু আশ যেন মেটে না। এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হয়, এইবার কিরীটীর সেই চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাব, কিন্তু পাই না। কৃষ্ণার সেই একই জবাব, না কোন খবর নেই।

শেষ পর্যন্ত ঠিক বারোদিন পরে একদিন গিয়ে দেখি, বাইরের ঘরে সোফায় বসে কৃষ্ণা ও কিরীটী গল্প করছে।

এই যে সুব্রত, আয়—আয়—

কি ব্যাপার, কোথায় ডুব দিয়েছিলি?

সচ্চিদানন্দর হত্যা-সন্ধানে। কেন, কৃষ্ণা তোকে কিছু বলেনি?

কই না তো! ওঃ, তবে তুমি সব জানতে?

কি করব বল, সত্যবদ্ধ ছিলাম। মুখ খুলতে পারিনি। ওকেই জিজ্ঞাসা কর না। এখন আবার বলা হচ্ছে, কৃষ্ণা জানায়নি?

আরে, সত্যি-সত্যি তুমি ওকে কোন কথা বলনি নাকি!

বলব মানে—promise করিয়ে নিয়েছিলে না!

কিন্তু যাক সে কথা। সে বোঝাপড়া ওর সঙ্গে পরে হবে—বলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কোথায় ছিলি এতদিন?

বললাম তো।

সব খুলে বল্।

কিরীটীর জবানিতেই এ কাহিনীর দ্বিতীয় অধ্যায় বর্ণনা করে যাই।

কিরীটী যে দীর্ঘ বারোদিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, সে সময়টায় সে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেনি। সে ইতিমধ্যে ঢাকায় গিয়েছিল সচ্চিদানন্দের বন্ধু যতীন্দ্র চাটুয্যে সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি ইতিহাসটা সংগ্রহ করতে ও সাধ্যমত আত্মগোপন করে মণিকা দেবীর পূর্ব-ইতিহাসটা যদি সংগ্রহ করতে পারা যায় —তারও চেষ্টায়। কিন্তু খুব বেশী যে একটা আশা বা উৎসাহ নিয়ে ফিরতে পেরেছে, সেটা তার কথাবার্তা শুনে মনে হল না।

সুদীর্ঘ ষোল বৎসর আগে যতীন চাটুয্যের মৃত্যু হয়েছে।

শহর-স্কুলের যে দু-একজন সহকর্মী শিক্ষক ভবতারিণী স্কুলে শিক্ষকতা করছেন, তার মধ্যে সুধীরবাবু ও মণিবাবুর মুখে যেটুকু কিরীটী সংবাদ পেয়েছে, তাও যেমন অস্পষ্ট, তেমনিই যেন অসম্পূর্ণ। যতীন চাটুয্যে লোকটি যেমন চিরদিন স্বল্পভাষী, তেমনি অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির ও ঘরকুনো ছিলেন।

শহরের কারো সঙ্গেই বড় একটা মিশতেন না।

সংসারে তাঁর স্ত্রী ও একটি মেয়ে ছাড়া কেউই ছিল না। যতীনবাবুর মত তাঁর স্ত্রীও অত্যন্ত মিতবাক ছিলেন, পাড়া-প্রতিবেশী কারও সঙ্গেই বড় একটা মিশতেন না। পাড়া-প্রতিবেশী সেটা বুঝত না, বলত, অহঙ্কার—দেমাক।

মধ্যে মধ্যে যতীনবাবুর নামে একটা রেজেষ্ট্রি চিঠি আসত স্কুলের ঠিকানাতেই।

চিঠিটা আসলে তিনি সই করে নিয়ে নিঃশব্দে পকেটে রেখে দিতেন। কেউ কোনদিন তাঁকে চিঠিটা খুলে পড়তে দেখেনি।

মণিবাবু বলেছিলেন, চিঠিটা আসত নাকি কলকাতা থেকে।

যতীনবাবুর মৃত্যুর পরও একবার চিঠি এসেছিল, কিন্তু চিঠির মালিক মৃত বলে চিঠিটা ফিরে যায়। তারই দিন আট-দশ পরে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক আসেন শহরে যতীনবাবুর খোঁজে। কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। কারণ তারই দিন তিনেক আগে এক রাত্রে যতীনবাবুর স্ত্রী তাঁর একটিমাত্র মেয়েকে নিয়ে কোথায় চলে যান শহর ছেড়ে, কেউ তা জানত না।

সেই ভদ্রলোকের নাম সুধামাধব সান্যাল। সুধামাধব কয়েকদিন শহরে থেকে যতীনবাবুর স্ত্রী ও কন্যার অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের কোন সংবাদ না পেয়ে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।

যতীনবাবুর স্ত্রী ও কন্যার কোন সংবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যতীন চাটুয্যে, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সংবাদ ঐটুকুর বেশি সংগ্রহ করতে পারা যায়নি। আর অভিনেত্রী মণিকা সম্পর্কেও কিরীটী বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি।

মাস ছয়েক আগে একটা বই শেষ হবার পর হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক তাঁর নতুন বইয়ের নায়িকার ভূমিকার জন্য মণিকা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তার কলকাতার বাসায় শুনতে পান, মণিকা দেবী অসুস্থ। কোথায় যে সে চেঞ্জে গিয়েছে, দরোয়ান বলতে পারে না।

অনেক খুঁজে-পেতে কিরীটী মণিকার পুরাতন দরোয়ান অযোধ্যা সিংকে কলুটোলার এক ধনী-গৃহে ধরে।

অযোধ্যা সিং প্রথমটায় মণিকা দেবী সম্পর্কে কোন কথাই বলতে চায় না।

অবশেষে অনেক কায়দা করে জপিয়ে এটুকু সংবাদ সংগ্রহ করেছে কিরীটী: মাস আষ্টেক আগে একদিন সন্ধ্যার সময় স্টুডিও থেকে স্যুটিং সেরে একটি জেনানাকে নিয়ে ফিরে আসে মণিকা। সেই জেনানাটি তারপর থেকে মণিকা দেবীর বাড়িতেই ছিল। তাকে কেউ কখনও দেড় মাসের মধ্যে ঐ বাড়ি থেকে একবারের জন্যেও বের হতে দেখেনি। এমন কি বাইরের ঘরেও কখনো তাকে দেখা যায়নি। দরোয়ান অবিশ্যি সেই জেনানার নাম বলতে পারেনি। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর ট্যাক্সিতে চেপে মণিকা ও ঐ জেনানা চলে যায়। দেড় মাস পরে মণিকা দেবী ফিরে আসে বটে, কিন্তু সেই জেনানা আর ফিরে আসেনি। কলকাতায় ফিরে আসবার দিন সাতেক বাদেই দরোয়ান ও সোফারকে চার মাসের করে মাইনে দিয়ে বিদায় দেয়, গাড়িও বেচে দেয়, বাড়িও ছেড়ে দেয় মণিকা দেবী।

এত চেষ্টা করেও তাহলে বিশেষ কোন ফল হয়নি বল? প্রশ্ন করলাম আমি।

তাইতো মনে হচ্ছে। মৃদু কণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

তাহলে সচ্চিদানন্দের হত্যা-রহস্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে?

কিরীটী অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল, আমার কথার জবাব পাওয়া গেল না। সিঁড়িতে এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

কিরীটী জুতোর শব্দ শুনে কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে বললে, কৃষ্ণা, পাশের ঘরে যাও। আর তিন কাপ চা পাঠিয়ে দিও। ডাঃ হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এদিকে আসছেন।

সত্যি, ডাঃ হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্যই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী সাদর আহ্বান জানাল, আসুন ডাক্তারবাবু, বসুন।

প্রৌঢ় ডাক্তার হরপ্রসন্ন একটা খালি সোফা অধিকার করে বসলেন। কিরীটী সামনের টিপয়ের উপরে রক্ষিত চামড়ার সিগার কেসটা থেকে একটা সিগার নিয়ে, কেসটা ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিলে।

দুজনে নিঃশব্দে সিগারে অগ্নি-সংযোগ করল।

প্রথম দর্শনেই ডাঃ হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্যকে চিনেছিলাম, সচ্চিদানন্দর গৃহে ওঁকে দেখেছিলাম। সচ্চিদানন্দের দীর্ঘদিনের পারিবারিক চিকিৎসক। কিন্তু ভাল করে আলাপ হবার সুযোগ তখন হয়নি। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, ইতিপূর্বে আলাপ-পরিচয় হবার আরো সুযোগ হয়েছে—আমার অজ্ঞাতেই।

তারপর বলুন ডাক্তারবাবু, আপনার রোগিণীর সংবাদ কি? কিরীটী ডাক্তারকে প্রশ্ন করে।

সেই পূর্ববৎ। চোখে তেমনি vacant look, indifferent, পারিপার্শ্বিকের উপরে কোন স্পৃহা নেই।

আহারাদির ব্যাপার?

না। তাতেও কোন interest নেই। খাদ্যবস্তু একেবারে মুখে তুলে না দিলে খেতেও চায় না। সর্বদাই কেমন চুপচাপ থাকে। তবে শিবানী মেয়েটিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। হাজার হলেও পর, অনাত্মীয়—বন্ধুর মেয়ে। কিন্তু সে যা করছে মিসেস সান্যালের জন্য, এমনটি আর চোখে কখনো পড়েনি আমার।

বাড়ির আর সকলে?

আপনার নির্দেশমত আমি যতক্ষণ প্রত্যহ ও বাড়িতে থেকেছি, যথাসাধ্য নজর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি।

কোন প্রকার আলোচনাই হয়নি সচ্চিদানন্দবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে ?

না। দুর্ঘটনাটা যেন ওরা প্রত্যেকেই সযত্নে এড়িয়ে চলে বলেই আমার মনে হয়।

উইল সম্পর্কে কোন আলোচনা শোনেননি ?

না। উইল তো শুনলাম, একদিন মহিমারঞ্জনবাবু বলছিলেন, এক মাস বাদে পড়া হবে সর্বসমক্ষে। উইল সম্পর্কে কারো কোন interest আছে বলেও মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা যা আমার কানে এসেছে গতকাল এবং যে জন্য আপনার ফোন পেয়ে এসেছি।

কি বলুন তো ?

মহিমাবাবু বলছিলেন, শিবানী দেবী নাকি দু-চারদিনের মধ্যে চলে যাবেন স্থির করেছেন।

কিরীটী যেন ডাক্তারের কথায় চমকে উঠে প্রশ্ন করে, চলে যাবেন ! হঠাৎ—

তা বলতে পারি না। তবে শুনলাম তো তাই। তাছাড়া মহিমাবাবু নিজেও মনে হল শিবানীর উপরে যেন সন্তুষ্ট নন।

সন্তুষ্ট নন ! কেন ?

তা বলতে পারি না। তবে কথাবার্তায় আগেও তাই মনে হয়েছে! বলে ডাক্তার ভট্টাচার্য চুপ করে গেলেন। বোঝা গেল, ও ব্যাপার নিয়ে আর বেশি আলোচনা করতে তিনি যেন ইচ্ছুক নন।

কিন্তু ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার হয়ে গেল পরের দিন—যখন আমি আর কিরীটী সচ্চিদানন্দ সান্যালের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

বাইরের ঘরে ফরাস বিছিয়ে ইতিমধ্যেই দেখলাম বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন মহিমারঞ্জন। একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে মহিমারঞ্জন কথা বলছিলেন, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম করে ফরসির নল হাতে ধূমপান করতে করতে।

আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই সাদর আহ্বান জানালেন মহিমারঞ্জন, আসুন, আসুন রায় মশাই !

আমরা ফরাসের একাংশেই আসন গ্রহণ করলাম।

মহিমারঞ্জন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, এবার তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে ঐ কথাই রইল নরেনবাবু। আর দিন কুড়ি বাদেই উইল পড়া হবে। তারপর যা ব্যবস্থা হয় করা যাবে।

আচ্ছা, তাহলে আমি উঠলাম। নমস্কার !

হ্যাঁ, নমস্কার। আসুন।

নরেনবাবু একবার আড়চোখে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ভদ্রলোকটি কে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ও, উনি নরেন শীল। আমাদের উকিল।

ও!

দু-একটা কুশলাদি প্রশ্নের পর মহিমারঞ্জনই আবার কথা শুরু করলেন, করোনার্সের ব্যাপারটা শুনেছেন বোধ হয় রায় মশাই? তারা রায় দিয়েছে—হত্যাই!

হ্যাঁ, শুনেছি।

কিন্তু হত্যা বললেই তো হবে না! কে হত্যা করল তাকে? আর কেনই বা হত্যা করতে গেল বলুন?

হত্যা যে তাঁকে করা হয়েছে, সে তো আপনিও নিশ্চিত জানেন মহিমাবাবু! অবিশ্যি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে—হত্যা তাঁকে কে করল, কেন করল?

কিন্তু যাই বলুন আপনি রায় মশাই, আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একেবারে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাই যদি বলেন মহিমাবাবু তো এমন অনেক কিছুই কি পৃথিবীতে ঘটে না, যা যুক্তি-তর্ক দিয়ে না বিশ্বাসযোগ্য হলেও আসলে সত্যি? কিন্তু সে কথা থাক। একটা কথা জানবার জন্যে এসেছিলাম—

কি বলুন তো?

শুনলাম মণিকা দেবী নাকি দু-একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাচ্ছেন, তা তিনি পুলিসের অনুমতি পেয়েছেন কি এ-বাড়ি ছেড়ে যাবার?

মুখটা গম্ভীর করেই জবাব দিলেন মহিমারঞ্জন, কার কাছে শুনলেন কথাটা?

শুনেছি। জিজ্ঞাসা করছি, কথাটা সত্যি নাকি?

হ্যাঁ, সত্যি।

কিন্তু পুলিসের অনুমতি পেয়েছেন কি তিনি?

জানি না। তিনি তো বাড়িতেই আছেন, তাঁকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না! আমি ওসবের মধ্যে নেই।

যেতে অবশ্য তিনি পারবেন—এ হত্যা-রহস্যের একটা মীমাংসা হয়ে গেলেই। কিন্তু সেটা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া তো চলবে না—

পুলিসের এই নির্দেশ আছে।

কিন্তু এও তো আপনাদের অন্যায় জুলুম রায় মশাই! মহিমারঞ্জন বলে ওঠেন।

অন্যায় জুলুম!

তাছাড়া কি বলব, অন্যায় নয়? কারণ আপনারা কি মীমাংসা করবেন, সেই জন্য অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এ-বাড়ির প্রত্যেককে গতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে হবে, এই বা কেমন যুক্তি!

যুক্তি আছে বলেই আদেশ জারী করা হয়েছে।

কিন্তু দেখুন রায় মশাই, সচ্চিদানন্দের অবর্তমানে এই পরিবার ও বাড়ির ভাল-মন্দের ভার আমার ঘাড়েই এসে পড়েছে। এক্ষেত্রে সে ব্যবস্থার দিকেও আমাকে নজর রাখতে হবে বৈকি।

তা তো ঠিকই, কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তুই নেই। পারিবারিক মঙ্গলের জন্য মণিকার চলে ওয়াটাকে আমি বাঞ্ছনীয়ই মনে করি সব দিক থেকে।

কি ব্যাপার! আপনি যেন মণিকা দেবীর উপরে বিশেষ সন্তুষ্ট নন বলেই মনে হচ্ছে?

চাপা আক্রোশ যেন মহিমারঞ্জনের কণ্ঠস্বরে এবারে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল, কোথাকার কে এক অভিনেত্রী মাগী! চরিত্রহীনা কুলটা নটী—ও আপদ বাড়ি থেকে যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় আমি তাই চাই। আর যাই করি না কেন, সমাজে দশজনকে নিয়ে বাস করে সমাজকে অস্বীকার করব কেমন করে বলতে পারেন?

কিন্তু উনি তো ঠিক সে পর্যায়ে পড়েন না। তাছাড়া সচ্চিদানন্দবাবু নিজে তাঁকে যখন বাড়িতে এনে স্থান দিয়েছিলেন, সব জেনেশুনেই—

আরে মশাই, সেই তো হল কাল! জানা নেই, শোনা নেই, কোথায় কে কি বলল, আর সেও অমনি নেচে উঠল!

আপনি দেখছি মণিকা দেবীর উপরে ভয়ানক চটে উঠেছেন!

চটব না মশাই, বলেন কি? এতদিন নজরে পড়েনি, বাড়ির মধ্যে বড় একটা থাকতাম না তো। সেই সকালে চারটি ভাত মুখে দিয়ে অফিসে ছুটতে হত, আর ফিরতাম সেই রাত্রি আটটায়। এখন তো আর তা নয়, দিনে-দুপুরেও বাড়িতে থাকতে হয়। সবই চোখে পড়ে—

কিন্তু সত্যিসত্যিই ব্যাপারটা কি বলুন তো মহিমাবাবু?

ব্যাপার আর বিস্তারিত করে কি বলব বলুন! মাগীটা এখন ঐ আনন্দ ছোকরার মাথা খাওয়ার জন্যে লেগে পড়েছে। আরে মশাই, তোকেও বলি, কি বংশের ছেলে তুই, কোথাকার কে একটা বাজারের নষ্টা মেয়েমানুষ—তার সঙ্গে তোরই বা এত কি—

হঠাৎ কিরীটীর সজাগ সতর্ক কণ্ঠস্বরে যেন চমকে উঠলাম।

সদর ও অন্দরের মধ্যবর্তী দরজার ওপরে ঝোলানো পর্দাটার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কিরীটী বলে উঠল, কে? কে ওখানে?

এবং কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চমকে সেই দিকে তাকাতেই মনে হল, একজোড়া খালি পা চট করে পর্দার তলায় ওধারে সরে গেল।

দরজার কাছাকাছি আমি বসেছিলাম, চট করে এগিয়ে গিয়ে পর্দার ওপাশে মুখ বাড়াতেই দেখি, মণিকার সেই ভৃত্য নন্দন।

একি, নন্দন! কি করছিলি রে তুই এখানে দাঁড়িয়ে?

নন্দন যেন আমার কথায় কেমন একটু থতমত খেয়ে যায়! পরক্ষণেই নিজে সামলে নিয়ে বলে, আজ্ঞে ঐ মামাবাবুর অফিসে যাবার সময় হল তাই বলতে এসেছিলাম—

কিরীটী ও মহিমারঞ্জন ইতিমধ্যে উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

মহিমারঞ্জনই এবারে যেন ফেটে পড়লেন, হতচ্ছাড়া, পাজি! ডাকতে এসেছিলি, না আড়ি পেতে কি কথা হচ্ছে এখানে তাই শুনছিলি! যেমন মনিব, তেমনি তার ছুঁচো চাকর।

মহিমারঞ্জনের কথায় নন্দনের চোখ দুটো যেন ধক্ করে বারেকের জন্যে জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। এবং শান্ত বিনম্র কণ্ঠে বললে, আজ্ঞে, কি আপনি বলছেন বাবু? আড়ি পেতে আমি আপনাদের কথা শুনতে যাব কেন?

তা ডাকতে এসে ঘরে না ঢুকে দরজার পাশে অমন করে দাঁড়িয়েই বা ছিলে কেন? জিজ্ঞাসা করলে এবার কিরীটীই।

ডাকতেই তো যাচ্ছিলাম বাবু। হঠাৎ আপনি কে কে করে উঠলেন, তাই চমকে দুপা পিছিয়ে গিয়েছি—

আমি নন্দনের মুখের দিকেই কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলাম। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি হবে না। বাহারে করে সেলুনে ছাঁটা তেল-চক্চকে চুলের মধ্যে—

বিশেষ করে রগের পাশ দিয়ে দু চারটে চুলে পাক ধরেছে। গায়ের রঙ কালো, কিন্তু অটুট স্বাস্থ্যের জন্যে চেহারাটা মন্দ নয় দেখতে। ছোট কপাল, নাকটা একটু চাপা। ছোট ছোট চোখ দুটিতে যেন একটা সতর্ক ধূর্ততা।

পরিধানে সেদিনকার মতই ধোপদুরস্ত ধুতি ও গায়ে একটা ছিটের হাফ সার্ট। ভৃত্য না বলে দিলে চট্ করে ভৃত্য বলে লোকটাকে ভাবাও মুশকিল এবং ভৃত্য হলেও সৌখীন ধনী লোকের সৌখীন ভৃত্য বলে বুঝতে কষ্ট হয় না।

সেদিন কিরীটী নন্দনের সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনি। আজ তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে এল।

তোমার নাম তো নন্দন, তাই না? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে।

বাড়ি কোথায়?

আজ্ঞে মেদিনীপুরে।

মণিকা দেবীর কাছে কতদিন আছ?

তা বাবু আট-দশ বছর হয়ে গেল।

তোমার মনিব লোক কেমন নন্দন?

দেবতা বাবু, অমন মন কারও হয় না। যেমন দয়া-মায়া, তেমনি ব্যবহার।

হুঁ। কত মাইনে পাও?

মাইনের কথা আর কি বলব বাবু! ধরা-বাঁধা তো কিছু নেই। যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, চাইলেই পেয়েছি। দরকার হলে পাঁচশো টাকাও পাওয়া যায়।

বুঝলাম নন্দনের শেষের কথাতেই, তার মনিব সম্বন্ধে কোন কথা তাকে কেটে ফেললেও পাওয়া যাবে না। কিরীটীও বুঝেছিল, তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে মহিমারঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার বললে, চলুন মহিমাবাবু। একবার ওপরটা ঘুরে আসা যাক।

চলুন। যেন একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই কিরীটীর প্রস্তাবে সায় দিলেন মহিমারঞ্জন।

আচ্ছা, তুমি যেতে পার নন্দন। নন্দনের দিকে তাকিয়ে বললে কিরীটী।

অনুমতি পেয়ে নন্দন আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল। আমরাও মহিমারঞ্জনের পিছনে পিছনে সিঁড়ি-পথে দোতলায় উঠতে লাগলাম।

হ্যাঁ, ভাল কথা।—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এক সময় কিরীটী মহিমারঞ্জনের

দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, সচ্চিদানন্দবাবুর চাবির গোছাটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে?

না।

আপনার ভগ্নী রাধারাণী দেবী কেমন আছেন?

সেই রকমই।

পূর্ব-স্মৃতি তাঁর কিছুই মনে পড়ছে না এখনও?

না। আর ফিরে আসবে বলেও ডাক্তার ভট্টাচার্য তো বলছেন না।

একজন ভাল সিকিয়াট্রিস্টকে দেখান না ডেকে এনে একবার ওঁকে!

তাই দেখাব ভাবছি। আর আমার তো মনে হয়, এ একপক্ষে তার শাপে বরই হয়েছে রাধারাণীর পক্ষে।

কেন বলুন তো? সোৎসুক কণ্ঠে কিরীটী জিজ্ঞাসা করে কথাটা মহিমারঞ্জনকে।

তাছাড়া আর কি! এতবড় একটা শোক! নইলে ও হয়তো সামলাতেই পারত না।

তা অবশ্য কতকটা সত্যি বটে। কিন্তু—তবে ওর একটা অন্য দিকও তো আছে!

বুঝলাম না ঠিক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কথাটা বলেন মহিমারঞ্জন কিরীটীর মু দিকে তাকিয়ে।

মানে—বলছিলাম, হঠাৎ যে স্মৃতি মস্তিষ্কের কোষে নিদারুণ কোন মানসিক আঘাতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, আবার একদিন হঠাৎ ফিরেও তো আসতে পারে সেটা।

তাও সম্ভব নাকি?

কোন কোন ক্ষেত্রে সেরকম কথা শোনা গেছে বৈকি—তাছাড়া, ডাক্তার ভট্টাচার্যও তো তাই বলেন।

কিন্তু আমার যেন মনে হল মহিমারঞ্জন কিরীটীর বক্তব্যের সঠিক তাৎপর্যটা না ধরতে পারলেও জবাবটা সে ঠিক দেয়নি। সে তার আসল বক্তব্যকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে অন্য জবাবের মধ্যে দিয়ে পরিস্থিতিটা বাঁচিয়ে গেল। এবং সেটা বুঝতে পেরেই কিরীটীর মুখের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলেশহীন একান্তভাবে নির্লিপ্ত সে মুখাবয়বের মধ্যে কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতেই কিরীটীর খেয়াল হল, সে আজ আর একবার তিনতলার ছাদের অর্কিড-ঘর বা কাচঘরটা দেখবে।

কাচঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে মহিমাবাবু আমাদের কাছ থেকে বিদায়

নিলেন। তাঁকে অফিসে একবার বেরুতে হবে। স্নান আহার সেরে তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে।

যেতে যেতে মহিমাবাবু বললেন, বলেন তো আনন্দকে আমি পাঠিয়ে দিতে পারি কিরীটীবাবু।

না না—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। নিজেরাই আমরা দেখাশোনা করে নিতে পারব।

মহিমাবাবু চলে গেলেন।

কাচঘরের দরজা ঠেলে আমি আর কিরীটী ভেতরে প্রবেশ করলাম। বাহিরে ঐ সময় প্রখর রৌদ্র ও তার তাপ থাকলেও কাচঘরের মধ্যে তার বিন্দুমাত্রও ছিল না। নিবিড় শান্ত একটা ছায়াস্নিগ্ধ শীতল পরিবেশ যেন মুহূর্তে মনকে স্পর্শ করে।

চারিদিকে নানা জাতীয় লতাগুল্ম কোথাও সোজা উঠে গিয়েছে, কোথাও এঁকেবেঁকে, কোথায় লতিয়ে লতিয়ে চলেছে। তার মধ্যে পুষ্প ও পত্রের বহুবিধ বর্ণ-বৈচিত্র্য যেন কোন নিপুণ শিল্পীর তুলির টানে টানে রঙের আলপনা বুনেছে।

মনে পড়ল, মাত্র দিন তেরো-চোদ্দ আগে এই শান্ত সুন্দর পরিবেশের মধ্যেই ার পাশবিক লিপ্সা দেখেছিলাম।

অসাড় প্রাণহীন দেহটি যেন এখনও চোখের ওপরে ভাসছে।

অন্যমনস্কের মত কিরীটী এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। এবং তাকাতে তাকাতেই সে অর্কিড-ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমিও তাকে অনুসরণ করছিলাম।

হঠাৎ এক সময় কাচঘরের মধ্যস্থলে কাঠের সেই বেঞ্চটার উপরে নজর পড়তেই উভয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

বেঞ্চের হেলান দেবার জায়গাটায় ডান হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে এক নারী-মূর্তি।

নারী-মূর্তিকে দেখামাত্রই তাকে চিনতে আমাদের কষ্ট হয়নি।

শিবানী!

পরিধানে সাদা মিলের চওড়া ভায়োলেট-পাড় শাড়ি। গায়ে আদ্দির হাতকাটা ব্লাউজ। মাথায় পর্যাপ্ত এলানো কেশভার কিছুটা হাতের উপর দিয়ে মুখের একাংশ ঢেকে ও কিছুটা পিছন দিক দিয়ে ঝুলছে।

আমার মত কিরীটীও বোধ হয় একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

নির্জন কাচঘরের মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে হয়তো ভদ্রমহিলা একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। উনি হয়তো ভাবতেও পারছেন না যে, তাঁর এই নির্জন নিরালা

বিশ্রামের অবসরে আমরা অতর্কিতে এখানে এসে পড়েছি বা এসে পড়তেও পারি।

সামান্যতম ভদ্রতা বা রুচি যার আছে, ঐ অবস্থায় ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আমরাও তাই ফিরবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই মণিকা মুখ তুলে তাকাল। এবং হঠাৎই ঐ সময় আমাদের সামনে দেখে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কে? কে আপনারা?

গলার স্বরটা কিছুটা অস্বাভাবিক। কেমন যেন একটু ধরা-ধরা। শুধু তাই নয়, চোখ দুটোও যেন মনে হল কেমন ভেজা-ভেজা ও লাল।

আমরা বিশেষ দুঃখিত মণিকা দেবী। বুঝতে পারিনি যে আপনি এখানে থাকতে পারেন এ সময়ে!

কিন্তু আকস্মিক সেই বিহ্বলতা মণিকা ততক্ষণে কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। মৃদু সলজ্জ কণ্ঠে বলে, কিরীটীবাবু?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি উঠলেন কেন? বসুন।

না, আমি যাই।

আপনার যদি নীচে এখন কোন কাজ না থাকে তো একটু বসুন মণিকা দে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন মণিকা কিরীটীর অনুরোধে বেঞ্চটার উপরে আবার বসে পড়ল।

আপনি তো জানেন মণিকা দেবী—

কিরীটীর কথায় বাধা দিয়ে এবার মণিকা বললে, কিছু মনে করবেন না মিঃ রায়, আপনি আমাকে ঐ নামে না ডাকলেই সুখী হব। আপনি বোধ হয় জানেন, আমার আসল নাম ও নয়। আসল নাম আমার শিবানী চট্টোপাধ্যায়। ঐ শিবানী নামেই আমাকে এবার থেকে সম্বোধন করবেন দয়া করে।

বেশ, তাই হবে। হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম—আপনি তো জানেন এখনও সচ্চিদানন্দবাবুর হত্যার ব্যাপারটার কোন একটা সঠিক মীমাংসাতেই আমরা আসতে পারিনি। তাই আবার এ বাড়িতে আমাদের আসতে হয়েছে।

আমরা ভুলতে চাইলেও, দেখছি আপনারা ভুলতে দেবেন না। কিন্তু সত্যিই কি আপনারা মনে করেন কিরীটীবাবু, এই কুৎসিত নিষ্ঠুর ব্যাপারটাকে মিথ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করে আর কোন লাভ আছে?

নিশ্চয়ই। আসল হত্যাকারীকে যতক্ষণ না আমরা চিহ্নিত করে তার একটা

ব্যবস্থা করতে পারি, ততক্ষণ কেবল আমরা কেন, আপনারাও কি দায়মুক্ত হতে পারবেন শিবানী দেবী? অন্যায় যে করে আর অন্যায়কে যে সহ্য করে, দোষ তো উভয়েরই।

কিরীটীর শেষের কথায় কেন জানি না মণিকা আর কোন জবাব দিতে পারল না। চুপ করেই রইল।

আর শুধু কি তাই! যতক্ষণ প্রকৃত দোষী না ধরা পড়ছে ততক্ষণ আপনারা কেউই তো সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। আর এক্ষেত্রে সন্দেহটা কতখানি গুরুতর, তা তো আপনার অজানা নেই। হত্যার সন্দেহ।

এবারেও মণিকা কিরীটীর কথার কোন জবাব দেয় না।

যাক সে কথা। প্রথম দিনের আলাপের সময়ে আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপের সুবিধা হয়নি। আজ যখন সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গিয়েছে, সেই অসমাপ্ত আলাপটা শেষ করে নিতে চাই। নিশ্চয়ই আপনার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই?

মণিকা কিরীটীর শেষের কথায় বারেকের জন্য চোখ তুলে ওর মুখের দিকে চেয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিলে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, না, বলুন, কি জানতে চান?

দেখুন শিবানী দেবী, আপনার সঙ্গে সামান্য আলাপেই বুঝতে পেরেছি, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী আপনি। অযথা ভূমিকা করে মিথ্যে সময় নষ্ট করা আমার অভিপ্রেত নয়। অভিনয়ের জগতে আপনি একজন যথেষ্ট সুপরিচিতা। তাই আপনার সেই অভিনয়ের পাচ বছরের জীবন সম্পর্কে আমার কোন প্রশ্ন নেই—একটিমাত্র প্রশ্ন ছাড়া।

স্থির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মণিকা তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

মাস আষ্টেক আগে স্বপনপুরী স্টুডিওতে 'সেতুবন্ধ' বইয়ে আপনার রোলটি ছিল এক অভাগিনী জননীর। এবং আপনার কন্যার রোলের জন্য একটি নবাগতা তরুণী অভিনেত্রী মনোনীতা হয়েছিলেন—তাঁর নাম বনলতা। কথাটা কি সত্য?

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে মণিকা জবাব দিল, হ্যাঁ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনলতা সে রোলে অভিনয় করেননি, তাই না?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন বলুন তো?

তা আমি কি করে জানব?

কিন্তু জানবার কথাও আপনারই কারণ তিনি আপনারই আবিষ্কার এবং আপনিই contract করিয়ে দিয়েছিলেন ও বনলতা শেষ পর্যন্ত অভিনয় না করায় আপনিই প্রডিউসারকে বনলতার কনট্রাক্ট-এর দরুন compensation দিয়ে মিটিয়ে দিয়েছিলেন কেন—ব্যাপারটা আমি শুনেছি।

কিরীটীর কথায় প্রথমটায় মণিকা কোন জবাব দিতেই যেন পারে না। কিন্তু মুহূর্ত পরেই পূর্ববৎ ধীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়, হ্যাঁ দিয়েছিলাম। তার কারণ, যখন অভিনয় করতে নেমে দেখলাম, বনলতা আদপেই আমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার পার্ট অভিনয় করতে পারছে না। আমার পার্টও ঐ সঙ্গে বাজে অভিনয়ের জন্যে নষ্ট হয়ে গিয়ে আমাকে না দুর্নামের ভাগী হতে হয়, তাই আমিই বনলতাকে সরাই এবং সেই কারণেই আমি compensation-টাও দিই।

সত্যিই কি তাই?

তাই।

কিন্তু আর দশজনের ধারণা কিন্তু অন্য।

তা সে রকম হলে আমি নাচার।

আচ্ছা, বনলতাকে আপনি প্রথম দিন স্যুটিংয়ের পরই নিজের ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন—কথাটা কি সত্যি?

কিরীটীর শেষের কথায় যেন চমকে ওঠে সহসা মণিকা দেবী। বলে, কে বললে সে কথা?

আমি জানি।

না। আপনি যদি তাই জেনে থাকেন, তাহলে জানবেন সেটা ভুল।

ভুল!

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ভুল। কারণ বনলতাকে কোনদিনই আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাইনি।

শুধু নিয়ে যাওয়াই নয়, এক মাস সে আপনার ওখানে ছিলও।

এসব আজগুবি কথা কার কাছে আপনি শুনছেন মিঃ রায়, জানি না। সর্বৈব মিথ্যা—

শুধু তাই নয়, এক মাস আপনার ওখানে বনলতা দেবীকে, সাদা কথায় কতকটা বন্দিনীর মত রেখে, তারপর একদিন তাঁকে সঙ্গে করেই ট্যাক্সিতে চেপে কিছু মালপত্র নিয়ে চেঞ্জে যাবার নাম করে কোথায় যেন যান। ফিরে আসেন আরও মাসখানেক পরে। ফিরে আসেন অবশ্য আপনি একাই। এবং ফিরে এসে

তার হপ্তাখানেকের মধ্যে বাড়ি তুলে দিয়ে, দরোয়ান ও সোফারকে বিদেয় দিতে চার মাসের মাহিনা দিয়ে এখানে এসে ওঠেন।

এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানানো গল্প।

মিথ্যাও নয়, বানানোও নয় শিবানী দেবী। এবং সে কথা আপনি আমার চাইতে ভালই জানেন। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, কে ঐ বনলতা মেয়েটি? কোথায় তাকে রেখে এলেন?

কি বলব বলুন? গল্পের কি কোন জবাব আছে?

ভুলে যাচ্ছেন শিবানী দেবী, আপনার সেই দরোয়ান অযোধ্যা সিং আজও বেঁচে আছে। প্রয়োজন হলে কোর্টে দাঁড়িয়ে সব কথাই সে বলবে।

তাকে দিয়ে ঐ সব কথা বলাতে চান আপনারা বলাতে পারেন—অযোধ্যা সিং ভুল করেছে। আমার বাড়িতে একটি মেয়ে ছিল। একদিন স্টুডিও থেকে ফেরবার পথে পথের ধারে তাকে ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে ভিক্ষা করতে দেখে বলি, আমার বাড়ীতে যদি সে কাজ করে, তাহলে তাকে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি। খাওয়া-পরা সব দেব। সে রাজী হওয়ায় তাকে বাড়িতে এনে আমি রেখেছিলাম। তার নাম ছিল বুনো। আমার ভৃত্য নন্দনকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন। সে-ই সব কথা বলবে। দেরাদুনে চেঞ্জে যাবার সময় বুনোকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাই। এবং দেরাদুনের বাড়ি থেকে এক রাত্রে সে কোথায় পালিয়ে যায়, আর তার সন্ধান পাইনি।

অবাক হয়েই মণিকা দেবীর কথা শুনছিলাম। কিরীটীর কথা যদি সত্যিই হয়, এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, তাহলে বলতেই হবে, মণিকা দেবী সত্যিই একজন উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রী। অপূর্ব তাঁর অভিনয়-শৈলী! একেবারে নিখুঁত!

অতঃপর কিরীটীও আর কোন প্রতিবাদ জানাল না। কেবল দেখলাম, কি এক চাপা কৌতুকে তার চোখের তারা দুটো চকচক করছে। ওষ্ঠপ্রান্তেও একটা চাপা হাসির ঈষৎ বঙ্কিম কুঞ্চন।

যাক, বনলতা দেবীকে যখন আপনি চেনেনই না, তখন তো আর কোন কথাই নেই। আচ্ছা, এবার আপনার অভিনয়-জগতে আসবার পূর্বে এবং এ-বাড়ি ছাড়বার পর হতে মাঝখানের তিন বছরের মোটামুটি একটা ইতিহাস আমাকে জানাবেন কি?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, একটু ইতস্তত: করে মণিকা বললে, সে আর কি শুনবেন—বিতাড়িত, আশ্রয়চ্যুত, সহায়-সম্বলহীন একটি তরুণীর দুঃখ ও কষ্টের

ইতিহাস! এদেশে তো তার অভাব নেই কিরীটীবাবু, নতুন করে তার আর কি শুনবেন, আর শোনবার আছেই বা কি!

বাঃ, চমৎকার! মনে মনে অভিনেত্রী মণিকার প্রশংসা না করে পারলাম না। যেমনি ধূর্ত এপক্ষ, ততোধিক ধূর্ত অন্যপক্ষ। দুটি ধারালো তরবারির মুলাকাত যেন!

কিরীটী বলে, দুঃখ তো আছেই। দুঃখকে বাদ দিয়েই বা কার জীবন বলুন, মণিকা দেবী? দুঃখের ইতিহাসের মধ্যে সত্যিই নতুন করে কিছু শোনবার নেই যে তাও আমি জানি। তা নয়, শুনতে চাইছি, কেমন করে হঠাৎ আপনি অভিনেত্রীর লাইনে এলেন? আর এ বাড়ি ছেড়ে যাবার পর ঐ তিনটে বছর কোথায় কোথায়ই বা আপনি ছিলেন?

ছিলাম তো অনেক জায়গায়ই। সব কি আর মনে আছে! মানুষের জীবনে দশ-দশার সে এক দশা আমারও কেটেছে কোন মতে।

মনে মনে সত্যিই কিরীটীর অবস্থা দেখে না হেসে পারছিলাম না। এমন শক্ত পাল্লায় কিরীটী বোধ করি ইতিপূর্বে খুব কমই পড়েছে।

সহসা কিরীটী প্রশ্নের ধারাটা একেবারে অন্য খাতে নিয়ে গেল।

আচ্ছা শিবানী দেবী, অসুস্থা রোগগ্রস্তা মাকে ঐভাবে অন্যের আশ্রয়ে ফেলে চলে গেলেন—একবারও তাঁর কথা কি আপনার মনে হয়নি? বা একবারও কি ইচ্ছা যায়নি, অসুস্থা মাকে একবার এসে দেখে যেতে?

মা! চমকিত কণ্ঠে যেন শব্দটা মণিকার কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল।

হ্যাঁ, আপনার মা। যাঁকে সে রাত্রে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান জেনেও সচ্চিদানন্দবাবুর স্ত্রীর তাড়া খেয়ে এ বাড়ি থেকে আপনাকে চলে যেতে হয়েছিল।

মণিকা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ঐ মুহূর্তে যেন জমে একেবারে সে পাথর হয়ে গিয়েছে। দেহে প্রাণের কোন চিহ্নমাত্রও নেই।

কিরীটীর সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। তেমনি পূর্ববৎ কঠিন শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে চলেছে, আশা করতে পারি নিশ্চয়ই, বিশেষ করে কোন মেয়ে তার বিধবা মায়ের অসুখ হলে তাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হবে?

ওঃ, আমার মার কথা বলছেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, মার জন্য আমার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না বৈকি, কিন্তু যে বাড়ি থেকে গলা-ধাক্কা খেয়ে মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমাকে বের হয়ে যেতে হয়েছিল, সে বাড়িতে পুনঃপ্রবেশের দুঃসাহস আর আমার ছিল না। তাছাড়া ঐ মুহূর্তে নিজের অপমানের জ্বালাতেই আমি জ্বলে পুড়ে

মরছিলাম, তাঁর কথা আমার ভাববারও অবকাশ ছিল না।

কিন্তু তার পর? নিজেকে যখন একটু গুছিয়ে নিলেন, তখনও কি অভাগিনী মায়ের কথা একটিবারও আপনার মনে পড়েনি?

পড়েছে বৈকি। মাকে চিঠিও দিয়েছিলাম, কিন্তু মা আমার চিঠির কোন জবাবই দেননি।

হঠাৎ এমন সময় আমাদের কানে প্রবেশ করল মচমচ একটা জুতোর শব্দ।

আমি আর কিরীটী, দুজনেই যুগপৎ আমরা ফিরে তাকালাম, অফিসে যাবার জন্য বোধ হয় একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন মহিমারঞ্জন।

মহিমারঞ্জন এগিয়ে এলেন।

মণিকাকে ঐ সময় কাচঘরে দেখবেন ভদ্রলোক বোধ হয় আশা করেননি। সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম ভ্রূ দুটো তাঁর কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বুঝলাম, ভদ্রলোক মণিকার উপরে বিশেষভাবেই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

তুমি এখানে রয়েছ মণিকা, ওদিকে রাধারাণীর নাওয়া-খাওয়ার সময় হল। বলা কটা বাজে খেয়াল আছে কি?

যাচ্ছি এখুনি।

ওঁর কোন দোষ নেই। আমরাই ওঁকে আটকে রেখে কথা বলছিলাম। কিরীটী বললে।

মণিকা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিরীটী তাকে নাম ধরে ডেকে, যেতে বাধা দিল, দাঁড়ান শিবানী দেবী। আমার আর কয়েকটি কথা ছিল।

আপনাকে তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে কিরীটীবাবু। আপনি বরং কিছুক্ষণ এই কাচঘরেই বসুন। আমি কাজ সেরেই আসছি। মণিকা কাচঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বেশ, তাই আসুন। এখানে আমরা রইলাম।

ওঃ, আপনারা তাহলে বসুন মিঃ রায়। আমি অফিসে চলি। মহিমারঞ্জন বললেন।

আচ্ছা। কিরীটী সম্মতিসূচক মাথা দোলায়।

মহিমারঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল, তাঁর অবর্তমানে এ-বাড়িতে আমাদের থাকাটা তিনি বিশেষ প্রীতির সঙ্গে যেন নিলেন না। কিন্তু মুখেও কিছু বলতে পারলেন না। বিরক্তিতে মুখটা অন্ধকার করে কাচঘর থেকে বের হয়ে

গেলেন।

ক্রমে মহিমারঞ্জনের জুতোর শব্দ কাচঘরের অপর প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মণিকার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। কিরীটী এবারে এগিয়ে গিয়ে খালি বেঞ্চটার উপরে বসতে বসতে বললে, বস্—সুব্রত।

পাশে বসলাম।

কিরীটী নিঃশব্দে পকেট থেকে চামড়ার সিগার-কেসটা বের করে একটা সিগার টেনে নিয়ে ওষ্ঠপ্রান্তে চেপে ধরে অগ্নি-সংযোগ করলে।

কিরীটী ধূমপান করতে থাকে। নিঃশব্দে কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যায়।

ইংরাজীতে যে একটা প্রবাদ আছে hard nut—অভিনেত্রীটির বেলায় কথাটা একেবারে স্বর্ণ প্রয়োগ বলা চলে। আমি মৃদু কণ্ঠে কিরীটীকে উদ্দেশ্য করে বললাম।

তা হয়তো চলে। তবে আমি ভাবছি, মণিকা দেবী নির্জনে বসে কার জন্য শোক করছিলেন, নিঃশব্দে গোপনে চোখের জল ফেলে।

সত্যিই তো! কথাটা আদপেই আমার মনে ছিল না। এই কাচঘরে প্রবেশ করে মণিকা দেবীর সঙ্গে আচমকা চোখাচোখি হতেই তো তার জলে ছলছল দুটি রক্তবর্ণ চক্ষু আমাদের নজরে পড়েছিল।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে হাসে-কাঁদে, তাকে আমরা অভিনয়ই বলি। এবং তাদের হাসি-কান্নার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হাসি-কাঁদি, তারপর অভিনয় শেষে সেটা ভুলেও যাই। ভাবি, ও তো অভিনয়ই মাত্র। কিন্তু সাজঘরের মধ্যে সকলের আড়ালে আত্মগোপন করে যদি তাকে হঠাৎ আমরা হাসতে বা কাঁদতে দেখি, সেটাকে কি ঠিক অভিনয় বলা চলে?

কি তুই বলতে চাস কিরীটী?

বলতে আমি এইটুকুই চাই। মণিকা দেবী যে একজন সত্যিকার উঁচুদরের পাকা অভিনেত্রী, তাতে নিঃসন্দেহে কোন মতদ্বৈতই নেই আমার। কিন্তু আজ কিছুক্ষণ আগে এই কাচঘরে প্রবেশ করে তার যে অশ্রু-ছলছল রাঙা দুটি চোখ দেখেছিলাম, সেটা যে অভিনয় নয়, সে সম্পর্কেও আমি নিঃসন্দেহ ও আমার কোনরূপ মতদ্বৈত নেই। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো শেষ করলে।

জবাব দেবার মত আমিও কিছু খুঁজে পেলাম না। কিরীটীর যুক্তিটা যে নেহাতই অকাট্য, সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশও নেই।

নারীচরিত্র দুজ্ঞের্য়, কিন্তু তার চাইতেও ঢের বেশী দুজ্ঞের্য় বুঝি অভিনেত্রী-চরিত্র।

আপাততঃ ঘটনাপরম্পরায় সচ্চিদানন্দের হত্যার ব্যাপারে যা কিছু সন্দেহ—মুখে না প্রকাশ করলেও, অভিনেত্রী মণিকা দেবীকে ঘিরেই যেন জমাট বেঁধে উঠেছিল। তথাপি কেন জানি না, মনের মধ্যে অভিনেত্রী মণিকাকে আমি হত্যাকারিণী বলে চিহ্নিত করতে পারছিলাম না। সামান্য পরিচয়ের মধ্য দিয়ে কেন জানি না বার বার ঐ একটা কথাই মনের মধ্যে এসে আমার গোলমাল বাধাচ্ছিল, মণিকার সবটুকুই অভিনয় নয়। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম সংশয় অসংশয়ে আমাকে সমস্ত যুক্তি মেনে নিতে দিচ্ছিল না।

হঠাৎ কিরীটীর প্রশ্নে আবার চমক ভাঙল, আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস সুব্রত, প্রথম দিনের সেই দাঁড়োপবিষ্ট বাকপটু লালমোহন পাখীটিকে তো কই নীচের দালানে সিঁড়ির কাছে আজ দেখলাম না !

লালমোহন পাখী !

হ্যাঁ রে, মনে নেই তোর ? সেই প্রথম দিন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠবার মুখে যে পাখীটি বলে উঠেছিল, কে রে সুধা ?

সত্যিই তো ! মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখীটার কথা।

পাখীটা সিঁড়ি দিয়ে আমাদের উঠতে দেখে সতর্ক প্রহরীর মত প্রশ্ন করেছিল : উপরে যাও কেন ? কে গা ?···মনে হয়েছিল জব্বর পাহারা। চোখ এড়াবার উপায় নেই।

সত্যিই তো ! পাখীটা দেখলাম না তো নীচে !

অনভিপ্রেত সতর্ক পাহারার জন্যে তাকে হয়তো ইচ্ছা করেই কোথাও সরানো হয়েছে। কিরীটী কতকটা স্বগতোক্তির মতই যেন কথাগুলো বললে।

•

চুপ করে আমি বেঞ্চটার উপরে বসেছিলাম। কিরীটী অন্যমনস্কভাবে অর্কিড-ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ এক সময়ে চোখে পড়ল, একটা মাটির টবের পাশে নীচু হয়ে বসে কি যেন সে কুড়িয়ে নিল।

কি রে কিরীটী ?

কিরীটী আমার ডাকে কোন সাড়া না দিয়ে আবার যেন টবটার আশেপাশে কি খুঁজতে লাগল। আমিও উঠে পড়ে এগিয়ে গেলাম।

কি খুঁজছিস ?

কাচের সিরিঞ্জের একটা অংশ। সিরিঞ্জের ভাঙা খোলটা পেয়েছি, কিন্তু এখনো পিস্টনটা পাইনি। দেখ, তো খুঁজে পাস কিনা ! বলতে বলতে কিরীটী ক্ষণপূর্বে

প্রাপ্ত কাচের সিরিঞ্জের অংশটা আমাকে দেখালে।

আরও কিছুক্ষণ দুজনে খোঁজাখুঁজি করে সিরিঞ্জের প্রার্থিত পিস্টনটি পাওয়া গেল না বটে, তবে একটা সরু নিড্‌ল পাওয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ হয়তো জিনিসটা খুঁজতাম, কিন্তু অদূরে পদশব্দ পেয়ে দুজনেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মণিকা দেবী ফিরে আসছে এবং তার পশ্চাতে ঐ বাড়িরই ভৃত্য রঘুর হাতে ট্রের উপরে দু কাপ ধূমায়িত চা।

এ কি! আবার চা আনতে গেলেন কেন কষ্ট করে আপনি শিবানী দেবী? আমি বললাম।

না না—বেশ করেছেন—অসংখ্য ধন্যবাদ—ব্যাপারটার জন্যে পূর্বাহ্ণে প্রস্তুত না থাকলেও এখন দেখছি সত্যিই চায়ের পিপাসা পেয়েছিল।

বলতে বলতে সহাস্যে কিরীটী ট্রের উপর থেকে একটা কাপ তুলে নিলে। আমিই বা তবে বাদ যাই কেন, আমিও বাকি কাপটি হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম।

ভৃত্য রঘু শূন্য ট্রেটা নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হতেই কিরীটী তাকে সম্বোধন করে ডাকল, তোমার নাম তো রঘু তাই না?

রঘু কিরীটীর ডাকে ফিরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আচ্ছা রঘু, তোমাদের এ বাড়িতে নীচের দালানে দাঁড়ে যে একটি চমৎকার লালমোহন পাখী সেদিন দেখেছিলাম, সেটা তো কই দেখলাম না আজ?

রঘু কেমন যেন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকালে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, পাখীটাকে বিড়ালে একদিন প্রায় শেষ করে দিয়েছিল, তাই আজকাল আর দালানে না রেখে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখেছি। কর্তাবাবুর বড় প্রিয় ছিল পাখীটা। নিজের হাতে সকালে বিকেলে পাখীটাকে ফল খাওয়াতেন। রোজ তিন-চার টাকার আপেল, কলা প্রভৃতি ফল মার্কেট থেকে আসত পাখীটার জন্যে, কিন্তু এখন তাকে ছোলা খেয়েই থাকতে হয়।

আহা! কেন রঘু, হঠাৎ তার ফল বন্ধ হল কেন?

মামাবাবুর হুকুম। পাখী আবার তিন-চার টাকার রোজ রোজ ফল খাবে কি?

কিরীটী মণিকা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, এ বাড়িতে এখন কর্তা বুঝি মহিমাবাবুই?

মণিকা কিরীটীর কথার কোন জবাব দিল না। কেবল নিঃশব্দ একটা হাসির বঙ্কিম রেখা মণিকার চাপা ওষ্ঠপ্রান্তে চকিতে বিদ্যুৎ-চমকের মত দেখা দিয়েই

মিলিয়ে গেল। এবং সেই নিঃশব্দ চকিত হাসির মধ্য দিয়েই ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্নের প্রয়োজন রইল না।

সচ্চিদানন্দর অবর্তমানে এখন তাহলে মহিমারঞ্জনই এ বাড়ির মালিকানা স্বত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন।

কিন্তু ঐ সঙ্গে মনে পড়ল আর একটা কথা। সচ্চিদানন্দর উইল সম্পর্কে কি মহিমারঞ্জন জ্ঞাত? তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির তিনের-চার অংশের মালিকই তো ঐ শিবানী দেবী!

তবে কি তাই? মহিমারঞ্জন কি উইলের রহস্য জানতে পেরেছেন? তাই কি তিনি মণিকার উপরে এতটা বিরক্ত হয়ে উঠেছেন ইদানীং?

ইতিমধ্যে চা-পান শেষ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। রঘু চায়ের শূন্য কাপ দুটি নিয়ে কাচঘর থেকে চলে গেল।

কিরীটী এবারে মণিকাকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করলে, আপনি নাকি শুনলাম শীগগির এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শিবানী দেবী?

কে বললে?

শুনেছি। কথাটা কি সত্যি?

মৃদু কণ্ঠে একটু ইতস্তত: করে মণিকা জবাব দিলে, হ্যাঁ।

কিন্তু সচ্চিদানন্দবাবুকে লেখা আপনার সে-চিঠি পড়ে তো মনে হয় না তা?

কিরীটীর কথায় চমকে যেন তার মুখের দিকে তাকাল মণিকা। এবং নিম্ন কণ্ঠে বললে, সে চিঠির কথা আপনি—আপনি জানলেন কি করে?

স্বয়ং চিঠির মালিকই আমাকে চিঠিটা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সে-কথা যাক। কিন্তু কই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না তো?

কি জবাব দেব?

এখান থেকে আপনি চলে যাবেন বলে তো সেদিন আসেননি?

না, তা আসিনি বটে, তবে—ইতস্তত: করে মণিকা চুপ করে যায়। তার বক্তব্য শেষ করে না।

তবে?

অনেক আশা নিয়েই এখানে এসেছিলাম সত্য, মিঃ রায়। কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, সমস্ত আশা আমার এমনি করে ভাগ্যদোষে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে! শেষের দিকে মণিকার গলাটা যেন কেমন ধরে আসে। মনে হল, চোখের কোণেও বুঝি জল এসে গেছে।

দুর্ঘটনার উপরে তো মানুষের কোন হাত নেই শিবানী দেবী !

তা জানি। তবু যেন মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না। আমি এ-বাড়িতে পা দেবার পর দেড় মাসও গেল না, কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল ! সেই কথাটাই যেন বার বার মনে হচ্ছে।

আচ্ছা, আপনি সচ্চিদানন্দবাবুর উইল সম্পর্কে কিছু জানেন, শিবানী দেবী ?

না।

উইল সম্পর্কে কোন আলোচনাও হয়নি আজ পর্যন্ত ?

না। তবে মামাবাবুর মুখেই একবার শুনেছিলাম এর মধ্যে কবে যেন, সামনের শনিবার উইল পড়া হবে।

আচ্ছা, ধরুন উইল যদি বলে, এ-বাড়ির সম্পত্তির উপরে আপনার অনেকখানিই দাবি আছে, তাহলে ?

না মিঃ রায়, টাকাকড়ি, ধন-দৌলতের উপরে কোন লোভ বা আকর্ষণই নেই আমার। আপনি হয়তো জানেন, অভিনেত্রী-জীবনে প্রচুর উপার্জন আমি করেছি। তারপর একটু থেমে মণিকা আবার বললে, চলে আমি অনেক আগেই যেতাম, কিন্তু কাকীমার কথা যখনই ভাবি, মনে হয় তাঁকে কার হাতে দিয়ে যাব ! লুপ্তস্মৃতি এক শিশুর চাইতেও বুঝি তিনি অসহায়।

কেন, আনন্দবাবু তো আছেন ? কিরীটী বলে।

আনন্দবাবু ! হ্যাঁ, তিনি আছেন বটে। কিন্তু তিনি পুরুষ না হয়ে যদি স্ত্রীলোক হতেন, তবে কোন ভাবনাই তো আর আমার থাকত না ! স্বচ্ছন্দে তাঁর হাতে সব তুলে দিয়ে যেতে পারতাম !

আচ্ছা, মিসেস সান্যাল কি এখনও তেমনিই আছেন ? কোন পরিবর্তনই হয়নি ?

না। যদিও কথাটা শুনতে ভাল নয়, তাহলেও আমার কি মনে হয় জানেন, বাকি জীবনটা তাঁর যদি স্মৃতিভ্রংশ হয়েই কেটে যেত, তাহলে হয়তো তাঁর পক্ষে সত্যিই মঙ্গল হত।

একথা কেন বলছেন শিবানী দেবী ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

মঙ্গল নয় ? এই বয়সে অত-বড় শোক তিনি সামলাবেন কেমন করে বলুন তো !

জবাবে এবারে কিরীটী আর বিশেষ কোন কথা বললে না। বুঝলাম, যে কোন কারণেই হোক, প্রসঙ্গটাকে সে আর বেশী টানতে চায় না।

অতঃপর কিরীটী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন শিবানী দেবী, নীচে যাওয়া যাক।

চলুন।

আগে আগে মণিকা ও পশ্চাতে আমি ও কিরীটী দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। এদিক-ওদিক দু পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলেছি। মাথার মধ্যে তখনও সেই সিরিঞ্জের পিস্টনটা ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা চৌকো কাঠের বাক্স—তার মধ্যে বিচিত্র এক চওড়া পাতাওয়ালা অর্কিড গাছ, তার পাশেই পড়ে আছে কি যেন একটা।

এগিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকে দেখতেই বুঝলাম, একটা চাবির গোছা। নীচু হয়ে নিঃশব্দে চাবির গোছাটা তুলে নিলাম। অযত্নে, অবহেলায় মাটিতে পড়ে থেকে ইতিমধ্যেই বেশ মরচে ধরতে শুরু করেছে।

কি রে সুব্রত? কিরীটী প্রশ্ন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

একগোছা চাবি।

চাবি! দেখি—

চাবির গোছাটা দেখালাম।

রিং সমেত চাবিগুলোর দিকে তাকিয়েই মণিকা বলে ওঠে সহসা, ঐ তো কাকাবাবুর চাবির রিংটা! আরে—

চাবির গোছাটা কিরীটী হাতে নিল।

নানা আকারের ছোট-বড়-মাঝারি প্রায় উনিশ-কুড়িটা চাবি রিংটার মধ্যে রয়েছে।

এইটাই সচ্চিদানন্দবাবুর চাবির গোছা, আপনি ঠিক জানেন শিবানী দেবী? কিরীটী মণিকা দেবীর দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ। কতদিন দেখেছি তাঁর হাতে ঐ চাবির রিংটা। কখনো কারও হাতে তিনি ভুলেও চাবির গোছা দিতেন না।

প্রথমেই আমরা দোতলায় এসে মিসেস সান্যাল যে-ঘরে ছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করলাম।

একটা সোফার উপরে মিসেস সান্যাল বসে ছিলেন চুপচাপ। মাথার অবগুণ্ঠন শিথিল হয়ে কাঁধের উপর খসে পড়েছে। সদ্য-স্নানের পর ভিজে চুলের রাশ ছড়িয়ে আছে পিঠের উপরে।

পরিধানে একটা সাদা থান। হাতে অবশ্য একগাছি করে সোনার চুড়ি

আছে।

আমাদের পদশব্দে মুখ তুলে তাকালেন। চোখে কেমন যেন অসহায় শূন্য দৃষ্টি।

নমস্কার! চিনতে পারছেন আমাকে? কিরীটী এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল।

মৃদুভাবে মাথা দুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ।

কে বলুন তো আমি?

কিরীটীবাবু।

কিরীটী বোধ হয় এতটা আশা করেনি। আনন্দে চোখ-মুখের চেহারা তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আপনার স্নান-আহার হয়েছে?

হ্যাঁ। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

আমরা উভয়ে পাশের খালি সোফাটা অধিকার করে বসলাম।

ভাবছিলাম এক স্মৃতিভ্রষ্ট নারীর সঙ্গে কি কথাই বা কিরীটী বলতে চায়, আর কি ভাবেই বা শুরু করতে চায় তার বক্তব্য। যাঁর সমস্ত অতীত একেবারে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গিয়েছে এবং যে অতীতও বিকৃত অনুভূতির মধ্যে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে বর্তমান নিয়ে, তাঁর সঙ্গে কি আলোচনাই বা হতে পারে? বিশেষ করে, যখন বর্তমানের চাইতে তাঁর সেই অতীতটাই আমরা জানতে চাই, তখন বর্তমান নিয়ে আলোচনা চালাবার সার্থকতাই বা কী এবং কতটুকু!

কিরীটী কিন্তু ততক্ষণে কথা শুরু করেছে, আচ্ছা মিসেস সান্যাল, এ বাড়িতে আপনারা অনেক দিন আছেন, না?

বোধ হয় আছি। জবাব দিলেন রাধারাণী।

ঠিক কতদিন আছেন বলে মনে হয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল।

তা তো ঠিক জানি না।

এ বাড়ির কোথায় কি আছে বলতে পারেন?

না। এ ঘর থেকে তো আমি বের হই না।

কেন?

আমাকে যে কেউ এ ঘর থেকে বের হতেই দেয় না।

আমরা অদূরে উপবিষ্ট মণিকার মুখের দিকে তাকালাম। মনে হল, তার দু চোখে যেন কি এক করুণ মিনতি। সে যেন নীরব কাকুতিভরা দৃষ্টি নিয়ে বলতে চায়, ও সব থাক্।

কিন্তু কিরীটী সেদিক দিয়েই গেল না।

হঠাৎ এমন সময় রাধারাণী দেবী নিজেই প্রশ্ন করলেন, আমার স্বামী কবে ফিরবেন, বলতে পারেন কিরীটীবাবু?

রাধারাণী দেবীর প্রশ্নে দু'জনেই আমরা চমকে উঠেছিলাম। প্রশ্নটা যেমনি অপ্রত্যাশিত তেমনি আকস্মিক। তাই কয়েকটা মুহূর্ত যেন আমাদের কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না।

রাধারাণী আবার বললেন, ওরা বলছিল, তিনি নাকি কোথায় বিদেশে গিয়েছেন। কিন্তু এ কি রকম বিদেশে যাওয়া বলুন তো! স্ত্রীকে কোন কিছু না জানিয়ে এমনি করে বিদেশে চলে গেল! আর গেলেন যদি বা, আসছেন না কেন? এই পর্য্যন্ত বলে শেষে আবার কতকটা আত্মগতভাবেই যেন বলতে লাগলেন, ওরা বলে, স্বামী আমার বিদেশে গেছে। তা যাক, কিন্তু লোকটাকে চিনি বলে তো মনে হয় না! মুখটাই মনে পড়ে না।

কি জানি কেন, অন্যের শ্রুতিগোচর না হলেও আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়িয়ে যায়নি শেষের একটি কথাও তাঁর এবং সহসা দু'চোখের কোলে আমার জল ... যায়।

হায় নারী! তুমি জানলেও না, কত বড় ক্ষতি তোমার হয়েছে। যে স্বামীকে তুমি আজ আর মনেও করতে পারছ না, সত্যিই সে আর ইহজগতে নেই!

আচ্ছা মিসেস্ সান্যাল, আগের কোন কথাই কি আপনার মনে পড়ে না? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

কোন্ কথা?

আপনার স্বামীর কোন কথা?

না। আশ্চর্য্য, লোকটাকে যেন মনেও করতে পারি না। এরাও কেউ কিছু বলে না। আপনি নিশ্চয় চিনতেন তাঁকে, অন্ততঃ আপনার কথা শুনে তাই মনে হয়। কি রকম দেখতে ছিলেন তিনি বলুন ত!

হ্যাঁ, আমি তাঁকে চিনতাম। কিন্তু আজ আমাকে এখুনি যেতে হবে। আবার কাল-পরশু আসব। তখন বলব ওসব কথা। আজ উঠি, কেমন? বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটী উঠে দাঁড়ায়।

বেশ! রাধারাণী দেবী বলেন।

নমস্কার!

রাধারাণী দেবীও দু'হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

আমরা অতঃপর ওঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

আমরা অতঃপর কিরীটীর ইচ্ছামত দোতলায় সচ্চিদানন্দের বসবার ঘরে এসে প্রবেশ করলাম।

মণিকাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো।

চাবির গোছার মধ্যেই ঘরের সেক্রেটারিয়েট ড্রয়ারের চাবি ছিল। তারই সাহায্যে কিরীটী ড্রয়ারগুলো এক-এক করে খুলে, ভিতরকার কাগজপত্র সব উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

একটা ফ্ল্যাট-ফাইলের মধ্যে সেই প্রথম দিনকার পরিচয়ের সময় মণিকা দেবী লিখিত যে চিঠিটা সচ্চিদানন্দ দেখিয়েছিলেন, সেটা পাওয়া গেল।

কিরীটী চিঠিটা নিয়ে নিজের পকেটে রাখল।

আর একটা ফাইলের মধ্যে কতকগুলো বিভিন্ন সময়কার রেজেষ্ট্রী চিঠির একনলেজমেণ্ট রসিদ পাওয়া গেল।

পর পর তারিখ অনুসারে একনলেজমেণ্ট রসিদগুলো একটা ক্লিপ দিয়ে একসঙ্গে আঁটা।

দেখলাম প্রত্যেকটা রসিদেই যতীন্দ্রনাথ চাটুয্যের নাম সই করা রয়েছে। প্রত্যেকটা রসিদই তিনি রিসিভ করেছেন।

প্রথম রসিদের প্রাপ্তির যে তারিখ সই করা আছে, সেটা আজ থেকে প্রায় সাতাশ বছর আগেকার একটা দিন—৭ই জুলাই। এবং শেষ রসিদ এগারো বছর আগেকার তারিখ ৭ই জানুয়ারী। অর্থাৎ ষোল বৎসর ধরে প্রত্যেক মাসের নিয়মিত ৭ই যতীন চাটুয্যের নামে একটি করে রসিদযুক্ত রেজেষ্ট্রী চিঠি গিয়েছে। এবং সেই চিঠি তিনি রসিদে সই করে নিয়েছেন।

কি এমন চিঠি, যতীন চাটুয্যের নামে সচ্চিদানন্দ দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে প্রত্যেক মাসের ঠিক সাত তারিখে যাতে পান, সেই ভাবে পাঠিয়েছেন?

কিই বা থাকতো সেই চিঠির মধ্যে? এবং কিরীটীর মুখেই শুনেছিলাম, যতীন চাটুয্যে মরবার পরও পত্রপ্রেরক তাঁর মৃত্যু-সংবাদ না জানায় ঐভাবে রেজেষ্ট্রী করে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে-চিঠি গ্রহীতা জীবিত না থাকায় ফিরে আসে প্রেরকের কাছে ঠিক এগারো বছর আগে। তারপর অবশ্যি আর চিঠি যায়নি।

চকিতে তখন একটা কথা মনে পড়ল।

তাই যদি হয় তাহলে প্রথম রাত্রে পরিচয়ের সময় সচ্চিদানন্দ যে বলেছিলেন,

তিনি তাঁর বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ তাঁর বিধবা স্ত্রী নারায়ণী দেবীর মুখেই বন্ধুর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে প্রথম শুনতে পান, সেটা, মিথ্যে? তিনি পূর্বেই জানতেন তাঁর বন্ধুর মৃত্যুর কথা!

তবে তিনি আমাদের কাছে সে-রাত্রে মিথ্যা বলেছিলেন কেন? আর যতীনের স্ত্রী নারায়ণী যখন তাঁর স্বামীর এতবড় একজন সত্যিকারের বন্ধুর কথা জানতেনই, তখন স্বামীর মৃত্যুর পরই সচ্চিদানন্দর কাছে চলে এলেনই বা না কেন কন্যাকে নিয়ে?

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটীর দিকে তাকিয়ে দেখি, লাল ফিতেয় বাঁধা খানকয়েক চিঠি খাম থেকে খুলে উল্টে-পাল্টে দেখছে সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

চিঠির বাণ্ডিলটা কিরীটী আবার লাল ফিতেটা দিয়ে বেঁধে, সেগুলো ও রসিদগুলো পকেটস্থ করল। সেদিনকার মত ড্রয়ারে চাবি দিয়ে মণিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ও-বাড়ি থেকে বের হয়ে এলাম।

সঙ্গে এনেছিলাম আমরা কয়েকটা জিনিস।

একটা গ্লাস-সিরিঞ্জের ভাঙা অংশ, একটা হাইপোডারমিক নিড্‌ল, খানদশেক নিয়ে একটা বাণ্ডিল, একগোছা একনলেজমেণ্ট রসিদ ও সচ্চিদানন্দর হারানো চাবির গোছাটা।

একটা টেবিলের উপর একে একে জিনিসগুলো দ্বিপ্রহরের দিকে সাজিয়ে রাখছিল কিরীটী। এবং আরও রাখল প্রথম দিনে প্রাপ্ত দুমড়ানো ফটোটা ও একগাছি লাল-সাদা সুতো, যেটা মৃতের মুঠি থেকে সে উদ্ধার করেছিল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একসময় কিরীটী প্রশ্ন করল, চিঠিগুলো পড়েছিস্ সুব্রত?

না।

পড়ে দেখ—

চিঠিগুলো হাতে তুলে নিলাম।

প্রথম চিঠিখানি খুলে মনঃসংযোগ করলাম। মেয়েলী হাতের গোটা গোটা আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা চিঠি।

চিঠির উপরে কোন জায়গার নাম নেই; কিন্তু বছর আঠারো আগেকার লেখ চিঠিটা—কেবলমাত্র তারিখ্ দেখে বোঝা যায়।

আমি তোমার আশ্রয় ছেড়ে আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছি এবং চিরদিনের মত চলে যাচ্ছি। কেননা, পরশু রাত্রে যা হয়ে গেল, তারপর অনেক ভেবেই আমাকে

এই পথ নিতে হল। ভেবে দেখো, এতে তোমার আমার উভয়েরই মঙ্গল। কিন্তু এও তুমি জেনো, আমার কাছ থেকে তুমি তাকে ছিনিয়ে নিলেও সে আমারই। এবং তা যদি সত্য হয়, তো একদিন না একদিন তাকে আমি খুঁজে বের করবই। আজ যাবার আগে জানিয়ে যাই, তোমার সমস্ত প্রতারণা, সমস্ত ধাপ্পাবাজি আমি ধরতে পেরেছি।

শেষ কথা, তুমি আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করো না। আর, করলেও সফল হবে না জেনো। সুধা আজ থেকে তোমার কাছে মৃত। এবং এও বলে যাচ্ছি, একদিন বুঝবে, আমার সঙ্গে তুমি কত বড় প্রতারণা করেছ। ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন তো এর বিচারের ভার আমি তাঁর হাতেই তুলে দিয়ে গেলাম। ইতি—

সুধা

দ্বিতীয় পত্র :

চিঠিটা লিখেছেন যতীন চাটুয্যে তাঁর বন্ধু সচ্চিদানন্দকে। চিঠির তারিখ প্রথম রসিদের তারিখের মাসখানেক আগেকার।

প্রিয় নন্দ,

তোমাকে তো সেদিনও বলেছি, আজও বলছি, তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পার। স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব আমি আমার কাঁধে তুলে নিয়েছি, জীবনে কখনও তা থেকে আমি বিচ্যুত হব না। ছোটবেলা থেকে তুমি তো আমাকে জান। কথার খেলাপ কখনও আমি করি না। আর সেও কখনও আমার মতের বিরুদ্ধে যাবে না। বেশি কথা আমি বলি না, এবং বেশি কথা আমি লিখতেও ভালবাসি না। তাই এইখানেই ইতি করছি। ভালবাসা জেনো।

তোমার চিরদিনের অভিন্নহৃদয় যতীন

তৃতীয় পত্র যতীন চাটুয্যেরই লেখা।

তারিখ আরও বৎসরখানেক পরের।

প্রাপ্তিসংবাদ নিশ্চয়ই তুমি পেয়েছ। কিন্তু কেন এভাবে আমাকে বিব্রত করছ বল তো! আমি গরীব স্কুল-মাস্টার, কিন্তু তাই বলে পোলাও-কালিয়া না জুটলেও শাকান্ন জোটে। এবং তাতেই আমি তৃপ্ত। এই কথাটা বুঝলে আমি বড় খুশি হব। ভালবাসা নিও—

তোমার যতীন

চতুর্থ পত্র : এখানিও যতীন চাটুয্যের লেখা তৃতীয় পত্রের ঠিক এক বৎসর পরের তারিখের লেখা।

প্রিয় নন্দ,

তোমার পত্র পেলাম। গতবার তোমার সঙ্গে দেখা হলে সাক্ষাতেই তো জানিয়ে দিয়েছিলাম আমার মতামত স্পষ্টাস্পষ্টি। আবার কেন তবে সে-কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছ? দেখ, পূর্বেও তোমাকে বলেছি, এখনও বলছি, ঐ সম্পর্কে কোন পত্রের লেন-দেন করা আমার আর আদৌ অভিপ্রেত নয়। তুমি যদি মনে কর, আমার দ্বারা দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে না, অনায়াসেই তুমি নিজের হাতে সেটা তুলে নিতে পার। দেখ ভাই আবার বলি, একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর না থাকলে কারও দ্বারা কোন গুরু-দায়িত্বই পালন করা সম্ভব হয় না। আর একটা কথা। কিছু মনে করো না ভাই। তুমি যে মধ্যে মধ্যে এখানে আস, সেটা আমি পছন্দ করি না। আমি চাই না, জটিলতা আরও বৃদ্ধি হোক। বুদ্ধিমান তুমি, আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। ভালবাসা নিও—

তোমার যতীন

পঞ্চম পত্র : যতীন চাটুয্যের লেখা। আরও বৎসর তিনেক বাদে।

তোমার পত্র পেয়েছি সবগুলিই। পত্রের জবাব দেব দেব করেও দিতে পারিনি। জান তো চিরদিন, এই পত্রের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে আমি একটু শিথিল। তার উপর ইদানীং কিছুদিন ধরে আবার আমার স্ত্রী নারায়ণী ও শিবানীর শরীর ভাল যাচ্ছে না। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। এদিককার চিরপরিচিত পালা জ্বর। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীই দেখছেন। তুমি লিখেছ, এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমার রাণীগঞ্জের কলিয়ারীতে গিয়ে থাকতে। ধন্যবাদ সেজন্য। প্রয়োজন আমার অল্প। তাই এখানে যা পাই, তিনটি প্রাণীর আমাদের কোন কষ্ট হয় না। তাছাড়া, আমার কি মনে হয় জান—সত্যিকারের যে বন্ধু, তার কাছে হাত পাতার মত লজ্জা ও বেদনা বুঝি আর নেই। জান তো মানুষ বড় স্বার্থপর। স্বার্থে এতটুকু আঘাত লাগলেই সইতে পারে না। তাই বিশেষ করে স্বার্থের ব্যাপারে আমাদের এতদিনকার বন্ধুত্বকে পীড়িত করবার আমার এতটুকু ইচ্ছা নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তোমার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলাম না বলে। আজ না বুঝলেও একদিন হয়ত কথাটার তাৎপর্য আমার বুঝতে পারবে। সেদিন হয়ত আমি থাকব না। ভয় নেই তোমার ভাই, বন্ধু বলে যে কর্তব্য মাথায়

আমার বিশ্বাস করে তুলে দিয়েছ, বিন্দুমাত্রও তার চ্যুতি বা ত্রুটি প্রাণ থাকতে হতে দেব না। তোমার স্ত্রীর অবস্থা পূর্ববৎ জেনে দুঃখ হল। ভগবান করুন, তিনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠুন। ভালবাসা নিও।

তোমার যতীন

•

ষষ্ঠ পত্র : পত্রের লেখিকা শিবানী। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু কাকাবাবু,

বাবা আপনার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছেন। তাঁর শরীরটা কিছুদিন যাবৎ ভাল যাচ্ছে না। তাই আমি চিঠি দিচ্ছি, তাঁর ইচ্ছামত তাঁর হয়ে। আমরা একপ্রকার ভাল আছি। আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না। বাবা বললেন, আপনার এখানে আসবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ও কাকীমা কেমন আছেন? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন আপনারা।

প্রণতা
শিবানী

চিঠিগুলো পড়া হলে পূর্ববৎ আবার একে একে ভাঁজ করে খামে ভরে, খামগুলো লাল ফিতেটা দিয়ে বাণ্ডিল বেঁধে রাখলাম।

চিঠির বাণ্ডিলটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে কিরীটীর দিকে তাকালাম। কিরীটী সোফার উপরে অলসভাবে গা এলিয়ে পড়ে আছে। চক্ষু দুটি মুদ্রিত।

বুঝলাম কোন কিছু সে গভীরভাবে চিন্তা করছে। সামনের টিপয়ের উপরে কাচের অ্যাসট্রের উপরে সিগারটা রাখা। কখন এক সময় সেটা নিভে গিয়েছে, সে খেয়ালও তার নেই।

কিরীটী?

উঁ! চোখ মেলে তাকাল কিরীটী। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, চিঠি পত্রগুলোর সাহায্যে আপাততঃ একটা জায়গায় পৌঁছেচি, কিন্তু মাঝখানে একটা ছোট ফাঁক থেকে যাচ্ছে, জোড় সেইখানেই লাগছে না।

কোথায়?

শ্রীমতী সুধাকে খুঁজে পাচ্ছি না ঘটনাগুলোর মধ্যে। একটিবার মাত্র উঁকি দিয়ে সেই যে তিনি অন্তরালে গা ঢাকা দিলেন, তারপর আর দেখা নেই তাঁর। কেন, কেন—

তাহলে তুই বলতে চাস—

হ্যাঁ! She is the missing link! অতএব তাঁকে যেমন করে হোক আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

আর শিবানী?

তাঁকে খুঁজে পেয়েছি। নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল কিরীটী।

পেয়েছিস্?

হ্যাঁ। শিবানীকে পেয়েছি, এখন সুধাকে পেলেই রহস্যের ফাঁকটা ভরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কারণ সচ্চিদানন্দের হত্যার বীজ ওখানেই ছিল।

তাহলে ধরতে পেরেছিস্, হত্যাকারী কে?

না। তবে কারণটা বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছি।

আমার কিন্তু মনে হয় মণিকাই হত্যা করেছে সচ্চিদানন্দকে।

বেশ মানলুম, কিন্তু উদ্দেশ্য কি? হত্যা সে যখন করেছে, নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই? অথচ ভেবে দেখলে দেখতে পাবে, মণিকার শিবানী পরিচয়টা যদি সত্য হয়, তাহলে কোন মতেই সে সচ্চিদানন্দকে হত্যা করতে পারে না। he would be the last person to touch even Sachchidananda.

কথাটা মিথ্যে নয়। এবং যুক্তির দিক দিয়ে তাই মনে হয়।

চিঠিগুলো তো পড়লি। কোন কিছু খুঁজে পেলি ওর মধ্যে? কারও কোন গুপ্ত পরিচয়?

গুপ্ত পরিচয়!

হ্যাঁ। Some one's identity?

চিঠির লেখাগুলো আর একবার মনে মনে আলোচনা করে নিলাম। কিন্তু তেমন কিছুই তো কই মনে আসছে না! কার কথা ও বলতে চায়?

বুঝতে পারছি, খুঁজে পাসনি। বলতে বলতে মণিকার লেখা চিঠিটা এবারে কিরীটী ইঙ্গিত করে দেখিয়ে বললে, চিন্তার সঙ্গে তোর ঐ চিঠিটাও জুড়ে নে। তারপর ভাল করে ভেবে দেখ। পড় না ঐ চিঠিটা আর একবার!

চিঠিটা তুলে নিয়ে আবার আগাগোড়া সবটা পড়লাম, কিন্তু তবু যেন কোন হদিস পেলাম না—কিরীটী যা বলতে চায় তার।

কি রে, পেলি কিছু?

না।

না কেন রে! ব্যাপারটা তো এখন জলের মত পরিষ্কার লাগছে। দুটো চিঠির

মধ্যে তারিখের ব্যবধান কত?

কোন্ দুটো চিঠির মধ্যে?

শিবানীর শেষ চিঠি ও প্রথম চিঠির মধ্যে!

এগারো বছরের। তারিখ দুটো দেখে বললাম।

কিন্তু কথাটা আমাদের শেষ পর্যন্ত আলোচনা করা হল না। বলীন সোম ও সুশীল রায় এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

মণিকা দেবী যে চলে যেতে চাইছেন! সুশীল রায় বললেন।

তাই নাকি! আপনাদের জানিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ, বিকেলে ফোন করে বলেছেন। বলীন সোম জবাব দিলেন কিরীটীকে।

বলে দিন, আর সাত দিন পরে যেতে পারেন। কিরীটী জবাব দিল সোমকে।

কিন্তু এদিককার ব্যাপার? সুশীল রায় প্রশ্ন করলেন।

সাত দিনের মধ্যেই যাহোক একটা মীমাংসা হয়ে যাবে মনে হয়।

সত্যি?

হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। অবশ্য দু'একদিন আগেও হয়ে যেতে পারে। কিরীটী জবাব দিল।

হত্যাকারী কে বুঝতে পেরেছেন তাহলে?

হত্যাকারী তো আপনাদের চোখের সামনেই রয়েছে! চেয়ে দেখুন ভাল করে, তাহলেই খুঁজে পাবেন।

কিরীটীর কথায় এবারে আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটীর কথায় যেন সকলের মনেই একসঙ্গে কয়েকটা পরিচিত মুখ ভেসে ওঠে পাশাপাশি আমাদের। মহিমারঞ্জন, আনন্দ সান্যাল, নন্দন, মণিকা দেবী ও রাধারাণী দেবী।

কিন্তু এদের মধ্যে কে, কে হত্যাকারী।

বলীন সোমই আমাদের মধ্যে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, মহিমারঞ্জন, আনন্দ সান্যাল, নন্দন, মণিকা দেবী ও রাধারাণী দেবী—এঁরাই তো আমাদের চোখের সামনে আপাততঃ ভাসছেন। এঁদেরই মধ্যে নিশ্চয় কেউ মনে হচ্ছে তাহলে—

অবশ্যই, কোন সন্দেহ নেই তাতে। মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দেয়।

এদেরই মধ্যে একজন তাহলে হত্যাকারী?

নির্ভুলভাবে। পূর্ববৎ হেসে কিরীটী জবাব দেয়।

কে ?

কে হত্যা করতে পারে—আপনিই বলুন না সোম, এঁদের মধ্যে কে ? হাসতে হাসতে কিরীটী যেন সোমকে পাল্টা প্রশ্ন করলে।

এবারে যেন সত্যিসত্যিই কেমন বিব্রত দেখাল সোমকে।

সত্যিই ত ! কে ? মহিমারঞ্জন, আনন্দ, নন্দন ও মণিকা, রাধারাণী—তিনজন পুরুষ ও দুজন নারীর মধ্যে কে ? এঁদের মধ্যে কে সচ্চিদানন্দকে হত্যা করল ?

মনে পড়ে কিরীটীর একটা কথা। কতদিন তাকে বলতে শুনেছি, পৃথিবীতে কোন কিছুই বিচিত্র নয়। এমন কি একজনের একজনকে হত্যা করাটার মধ্যেও বিচিত্র কিছু নেই। মানুষের বুকের মধ্যে ভালবাসা, প্রেম, ঘৃণা, আক্রোশ. দ্বেষ ও তুচ্ছতার মত হত্যা-লিপ্সাটাও একটা অন্তরূপ প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোন মানুষের পক্ষেই জীবনের কোন না কোন সময়ে কাউকে হত্যা করার মধ্যে এমন কিছু একটা বৈচিত্র্যই নেই। অতি শান্ত-শিষ্ট, ধীর-স্থির, সজ্জন প্রকৃতির লোকের মধ্যেও কোন না কোন সময় যদি হত্যা-লিপ্সা জাগেই, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেবল যে গভীর কোন উদ্দেশ্য নিয়েই সর্বক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তা নয়। তুচ্ছতম কারণেও মানুষ মানুষকে হত্যা করতে পারে এবং তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

হঠাৎ কিরীটীর কথায় আবার চমক ভাঙল।

কিন্তু হত্যাকারী কে ? সেই কথাটা স্থির করবার পূর্বে ভেবে দেখা যাক, সে-রাত্রে সচ্চিদানন্দবাবু ও-বাড়িতে ফিরে যাবার পর কি ঘটতে পারে ! এবং সেটা ভাবতে গেলে স্বভাবতঃই কয়েকটা সূত্র আমাদের মনে পড়ে। হত্যা-ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর ও-বাড়িতে ইতস্ততঃ যেসব ছিন্ন সূত্রগুলো আমরা খুঁজে পেয়েছি সেগুলো যদি একত্রিত করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই—কিরীটী ধীর মৃদু কণ্ঠে তার বিশ্লেষণ বলে যেতে লাগল। আমরা সকলেই মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনে যেতে লাগলাম।

বাড়িতে ফিরবার পর, যতদূর আমরা অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি, একমাত্র সে-রাত্রে মণিকা দেবীর সঙ্গেই তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সে-সময় কেউ দেখেছে কিনা জানি না। অবিশ্যি সে-সময় তাঁদের কেউ কথাবার্তা বলতে দেখেছে কি না এখনও পর্যন্ত আমরা সেটা জানতে পারিনি, জানা যায়নি। তবে না দেখলেও তাঁদের সে রাত্রে কথাবার্তা বলতে অন্তত যে একজন শুনেছিলেন, সেটা আমরা জানি আর তিনি হচ্ছেন আমাদের মহিমারঞ্জন। তিনি তখনও

জেগে ছিলেন। সচ্চিদানন্দকে খাবার কথা বলতে এসেছিলেন মণিকা, কিন্তু তিনি কিছু খাবেন না সে-রাত্রে, সেই কথাই জানিয়ে দেন তাঁকে। তারপর ধরে নিতে পারি, নিশ্চয়ই মণিকা চলে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের ঘরে। সচ্চিদানন্দ হয়ত তারপর নিজের ঘরে যান, বাইরের পোষাক ছাড়েন এবং নিশ্চয়ই সেখান থেকে অত রাত্রে আবার তাঁর স্টাডি-রুম বা অফিস-রুমে গিয়ে প্রবেশ করেন। টেবিলের উপরে মদের Vat 69-এর বোতল ও ভাঙা কাচের গ্লাসটাই তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু শুধু কি অত রাত্রে মদ্যপান করবার জন্যেই সচ্চিদানন্দ সে-ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, না অন্য কোন বিশেষ কাজ ছিল তাঁর? কারণ অত রাত্রে কেবলমাত্র দু-এক পেগ ড্রিংক করবার জন্যই সে-ঘরে তিনি যাবেন কেন! এখন কথা হচ্ছে ঐ ঘরে তাঁর থাকাকালীন সময় কেউ প্রবেশ করেছিল কিনা? নিশ্চয়ই সে-ঘরে কেউ রাত্রে প্রবেশ করেছিল বলেই আমার ধারণা। কিন্তু কে? এবং তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন কারণে শেষ পযন্ত হয়ত কথা কাটাকাটি হয়েছিল, যার ফলে সচ্চিদানন্দ হয়ত নেশার আক্রোশে তাঁর হাতের গ্লাসটা ছুঁড়ে মারেন তাঁকে। এবং এ সব কিছু মহিমরঞ্জনের অগোচরে ঘটেনি। কেননা, তিনি ঠিক পাশের ঘরেই ছিলেন। সেদিক দিয়ে মহিমারঞ্জন তাঁর জবানবন্দীতে বলেছে। সবটুকুই তার বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সেটা আপনারাই বিচার করবেন। আমার ধারণা, মহিমারঞ্জন সব কথা সত্যি বলেননি। ঘরের মধ্যে যে কাগজের টুকরোগুলো কুড়িয়ে পাই, সেগুলো জোড়া দিয়ে দেখেছি সেটা একটা উইলের খসড়া। নতুন একটা উইল করবার ইচ্ছা জাগে সম্ভবতঃ সচ্চিদানন্দর সে-রাত্রে। কিন্তু সে-খসড়াটা ছিন্ন-ভিন্ন করে ঘরের মধ্যে ছড়িয়েই বা দিয়েছিলেন কেন তিনি? খুব সম্ভবতঃ তাঁর মত শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রেই বদলে গিয়েছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন পূর্ববৎ নেশার ঘোরেই। তারপর তিনি নিশ্চয়ই আবার ঘর থেকে বের হয়ে যান, ঘরের দরজা খোলা রেখেই, যা বড় একটা তিনি করতেন না। সেখান থেকে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, শোবার ঘরে না সোজা কাচঘরে? মৃতদেহ কাচঘরে পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি শেষ পর্যন্ত তিনি কাচঘরেই গিয়েছিলেন সে-রাত্রে। কিন্তু আবার এখানেও প্রশ্ন জাগে—অত রাত্রে কি জন্য তিনি কাচঘরে গিয়েছিলেন? এমনিই কাচঘরে গিয়েছিলেন, না কারও সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে কাচঘরে গিয়েছিলেন, না কেউ তাঁকে কাচঘরে ঐ রাত্রে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? আমার মনে হয়, কোন কারণে মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যই তিনি সে-রাত্রে কাচঘরে

গিয়েছিলেন। কারণ কাচঘরটি ছিল তাঁর অতি প্রিয় স্থান। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন তার বেশির ভাগ সময়ই নাকি তাঁর ঐ কাচঘরে কাটত—এ সংবাদ আমরা পেয়েছি। যাই হোক, তাঁর কাচঘরে যাবার পরই শেষ ঘটনা ঘটে।. এখানেও একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—তিনতলার কাচঘরটা ঠিক একেবারে মহিমারঞ্জনের ঘরের উপরেই অবস্থিত, সেটা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে আপনাদের কারও কষ্ট হবে না। সেক্ষেত্রে, ঘরে শুয়ে উপরের ছাদে কোনপ্রকার শব্দ হলে সেটা জানতে পারা বিশেষ কিছু কষ্টকর নয়। অথচ, মহিমারঞ্জন জবানবন্দীতে বলেছেন, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন—কিছুই জানেন না। আবার চিন্তা করতে হবে আপনাদের, তাঁর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য কিনা। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো পূর্বের মতই বলব, না। তার কারণ, যে ব্যক্তি রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত মাথার কষ্টে জেগেছিলেন, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেও তাঁর ঘুম এত গাঢ় হতে পারে না, যাতে করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাচ ভাঙার শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙবে না। কিন্তু যাক সে কথা। এবারে আসা যাক পরবর্তী ঘটনায়। অবশ্য একটা কথা আপনারা ভুলবেন না, সব কিছুই আমি আমার অনুমানের উপর ভিত্তি করেই বলে যাচ্ছি, বিচার বিশ্লেষণ করে। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তাঁর ঘাড়ে একটা কালো দাগ ছিল এবং তার মধ্যে ছিল ছোট একটা puncture point. আর পাওয়া গিয়েছে আজ কাচঘরের মধ্যে ঐ কাচের সিরিঞ্জের একটা অংশ ও hypodermic needleটা। এবং মৃতের ওষ্ঠপ্রান্তে ছিল ক্ষীণ একটা লালা ও রক্তমিশ্রিত দাগ। শরীরের মধ্যে ছিল একটা নীলাভা। ময়না তদন্তের ফলে জানা গিয়েছে, স্টমাকে ছিল অ্যালকোহল, সম্পূর্ণটা absorption হবার সময় পায়নি, যা সে-রাত্রে তিনি শেষবার পান করেছিলেন।

এই সময় বাধা দিলেন ইন্সপেক্টার সুশীল রায়, তাছাড়া আরও একটা কথা মিঃ রায়, যা পরের দিন পুলিশ-সার্জন আমাকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে জানান। তাঁর ধারণা, মৃত্যুর কারণ combined action of অ্যালকোহল ও মরফিন হাইড্রোক্লোর ছাড়াও অন্য কোন একটা মারাত্মক বিষ, যা তিনি ধরতে পারেননি!

সেই কথা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। কোন তীব্র বিষাক্তজাতীয় বিষাক্ত orchid-এর রস শরীরের মধ্যে তাঁর সংক্রামিত হয়েছিল। আপনাদের কারও নজরে পড়েনি, কিন্তু আমার নজরে পড়েছিল—কিরীটী বলতে লাগল, কাচঘরের বেঞ্চটার

ঠিক বাঁ-দিকেই টবের মধ্যে একটা অর্কিড গাছ থেঁতলে ছিল। সে অর্কিডটার নাম আমি জানি না, কিন্তু গাছটা দেখেই আমার মনে পড়েছিল, কোথায় কবে যেন একটা ম্যাগাজিনে ঐ বিষাক্ত অর্কিডের একটা ছবি দেখেছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে ঐ অর্কিড জন্মায় এবং ঐ গাছের পাতার রস ভয়ানক বিষাক্ত। গায়ে একবার কোনক্রমে প্রবেশ করলে আর রক্ষা নেই। আধ ঘণ্টা থেকে তিন কোয়ার্টারের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য। অবশ্য জানি না, ঐ অর্কিড সম্পর্কে সব কথা জানতেন কিনা সচ্চিদানন্দ নিজেও। সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ, আমার মনে হয়, বিষাক্ত অর্কিডই, মরফিন হাইড্রোক্লোর নয়। তথাপি একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, দেহের মধ্যে মরফিন হাইড্রোক্লোর সংক্রামিত করা হয়েছিল এবং কাচঘরের মধ্যে ভগ্ন সিরিঞ্জটা পাওয়া গিয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে কোন একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার পূর্বে যে, হারানো সূত্রটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, সেটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দের অতীত জীবনের একটি অধ্যায়। যে অধ্যায়টির মধ্যে জড়িয়ে আছেন তাঁর মৃত বন্ধু যতীন চাটুয্যে, তাঁর কন্যা শিবানী, সচ্চিদানন্দবাবুর স্ত্রীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও সুধা নাম্নী কোন স্ত্রীলোক।

সুধা ? সুধা কে ? আর যতীন চাটুয্যেই বা কে ? প্রশ্ন করে সুশীল রায়।

সংক্ষেপে কিরীটী সুশীল রায়ের প্রশ্নের জবাবে যতীন চাটুয্যের কথা ও পত্র-কাহিনী বিবৃত করে গেল।

কাল বাদে পরশু আমরা যাব আবার সচ্চিদানন্দের বাড়িতে এবং এবারে আমরা সকলে গিয়ে মিলব রাত্রি দশটায় কাচঘরে। ছোট্ট একটা অভিনয় করবার ইচ্ছা আছে আমার সেই কাচঘরে।

কিরীটীর কথায় সকলেই আমরা ওর মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু তার আসল মতলবটা ঠিক বোঝা গেল না।

পরের দিন বিকালের দিকে কিরীটীর ওখানে গিয়ে দেখি, নাট্যালয় থিয়েটারের বিখ্যাত মেকআপ-ম্যান রতিকান্তের সঙ্গে কিরীটী গভীর ভাবে কি সব আলোচনা করছে। তার পাশে বসে আছেন, এ-যুগের অন্যতম বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা সরল মজুমদার।

আমাকে দেখেও যেন কিরীটী দেখল না। রতিকান্তকে বলছিল, বুঝলেন তো রতিবাবু—হুবহু ঐভাবে মেকআপ দিতে হবে। সরলবাবু শুধু বসে মূক অভিনয় করে যাবেন। বলতে বলতে একটা অয়েল-পেপার মোড়া ফটো রতিকান্তের দিকে

এগিয়ে দিল, এই ফটোটা নিয়ে যান। যতটা সম্ভব খুঁটিনাটি study করে নেবেন।

অতঃপর নমস্কার জানিয়ে রতিকান্ত ও সরল মজুমদার উঠে দাঁড়ালেন।

তবে চলি—

হ্যাঁ, আসুন। রাত্রি পৌনে দশটায় ঠিক আমি দরজায় থাকব আপনাদের অপেক্ষায়।

ওঁরা দুজনে চলে গেলেন।

ব্যাপার কি কিরীটী?

রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।

রিহার্সাল! কিসের?

আগামীকালের অভিনয়ের।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে আমরা সচ্চিদানন্দ-ভবনে গিয়ে পৌঁছলাম। মহিমারঞ্জন আমাদের অপেক্ষাতেই বাইরের ঘরে ছিলেন। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

কিরীটী মহিমারঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলে, যেমন যেমন বলেছিলাম, সব ঠিক আছে তো মহিমাবাবু?

হ্যাঁ। দোতলার অফিস-ঘরেই সকলে উপস্থিত আছেন।

ঠিক আছে। আপনি তাহলে ওপরে যান। ঠিক রাত দশটায় প্রথমেই আনন্দবাবুকে কাচঘরে পাঠাবেন। তার মিনিট পনেরো পরে যাবেন আপনি ও মণিকা দেবী।

তাই হবে।

মহিমারঞ্জন ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

একটু পরেই একটা গাড়ি এসে সদরে থামল। কিরীটী বললে, ওঁরা বোধ হয় এলেন।

কিরীটী দরজা-পথে বের হয়ে গেল এবং একটু পরেই বলীন সোম, সুশীল রায় ও সর্বাঙ্গে চাদরে আবৃত কে একজন কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এসে প্রবেশ করলেন।

সকলে আমরা অতঃপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। এবং দোতলা অতিক্রম করে সোজা একেবারে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলার কাচঘরে গিয়ে

প্রবেশ করলাম।

কাচঘরের মধ্যে একটা স্বল্প-শক্তির বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলছে। চারিদিকে অর্কিড গাছ—তার উপরে সেই স্বল্পালোক পড়ে কেমন যেন একটা বিচিত্র আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে।

গা-টার মধ্যে কেমন যেন ছমছম করে।

এদিক-ওদিক প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল কিরীটী, কেবল সর্বাঙ্গ চাদরে আবৃত ভদ্রলোককে বসাল নিয়ে গিয়ে বেঞ্চটার উপরে।

গা থেকে চাদরটা সরাতেই সেই মৃদু আলোকে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলাম, কে ?

অবিকল হুবহু সচ্চিদানন্দ সান্যাল যেন।

কিরে, চিনতে পেরেছিস সচ্চিদানন্দ সান্যালকে, সুব্রত ?

বিস্ময়ে যেন আমার বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল। এমন নিখুঁত মেকআপ যে, সত্যিই বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এবং এতক্ষণে যেন কিরীটীর পরিকল্পনাটা আমার কাছে সবটাই পরিষ্কার হয়ে আসে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, আর পাঁচ মিনিট আছে। এইবার আনন্দবাবু আসবেন সুব্রত। চল, আমরা ঐ লতানো অর্কিডটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াই।

আমরা লতানো অর্কিডের পিছনে গিয়ে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

স্তিমিতালোকিত কাচঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে। এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ বলে মনে হয়। তারপর একসময় পায়ের শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম আনন্দ সান্যাল প্রবেশ করছেন কাচঘরে। পায়ের শব্দ এগিয়ে চলেছে বেঞ্চের দিকে।

হঠাৎ পদশব্দ থেমে গেল। তারপরই একটা অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার : কে? কে ওখানে? এবং সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত পদবিক্ষেপে আনন্দ সান্যাল ফিরে যাবার চেষ্টা করতেই কিরীটী সামনে এগিয়ে বিদ্যুৎগতিতে তার পথরোধ করে দাঁড়াল, দাঁড়ান আনন্দবাবু !

না না, কে—কে তুমি ? প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় আনন্দ সান্যাল।

কিরীটীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আনন্দবাবু যেন কতকটা ধাতস্থ হয়। ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখের দিকে তাকাল। কিছুটা ধাতস্থ হলেও তখনও পুরোপুরিভাবে

সে যেন আকস্মিক পরিস্থিতিটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি !

আনন্দবাবু !

কিন্তু ওখানে কে ? কে ওখানে বেঞ্চের ওপরে বসে আছেন ?

আপনার কাকার প্রেতাত্মা। বজ্রকঠিন কণ্ঠে যেন কিরীটী জবাব দেয়।

প্রেতাত্মা ! বোকার মতই প্রশ্নটা করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় আনন্দ সান্যাল।

হ্যাঁ। এমনি করে প্রতি রাত্রে উনি ওখানে এসে বসেন তাঁর হত্যাকারীর প্রতীক্ষায়। এখন বুঝতে পারছেন তো হত্যাকারীকে ধরা দিতেই হবে।

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন—বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, আমি, আমি—কাকাকে হত্যা করিনি।

তা আমি জানি। কিন্তু সে-রাত্রে নিশ্চয়ই আপনি টের পেয়েছিলেন, বারান্দা দিয়ে কে হেঁটে গিয়েছিল ?

না। না। আপনি বিশ্বাস করুন—

কিন্তু আপনি যে মরীচিকার পিছনে ছুটছেন, তা কি জানেন ?

মরীচিকা ?

হ্যাঁ।

ঠিক এমনি সময়ে একসঙ্গে দুজোড়া পদশব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কাচঘরের দিকেই আসছে এগিয়ে সে পদশব্দ।

চুপ। এপাশে সরে দাঁড়ান।

কথাটা বলে সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী যেন আনন্দবাবুকে একপ্রকার জোর করে টেনেই আমাদের পিছনে পূর্বের জায়গায় এসে দাঁড়াল।

অস্পষ্ট আলোতে চোখে পড়ল, মহিমারঞ্জন ও তাঁর পিছনে মণিকা দেবী এগিয়ে আসছেন।

এবং তাঁরাও বেঞ্চের কাছাকাছি এসে আনন্দবাবুর মতই ভুল করে থমকে দাঁড়ালেন : কে ? কে ? যুগপৎ একই সময়ে দুজনার কণ্ঠ থেকে প্রশ্নটা নির্গত হয়, কে ? কে ?

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দপ করে কাচঘরের একটিমাত্র আলো নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মুহূর্তে সমস্ত কাচঘরটা থমথমে হয়ে উঠল।

এবং মুহূর্ত পরে যেই আবার আলোটা জ্বলে উঠল, দেখলাম, ক্ষণপূর্বে সামনের বেঞ্চে সচ্চিদানন্দবাবুর প্রতিকৃতির মেকআপ নিয়ে যে সমরবাবু বসেছিলেন, তিনি

তখন আর সেখানে নেই। বেঞ্চ খালি।

হতভম্ব নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে মহিমারঞ্জন ও মণিকা দেবী।

কিরীটী এগিয়ে গেল এবারে। ডাকল, মহিমাবাবু?

কিরীটীর ডাকে মহিমাবাবু ফিরে তাকালেন, কে?

একটু আগে কিছু বেঞ্চের ওপরে দেখলেন?

হ্যাঁ। নিম্নকণ্ঠে জবাব এল।

এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয় সচ্চিদানন্দবাবু মারা যাননি?

কি বলছেন আপনি কিরীটীবাবু? বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালেন মহিমারঞ্জন প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে।

ঠিকই বলছি। তিনি আজও বেঁচে আছেন। এবং আপনারা দুজনেই যে আপনাদের জবানবন্দীতে সেদিন অনেক সত্যকথাই গোপন করে গিয়েছিলেন, তাও আমরা জানি।

এমনি অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে জীবনে আর কখনও মহিমারঞ্জন বা মণিকা দেবী হয়ত পড়েননি। তাঁরা যেন একেবারে বিস্ময়ে বোবা বনে গিয়েছেন।

এখন বলবেন কি মহিমাবাবু, সে-রাত্রে আপনার পাশের ঘরে কার সঙ্গে সচ্চিদানন্দবাবুকে কথা বলতে শুনেছিলেন?

মহিমারঞ্জন নির্বাক।

তাহলে সুব্রত, নীচে যা—মিসেস্ সান্যালকে ডেকে আন।

সহসা আর্তকণ্ঠে মণিকা দেবী প্রতিবাদ জানালে, না-না, তাঁকে কেন? তাঁকে নয়!

সুব্রত, যা—

আমি এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে।

রাধারাণী দেবীকে সঙ্গে করে ফিরে এলাম কাচঘরে।

এসে দেখি, পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে আছেন মণিকা দেবী ও মহিমারঞ্জন এবং আনন্দবাবুও তাঁদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন।

আসুন মিসেস্ সান্যাল, বসুন।

নিঃশব্দে রাধারাণী এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চের উপরে বসলেন। চোখে তাঁর সেই অসহায় দৃষ্টি।

সচ্চিদানন্দবাবু, বের হয়ে আসুন।

কিরীটীর ডাকে সরলবাবু আবার যন্ত্রচালিতের মতই আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে রাধারাণীর একটু কাছে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ার মতই চমকে সম্মুখে দণ্ডায়মান সচ্চিদানন্দবেশী সরলবাবুর দিকে তাকালেন রাধারাণী।

চিনতে পারছেন ওঁকে রাধারাণী দেবী? ভাল করে চেয়ে দেখুন—দেখুন—

স্থির অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাধারাণী সরলবাবুর মুখের দিকে। কাচঘরের মৃদু আলোকেও তাঁর মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন পড়তে পারছি। কুঞ্চিত কপাল, স্থির পাথরের মত দুটি চক্ষুর তারা। গলার শিরা দুটো ফুলে উঠেছে।

ক্রমে সমস্ত শরীরটা তাঁর যেন মৃদু মৃদু কাঁপতে শুরু করে।

রাধারাণী! এই সর্বপ্রথম মূক অভিনয়ের মধ্যে সরলবাবু কথা বললেন কতকটা চাপা গলায়।

বার দুই সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল রাধারাণীর বেতস-লতার মত।

তারপরই তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে রাধারাণী বেঞ্চটার উপরে টলে পড়লেন। কিরীটী প্রস্তুতই ছিল। ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গিয়ে রাধারাণীকে ধরে বেঞ্চটার উপরে শুইয়ে দিলে।

রাধারাণীর তখন আর জ্ঞান নেই!

সরলবাবুকে পুনর্বার চোখের ইঙ্গিত করতেই কিরীটী ও তিনি সোজা এবারে কাচঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে প্রায় পনেরো মিনিট পরে রাধারাণী চোখ মেললেন।

মিসেস সান্যাল! স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকল কিরীটী।

একটা দীর্ঘশ্বাস রাধারাণীর বুকটা কাঁপিয়ে বের হয়ে এল শুনতে পেলাম। চারপাশে আমরা নির্বাক স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে।

উঠে বসবার চেষ্টা করলেন রাধারাণী। কিরীটী বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই দৃঢ় শান্ত পদে মণিকা এগিয়ে গেল রাধারাণীর কাছে।

কিন্তু রাধারাণী মণিকার দিকে তাকিয়েই তীক্ষ্ণ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ছুঁস্ না—ছুঁস্ না তুই আমাকে!

থমকে দাঁড়িয়ে গেল মণিকা।

মুখ নীচু করে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে মুখ তুলে কিরীটীর দিকে তাকাল,

কিরীটীবাবু !

বলুন !

আমার কিছু কথা ছিল আপনাকে বলবার ।

বলুন !

না, এখানে নয় । অনুগ্রহ করে যদি নীচে আমার ঘরে আসেন ।

মুহূর্ত কি যেন ভাবল কিরীটী । তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, বেশ, তাই চলুন । সুশীলবাবু, বলীনবাবু, আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন । আমি শুনে আসি, উনি কি বলতে চান ।

কিরীটী ও মণিকা কাচঘর থেকে বের হয়ে গেল ।

পরে কিরীটীর মুখে শুনেছিলাম, কি বলেছিল মণিকা সে-রাত্রে তাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ।

যেমন যেমন বলেছিল তেমনি বলে যাচ্ছি ।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মণিকা কিরীটীকে বললে, বসুন মিঃ রায় ।

কিরীটী ঘরের একটিমাত্র চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ।

কি ভাবে আমার বক্তব্য শুরু করব বুঝতে পারছি না—একটু ইতস্ততঃ করে মণিকা বলে ।

যেখান থেকে যেভাবে বললে আপনার সুবিধা হয় সেইভাবেই বলুন ।

একটা দীর্ঘশ্বাস মণিকার বুকটা কাঁপিয়ে বের হয়ে গেল ।

হ্যাঁ, বলতে আমাকে হবেই । আর কোন কথা গোপন করলে চলবে না । কারণ আমি না বললেও আর একজন বেঁচে আছে—সে বলবেই । কিন্তু পাছে সে সব সত্য কথা না বলে, তাই আমিই বলব স্থির করেছি ।

মণিকার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল সচ্চিদানন্দ বেঁচেই আছেন ।

সব কথা সেদিন আপনাকে আমি বলিনি, তার কারণ, রাধারাণীকেই আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম । কিন্তু তারও আর যখন কোন প্রয়োজন নেই, তখন সত্যি কথা যা আপনাকে তা বলব । তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, জানি না কতদিনের আলাপ আপনার সচ্চিদানন্দর সঙ্গে, ওকে আপনি কতটুকু চেনেন জানি না, তবে আমি চিনি । ও মানুষ নয়, মানুষের শরীরে আস্ত একটা শয়তান ! এ দুনিয়ায় ওর অসাধ্য কাজ কিছু ছিল না । অনেক সময় স্বার্থের জন্য মানুষ অনেক জঘন্য কাজ করে, কিন্তু বিনা স্বার্থে কেবলমাত্র স্বভাবে ও পারে

না এমন কোন নীচ বা জঘন্য কাজ নেই।

কথা বলতে বলতে কি অবিমিশ্র ঘৃণাই না ঝরে পড়ছিল মণিকার কণ্ঠস্বরে।

ওর প্রথম স্ত্রীর কথা জানেন কি?

হ্যাঁ, শুনেছি ওঁর মুখেই। বিবাহের পর মাত্র বছর তিনেক বেঁচেছিলেন, তারপর মারা যান।

বিকৃত একটা ঘৃণার হাসি ফুটে ওঠে মণিকার ওষ্ঠপ্রান্তে, মারা গেছে! তাই বলেছিল বুঝি?

হ্যাঁ।

তা এক পক্ষে মিথ্যা বলেনি। মৃত্যুই বৈকি! মৃত্যু ছাড়া আর কি! তারপর একটু থেমে আবার বললে, আর শিবানী? শিবানীর কথা কিছু বলেনি?

বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুর মেয়ে—

আপনি সে-কথা বিশ্বাস করেছিলেন?

না।

না? কিন্তু কেন বলুন তো?

আপনার শিবানী পরিচয়টা যেমন বিশ্বাস করিনি, তেমনি তাঁর সে-কথাও বিশ্বাস করিনি।

কেন? আমার শিবানী পরিচয়টা আপনি বিশ্বাস করেননি কেন?

তার কারণ সত্যিকারের শিবানী আপনি নন বলে।

কে বললে আমি সত্যিকারের শিবানী নই?

এতদিন সংশয় থাকলেও প্রমাণ পাইনি, তবে গত পরশু সকালে সে-প্রমাণও আমি পেয়েছি।

প্রমাণ পেয়েছেন! কি প্রমাণ?

আপনার ও সত্যিকারের শিবানীর লেখা চিঠি দুখানা দেখে। যদিও দীর্ঘ বৎসরের ব্যবধানে লেখা দুখানা চিঠি, তথাপি হাতের লেখার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। মানুষের হাতের লেখা বদলায়, কিন্তু ঢংটা একেবারে বদলায় না। এবং দুটো চিঠিই hand-writing expert-কে দিয়ে বিচার করিয়েছি আমি। তারও অভিমত, দুটো চিঠি কদাপি এক হাতের লেখা নয়।

তাহলে আমি কে?

আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো আপনার আসল নাম সুধা!

সুধা? কেমন করে জানলেন আপনি। চমকে প্রশ্ন করে মণিকা।

কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়, সেও বলতে পারেন আমার অনুমান। এবং আরো একটা অনুমান যদি আমার মিথ্যা না হয়ে থাকে তো আপনারই মেয়ের নাম শিবানী।

অতঃপর মণিকা স্তব্ধ বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, আপনার কথাই ঠিক। শিবানী আমারই মেয়ে। আমিই তার হতভাগিনী মা।

আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো সব কথা আমাকে খুলে বলুন সুধা দেবী কিরীটী মৃদু কণ্ঠে অনুরোধ জানায়।

বলব। আর বলব বলেই তো আপনাকে ডেকে আনলাম। ওর মুে নিশ্চয়ই যতীন চাটুয্যের নাম শুনেছেন আপনি ?

শুনেছি।

তিনিই আমার আপন সহোদর ভাই। আমি তাঁর একমাত্র বোন। গ্রামে আমাদের বাড়ি। আমার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয় আমাদের গ্রামেই।

বছর চোদ্দ-পনের বয়স তখন সুধার।

একদিন সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাট থেকে সুধা যখন জল নিয়ে ফিরছে, হঠাৎ একদল মুসলমান এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

তারপর তিনদিন ধরে তার দেহের উপর দিয়ে চলে অকথ্য অত্যাচার ; এবং সে অত্যাচার সুধা সহ্য করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যায়।

জ্ঞান হবার পর দেখলে, একটা পাটক্ষেতের মধ্যে সে পড়ে আছে। সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা। পরের দিন প্রত্যূষে এক চাষা তাকে ঐ অবস্থায় ক্ষেতের মধ্যে দেখতে পেয়ে বুকে করে তুলে এনে তার নিজের ঘরে তোলে।

এদিকে সুধার দাদা সর্বত্র পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন তার বোনকে।

চাষী ও চাষী-বৌ ওকে অনেক করে সুস্থ করে তোলে এবং সাতদিনের দিন সেই চাষীটাই গিয়ে সঙ্গে করে পৌঁছে দিল সুধাকে তার দাদার ঘরে।

কিন্তু বৌদি বললেন, তাকে আর ঘরে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। ধর্ষিতা মেয়ে, তার জাত-ধর্ম নেই। শুধু বৌদিই নয়, গ্রামের মাতব্বররাও একসঙ্গে সেই কথা বললেন।

যতীন কিন্তু সম্মত হতে পারলেন না তাঁদের বিচারে।

তিনি বললেন, দোষ তো ওর নয়। দোষ আমাদের সমাজব্যবস্থার। দোষ

আমার নিজের। কেন আমি পারিনি আমার বয়স্থা বোনকে রক্ষা করতে! আমাদের অপরাধে ও কেন শাস্তি পাবে?

একবাক্যে সকলেই তখন বললেন, এ তুমি কি বলছ যতীন?

ঠিকই বলছি। ঘর আমার শক্ত ছিল না, সেই সুযোগে চোর ঘরে সিঁধ কেটেছে। সে ক্ষেত্রে কেবল চোরকেই দোষ দিলে হবে কেন? আমারও দোষ আছে এবং শাস্তি যদি কারো প্রাপ্য থাকেই সে আমারই।

তাহলে তুমি কি করতে চাও শুনি? মাতব্বররা জিজ্ঞাসা করলেন।

ওকে আমি ত্যাগ করতে পারব না।

কি বলছ তুমি যতীন? তোমার কি মাথা খারাপ হল?

তা যা বলেন, মোদ্দা কথা আমার বোনকে আমি ত্যাগ করতে পারব না।

ঐ ম্লেচ্ছ কর্তৃক অপহৃতা ধর্মচ্যুতাকে তুমি ঘরে স্থান দেবে? এই তাহলে তোমার শেষ কথা যতীন?

হ্যাঁ কাকা, এই আমার শেষ কথা। ওকে আমি ত্যাগ করতে পারব না বিনা দোষে।

বিনা দোষে?

নিশ্চয়ই। ওর উপরে যে অত্যাচার হয়েছে, তার মধ্যে ওর অপরাধটা কোথায়?

তোমাকে আমরা একঘরে করব!

করবেন।

এ গ্রাম ছাড়তে হবে তোমাকে!

সে আপনাদের বলবার আগেই স্থির করে রেখেছি। অতঃপর আর যেখানেই বাস করি, এখানে আর বাস করা যে চলবে না আমার তা আমি জানি।

যতীন, এখনও ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখ। এ গোঁয়ারতুমির ব্যাপার নয়!

মিথ্যে আপনি কথা বাড়াচ্ছেন কাকা। আমি আমার কর্তব্য স্থির করে রেখেছি, ওকে ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে যতীন গ্রাম ত্যাগ করলেন। শহরে এসে বাসা বাঁধলেন। শিক্ষকতার কাজ নিলেন সেখানকার স্কুলে। সে স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন সচ্চিদানন্দবাবুর বাবার এক বন্ধু। এবং যতীনের সৎসাহসের প্রশংসা করে নিজেই

তিনি বন্ধুকে বলে তাঁর স্কুলে পুত্রের বন্ধু যতীনকে চাকরি দিয়ে আশ্রয় দিলেন।

এই সময় থেকেই সচ্চিদানন্দর সঙ্গে যতীনের মেলামেশাটা একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে নতুন করে। সচ্চিদানন্দ ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগলেন যতীনের গৃহে। কিন্তু ঐ ঘন ঘন যাতায়াতের মধ্যে ছিল বন্ধু-প্রীতির চাইতেও বন্ধুর ভগ্নীর উপরে প্রীতিটাই বেশী। যদিচ যতীন সেটা বুঝতে পারেননি। এদিকে যতীন দু-চার জায়গায় ভগ্নীর বিবাহ দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে লাগলেন। গ্রাম ত্যাগ করে এলেও দেখলেন, কলঙ্ক তাঁকে ত্যাগ করেনি। আর ভগ্নীকে নিজগৃহে স্থান দিলেও স্ত্রী পরিচয়ে অন্য কেউই তাকে তাদের গৃহে স্থান দিতে রাজী নয়।

এমন সময় সচ্চিদানন্দ একদিন বন্ধুকে বললেন, যতীনের যদি অমত না থাকে তো সে সুধাকে বিবাহ করতে রাজী আছে।

এ প্রস্তাব শুধু অভাবিতই নয়, অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য। দুহাতে যতীন সচ্চিদানন্দের দুটি হাত ধরে বললেন, সত্যি বলছ ভাই?

হ্যাঁ। যদি তুমি রাজী থাক।

রাজী! কি বলছ তুমি? সুধা যদি তোমার পায়ে স্থান পায় তো জানব সে সত্যিই সৌভাগ্যবতী!

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে—সচ্চিদানন্দ বললেন।

কথা!

হ্যাঁ, সুধাকে আমি বিবাহ করব বটে, তবে জানই ত আমি বাবার অমতে এ বিবাহ করলে তিনি জীবনে আমাকে ক্ষমা করবেন না। তাই মনে করেছি সকলকে জানাজানি করে নয়, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে গোপনে ওকে আমি বিবাহ করব। তারপর একদিন ধীরে-সুস্থে বাবাকে জানালেই হবে সব কথা।

কিন্তু ভাই—যতীন ইতস্ততঃ করে।

সচ্চিদানন্দ বলে, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

না ভাই, তা নয়। তবে—

কিছু ভেব না তুমি।

চিরদিনের সরলপ্রকৃতি যতীন মানুষের প্যাঁচোয়া মনের কথা জানবেন কি করে! বিশেষ করে সচ্চিদানন্দ তাঁর একপ্রকার বাল্যবন্ধু।

স্ত্রী নারায়ণী একটুও কিন্তু বাধা দিলেন না। এত বড় একটা আপদ যদি সহজে ঘাড় থেকে নেমে যায় তো যাক না!

সুধা তো রাজী ছিলই। সমস্ত প্রাণ দিয়ে যে হতভাগিনী সুধা সচ্চিদানন্দকে

ভালবেসেছিল !

তারপর একদিন কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যাবার নাম করে সচ্চিদানন্দর হাতে নিশ্চিন্তে তুলে দিয়ে এলেন যতীন সুধাকে।

ফিরে এসে রটিয়ে দিলেন, বর্ধমানে সে তার মাসীর বাড়িতে রয়ে গেল !

শহরের বাসিন্দারা এ ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না।

সুধাকে সচ্চিদানন্দর হাতে তুলে দিয়ে আসবার পর দীর্ঘ আট মাস যতীন কোন খবরই আর তাদের পেলেন না।

দীর্ঘ এক বছর আট মাস পরে এলাহাবাদ থেকে সচ্চিদানন্দের এক চিঠি পেলেন যতীন, তার স্ত্রী সুধা মাত্র তিন দিনের জ্বরে মারা গিয়েছে একটি পাঁচ মাসের শিশু-কন্যা রেখে। কন্যাটিকে নিয়ে সত্যিই সে একা একা বড় বিব্রত হয়ে পড়েছে অথচ বাবা তার বিবাহের সংবাদ পেয়ে তাকে ইতিমধ্যে ত্যাজ্যপুত্র করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় এবং তার স্ত্রীর কোন সন্তানাদি নেই শুনে ক্ষমা করেছেন। তাই এখন যদি ব্যাপারটা গোপন রেখে তার পিতার জীবিতকাল পর্যন্ত তার কন্যাটিকে নিজের সন্তান বলে প্রতিপালন করে তো সকল দিক রক্ষা হয়। সে অবশ্য আর বিবাহ করবে না এবং তার একমাত্র সন্তান শিবানী যাতে তার পিতৃ-সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হয়, সেই কারণেই সে শিবানীকে আপাততঃ তাদের কাছে রাখতে চায় তাদের সন্তান পরিচয়ে। অবশ্য কন্যার ভরণপোষণের সমস্ত খরচা সেই বহন করবে, মাসে মাসে তিনশো করে টাকা পাঠাবে রেজিস্ট্রী করে তার নামে।

সচ্চিদানন্দর এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান জানাতে পারলেন না যতীন। আহা ! সুধার মাতৃহারা সন্তান !

সুধার কন্যাটিকে তিনি সন্তান-পরিচয়ে নিতে রাজী আছেন জানালেন, কিন্তু তার পরিবর্তে ভরণপোষণ বাবদ কোন টাকাই তিনি নিতে পারবেন না জানিয়ে দিলেন। সুধার সন্তান তো তাঁরই সন্তান।

যতীন ও নারায়ণী এক বৎসরের জন্যে কাশীতে গিয়ে রইলেন। সেই সময়েই সচ্চিদানন্দ শিবানীকে তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন।

এবং চোখের জলের ভিতর দিয়ে বার বার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন, টাকা না নিলে সে বড় ব্যথা পাবে। আর তাছাড়া টাকা তো সে অন্য কাউকে দিচ্ছে না, দিচ্ছে তার নিজের সন্তানের ভরণপোষণের জন্যেই ! সে-টাকায় শিবানীর

যে সত্যিকারের ন্যায্য অধিকার আছে।

কি করেন, যতীনকে রাজী হতেই হল শেষ পর্যন্ত।

[illegible] শিবানী একটু রোগাই ছিল, তাই দেড় বছরের শিশুকে নিয়ে প্রায় এক বছর সাত মাস বাদে যতীন সস্ত্রীক যখন শহরে ফিরে এলেন, লোকে জানল শিবানী তাঁদেরই সন্তান এবং সেই পরিচয়েই শিবানী তার মামা-মামীর কাছে মানুষ হতে লাগল।

মাসে মাসে নিয়মিত সাত তারিখে সচ্চিদানন্দর নিকট হতে তিনশো করে টাকা রেজিস্টার্ড কভারে করে আসতে লাগল যতীনের নামে।

কিন্তু তিন বছরও গেল না, যতীন সংবাদ পেলেন সচ্চিদানন্দ আবার বিবাহ করেছেন।

সংবাদটা পেয়ে তিনি দুঃখ পেলেন না, কেবল একটু হাসলেন।

শিবানী তাঁদের কাছেই কন্যা-পরিচয়ে মানুষ হতে লাগল।

কিন্তু সুধা কি সত্যিই মারা যায়নি?

না।

তবে?

আসলে কোন দিনও সে সুধাকে বিয়েই করেনি।

বিয়ে করেনি!

না, সুধাকে নিয়ে এসে সচ্চিদানন্দ চেৎলায় একটা বাড়িভাড়া নিলেন এবং প্রথম থেকেই সুধাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে লাগলেন।

সুধা বিবাহের কথা তুললেই নানা অজুহাতে কালক্ষেপ করতে লাগলেন সচ্চিদানন্দ।

সুধা যখন বুঝতে পারল, সচ্চিদানন্দ কোনদিনই তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর সম্মান দেবে না, এবং এভাবেই তাকে তার রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে, তখন সে মা হতে চলেছে।

শিবানী তার গর্ভে তখন। পাঁচ মাস।

সুধা স্পষ্টই বুঝতে পারলে, ধনী-সন্তান সচ্চিদানন্দ প্রেমের অভিনয়ে তাকে ভুলিয়ে তার সর্বনাশই করেছে। কোনদিনই তাকে সে বিবাহ করবে না। সে চিরদিনই সচ্চিদানন্দের রক্ষিতা হয়েই থাকবে।

আক্রোশে ও আকণ্ঠ ঘৃণায় তখন তার অন্তরাত্মা যেন পাথর হয়ে গেল।

এবং সেই মুহূর্ত থেকেই সর্বতোভাবে সচ্চিদানন্দকে সুধা এড়িয়ে চলতে লাগল। পালাবার ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু সুধা সচ্চিদানন্দের আশ্রয় হতে পালাতে পারল না। গর্ভে তার সন্তান। আক্রোশ শুধু তার সচ্চিদানন্দর উপরেই নয়, তার গর্ভের অনাগত সন্তানের উপরেও বিতৃষ্ণায় মন তার ভরে গেল। ঐ শয়তানটারই আত্মজ তার গর্ভে!

যথাসময়ে শিবানী ভূমিষ্ঠ হল। কিন্তু তিল তিল করে যে ঘৃণা ও আক্রোশ পিতা ও তার আত্মজের উপরে সুধার মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তাতে সে ফিরেও তাকালে না নিজের গর্ভের সন্তানের দিকে।

এবং সন্তানের জন্মের পর থেকেই সুধা সুযোগ খুঁজতে লাগল সচ্চিদানন্দর আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে।

সুধার শরীরটাও খারাপ যাচ্ছিল। সচ্চিদানন্দ কন্যা ও সুধাকে নিয়ে এলাহাবাদ গেলেন।

এলাহাবাদ পৌঁছবার দিন তিনেক বাদেই এক রাত্রে সুধা সচ্চিদানন্দর গৃহ ত্যাগ করে গেল।

চার মাস এলাহাবাদে থেকে সচ্চিদানন্দ সর্বত্র খুঁজলেন সুধাকে কিন্তু তার কোন সন্ধানই পেলেন না। অবশেষে হতাশ হয়ে পত্র দিলেন যতীনকে।

কিন্তু কোথায় গেল সুধা?

ভরা যৌবন! গা-ভরা রূপ! কোথায় যাবে এখন সুধা!

স্টেশনে এসে কলকাতার একখানা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসল সুধা।

গাড়িতেই এক মুসলমান সেতারীর সঙ্গে আলাপ হল। সুধার বয়সী একটি মেয়ে ছিল ওস্তাদ মেহারা খাঁর। বছর দুই আগে সেই মেয়ে জুবেদা মারা গিয়েছে। সেই মৃতা জুবেদার হারানো মুখখানিই যেন খুঁজে পেলেন ওস্তাদজী কুড়িয়ে পাওয়া সুধার মুখের মধ্যে।

সুধাকে নিরাশ্রয় জেনে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন মেহারা খাঁ। সুধা তার নাম বলেছিল রেখা, আসল নাম গোপন করে।

সুধা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এল রেখা।

মেহেরা খাঁর যত্নে ও চেষ্টায় সুধা গীত-বাদ্যে পারদর্শিনী হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে এবং তার মধ্যেই যেন খুঁজে পেল তার দুঃখের সান্ত্বনা।

সুধা তার অতীত জীবনকে পুরোপুরিই ভুলেছিল, কেবল ভুলতে পারেনি

একখানি কচি নিষ্পাপ শিশুর মুখ যাকে সে ঘৃণাভরে ফেলে চলে এসেছিল।

অবসর সময়ে তো বটেই, কাজের মধ্যেও থেকে থেকে সহসা একখানি কচি মুখ যেন মনের মাঝখানে ভেসে উঠত। যেন অদৃশ্য দুটি কচি বাহু কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরত। হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়ত রেখা। হয়ত সেতার বাজাতে বাজাতে তাল কেটে গেল, সেই কচি মুখখানা মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে।

মেহেরা খাঁ জিজ্ঞাসা করত, কি হল বেটি?

কিছু না আব্বাজান।

দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। মধ্যে মধ্যে রেখার মনে হয়, এখন হয়ত সে নরম তুলতুলে দুটি পা ফেলে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছে। আধো-আধো ভাষা ফুটেছে মুখে। কতদিন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে মনে হয়েছে, কচি কচি দুটি হাত যেন তার গলাটা জড়িয়ে ধরে ডাকছে আধো আধো সুধাঝরা কণ্ঠে, মা! মাগো! আমার মা-মণি!

ঘুম ভেঙে গেছে। চিৎকার করে উঠেছে হয়ত সুধা, খুকী—সোনামণি আমার!

কিন্তু কোথায় খুকী! শূন্য অন্ধকার ঘর।

ভরা যৌবন সুধার! রূপ যেন দেহে ধরে না! মেহেরা খাঁর গৃহে বহু গুণী-জ্ঞানীর পদার্পণ ঘটে, কিন্তু সুধা কোন পুরুষের সামনেই আর বের হয় না।

সচ্চিদানন্দ তার সমস্ত বুকে ভরে দিয়েছে যেন সমগ্র পুরুষ জাতটার উপরেই একটা অবিমিশ্র ঘৃণা। একটা সুকঠিন বিতৃষ্ণা।

পুরুষের ছায়ামাত্র দেখলেও যেন ঘৃণায় তার শরীর সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কোন পুরুষকেই সে সহ্য করতে পারে না।

দীর্ঘ ষোল বৎসর মেহেরা খাঁর গৃহেই কেটে গেল সুধার। তারপর একদিন মেহেরা খাঁর মৃত্যু হল। আবার সুধা সংসারে একা।

মেহেরা খাঁর মৃত্যুর পর তিনটে বছর সুধা ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়ালো। তারপর হঠাৎ একদিন কি তার খেয়াল হল চিত্রজগতে একজন অভিনেত্রীর বিজ্ঞাপন দেখে সে ডিরেকটারের সঙ্গে দেখা করল।

ডিরেকটার তাকে পছন্দ করলেন। নাম লেখাল সে চিত্রজগতের খাতায়। আবার নতুন করে নাম নিল সে, মণিকা।

কে জানত অমন অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভা ছিল মণিকার মধ্যে! বিদ্যুতের শিখার মতই মণিকার অপূর্ব অভিনয়-প্রতিভায় চিত্রজগৎ যেন আলোকিত হয়ে গেল

অকস্মাৎ তার রূপালী পর্দায় প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই।

সকলের মুখে-মুখেই মণিকার নাম।

অভিনেত্রী মণিকা!

তারকা! বহুবল্লভা মণিকা!

এবারে আশেপাশে ভিড় করে এল পুরুষ অভিনেতার দল, কিন্তু কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দিল না মণিকা।

আশ্চর্য দেহের গঠন মণিকার, আশ্চর্য বাঁধুনী! পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তখন মণিকার, কিন্তু দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। দেখে মনে হবে, বড় জোর আঠারো কি উনিশ! মন-পাগল-করা দেহ-সৌন্দর্য্য! পর্যাপ্ত যৌবন-শ্রীতে যেন ঢলঢল শ্বেতপদ্ম!

এই পর্যন্ত বলে সুধা থামল।

কিরীটী প্রশ্ন করলে, তারপর?

তারপর সুধার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়। বেশ ছিলাম। দিন কেটে যাচ্ছিল। কেবল মধ্যে মধ্যে মনে পড়ত একখানি কচি মুখ। আজ যদি সে বেঁচে থাকে তো, সতের-আঠার বছর বয়স হয়েছে। যাক সে কথা। যা বলছিলাম তাই বলি। কোন একটি বইতে অভিনয় করবার জন্য ব্রজেনবাবুর ডাইরেকসনে ফ্লোরে গিয়ে একটি সতের-আঠার বছরের মেয়েকে দেখে যেন চমকে উঠলাম। নতুন অভিনেত্রী। ঐ বইতেই তার প্রথম কনট্রাক্ট্। শুনলাম মেয়েটির নাম বনলতা। কেন জানি না বনলতাকে দেখেই আমার মনে হল ও যেন আমার কতকালের চেনা, বড় আপনার। স্বপ্নের মধ্যে যে কচি মুখটা আজও আমার চোখে জল আনে, ও মুখখানিতে যেন তারই আদল। সুটিং-এর ফাঁকে একসময় ডেকে নিয়ে এলাম তাকে আমার সাজঘরে নিভৃতে। যতই তাকে দেখছি, ততই যেন মনে হচ্ছে নিজেকেই নিজে আয়নার মধ্যে দেখছি নতুন করে। হুবহু যেন আমারই প্রতিচ্ছবি। প্রথম যৌবনের সেই আমিই যেন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। বললাম, বস।—সে বসল। জিজ্ঞাসা করলাম নানা কথার মধ্যে দিয়ে, কেন সে এ লাইনে এল। কোথায় তার বাড়ি! কি তার পরিচয়! কিন্তু কোন পরিচয়ই সে তার দিতে রাজী নয়। বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু সারাটা রাত চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। বার বার বনলতার মুখখানিই মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল।

কেন? তাকে দেখেও চিনতে পারলেন না যে সে আপনারই আত্মজা?

না। চিনেও যেন চিনতে পারিনি মিঃ রায়।

কিন্তু আমি তো তাকে না দেখেও তার ফটো দেখেই চিনেছিলাম প্রথম দিনই যে সে সচ্চিদানন্দবাবুরই সন্তান।

সত্যি চিনেছিলেন! কিন্তু কেমন করে বলুন তো মিঃ রায়?

তার ডান চোখের পাতার উপরে একটা ছোট্ট তিল দেখে। যেটা সে তার বাপের কাছ থেকেই পেয়েছিল। এবং তার বাপের ওষ্ঠের মতই তারও যে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ ছিল। সচ্চিদানন্দবাবু প্রথম পরিচয়ের দিন সে কথা না বললেও বুঝতে আমার বাকি ছিল না ফটোটা দেখেই, শিবানী তাঁর কে। কি তার সম্পর্ক সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে। তাছাড়া আরো একটা কারণ অবশ্য ছিল, বন্ধুর মেয়েকে অমন করে খুঁজে বেড়াতে কেউ কি পারে, না তাই সম্ভব কখনো দীর্ঘ আট বছর ধরে। আর আপনিও হয়ত শুনে আশ্চর্য হবেন যে, আপনাকেও আমি সেই তিল দিয়েই চিনেছিলাম। চোখের পাতায় তিল এঁকে আপনি সচ্চিদানন্দবাবুকে যেমন ধোঁকা দিতে পারেননি, আমাকেও তেমনি পারেননি সুধা দেবী। প্রথম দিনই আপনাকে আমি দেখেই বুঝেছিলাম, আপনি শিবানী নন—শিবানীর মা।

আশ্চর্য! কিন্তু সে আপনার কাছে গিয়েছিল বুঝি শিবানীরই খোঁজ করে দিতে?

হ্যাঁ। আপনার এখানে আসবার পর হারানো শিবানীর কথা হয়ত তাঁর বেশী করেই মনে পড়েছিল, আপনাকে বার বার চোখের সামনে দেখে দেখে। তাছাড়া আমার মনে হয়, সচ্চিদানন্দবাবু যতই খারাপ হোন, আপনার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহারই করুন, শিবানীকে তিনি সত্যিকারের ভালবাসতেন। হয়ত তার আরো একটা কারণ ছিল, প্রথমতঃ হাজার হোক শিবানী তো তাঁরই রক্ত হতে জাত সন্তান এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর আর কোন সন্তান না হওয়ায়।

বিশ্বাস করি না আমি। তাই যদি হবে তবে অমন করে নিজের সন্তানকে কেউ গভীর রাত্রে বাড়ি থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে?

আপনি হয়ত ঘটনার একটা দিকই দেখেছেন সুধা দেবী। অন্য দিকটা দেখে বিচার করেননি। তাঁর বিকৃত-মস্তিষ্কা স্ত্রীর কথাটাও আপনার ভাবা উচিত ছিল।

অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে সুধা দেবী আবার বলতে লাগলেন, অথচ দেখুন বিধাতার কি আশ্চর্য বিধান! পাপ করল একজন, কিন্তু যন্ত্রণা ভোগ করল সারাটা জীবন ধরে অন্য একজন। তাই তো যে সংকল্প নিয়ে এ বাড়িতে শিবানীর পরিচয়ে একদিন এসে উঠেছিলাম, হতভাগিনী রাধারাণীকে

দেখে সে সংকল্প আমার স্রোতের মুখে অসহায় কুটোর মতই কোথায় ভেসে গেল! আমি যেন সত্যি-সত্যিই একেবারে বোকা বনে গেলাম।

কি বলছেন আপনি সুধা দেবী?

ঠিক তাই। কিন্তু সুধা নামে আর ডাকবেন না আমাকে মিঃ রায়। সুধা মরে গেছে। মণিকা বলেই ডাকবেন। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। শুনে হয়ত চমকে উঠবেন কিন্তু সত্যিই শেষ বোঝাপড়া করে আমার ও আমার নিরপরাধ নিষ্পাপ মেয়ের দুর্ভাগ্যের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই এ গৃহে আমি পা দিয়েছিলাম।

অবাক বিস্ময়ে কিরীটী তাকিয়ে থাকে সুধার মুখের দিকে।

যাক যা বলছিলাম, বনলতাকে একদিন জোর করে আমার বাড়িতে এলাম সোজা স্টুডিও থেকে। সুধা দেবী আবার বলতে লাগলেন, বনলতা প্রথমটায় আসতে চায়নি, কিন্তু আমি আমার ভিতরের উদ্বেগকে আর যেন কিছুতেই দমন করে রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু বনলতা দেখলাম ঠিক আমারই প্রকৃতি পেয়েছে। প্রচণ্ড একগুঁয়ে অভিমানিনী, জেদী ও চাপা। কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না। সে একটা ইতিহাস। সব কথা গুছিয়ে আপনাকে বলতে পারব না। তবে এইটুকু জানুন, শেষ পর্যন্ত বনলতা আমার কাছে সব স্বীকার করল চোখের জলের মধ্যে দিয়ে। সে রাত্রে এ-বাড়ি থেকে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে রাধারাণী বের করে দেবার পর প্রচণ্ড অভিমানে সে যেদিকে দু'চোখ যায় হাঁটতে শুরু করে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, বড় হবার পর সে একদিন তার মামা-মামীর কথাবার্তা শুনেই বুঝেছিল, সে তাদের মেয়ে নয়। কিন্তু জানত না, আমার ভাই ও ভাই-বৌয়ের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক আছে। এবং জানবারও চেষ্টা করেনি সে সম্পর্কের কথা। এবং তাদেরও কখনও ঘুণাক্ষরে জানতে দেয়নি যে, সব কথা সে জানতে পেরেছে। তাই এ-বাড়ি থেকে সে-রাত্রে রাধারাণী যখন গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিল, সে ফিরেও তাকায়নি পিছনের দিকে। হনহন করে শিবানী সেই মধ্যরাত্রের অন্ধকারে নির্জন শহরের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌছয়। তখন পুবের আকাশ রাঙা হয়ে এসেছে। এক বৃদ্ধ গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলেন, ঐ সময় গঙ্গায় তিনি একাকী শিবানীকে সিঁড়ির ধারে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে একা চুপ করে বসে কে মা তুমি?

শিবানী জবাব দেয় না।

কি গো, কথা বলছ না কেন?

শিবানী তবু নিরুত্তর।

কি নাম তোমার? কাদের মেয়ে তুমি? আবার বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ তাকে একপ্রকার জোর করেই নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। শিবানীও ভাবে, আপাততঃ বৃদ্ধের ওখানেই ওঠা যাক। তারপর নিজের একটা পথ বেছে নিলেই চলবে।

বৃদ্ধের সংসারে এক পুত্র ছাড়া কেউ ছিল না। পুত্রটিও বৃদ্ধের কাছে থাকত না। কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে কাজ করত। ক্বচিৎ কখনো আসত কালেভদ্রে। বৃদ্ধ শিবানীকে আশ্রয় দিল। কিন্তু বৃদ্ধের ছেলেটি ছিল একটি সাক্ষাৎ শয়তান। মাস দুয়েক পরে একদিন বাপের সঙ্গে দেখা করতে এসে শিবানীকে দেখে তার প্রতি তার লোভ জাগল। এবং তারপর থেকেই মধ্যে মধ্যে সে বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে লাগল। এবং নানা ছল-ছুতো করে শিবানীর সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করতে লাগল। শিবানীর তখন উচিত ছিল বৃদ্ধকে সব জানিয়ে দেওয়া, কিন্তু ভয়ে ও লজ্জায় সে সব কথা চেপে যেতে লাগল। তার ফলে হল, সেই ছেলেটি ক্রমে দুর্বার ও বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে এসব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত যা ঘটবার তাই ঘটল। এক রাত্রে কৌশলে ঘরের দরজা খুলে সেই পশু শিবানীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে শিবানীকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করল। অতএব শিবানীর সে আশ্রয়ও গেল। শিবানী আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তারপরের আটটা বছরের ইতিহাস আর নাই বা শুনলেন। শুধু জেনে রাখুন, চরম দুর্দশা, লাঞ্ছনা, অপমান তাকে দিনের পর দিন যে কত সহ্য করতে হয়েছে! পুরুষের লোভের চক্রে পড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত, জর্জরিত হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক সহৃদয় যুবকের আশ্রয় পায় সে। এবং তারই সাহায্যে সে অভিনয়-জগতে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। শিবানীর মুখে তার গত আট বছরের জীবনের লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা শুনতে শুনতে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। তাকে গভীর সান্ত্বনা দিয়ে আমি বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, ওরে, আমিই তোর হতভাগিনী মা। উঃ, কি কুক্ষণেই যে মেয়ের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম! আমার পরিচয় পেয়ে সহসা যেন সে শক্ত পাথরের মত হয়ে গেল। চোখের জল তার গেল শুকিয়ে। সেই রাত্রে শেষের দিকে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে এল তার জ্বর। সাতদিন একনাগাড়ে জ্বরের পর দেখা গেল মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এক মাস ধরে অনেক চেষ্টা করে, বহু চিকিৎসা

করেও তাকে ভাল করতে পারলাম না। প্রচণ্ড উন্মাদ সে এখন। রাঁচীর পাগলা গারদে তাকে রেখে কলকাতায় ফিরে এলাম একা। ভাবতে পারেন মিঃ রায়, আমার তখনকার মনের অবস্থা! একমাত্র মেয়ে যার পাগল হয়ে যায় এবং তার জন্য দায়ী যে, তাকে সে যদি ক্ষমা না করতেই পারে, তাহলে সে সত্যিই কি আপনাদের বিচারের চোখে অপরাধী হবে? যদি সে সেই শয়তানকে তার জীবনের সেই দুঃস্বপ্নকে হত্যা করেই, তবে কি তাকে আপনারা হত্যাকারী বলবেন? এই যদি আপনাদের বিচার হয়, তবে জানবেন, সে বিচার আমি মানতে রাজি নই। না—না—না!

একটু থেমে আগুন-ঝরা চোখে সুধা তাঁর কাহিনী আবার বলে যেতে লাগলেন :

একেবারে উন্মাদ একমাত্র মেয়েকে রাঁচীর পাগলা গারদে রেখে কলকাতায় ফিরে এলাম। বুকের মধ্যে হাহাকার আর প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে। অসহ্য সেই আগুনের তাপে দিবারাত্র আমার সর্বশরীর ঝল্সে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে হোক, যে আমার একমাত্র মেয়ের জীবনটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এমনি করে ছারখার করে দিল, তাকে কোনমতেই ক্ষমা করব না। শিবানীর বাপের ঠিকানা আমার জানাই ছিল, তাকে শিবানীর নাম দিয়ে চিঠি দিলাম। আমার পরিকল্পিত ফাঁদে সে সহজেই ধরা দিল। তারপর শিবানীর পরিচয়ে এই বাড়িতে একদিন এসে উঠলাম। কিন্তু এখানে এসে যখন আর এক উন্মাদিনী নারীকে দেখলাম যে বিনা দোষে তার স্বামীর পাপের ফল ভোগ করছে এবং সে যখন পরম বিশ্বাসে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল, কি জানি কেন সেই মুহূর্ত থেকেই সমস্ত সংকল্প আমার শিথিল হয়ে আসতে লাগল। যত মনে মনে সংকল্পকে দৃঢ় করে তোলবার চেষ্টা করি, ততই যেন নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়, দুর্বল পঙ্গু মনে হয়। মনে পড়ে আর এক হতভাগিনী উন্মাদিনীর কথা।

এদিকে তখন শুরু হয়েছে এক বিচিত্র অভিনয় এই বাড়িতে।

অভিনয়!

হ্যাঁ, অভিনয়। সচ্চিদানন্দ আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে আমি শিবানী নই, শিবানীর মা, তবু মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারছে না। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। এদিকে প্রতি মুহূর্তে আমি আমার সংকল্প থেকে চ্যুত হয়ে বুঝতে পারছি, এতকাল সমস্ত পুরুষজাতটাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করলেও তাকে কিছুতেই ঘৃণার দ্বারা অস্বীকার করতে পারি

না। একদিকে আমার একমাত্র উন্মাদিনী মেয়ের সেই মুখখানা, অন্যদিকে অসহায় দৈব কর্তৃক জর্জরিত হতভাগ্য এক পুরুষ—একদা যাকে সমস্ত প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলাম। দুয়ের মধ্যে দিবানিশি এক মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্ব! আর তারই মাঝে চলছে তখন এক বিকৃতমস্তিষ্কা নারীর মনে আমাকে কেন্দ্র করে তার স্বামীকে নিয়ে ভয়ঙ্কর এক সন্দেহের ঝড়! অথচ মুখ ফুটে সেও কিছু বলতে পারছে না। প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে যেন অভিনয় করে চলতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সে-অভিনয় শেষ হল এক মর্মান্তিক নৃশংস হত্যাপ্রচেষ্টায়। অভিনয়ের সেটা বলতে পারেন শেষ রাত্রি বা শেষ রজনী।

অভিনয়ের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য।

আমরা তিনজনে প্রত্যেকেই বোধ হয় অভিনয় করতে করতে গত এক মাস ধরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই প্রত্যেকেই আমরা তখন এসে পৌঁছেছি ধৈর্যের শেষ সীমায়। সুধা দেবী আবার বলতে লাগলেন।

সে-রাত্রে সে ফিরে এসে আমাকে কিছু খাবে না বলে সবে যখন তার শোবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছে, রাধারাণী গিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করল।

সুধার বিবৃতি।

চমকে ওঠেন সচ্চিদানন্দ এত রাত্রে রাধারাণীকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে দেখে।

কে? রাধা! একি, এখনও ঘুমওনি?

এই ফটোটা দিতে এলাম তোমাকে। তোমার প্রেয়সীর ফটো। বিকৃত উন্মাদ আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠলেন রাধারাণী।

তখনও সুধা জানত না তার প্রথম যৌবনের ঐ ফটোটা তার সুটকেশ থেকে তার অজ্ঞাতে সচ্চিদানন্দ চুরি করে নিয়ে গিয়ে নিজের শোবার ঘরে বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলেন। এবং এক সময় রাধারাণী সেই ঘরে এসে বালিশের তলায় ফটোটা দেখতে পেয়ে নিয়ে যান।

কোথায় পেলে এ ফটো? দাও—

দেব বৈকি! এই নাও—বলে দুমড়ে মুচড়ে ফটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাধারাণী স্বামীর গায়ের উপরে।

বাইরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছে, সব শুনছে সুধা তখন।

হনহন করে রাধারাণী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ফট করে আগেই দরজার

পাশ থেকে সরে গিয়েছিল সুধা। তাকে দেখতে পেলেন না রাধারাণী দরজার পাশে। অবশ্য মনের সে অবস্থাও তাঁর ছিল না।

এদিকে রাধারাণী চলে যাবার পর সচ্চিদানন্দ তাঁর অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আলমারী থেকে মদের বোতল ইত্যাদি বের করে ঢক্ ঢক্ করে দুটো পেগ খেলেন।

তারপর ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে কি যেন লিখতে লাগলেন।

আবার কি ভেবে কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে আবার খানিকটা মদ্যপান করলেন।

এমন সময়ে সুধা গিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

চমকে তাকাতে গিয়ে সচ্চিদানন্দর হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল ঝন-ঝন শব্দ তুলে।

কে! ফিরে তাকালেন সচ্চিদানন্দ।

চিনতে পারছ না? সুধা প্রশ্ন করে।

চিনতে পেরেছি। কিন্তু এসবের মানে কি?

তার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমার মেয়ে কোথায়?

তোমার মেয়ে?

হ্যাঁ।

কি ভেবে সচ্চিদানন্দ বললেন, চল, ছাদে কাচঘরে চল, সব কথা তোমাকে বলব। এখানে নয়, পাশের ঘরে মহিম রয়েছে।

চল।

কাচঘরে গিয়ে বসলেন সচ্চিদানন্দ বেঞ্চটার উপরে, বোসো সুধা।

না। কি বলতে চাও তুমি বল। সুধা দাঁড়িয়ে থাকে।

বসবে না?

না। কি বলবার আছে তোমার, বল।

কাচঘরের আলো জ্বালা ছিল না। শুধু কাচের ছাদ ভেদ করে ক্ষীণ চাঁদের আলো একটা অস্পষ্ট আলো-ছায়া গড়ে তুলেছে।

কি চাও তুমি? কেন আবার এসেছ এখানে মিথ্যা পরিচয়ে? সচ্চিদানন্দ প্রশ্ন করলেন।

যদি বলি প্রতিহিংসা নিতে এসেছি? জবাব দেয় সুধা।

হঠাৎ এমন সময় নিঃশব্দে একটা ছায়া এসে কখন সচ্চিদানন্দর পশ্চাতে

দাঁড়িয়েছে, উনি তা টেরও পাননি এবং সুধাও দেখতে পায়নি।

সেই ছায়ামূর্তি হঠাৎ যেন পশ্চাৎ দিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সচ্চিদানন্দর উপরে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দিকে যেন ছিটকে গিয়ে পড়লেন অর্ধস্ফুট একটা আর্ত-চিৎকার করে সচ্চিদানন্দ।

ঘটনার আকস্মিকতায় সুধা স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চমক ভাঙল সুধার আর একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দে।

ঠিক সেই সময়ে কাচঘরের আলো জ্বলে উঠল দপ্‌ করে।

বিহ্বল ভাবটা কেটে যাবার পর সুধা তাকিয়ে দেখলো, তার অল্প দূরে সামনে দাঁড়িয়ে নির্বাক মহিমারঞ্জন। আর তার কিছু দূরে চিত হয়ে পড়ে নিশ্চল সচ্চিদানন্দের দেহটা এবং বেঞ্চের পাশে পড়ে নিশ্চল রাধারাণীর দেহটাও।

রাধারাণী মারা যাননি, কেবল জ্ঞান হারিয়েছিলেন। কপালে শুধু লেগেছিল তাঁর সামান্য।

কিন্তু সচ্চিদানন্দ তখন মৃত। কিন্তু তখন যদি জানতাম, সত্যি সত্যিই সে মরেনি মিঃ রায়—বলতে বলতে সুধা দু হাতে মুখ ঢাকল।

তাহলে কি করতেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

বিহ্বল কণ্ঠে সুধা বললে, কি করতাম জানি না। তবে—তবে সত্যিই যদি সে মারা যেত মিঃ রায় সেইটাই হয়ত ভাল হত!

আক্রোশের বশে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রাধারাণী নিজের নিদ্রার জন্য প্রত্যহ যে মরফিন নিতেন, তাই পিছন থেকে এসে সচ্চিদানন্দকে ইন্‌জেক্ট করতে, অতর্কিতে সচ্চিদানন্দ অর্ধস্ফুট চিৎকার করে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যান বিষাক্ত অর্কিডের উপরে এবং সম্ভবতঃ ছুঁচের ক্ষতস্থান-পথে সেই অর্কিডের বিষাক্ত রস তাঁর শরীরে প্রবেশ করে অতর্কিতেই তাঁর মৃত্যু ঘটায়।

কিন্তু কিভাবে যে বিকৃতমস্তিষ্ক রাধারাণীর দ্বারা সেটা সম্ভব হয়েছিল, সেটাই বোধগম্যের ও বিচারশক্তির বাইরে।

অতর্কিতে শরীরে ছুঁচ বিদ্ধ হওয়ায় বোধ হয় ঘুরে রাধারাণীকে দেখতে পেয়ে তাঁর শাড়ির আঁচলটা ধরে ফেলেছিলেন, তাতেই আঁচলের খানিকটা লাল সুতো পড়ে যাবার সময় হাতের মুঠোর মধ্যে সচ্চিদানন্দর থেকে যায়।

যা থেকে পরের দিন কিরীটী রাধারাণীর পরনে লালপাড় শাড়ি দেখে বুঝেছিল, মৃত্যুর সময়ে রাধারাণী ঘটনাস্থলে ছিলেন।

এবং রাধারাণীর স্মৃতি হঠাৎ লোপ পাওয়ায় কিরীটীর প্রথম থেকে সন্দেহ

হয়েছিল, রাধারাণীই হয়ত হত্যাকারী। স্বামীকে হত্যা করবার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাই তাঁর দুর্বল বিকৃতমস্তিষ্ক সহ্য করতে পারেনি। যার ফলে তাঁর স্মৃতিলোপ ঘটেছে।

কাচঘরে কিরীটী যখন ফিরে এল, রাধারাণী তখন কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন হাউ হাউ করে।

মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটেছে তাঁর।

মহিমারঞ্জন কিছুতেই তাঁকে যেন সামলাতে পারছেন না।

সুধাও কিরীটীর সঙ্গে এসেছিল, নিঃশব্দে সে এগিয়ে গেল উন্মাদিনী রাধারাণীর দিকে। তখনও বেচারী সুধা জানে না যে, সত্যিসত্যিই সচ্চিদানন্দর মৃত্যু ঘটেছে।

ক্ষণপূর্বে যা দেখে সে কিরীটীর কাছে সমস্ত কথা অকপটে স্বীকার করেছে, তা সত্যিসত্যিই অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কিছুতেই ঐ মুহূর্তে কিরীটী মুখ ফুটে সত্য কথাটা বলতে পারল না। মর্মান্তিক ভাবে করুণ ও বিয়োগান্ত ঐ ঘটনার পর কেবলই তাঁর মনে হতে লাগল, বিধাতা নিজেই যখন নিজের হাতে ওদের মাথায় বিচারের দণ্ড তুলে দিয়েছেন, তখন তার ওখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল।

তাই নিঃশব্দে সে সুব্রত, সুশীল রায় ও বলীন সোমকে ইঙ্গিতে ডেকে কাচঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

কাচঘরে রইল তিনটী প্রাণী। একটি উন্মাদিনী, একটি হৃতসর্বস্বা ও অন্যজন তার দর্শক।

রাধারাণী, সুধা ও মহিমারঞ্জন।

নীল কুঠী

॥ এক ॥

দেখা হয়ে গেল দুজনের। রজত আর সুজাতার।

এতদিন পরে এমনি করে দুজনের আবার দেখা হয়ে যাবে কেউ কি ওরা ভেবেছিল! দুজনে দুদিকে যে ভাবে ছিটকে পড়েছিল তারপর আবার কোন দিন যে দেখা হবে তাও এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে ব্যাপারটা দুজনের কাছেই ছিল সত্যি স্বপ্নাতীত।

তবু দেখা হল দুজনের। রজত আর সুজাতার।

দুজনের একজন আসছিল লাহোর থেকে। অন্যজন লক্ষ্ণৌ থেকে। এবং দুজনেরই কলকাতায় আগমনের কারণ হচ্ছে একই লোকের কাছ থেকে পাওয়া দুখানা চিঠি।

আরও আশ্চর্য, যখন ওরা জানতে পারল একই দিনে নাকি দুজনে এই চিঠি দুখানা পেয়েছে।

একই তারিখে লেখা দুখানা চিঠি। এবং একই কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে দুখানা চিঠিতে লেখা। আর সেই চিঠি পেয়েই লক্ষ্ণৌ থেকে সুজাতা ও লাহোর থেকে রজত একই দিনে রওনা হয়ে এক ঘণ্টা আগে-পিছে হাওড়া স্টেশনে এসে নামল।

পরবর্তী উত্তরপাড়া যাবার লোকাল ট্রেনটা ছিল ঘণ্টা দেড়েক পরে। দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল তাই হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমের উপরেই।

এ কি! সুজাতা না? রজত প্রশ্ন করে বিস্ময়ে।

কে, ছোড়দা! সুজাতাও পাল্টা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা করে।

কোথায় যাচ্ছিস? লক্ষ্ণৌ থেকেই আসছিস নাকি?

হ্যাঁ, উত্তরপাড়া। ছোট্‌কার একটা জরুরী চিঠি পেয়ে আসছি।

আশ্চর্য! আমিও তো ছোট্‌কার জরুরী চিঠি পেয়েই উত্তরপাড়ায় যাচ্ছি। জবাবে বলে রজত।

রজত ও সুজাতা জ্যেঠতুত ও খুড়তুত ভাই বোন। একজন থাকে লাহোরে, অন্যজন লক্ষ্ণৌতে। প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ভাই বোনে সাক্ষাৎ।

এদিকে ট্রেন ছাড়বার শেষ ঘণ্টা তখন বাজতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি

দুজনে সামনের লোকাল ট্রেনটায় উঠে বসল।

শীতের বেলা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বেলা সবে সাড়ে চারটে হলেও, বাইরের আলো ইতিমধ্যেই ঝিমিয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যেই অফিস-ফেরতা নিত্যকার কেরানী যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে ট্রেনে। ট্রেনের কামরায় ঠেসাঠেসি গাদাগাদি। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ভিড় থাকলেও ততটা ভিড় নেই। একটা বেঞ্চের একধারে ওরা কোনমতে একটু জায়গা করে নিয়ে গায়ে গা দিয়ে বসে পড়ল।

দুজনেই ভাবছিল বোধ হয় একই কথা।

ছোটকাকা বিনয়েন্দ্রর জরুরী চিঠি পেয়ে দুজনে, একজন লাহোর থেকে অন্যজন লক্ষ্ণৌ থেকে আসছে উত্তরপাড়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। জরুরী চিঠি পেয়ে আসছে ওরা কিন্তু তখনো জানে না কী ব্যাপারে জরুরী চিঠি দিয়ে তাদের আসতে বলা হয়েছে। অথচ গত দশ বছর ধরে তাদের ওই কাকা বিনয়েন্দ্র যদিও আপনার কাকা, তাঁর সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কই ছিল না।

দেখা-সাক্ষাৎ বা মুখের আলাপে কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত দূরের কথা, গত দশ বছর পরস্পরের মধ্যে ওদের কোন পত্র বিনিময় পর্যন্ত হয়নি। ওরাও সত্যি কথা বলতে কি ভুলেই গিয়েছিল যে, ওদের একজন আপনার কাকা এ সংসারে কেউ এখনো আছেন!

সেই কাকার কাছ থেকে জরুরী চিঠি। অত্যন্ত জরুরী তাগিদ, পত্র পাওয়ামাত্র যেন চলে আসে ওরা উত্তরপাড়ায়। ইতি অনুতপ্ত ছোট্‌কা। চিঠির মধ্যে কেবল এতকাল পরে আসবার জন্ত ওই জরুরী তাগিদটুকু থাকলেই ওরা এভাবে চিঠি পাওয়ামাত্রই চলে আসত কিনা সন্দেহ। আরও কিছু ছিল সেই সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে যেটা গুরুত্বের দিক দিয়ে ওরা অস্বীকার করতে পারেনি। এবং যে কারণে ওরা চিঠি পাওয়ামাত্রই না এসেও পারেনি।

কল্যাণীয়েষু রজত,

আমার আর বেশী দিন নেই। স্পষ্ট বুঝতে পারছি মৃত্যু আমার একেবারে সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাত থেকে আর আমার কোন মতেই নিস্তার নেই। দাদুর প্রেতাত্মার চেষ্টা এতদিনে বোধ হয় সফল হবেই বুঝতে পারছি। আগে কেবল মধ্যে মধ্যে রাত্তের বেলা তাকে দেখতাম, এখন যেন তাকে দিনে রাত্রে সব সময়ই দেখতে পাচ্ছি। সেই প্রেত-ছায়া এবারে বোধ হয় আর

আমাকে নিস্তার দেবে না। এতকাল যে কেন তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিনি যাবার আগে অন্তত সে কথাটা তোমাকে জানিয়ে যদি না যাই এবং আমার যা কিছু তোমার হাতে তুলে না দিয়ে যেতে পারি তবে মরণের পরেও হয়তো আমার মুক্তি মিলবে না। তাই আমার শেষ অনুরোধ এই চিঠি পাওয়া-মাত্রই রওনা হবে।

ইতি আশীর্বাদক, অনুতপ্ত, ভাগ্যহীন, তোমার ছোট্কা।

সুজাতার চিঠিতেও অক্ষরে অক্ষরে একই কথা লেখা। কেবল কল্যাণীয়েষু রজতের জায়গায় লেখা, কল্যাণীয়া মা সুজাতা।

তাই যত মন-কষাকষিই থাক, দীর্ঘদিনের সম্পর্কহীন এবং ছাড়াছাড়ি থাকা সত্ত্বেও রজত বা সুজাতা কেউই তাদের ছোট্কা বিনয়েন্দ্রর ওই চিঠি পড়ে রওনা না হয়ে পারেনি।

গত দশ বছরই না হয় ছোট্কার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই কিন্তু এমন একদিন তো ছিল যখন ওই ছোট্কাই ছিল ওদের বাড়ির মধ্যে সবার প্রিয়। যত কিছু আদর আবদার ছিল ওদের ঐ ছোট্কার কাছেই।

সেজন্য রজতের মাও কম তো বলেননি ওদের ছোট্কাকে।

প্রত্যুত্তরে ছোট্কা হেসেছেন শুধু ওদের দুজনকে পরমস্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে।

ছোট্কার ওরা দুজনেই যে ছিল বাড়ির মধ্যে একমাত্র সঙ্গী বা সাথী।

হাসতে হাসতে ছোট্কা রজতের মাকে সম্বোধন করে বলেছেন, না না, ওদের তুমি অমন করে বোলো না।

রজতের মা জবাবে বলেছেন, না, বলবে না! আদর দিয়ে দিয়ে ওদের মাথা দুটো যে চিবিয়ে খাচ্ছ। দুটিই সমান ধিঙ্গি হয়েছে, লেখাপড়ার নামে ঘণ্টা। কেবল ছোট্কা এটা দাও, ছোট্কা ওটা দাও, এটা কর ছোট্কা, ওটা কর।

আহা, অমন করে বোলো না বউদি। একজন এই বয়সে বাপ হারিয়েছে, আর একজন তো বাপ মা দুটো বালাই-ই চুকিয়ে বসে আছে।

সত্যিই তো!

রজতের বাবা অমরেন্দ্রনাথ সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকরি করতেন। তিন ভাই অমরেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রর মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অল্প বয়সেই দেখা দিল রক্তচাপাধিক্য, হঠাৎ করোনারী থ্রম্বসিসে একদিন দ্বিপ্রহরে অফিসে কাজ করতে করতেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞানহীন অমরেন্দ্রনাথকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে

নিয়ে আসা হল কিন্তু লুপ্ত জ্ঞান আর তাঁর ফিরে এল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। রজতের বয়স তখন সবেমাত্র ন বছর। এক বছরও ঘুরল না, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। একটা ব্রিজ কনস্‌ট্রাকসনের তদ্বির করে ফিরছিলেন সস্ত্রীক নিজের গাড়িতেই। ড্রাইভার ড্রাইভ করছিল। একটা রেলওয়ে ক্রশিংয়ের বাঁকের মুখে ড্রাইভার স্পীডের মুখে গাড়ি টার্ন নিতে গিয়ে গাড়ি উল্টে গিয়ে একই সঙ্গে ড্রাইভার ও সস্ত্রীক সুরেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে সঙ্গে সঙ্গেই।

সুজাতার বয়স তখন বছর ছয়েক মাত্র।

অতি অল্প বয়সে মা ও বাপকে একসঙ্গে হারালেও সুজাতার খুব বেশী অসুবিধা হয়নি। কারণ সে প্রকৃতপক্ষে তার জন্মের পর থেকেই আয়ার কোলে ও জেঠাইমার তত্ত্বাবধানে মানুষ হচ্ছিল। বাপ-মার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব কমই ছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কনস্‌ট্রাকসনের কাজে বাইরে বাইরেই সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন, সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া। সুজাতার যা কিছু আদর-আবদার ছিল তার ছোট্‌কা বিনয়েন্দ্রনাথ ও জেঠীমার কাছেই।

একটা বছরের মধ্যেই সাজানো-গোছানো সংসারটার মধ্যে যেন অকস্মাৎ একটা ঝড় বহে গেল। সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

সমস্ত ঝক্কি ও দায়িত্ব এসে পড়ল বিনয়েন্দ্রনাথের ঘাড়ে।

বিনয়েন্দ্রনাথ তখন রসায়নে এম. এস. সি. পাস করে এক বে-সরকারী কলেজে সবেমাত্র বছর দুই হল অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন ও ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

সংসারের টাকাপয়সার ব্যাপারটা কোন দিনও তাঁকে ভাবতে হয়নি ইতিপূর্বে। যা আয় করতেন তার সবটাই তাঁর ইচ্ছামত রসায়ন শাস্ত্রের বই কিনে ও ভাইপো-ভাইঝিদের আদর-আবদার মেটাতেই ব্যয় হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ যেন মোটা রকমের উপার্জনক্ষম মাথার উপরে দুই ভায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত ঝক্কি এসে তাঁকে একেবারে বিব্রত করে তুলল।

কিন্তু অত্যুৎসাহী, সদাহাস্যময় আনন্দ ও জ্ঞানপাগল বিনয়েন্দ্রনাথকে দেখে সেটা বোঝবার উপায় ছিল না।

অমরেন্দ্রনাথ যত্র আয় করতেন তত্র ব্যয় করতেন; কাজেই মৃত্যুর পর সামান্য হাজার দু-তিন টাকা ব্যাঙ্কে ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি এবং সময়ও পাননি।

সুরেন্দ্রনাথও তাই, তবে হাজার পনের টাকার জীবনবীমা ছিল তাঁর।

বিনয়েন্দ্রনাথ বউদির শত অনুরোধেও বিবাহ করলেন না, নিজের রিসার্চ ও ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়েই দিন কাটাতে লাগলেন।

এমনি করেই দীর্ঘ চোদ্দটা বছর কেটে গেল।

রজত বি. এ. পাস করে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হল ও সুজাতা বি. এ. ক্লাসে সবে নাম লিখিয়েছে এমন সময় অকস্মাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

অমরেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রর মাতামহ অম্বিকাচরণ রায় সেকালের একজন বর্ধিষ্ণু জমিদার, থাকতেন উত্তরপাড়ায়।

একদিন বিনয়েন্দ্র কলেজ থেকেই সেই যে দাদুকে তাঁর দেখতে গেলেন তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়িতে, আর ফিরে এলেন না কলকাতার বাসায়।

সন্ধ্যার দিকে উত্তরপাড়া থেকে অবিশ্যি বিনয়েন্দ্রর একটা চিঠি একজন লোকের হাত দিয়ে এসেছিল রজতের মার নামে এবং তাতে লেখা ছিল :

বউদি,

দাদুর হঠাৎ অসুখের সংবাদ পেয়ে উত্তরপাড়ায় এসে দেখি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতিটা কয়েকদিন থেকে একটু বেশী রকমই বাড়াবাড়ি চলেছে। তাঁকে দেখবার কেউ নেই, এ অবস্থায় তাঁকে একা একটিমাত্র চাকরের ভরসায় ফেলে ফিরতে পারছি না। তবে একটু সুস্থ হলে যাব। রজতই যেন একরকম করে সব চালিয়ে নেয়।

ইতি বিনয়েন্দ্র

ওইটুকু সংবাদ ছাড়া ওদের কলকাতার বাসার ওই লোকগুলোর খরচপত্র কেমন করে কোথা থেকে চলবে তার কোন আভাস মাত্রও সে চিঠিতে ছিল না।

বিনয়েন্দ্রর পক্ষে ওই ধরনের চিঠি দেওয়াটা একটু বিচিত্রই বটে।

যাহোক সেই যে বিনয়েন্দ্র উত্তরপাড়ায় চলে গেলেন আর সেখান থেকে ফিরলেন না। এবং দ্বিতীয় আর কোন সংবাদও দিলেন না দীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে; এমন কি সকলে কে কেমন আছে এমনি ধরনের কোন একটি কুশল সংবাদ নিয়েও কোন সন্ধান বা পত্র এল না ওই দীর্ঘ তিন বছরে।

রজতের মা বিনয়েন্দ্রর এতাদৃশ ব্যবহারে বেশ কিছুটা মর্মাহত তো হলেনই এবং অভিমানও হল তাঁর সেই সঙ্গে।

আশ্চর্য! বিনয়েন্দ্র অকস্মাৎ সকলকে কেমন করে ভুলে গেল আর ভুলতে পারলই বা কী করে! যাহোক অভিমানের বশেই রজতকে পর্যন্ত তাঁর অনুরোধ

নিয়ে আসা হল কিন্তু লুপ্ত জ্ঞান আর তাঁর ফিরে এল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। রজতের বয়স তখন সবেমাত্র ন বছর। এক বছরও ঘুরল না, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। একটা ব্রিজ কনস্ট্রাকসনের তদ্বির করে ফিরছিলেন সস্ত্রীক নিজের গাড়িতেই। ড্রাইভার ড্রাইভ করছিল। একটা রেলওয়ে ক্রশিংয়ের বাঁকের মুখে ড্রাইভার স্পীডের মুখে গাড়ি টার্ন নিতে গিয়ে গাড়ি উল্টে গিয়ে একই সঙ্গে ড্রাইভার ও সস্ত্রীক সুরেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে সঙ্গে সঙ্গেই।

সুজাতার বয়স তখন বছর ছয়েক মাত্র।

অতি অল্প বয়সে মা ও বাপকে একসঙ্গে হারালেও সুজাতার খুব বেশী অসুবিধা হয়নি। কারণ সে প্রকৃতপক্ষে তার জন্মের পর থেকেই আয়ার কোলে ও জেঠাইমার তত্ত্বাবধানে মানুষ হচ্ছিল। বাপ-মার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব কমই ছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কনস্ট্রাকসনের কাজে বাইরে বাইরেই সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন, সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া। সুজাতার যা কিছু আদর-আবদার ছিল তার ছোট্‌কা বিনয়েন্দ্রনাথ ও জেঠীমার কাছেই।

একটা বছরের মধ্যেই সাজানো-গোছানো সংসারটার মধ্যে যেন অকস্মাৎ একটা ঝড় বহে গেল। সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল।

সমস্ত ঝক্কি ও দায়িত্ব এসে পড়ল বিনয়েন্দ্রনাথের ঘাড়ে।

বিনয়েন্দ্রনাথ তখন রসায়নে এম. এস. সি. পাস করে এক বে-সরকারী কলেজে সবেমাত্র বছর দুই হল অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন ও ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

সংসারের টাকাপয়সার ব্যাপারটা কোন দিনও তাঁকে ভাবতে হয়নি ইতিপূর্বে। যা আয় করতেন তার সবটাই তাঁর ইচ্ছামত রসায়ন শাস্ত্রের বই কিনে ও ভাইপো-ভাইঝিদের আদর-আবদার মেটাতেই ব্যয় হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ যেন মোটা রকমের উপার্জনক্ষম মাথার উপরে দুই ভায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত ঝক্কি এসে তাঁকে একেবারে বিব্রত করে তুলল।

কিন্তু অত্যুৎসাহী, সদাহাস্যময় আনন্দ ও জ্ঞানপাগল বিনয়েন্দ্রনাথকে দেখে সেটা বোঝবার উপায় ছিল না।

অমরেন্দ্রনাথ যত্র আয় করতেন তত্র ব্যয় করতেন ; কাজেই মৃত্যুর পর সামান্য হাজার দু-তিন টাকা ব্যাঙ্কে ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি এবং সময়ও পাননি।

সুরেন্দ্রনাথও তাই, তবে হাজার পনের টাকার জীবনবীমা ছিল তাঁর।

বিনয়েন্দ্রনাথ বউদির শত অনুরোধেও বিবাহ করলেন না, নিজের রিসার্চ ও ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়েই দিন কাটাতে লাগলেন।

এমনি করেই দীর্ঘ চোদ্দটা বছর কেটে গেল।

রজত বি. এ. পাস করে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হল ও সুজাতা বি. এ. ক্লাসে সবে নাম লিখিয়েছে এমন সময় অকস্মাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

অমরেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রর মাতামহ অম্বিকাচরণ রায় সেকালের একজন বর্ধিষ্ণু জমিদার, থাকতেন উত্তরপাড়ায়।

একদিন বিনয়েন্দ্র কলেজ থেকেই সেই যে দাদুকে তাঁর দেখতে গেলেন তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়িতে, আর ফিরে এলেন না কলকাতার বাসায়।

সন্ধ্যার দিকে উত্তরপাড়া থেকে অবিশ্যি বিনয়েন্দ্রর একটা চিঠি একজন লোকের হাত দিয়ে এসেছিল রজতের মার নামে এবং তাতে লেখা ছিল:

বউদি,

দাদুর হঠাৎ অসুখের সংবাদ পেয়ে উত্তরপাড়ায় এসে দেখি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতিটা কয়েকদিন থেকে একটু বেশী রকমই বাড়াবাড়ি চলেছে। তাঁকে দেখবার কেউ নেই, এ অবস্থায় তাঁকে একা একটিমাত্র চাকরের ভরসায় ফেলে ফিরতে পারছি না। তবে একটু সুস্থ হলে যাব। রজতই যেন একরকম করে সব চালিয়ে নেয়।

ইতি বিনয়েন্দ্র

ওইটুকু সংবাদ ছাড়া ওদের কলকাতার বাসার ওই লোকগুলোর খরচপত্র কেমন করে কোথা থেকে চলবে তার কোন আভাস মাত্রও সে চিঠিতে ছিল না।

বিনয়েন্দ্রর পক্ষে ওই ধরনের চিঠি দেওয়াটা একটু বিচিত্রই বটে।

যাহোক সেই যে বিনয়েন্দ্র উত্তরপাড়ায় চলে গেলেন আর সেখান থেকে ফিরলেন না। এবং দ্বিতীয় আর কোন সংবাদও দিলেন না দীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে; এমন কি সকলে কে কেমন আছে এমনি ধরনের কোন একটি কুশল সংবাদ নিয়েও কোন সন্ধান বা পত্র এল না ওই দীর্ঘ তিন বছরে।

রজতের মা বিনয়েন্দ্রর এতাদৃশ ব্যবহারে বেশ কিছুটা মর্মাহত তো হলেনই এবং অভিমানও হল তাঁর সেই সঙ্গে।

আশ্চর্য! বিনয়েন্দ্র অকস্মাৎ সকলকে কেমন করে ভুলে গেল আর ভুলতে পারলই বা কী করে! যাহোক অভিমানের বশেই রজতকে পর্যন্ত তাঁর অনুরোধ

সত্ত্বেও একদিনের জন্যও তিনি বিনয়েন্দ্রর সন্ধানে যেতে দিলেন না।

যাক, সে যদি ভুলে থাকতে পারে তাঁরাই বা কেন তাকে ভুলে থাকতে পারবেন না!

॥ দুই ॥

উত্তরপাড়ায় বিনয়েন্দ্রর যে মাতামহ ছিলেন অনাদি চক্রবর্তী, তাঁর বয়স প্রায় তখন সত্তরের কাছাকাছি।

এমন একদিন ছিল যে সময় উত্তরপাড়ায় চক্রবর্তীদের ধনসম্পদের প্রবাদটা কিংবদন্তীর মতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে হচ্ছে রামানন্দ চক্রবর্তীর যুগ। অথচ খুব বেশী দিনের কথাও তো সেটা নয়। কলকাতায় সে সময় ইংরাজ কুঠিয়ালদের প্রতিপত্তি সবে শুরু হয়েছে। রামানন্দ ছিলেন ওইরূপ এক কুঠিরই মুচ্ছুদ্দি। রামানন্দ বিয়ে করেছিলেন ভাটপাড়ার বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারে। বউ লক্ষ্মীরাণী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু সুখে বা আনন্দে সংসার তিনি করতে পারেননি।

হঠাৎ এক নিষুতি রাত্রে রামানন্দের ঘরে ডাকাত পড়ল। ডাকাতদের হাতে ছিল গাদা বন্দুক আর জ্বলন্ত মশাল।

ডাকাতের দল কেবল যে রামানন্দর ধনদৌলতই লুঠ করল তাই নয়, লুঠ করে নিয়ে গেল ওই সঙ্গে তাঁর পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী লক্ষ্মীরাণীকেও।

সত্য কথাটা কিন্তু রামানন্দ কাউকেই জানতে দিলেন না। তিনি রটনা করে দিলেন ডাকাতদের হাতে লক্ষ্মীরাণীর মৃত্যু ঘটেছে।

দু-চারজন আত্মীয়স্বজন কথাটা বিশ্বাস না করলেও উচ্চবাচ্য করতে সাহস করল না বা রামানন্দর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সাহস পেল না রামানন্দের প্রতিপত্তি ও ধনৈশ্বর্যের জন্যই বোধ হয়।

রামানন্দের একটি মাত্র ছেলে যোগেন্দ্র চক্রবর্তী। যোগেন্দ্রকে বুকে নিয়ে রামানন্দ স্ত্রীবিচ্ছেদের দুঃখটা ভুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই যেন ভুলতে পারেন না লক্ষ্মীরাণীকে।

সুরার আশ্রয় নিলেন। এবং শুধু সুরাই নয় সেই সঙ্গে এসে জুটল বাগানবাড়িতে বাঈজী চন্দনাবাঈ। হু হু করে সঞ্চিত অর্থ বের হয়ে যেতে লাগল।

তারপর একদিন যখন তাঁর মৃত্যুর পর তরুণ যুবা যোগেন্দ্রর হাতে বিষয়-

সম্পত্তি এসে পড়ল, রামানন্দর অর্জিত বিপুল ঐশ্বর্যের অনেকখানিই তখন শুঁড়ীর দোকান দিয়ে সাগরপারে চালান হয়ে গেছে।

এদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার যে বিষ রামানন্দের রক্ত থেকে তাঁর সন্তানের রক্তের মধ্যেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছিল, রামানন্দ কিন্তু সেটা জানতে পারলেন না, এবং বাপের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর এতদিনকার জানা উচ্ছৃঙ্খলতা স্বমূর্তিতে যেন প্রকাশ পেল। এবং যোগেন্দ্র তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাপকেও ডিঙিয়ে গেলেন যেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হল আরও অল্প বয়সে। তাঁর পুত্র অনাদির বয়ঃক্রম তখন মাত্র আঠার বছর। সম্পত্তিও তখন অনেকটা বেহাত হয়ে গেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অনাদি ছিলেন যাকে বলি সত্যিকারের উদ্যোগী পুরুষসিংহ। তিনি তাঁর চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের দ্বারা ক্রমশঃ সেই জীর্ণ দেউলকে সংস্কার করে ভাগ্যের চাকাটা আবার ফিরিয়ে দিলেন।

অনাদির কোন পুত্রসন্তান জন্মায়নি। জন্মেছিল মাত্র একটি কন্যা সুরধনী।

লক্ষ্মীরাণী চক্রবর্তী পরিবার থেকে লুণ্ঠিতা হলেও তার রূপের যে ছাপ চক্রবর্তী পরিবারে রেখে গিয়েছিল সেটা পরিপূর্ণভাবে যেন ফুটে উঠেছিল সুরধনীর দেহে।

অপরূপ সুন্দরী ছিলেন সুরধনী। এবং চক্রবর্তীদের ঘরে লক্ষ্মীরাণীর যে অয়েল-পেনটিংটা ছিল তার মুখের গঠন ও চেহারার নিখুঁত মিল যেন ছিল ওই সুরধনীর চেহারায়।

অনাদি চক্রবর্তী অল্প বয়সেই সুরধনীর বিবাহ দেন গরীবের ঘরের এক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র মৃগেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

অমরেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের জন্মের পর তৃতীয়বার যখন সুরধনীর সন্তানসম্ভাবনা হল তিনি উত্তরপাড়ার পিতৃগৃহে আসেন কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে।

মৃগেন্দ্রনাথ অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হলেও জীবনে তেমন উন্নতি করতে পারেননি। অথচ নিজে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও আত্মাভিমানী ছিলেন বলে শ্বশুর অনাদি চক্রবর্তীর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর কোনরূপ সাহায্যও কখনো গ্রহণ করেননি। এবং স্ত্রীকেও সহজে পিতৃগৃহে যেতে দিতেন না।

এজন্য জামাই মৃগেন্দ্রর উপরে অনাদি চক্রবর্তী কোনদিন সন্তুষ্ট ছিলেন না। ঠাট্টা করে বলতেন, সাপ নয় তার কুলপানা চক্র।

ধনী পিতার আদরিণী ও সুন্দরী কন্যা সুরধনীও স্বামীর প্রতি কোন দিন খুব বেশী আকৃষ্ট হননি। কারণ তাঁর রূপের মত ধনেরও একটা অহঙ্কার ছিল।

সেবারে যখন অনেক অনুনয় বিনয় করবার পর দিন সাতেকের কড়ারে সুরধনী

পিতৃগৃহে এলেন এবং সাতদিন পরেই ঠিক মৃগেন্দ্র স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলেন, সুরধনী বললেন, আর কটা দিন তিনি থাকতে চান।

মৃগেন্দ্র রাজী হলেন না। বললেন, না, চল।

কেন, থাকি না আর কটা দিন ?

না সুরো। গরীব আমি, আমার স্ত্রী বেশী দিন ধনী শ্বশুরের ঘরে থাকলে লোকে নানা কথা বলবে।

তা কেন বলতে যাবে। বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবে।

না, চল। মানুষকে তুমি চেন না, তারা বাঁকা ভাবেই নেবে।

সবারই তো তোমার মত বাঁকা মন নয়।

কী বললে, আমার মন বাঁকা ?

তা নয়তো কী। অন্য কোথাও নয়, এ আমার নিজের বাপের বাড়ি। থাকিই না কটা দিন আর। গিয়েই তো আবার সেই হাঁড়ি ঠেলা শুরু।

ও, সোনার পালঙ্কে দুদিন শুয়েই বুঝি আরাম ধরে গেছে !

কোথা থেকে কী হয়ে গেল।

সমান বক্রভাবে সুরধনী জবাব দিলেন, সোনার পালঙ্কে ছোটবেলা থেকেই শোওয়া আমার অভ্যাস। তোমরাই বরং চিরদিন কুঁড়েঘরে থেকেছ, তোমাদেরই চোখে ধাঁধা লাগা সম্ভব দুদিনের সোনার পালঙ্কে শুয়ে, আমাদের নয়।

হুঁ। আচ্ছা বেশ, থাক তবে তুমি এখানেই।

মৃগেন্দ্র চলে গেলেন।

সত্যি সত্যি মৃগেন্দ্রর দিক থেকে পরে আর কোন ডাকই এল না।

সুরধনী এবং অনাদি চক্রবর্তী ভেবেছিলেন দু-একদিন পরেই হয়তো মৃগেন্দ্রর রাগ পড়বে কিন্তু দেখা গেল দু-একদিন বা দু-এক সপ্তাহ তো দূরের কথা দশ বছরেও মৃগেন্দ্র চক্রবর্তী বাড়ির ছায়া পর্যন্ত আর মাড়ালেন না। এমন কি সুরধনীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েও তিনি এলেন না। কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্রকে ও সঙ্গে একটি ভৃত্য পাঠিয়ে দিলেন তাদের হাতে এক চিঠি দিয়ে অবিলম্বে বিনয়েন্দ্রকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

বিনয়েন্দ্র চক্রবর্তী বাড়িতেই জন্মেছিল এবং দাদুর আদরে মানুষ হচ্ছিল।

অনাদি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন নাতিকে।

সেই থেকেই অনাদি চক্রবর্তীর সঙ্গে মৃগেন্দ্রদের আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

কোন পক্ষই কেউ কারোর সন্ধান করতেন না বা কোনরূপ খোঁজখবরও নিতেন না।

॥ তিন ॥

আরও অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেল।

মৃগেন্দ্রও মারা গেলেন একদিন।

অমরেন্দ্র, সুরেন্দ্র লেখাপড়া শিখে উপার্জন শুরু করল, সংসার করল, তাদের ছেলেমেয়ে হল। কিন্তু চক্রবর্তী বাড়ির সঙ্গে এ-বাড়ির আর যোগাযোগ ঘটে উঠল না। যক্ষের মত বৃদ্ধ অনাদি চক্রবর্তী একা একা তাঁর উত্তরপাড়ার বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা নীলকুঠিতে দিন কাটাতে লাগলেন।

অল্প বয়সে বিনয়েন্দ্র মাতামহের স্নেহের নীড় ছেড়ে এসে ক্রমে তাঁর দাদুকে ভুলতে পেরেছিলেন কিন্তু ভুলতে পারেননি অনাদি চক্রবর্তী। একটি বালকের স্মৃতি সর্বদা তাঁর মনের পর্দায় ভেসে বেড়াত।

তথাপি প্রচণ্ড অভিমানবশে কোনদিনের জন্য বিনয়েন্দ্রর খোঁজখবর নেননি বা তাকে ডাকেননি অনাদি চক্রবর্তী।

চক্রবর্তী-বাড়ির পুরাতন ভৃত্য রামচরণ কিন্তু বুঝতে পারত বৃদ্ধ অনাদি চক্রবর্তীর মনের কোথায় ব্যথাটা। কিন্তু সে দু-একবার মুখ ফুটে অনাদি চক্রবর্তীকে কথাটা বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল বলে আর উচ্চবাচ্য করেনি কোনদিন।

শেষের দিকে বৃদ্ধ অনাদি চক্রবর্তীর মাথায় কেমন একটু গোলমাল দেখা দিল।

প্রথম প্রথম সেটা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য মনে হয়নি বলেই রামচরণ ততটা মাথা ঘামায়নি কিন্তু শেষটায় যখন একটু বাড়াবাড়ি শুরু হল, তখন সে অনন্যোপায় হয়ে বিনয়েন্দ্রনাথকেই তার কলেজে, সরকার মশাইকে দিয়ে তার নিজের জবানীতেই একটা চিঠি লিখে পাঠাল।

খোকাবাবু,

কর্তাবাবু, আপনার দাদুর অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি হয়তো জানেন না আপনার চলে যাওয়ার পর থেকেই বাবুর মাথার একটু একটু গোলমাল দেখা দেয়। এবং সেটা আপনারই জন্য, আপনাকে হারিয়ে এবারে হয়তো আর বাঁচবেন

না। তাই আপনাকে জানাচ্ছি একটিবার এ সময়ে যদি আসেন তো ভাল হয়।

ইতি রামুদা

চিঠিটা পেয়ে বিনয়েন্দ্র কলেজের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসলেন।

একবার দুবার তিনবার চিঠিটা পড়লেন।

শৈশবের আনন্দ কলহাসি মুখরিত জীবনের অনেকগুলো পৃষ্ঠা যেন তাঁর মনের মধ্যে পর পর উল্টে যেতে লাগল। বহুকাল পরে আবার মনে পড়ল সেই বৃদ্ধ স্নেহময় দাদুর কথা। বিশেষ করে মধ্যে মধ্যে একটা কথা যা তাঁর দাদু তাঁকে প্রায়ই বলতেন, তোর বাবা যদি তোকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় দাদুভাই, চলে যাবি না তো ?

বিনয়েন্দ্র জবাবে বলেছেন, ইস, অমনি নিয়ে গেলেই হল কিনা, যাচ্ছে কে ! তোমাকে কোনদিনও আমি ছেড়ে যাব না দাদু, দেখে নিও তুমি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাদু তাঁকে আটকে রাখতে পারেননি। ছেড়ে দিতেই হয়েছে। পরের জিনিসের উপর তাঁর জোর কোথায়।

বিনয়েন্দ্রর মনটা ছটফট করে ওঠে। তিনি তখুনি বের হয়ে পড়েন দাদুর ওখানে যাবার জন্যে।

দীর্ঘ একুশ বছর বাদে সেই পরিচিত বাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন বিনয়েন্দ্র।

বিরাট প্রাসাদ শূন্য—যেন খাঁ খাঁ করছে। সিঁড়ির মুখেই বাড়ির পুরাতন ভৃত্য রামচরণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, রামচরণ প্রথমটায় ওঁকে চিনতে পারেনি কিন্তু বিনয়েন্দ্র ঠিকই চিনেছিলেন।

মাথার চুল সাদা হয়ে গেলেও মুখের চেহারা তার বিশেষ একটা পরিবর্তিত হয়নি।

রামুদা না ?

কে ?

আমাকে চিনতে পারছ না রামুদা, আমি খোকাবাবু, বিনু।

বিনু ! খোকাবাবু, সত্যি সত্যিই তুমি এতদিন পরে এলে ! চোখে জল এসে যায় রামচরণের।

দাদু—দাদু কেমন আছেন রামুদা ?

চল। ওপরে চল।

রামচরণের পিছু পিছু বিনয়েন্দ্র দোতলায় যে ঘরে অনাদি চক্রবর্তী থাকতেন সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

বিকৃত-মস্তিষ্ক অনাদি চক্রবর্তী তখন ঘরের মধ্যে একা একা পায়চারি করছিলেন আপন মনে ভূতের মত।

পদশব্দে ফিরে তাকালেন। দৃষ্টি ক্ষীণ—স্পষ্ট কিছুই দেখতে পান না।

রামচরণ বললে, এই জ্বর নিয়ে আবার বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন?

বেশ করছি। আমার খুশি। তোর বাবার কী!

এখুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন যে!

পড়ি পড়ব মাথা ঘুরে, তোর বাবার কী!

এমন সময় বিনয়েন্দ্র ডাকেন, দাদু!

কে?

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন অনাদি চক্রবর্তী।

দাদু, আমি বিনু।

বিনু! বিনু!

হঠাৎ অনাদি চক্রবর্তীর সমস্ত দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাচ্ছিলেন টলে; কিন্তু চকিতে এগিয়ে গিয়ে বলিষ্ঠ দু হাতে বিনয়েন্দ্র ততক্ষণে পতনোন্মুখ বৃদ্ধকে ধরে ফেলেছেন।

আর ফেরা হল না বিনয়েন্দ্রর।

চক্রবর্তীদের নীলকুঠিতেই রয়ে গেলেন। এবং মাস চারেক বাদে অনাদি চক্রবর্তী মারা গেলেন।

অনাদি চক্রবর্তী মারা যাবার পর দেখা গেল তিনি তাঁর স্থাবর অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি ছিল সব এবং মায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সব কিছু দিয়ে গিয়েছেন বিনয়েন্দ্রকেই।

কিন্তু তার মধ্যে দুটি সর্ত আছে।

বিনয়েন্দ্র জীবিতকালে তাঁর ঐ নীলকুঠি ছাড়া অন্যত্র কোথাও গিয়ে থাকতে পারবেন না। তাহলেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি চলে যাবে ট্রাষ্টির হাতে এবং তখন একটি কপর্দকও আর পাবেন না। দ্বিতীয়তঃ অমরেন্দ্র সুরেন্দ্রর সন্তানসন্ততিদের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

মৃগেন্দ্রর প্রথম দুই সন্তান অমরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র তাদের বাপের মতই হয়েছিল। কখনও তারা দাদুর ওখানে আসেনি এবং দাদুর কথা কোনক্রমে উঠলে কখনও প্রীতিকর কথা বলত না।

সেই সব অনাদি চক্রবর্তীর কানে যাওয়ায় তিনি তাদের কোনদিনই ভাল চোখে দেখতে পারেননি। এবং সেই কারণেই হয়তো তিনি তাদের বঞ্চিত করে যাবতীয় সম্পত্তি একা বিনয়েন্দ্রকেই দিয়ে গিয়েছিলেন।

উইলটা অনাদি চক্রবর্তী মৃত্যুর পাঁচ বছর আগেই করেছিলেন।

বিনয়েন্দ্র উত্তরপাড়ার নীলকুঠি থেকে আর ফিরলেন না। সবাই আত্মীয়-অনাত্মীয়রা বুঝল এবং বললে, বিষয়সম্পত্তি উইল অনুযায়ী সেখান থেকে এলে হাতছাড়া হয়ে যাবে বলেই তিনি সেখান থেকে আর এলেন না।

কিন্তু আসলে বিনয়েন্দ্র যে আর নীলকুঠি থেকে ফিরে আসেননি তার একমাত্র কারণ তার মধ্যে ঐ বিরাট সম্পত্তির ব্যাপারটা থাকলেও একমাত্র কারণ কিন্তু তা নয়। অন্য মুখ্য একটা কারণ ছিল।

বহুদিনের ইচ্ছা ছিল তাঁর একটি নিজস্ব ল্যাবোরেটারী তৈরী করে নিজের ইচ্ছেমত গবেষণা নিয়ে থাকেন। কিন্তু তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ তো তাঁর ছিল না। এখন দাদুর মৃত্যুতে সেই সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে আসায় বহুদিনের তাঁর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ করবার পক্ষে আর কোন বাধাই এখন অবশ্য রইল না। এবং দীর্ঘ তিন বছর পরে আবার সব কথা খুলে বলে তিনি রজতের মাকে একটা দীর্ঘ পত্র দিয়েছিলেন।

কিন্তু রজতের মা সে চিঠি পড়লেন না পর্যন্ত, খাম সমেত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও বিনয়েন্দ্র চিঠির কোন জবাব পেলেন না।

আবার চিঠি দিলেন। দ্বিতীয় চিঠিও প্রথম চিঠিটার মতই অপঠিত অবস্থায় শতছিন্ন হয়ে জানলাপথে নিক্ষিপ্ত হল।

দীর্ঘ দু মাস অপেক্ষা করবার পরও যখন সেই দ্বিতীয় চিঠিরও কোন জবাব এল না, প্রচণ্ড অভিমানে বিনয়েন্দ্র আর ওপথ মাড়ালেন না।

তারপর আরও পাঁচটা বছর কালের বুকে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন বিনয়েন্দ্র সংবাদ পেলেন, রজত লাহোরে চাকরি নিয়ে তার মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই বৌদির মৃত্যু হয়েছে। এবং সুজাতাও তার

পরের বছর বি. এ. পাস করে লক্ষ্ণৌয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

একজন লাহোরে. অন্যজন লক্ষ্ণৌতে।

॥ চার ॥

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে রজত আর সুজাতা গঙ্গার ধারে নীলকুঠির লোহার কটকটার সামনে এসে সাইকেল-রিক্সা থেকে নেমে এবং রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গেট দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় হঠাৎ বাধা পেয়ে তাদের দাঁড়াতে হল।

.দাঁড়ান।

গেটের সামনে বাধা দিয়েছিল একজন লাল-পাগড়ি-পরিহিত কনস্টেবল।

কে আপনারা, কী ব্যাপার! দু'জনেই থমকে দাঁড়ায়।

কোথা থেকে আসছেন?

রজত বললে, আমার নাম রজত সান্যাল আর ইনি আমার বোন সুজাতা সান্যাল। আমি আসছি লাহোর থেকে আর আমার বোন লক্ষ্ণৌ থেকে।

ও, তা এ বাড়ির মালিক—বিনয়েন্দ্র সান্যাল।

রজত আবার বললে, আমাদের কাকা।

বিনয়েন্দ্রবাবু তাহলে—

বললাম তো আমাদের কাকা।

আপনারা তাহলে কি কিছুই জানেন না?

কিছু জানি না মানে! কি জানি না?

গেটের সামনেই ঢোকার মুখে পুলিস কর্তৃক বাধা পেয়েই মনের মধ্যে উভয়েরই একটা অজানিত আশঙ্কা জাগছিল। এখন পুলিস প্রহরীদের কথায় সে আশঙ্কাটা যেন আরও ঘনীভূত হয়।

এ বাড়ির কর্তা কাল রাতে খুন হয়েছেন।

অ্যাঁ! কী বললে? যুগপৎ একটা অস্ফুট আর্তচিৎকারের মতই যেন একই মুহূর্তে দু'জনের কণ্ঠ হতে কথাটা উচ্চারিত হল।

সংবাদটা শুধু আকস্মিকই নয়, অভাবনীয়।

হ্যাঁ বাবু, বড় দুঃখের বিষয়। এ বাড়ির কর্তাকে কাল রাত্রে কে যেন খুন করেছে।

রজত বা সুজাতা দু'জনের একজনের ওষ্ঠ দিয়েও কথা সরে না। দু'জনেই বাক্যহারা, বিস্মিত, স্তম্ভিত।

ভিতরে যান, ইন্সপেক্টারবাবু আছেন।

কিন্তু কি বলছ তুমি, আমি যে কিছুই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। এ বাড়ির কর্তা নিহত হয়েছেন মানে? রজত কোনমতে প্রশ্নটা করে।

পুলিস প্রহরীটি মৃদু কণ্ঠে বললে, সেই জন্যই তো বাড়িটা পুলিসের প্রহরায় আছে। যান, ভিতরে যান, ভিতরে দারোগাবাবু আছেন, তাঁর কাছেই সব জানতে পারবেন।

কিন্তু পা যেন আর চলে না।

অতর্কিত একটা বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন সমস্ত চলচ্ছক্তি ওদের লোপ পেয়ে গেছে। এই চরম দুঃসংবাদের জন্যেই কি তারা এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এল পত্র পাওয়ামাত্রই!

গেট পার হবার পর পায়ে-চলা একটা লাল সুরকি-ঢালা রাস্তা। শেষ হয়েছে গিয়ে সেটা প্রশস্ত একটা গাড়িবারান্দার নীচে।

গাড়িবারান্দায় উঠলেই সামনে যে হলঘরটা সেটাই বাইরের ঘর।

হলঘরের দরজাটা খোলা এবং সেই খোলা দরজা-পথে একটা আলোর ছটা বাইরের গাড়িবারান্দায় এসে পড়েছে। যন্ত্রচালিতের মতই দুজনে হলঘরটার মধ্যে খোলা দরজা-পথে গিয়ে প্রবেশ করল।

তাদের কাকা বিনয়েন্দ্রর আকস্মিক নিহত হবার সংবাদটা যেন দু'জনেরই মনকে অতর্কিত আঘাতে একেবারে অবশ করে দিয়েছে। সত্যি কথা বটে দীর্ঘদিন ঐ কাকার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। এমন কি দীর্ঘ গত দশ বছরে পরস্পরের মধ্যে কোন পত্রযোগে সংবাদের আদান-প্রদান পর্যন্ত ছিল না।

তথাপি সংবাদটা তাদের বিহ্বল করে দিয়েছে। ব্যাপারটা সঠিক কি হল, এখনও যেন তারা বুঝে উঠতে পারছে না।

হলঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাই তারা দুজনেই যেন থমকে দাঁড়াল।

এ বাড়িতে ইতিপূর্বে ওরা কখনও আসেনি। এই প্রথম এল। বিরাট হলঘরটি। এক পায়ে চৌকির উপরে বিস্তৃত ফরাস। তার উপর এদিক-ওদিক কয়েকটা মলিন তাকিয়া পড়ে আছে।

অন্য দিকে কয়েকটা পুরাতন আমলের রংচটা, ভেলভেটের গদীমোড়া, মলিন ভারি কারুকার্য করা সেগুন কাঠের তৈরী কাউচ।

দেওয়ালে বড় বড় কয়েকটি অয়েল-পেন্টিং।

চোগাচাপকান পরিহিত ও মাথায় পাগড়ি-আঁটা পুরুষের প্রতিকৃতি। এই চক্রবর্তীদের স্বনামধন্য সব পূর্বপুরুষদেরই প্রতিকৃতি বলেই মনে হচ্ছে।

মাথার উপরে সিলিং থেকে দোদুল্যমান বেলোয়ারী কাচের সেকেলে ঝাড়বাতি। তবে আগে হয়তো এককালে সেই সব বাতিদানের মধ্যে জ্বলত মোমবাতি, এখন জ্বলছে তারই মধ্যে বিজলী বাতি। এবং ঝাড়ের সবগুলি বাতি জ্বলছে না, জ্বলছে মাত্র দুটি অল্প শক্তির বিদ্যুৎ বাতি। যাতে করে অতবড় হলঘরটায় আলোর ঘাঁকতি ঘটেছে।

স্বল্প আলোয় সর্বত্র যেন একটা ছমছমে ভাব। ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

শুধু ঘরের মধ্যে কেন এত বড় বিরাট নীলকুঠিটার মধ্যে কেউ আছে বলেই মনে হয় না। কোন পরিত্যক্ত কবরখানার মতই একটা যেন মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা সমস্ত বাড়িটার মধ্যে চেপে বসেছে।

এ বাড়িতে রজত বা সুজাতা ইতিপূর্বে একবারও আসেনি। অপরিচিত সব কিছু। দু'জনে কিছুক্ষণ হলঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আবার একসময় সামনের ভেজানো দরজাটা খুলে অন্দরের দিকে পা বাড়ায়।

লম্বা একটা দীর্ঘ টানা বারান্দা। নির্জন খাঁ-খাঁ করছে।

এখানেও একটি স্বল্প শক্তির বিদ্যুৎ বাতির জন্য রহস্যময় একটা আলোছায়ার থমথমে ভাব। বারান্দায় প্রবেশ করে রজত একবার চারিদিকে তার চোখের দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল। ঘরের মত সেই বারান্দাটাও শূন্য। এবং হঠাৎ তার নজরে পড়ল বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় অর্ধেক ভেজানো একটা দ্বারপথে ঘরের মধ্যকার একটা ক্ষীণ আলোর আভাস আসছে।

সেই ঘরের দিকেই এগুবে কিনা রজত ভাবছে, এমন সময় অল্প দূরে সামনেই দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে ভারী জুতোর মচমচ শব্দ শোনা যেতেই উভয়েরই দৃষ্টি সেই দিকে গিয়ে নিবদ্ধ হল।

প্রশস্ত সিঁড়ি।

॥ পাঁচ ॥

সিঁড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে, তারপরেই বাঁয়ে বাঁক নিয়ে উপরে উঠে গেছে বোঝা যায় সিঁড়িটা। মচমচ ভারি জুতোর শব্দটা আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচেই নেমে আসছে মনে হল।

আপাততঃ ওরা দুজনেই উদগ্রীব হয়ে শব্দটাকে লক্ষ্য করে ঐ দিকেই তাকিয়ে থাকে। ক্রমে বারান্দার অল্প আলোয় ওদের নজরে পড়ল দীর্ঘকায় এক পুরুষ মূর্তি ঃ

পুরুষ মূর্তিটিই জুতোর শব্দ জাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

আগন্তুক দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ ফুট হবেন।

পরিধানে মুসলমানী চোস্ত পায়জামা, গায়ে কালো সার্জের গলাবন্ধ ঝুল সেরওয়ানী। পায়ে কালো ডার্বী জুতো। মুখখানি লম্বাটে ধরনের। কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সরু গোঁফ। মাথায় চুল ঘন কুঞ্চিত, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। হাতে একটি মোটা লাঠি। লাঠিটা ডান হাতে ধরে উঁচু করে নামছিলেন ভদ্রলোক।

হঠাৎ সিঁড়ির নিচে অল্প দূরেই দণ্ডায়মান ওদের দু'জনের দিকে নজর পড়তেই নামতে নামতে সিঁড়ির মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক হাতে লাঠিটা ধরে ওদের দিকে তাকালেন। চশমার লেন্সের ভিতর দিয়ে চোখের দৃষ্টিজোড়া যেন ওদের সর্বাঙ্গ লেহন করতে লাগল।

ওরাও নিঃশব্দে দণ্ডায়মান আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোন পক্ষ থেকেই কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল এমনি। হঠাৎ এমন সময় সেই স্তব্ধতার মধ্যে একটা পুরুষের কণ্ঠস্বর পশ্চাৎ দিক থেকে শুনতে পেয়েই রজত ঘুরে ফিরে তাকাল পশ্চাতের দিকে।

এ কি! পুরন্দরবাবু, কোথায় বের হচ্ছেন?

দ্বিতীয় আগন্তুককে দেখা মাত্রই রজতের বুঝতে কষ্ট হয় না তিনি কোন পুলিসের লোক। পরিধানে চিরন্তন পুলিসের পোশাক। পরিধানে লংস ও হাফসার্ট, কাঁধে পুলিসের ব্যাজ।

হ্যাঁ। একটু বাইরে থেকে ঘুরে না এলে মারা পড়ব, মিঃ বসাক।

পুরন্দরবাবুর প্রত্যুত্তরে পুলিস অফিসার মিঃ বসাক বললেন, কিন্তু আপনাকে

তো সকাল বেলাতেই বলে দিয়েছিলাম, আপাততঃ investigation শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের কারোরই কোথাও এ বাড়ি থেকে বের হওয়া চলবে না মিঃ চৌধুরী।

বেশ রুক্ষ ও কর্কশ কণ্ঠেই এবারে পুরন্দর চৌধুরী প্রত্যুত্তর দিলেন, কিন্তু কেন বলুন তো? এ আপনাদের অন্যায় জুলুম নয় কী?

অন্যায় জুলুম বলছেন?

নিশ্চয়ই। আপনাদের কি ধারণা তাহলে আমিই বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করেছি?

সে কথা তো আপনাকে আমি বলিনি।

তবে? তবে এভাবে আমাকে বাড়ির মধ্যে নজরবন্দী করে রাখবার মানেটা কী? কী উদ্দেশ্য বলতে পারেন?

উদ্দেশ্য যাই থাক, আপনাকে যেমন বলা হয়েছে তেমনি চলবেন।

আর যদি না চলি?

পুরন্দরবাবু, আপনি ছেলেমানুষ নন, জেনেশুনে আইন অমান্য করবার অপরাধে যে আপনাকে পড়তে হবে সেটা ভুলে যাবেন না।

বলেই যেন সম্পূর্ণ পুরন্দর চৌধুরীকে উপেক্ষা করে এবারে মিঃ বসাক দণ্ডায়মান রজত ও সুজাতার দিকে ফিরে তাকালেন।

বারান্দায় প্রবেশ করা মাত্রই ওদের প্রতি নজর পড়েছিল মিঃ বসাকের, কিন্তু পুরন্দর চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ওদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলেননি বোধ হয়।

এবারে ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, আপনারা?

রজত সংক্ষেপে নিজের ও সুজাতার পরিচয় দিল, আমি আর সুজাতা এই এখুনি আসছি।

কিন্তু আপনারা এত তাড়াতাড়ি এলেন কি করে?

কি বলছেন আপনি মিঃ বসাক? রজত প্রশ্ন করে।

মানে আমি বলছিলাম আজই তো বেলা দশটা নাগাদ আপনাদের দু'জনকে আসবার জন্য তার করেছি।

তার করেছেন?

হ্যাঁ। এ বাড়িতে গত রাত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে!

আমরা শুনেছি।

আপনারা শুনেছেন! শুনেছেন যে বিনয়েন্দ্রবাবু—

মিঃ বসাক ফিরে তাকালেন সুজাতার দিকে তার কথায়, কেন বলুন তো সুজাতা দেবী?

না না—আমি এখানে থাকতে পারব না, আমার যেন কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ছোড়দা, আমি কলকাতায় যাব।

কেমন যেন ভীত শুষ্ক কণ্ঠে কথাগুলো বলে সুজাতা।

মিঃ বসাক হাসলেন, বুঝতে পারছি সুজাতা দেবী, আপনি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, আমিও আজকের রাত এখানেই থাকব, কলকাতায় ফিরে যাব না। তাছাড়া এই রাত্রে কলকাতায় গিয়ে সেই হোটেলেই তো উঠবেন। তার চাইতে আজকের রাতটা এখানেই কাটান না, কাল সকালে যা হয় করবেন।

হ্যাঁ। সেই ভাল সুজাতা। রজত বোঝাবার চেষ্টা করে।

না ছোড়দা, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। থাকতে হয় তুমি থাক, আমি কলকাতায় ফিরেই যাব। সুজাতা আবার প্রতিবাদ জানায়।

তা যেতে হয় যাবেন'খন। আবার বললেন মিঃ বসাক।

এবারে সুজাতা চুপ করেই থাকে।

কিন্তু আজকের রাতটা সত্যিই থেকে গেলে হত না সুজাতা? রজত বোঝাবার চেষ্টা করে।

না—

শোন্ একটা কথা—বলে রজত সুজাতাকে এক পাশে নিয়ে যায়।

কী?

তোর যাওয়াটা বোধ হয় এক্ষুনি উচিত হবে না।

কেন?

কাকার কি করে মৃত্যু হল সেটাও তো আমাদের জানা প্রয়োজন। তাছাড়া আমি রয়েছি, আরও এত পুলিসের লোক রয়েছে—ভয়টাই বা কি?

না ছোড়দা—

যেতে হয় কাল সকালেই না হয় যাস। চল্—

ঐ সময় মিঃ বসাকও আবার বললেন, চলুন, ঘরে চলুন। শুধু আমরাই নয় মিস রায়, এ বাড়ি ঘিরে আট-দশজন পুলিস প্রহরীও আছে এবং সারা রাতই তারা থাকবে।

সকলে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

এ ঘরের সাইজটাও নেহাত ছোট নয়। বেশ প্রশস্তই। মনে হল চারিদিকে চেয়ে ঘরটা ইদানীং খালিই পড়ে থাকত। একটা টেবিল ও এদিক-ওদিক খানকতক চেয়ার ও একটা আরাম-কেদারা ছাড়া ঘরের মধ্যে অন্য কোন আসবাবপত্রই আর নেই।

ঘরের আলোটা কম শক্তির নয়। বেশ উজ্জ্বলই। টেবিলের উপরে একটা সিগারেটের টিন, একটা দেশালাই ও একটা ফ্ল্যাট্ ফাইল পড়ে ছিল। মিঃ বসাক রজতের দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন রজতবাবু, বসুন সুজাতা দেবী। পুরন্দরবাবু বসুন।

সকলে এক-একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

রজতই প্রথমে কথা বললে।

মিঃ বসাক তাঁর ডাইরীতে রজতবাবু সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা হচ্ছে রজতবাবুর বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। বেশ বলিষ্ঠ দোহারা গঠন। গায়ের রং কালো। চোখে মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। এম. এ. পড়তে পড়তে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে লাহোরের একটা মার্চেন্ট অফিসে তাঁর মামার সুপারিসেই চাকরি পেয়ে বছর পাঁচ আগে লাহোরে চলে যান। রজতবাবুর মামা লাহোরের সেই অফিসেই উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী ছিলেন।

কিন্তু গত বছর দুয়েক হল রজতবাবু সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে লাহোরে আনারকলি অঞ্চলে একটা ওষুধ ও পারফিউমারীর দোকান নেন এক পাঞ্জাবী মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে আধাআধি বখরায়।

মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ব্যবসার প্রয়োজনে কলকাতায় আসতেন বটে তবে কখনও কাকা বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেননি বা উত্তরপাড়ায় ইতিপূর্বে কখনও আসেননি।

* * *

আর সুজাতা দেবী! রজতবাবুর চাইতে বছর চার-পাঁচেক বয়সে ছোটই হবে। দেখতে অপরূপ সুন্দরী। সে বোধ হয় তার অপরূপ সুন্দরী পিতামহী সুরধনী দেবীর চোখ-ঝলসানো রূপের ধারাটাকে বহন করে এনেছিল। চোখে মুখে অদ্ভুত একটা শান্ত নিরীহ সরলতা যেন। সুজাতা লক্ষ্ণৌতে চাকরি করছে। বি. এ. পাস। বিবাহ করেনি।

॥ সাত ॥

রজতই প্রথমে কথা বললে, কিন্তু কি করে কি হল কিছুই যে আমি বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ বসাক। ছোট্‌কার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না সত্যি বটে, তবে তাঁকে তো ভাল করেই জানতাম। তাঁর মত অমন ধীর স্থির শান্ত চরিত্রের লোককে কেউ হত্যা করতে পারে এ যে কখনও কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।

মিঃ বসাক মৃদু কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাস না করতে পারলেও ব্যাপারটা যে ঘটেছে তা তো অস্বীকার করতে পারবেন না রজতবাবু। তাছাড়া দীর্ঘদিন বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনাদের কোন যোগাযোগ পর্যন্ত ছিল না। তাঁর সম্পর্কে কোন কথাও আপনারা শোনেননি।

তা অবশ্য ঠিক।

এই সময়ের মধ্যে তাঁর কোন পরিবর্তন হয়েছিল কিনা এবং এমন কোন কিছু ঘটেছিল কিনা যে জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটল তাও তো আপনি বলতে পারেন না।

তা অবশ্য পারি না।

আচ্ছা পুরন্দরবাবু,—হঠাৎ মিঃ বসাক পার্শ্বেই উপবিষ্ট পুরন্দর চৌধুরীর দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি তো তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু আপনি জেনেছিলেন ?

না। He was a perfect gentleman। গম্ভীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন পুরন্দর চৌধুরী।

এবারে আবার মিঃ বসাক রজতের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমি লালবাজার থেকে এসে পৌঁছবার আগেই এখানকার থানা-ইনচার্জ রামানন্দবাবু যতটা সম্ভব তদন্ত করেছিলেন। তাঁর রিপোর্ট থেকে যতটা জানতে পেরেছি, বিনয়েন্দ্রবাবু নাকি ইদানীং সাত-আট বছর অত্যন্ত secluded life lead করতেন। দিবারাত্র তাঁর ল্যাবরেটরী ঘরের মধ্যেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। পাড়ার কারোর সঙ্গেই তাঁর বড় একটা মেলামেশা ছিল না। আশপাশের ভদ্রলোকেরা কেউ তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বলতে পারেননি। একজন ভদ্রলোক তো বললেন, লোকটা যে বাড়িতে থাকে তাই জানবার উপায় ছিল না।

ঐ সময় রামচরণ চায়ের ট্রে হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

রজত রামচরণের দিকে তাকিয়ে মিঃ বসাককে সম্বোধন করে বললে, রামচরণ তো এ বাড়ির অনেকদিনকার পুরনো চাকর। ওকে জিজ্ঞাসা করেননি? ও হয়তো অনেক কথা বলতে পারবে।

হ্যাঁ, রামচরণের কাছে কিছু কিছু information পেয়েছি বটে তবে সেও অত্যন্ত এলোমেলো।

রামচরণ একবার রজতের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোন কথা না বলে চায়ের কাপগুলো একটার পর একটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে যেমন এসেছিল তেমনি বের হয়ে গেল।

চা পান করতে করতে মিঃ বসাক আবার বলতে লাগলেন।

প্রথম ভোরের লোকাল ট্রেনে পুরন্দর চৌধুরী বিনয়েন্দ্রবাবুর একটা জরুরী চিঠি পেয়ে এখানে এসে পৌছান। পুরন্দর চৌধুরী আসছেন সিঙ্গাপুর থেকে। ভোরবেলায় তিনি প্লেনে করে কলকাতায় এসে পৌছান এবং সোজা একেবারে ট্যাক্সিতে করে অন্য কোথায়ও না গিয়ে উত্তরপাড়ায় চলে আসেন।

ইতিপূর্বে অবশ্য পুরন্দর চৌধুরী বার তিন-চার এ বাড়িতে এসেছেন, তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন এবং রামচরণও বলেছে।

পুরন্দর চৌধুরী এককালে কলেজ লাইফে বিনয়েন্দ্রর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তারপর বি. এস. সি. পরীক্ষায় ফেল করে কাউকে কিছু না জানিয়ে জাহাজে খালাসীর চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে যান ভাগ্যান্বেষণে। এখনও সেখানেই আছেন। পুরন্দর চৌধুরী এখানে এসে নীচে রামচরণের দেখা পান। রামচরণেকেই জিজ্ঞাসা করেন বাবু তার কোথায়।

রামচরণ ঐ সময় প্রভাতী চা নিয়ে বাবুর ল্যাবরেটরীর দিকেই চলেছিল। সে বলে, গত রাত থেকে বাবু ল্যাবরেটারীতেই কাজ করছেন। এখনও বের হননি।

এ রকম প্রায়ই নাকি মধ্যে মধ্যে সারাটা রাত বিনয়েন্দ্র ল্যাবরেটারীতেই কাটিয়ে দিতেন।

সকলের উপরে কঠোর নির্দেশ ছিল বিনয়েন্দ্র যতক্ষণ ল্যাবরেটারীতে থাকবেন কেউ যেন তাঁকে কোন কারণেই না বিরক্ত করে। সেইজন্যই রামচরণ সে রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করেনি।

রামচরণের জবানবন্দি থেকেই জানা যায়, গত রাত্রে এগারোটা নাগাদ

একবার নাকি ল্যাবরেটারী থেকে বের হয়েছিলেন বিনয়েন্দ্র।

সেই সময় খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় বিনয়েন্দ্র বলেছিলেন, রাত্রে আর তিনি কিছু খাবেন না। এক গ্লাস দুধ যেন কেবল গরম করে তাঁর শোবার ঘরে রামচরণ রেখে দেয়। প্রয়োজন হলে তাই তিনি খাবেন।

রামচরণ প্রভুর নির্দেশমত এক গ্লাস দুধ গরম করে ল্যাবরেটারী সংলগ্ন তাঁর শয়নঘরে রেখে শুতে যায়, রাত তখন প্রায় পৌনে বারোটা।

তারপর সে নীচে এসে তার নিজের ঘরে শুতে যায়।

কেন জানি না সেদিন রাত্রি দশটার সময় রাত্রের আহার শেষ করবার পর থেকেই অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল রামচরণের। অন্যান্য রাত্রে তার চোখে ঘুম আসতে আসতে সেই রাত বারটা বেজে যায়। অত ঘুম পাচ্ছিল বলেই রামচরণ বোধ হয় বিছানায় গিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে।

অন্যান্য দিন খুব সকালেই তার ঘুম ভাঙে কিন্তু গতকাল ঘুম ভাঙে তার প্রায় বেলা সাড়ে সাতটায়। তাও লছমনের ডাকাডাকিতে।

লছমন এ বাড়িতে পাচকের কাজ করে। ঘুম ভেঙে অত বেলা হয়ে গেছে দেখে সে একটু ভীতই হয়ে পড়ে। কেন না বাবুর খুব ভোরে চা-পানের অভ্যাস। এবং সময়মত প্রভাতী চা না পেলে গালাগালি দিয়ে তিনি ভূত ছাড়াবেন।

লছমনকে জিজ্ঞাসা করে বাবু তাঁকে ডেকেছেন কিনা চায়ের জন্য।

লছমন বলে, না।

যাহোক তাড়াতাড়ি চা নিয়ে যখন সে উপরে চলেছে, পুরন্দর চৌধুরীর সঙ্গে সিঁড়ির সামনে তার দেখা।

সাহেব, আপনি কখন এলেন? রামচরণ জিজ্ঞাসা করে।

এই আসছি! তোমার বাবু কেমন আছেন?

ভালই। চলুন, বাবু বোধ হয় কাল রাত থেকে ল্যাবরেটারী ঘরেই আছেন।

উভয়ে উপরে এসে দেখে ল্যাবরেটারী ঘরের দরজাটা ইষৎ খোলা; যেটা ইতিপূর্বে খোলা থাকতে কেউ দেখেনি। রামচরণ বেশ একটু আশ্চর্যই হয়।

রামচরণ চায়ের কাপ হাতে ল্যাবরেটারী ঘরে প্রবেশ করে, পুরন্দর চৌধুরী বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

রামচরণকে শুধু বলে দেন তাঁর আসার সংবাদটা বাবুকে দিতে।

সরাসরি ঢোকেন না তিনি ল্যাবরেটারীতে. কেন না সংবাদ না দিয়ে ও

অনুমতি না নিয়ে যে ল্যাবরেটারী ঘরে একমাত্র রামচরণ ব্যতীত এ বাড়ির কারুরই প্রবেশ করবার হুকুম ছিল না সেটা পুরন্দরের অজানা ছিল না।

বারান্দার ঘরের সামনে দোতলায় পুরন্দর চৌধুরী দাঁড়িয়ে ছিলেন; হঠাৎ একটা কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ ও আর্তকণ্ঠের চিৎকার তাঁর কানে এল।

কী হল?

ল্যাবরেটারীর ভিতর থেকে আবার রামচরণের চাপা আর্তস্বর শোনা গেল। এবং পুরন্দর চৌধুরী কিছু বুঝে উঠবার আগেই খোলা দরজাপথে একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই বের হয়ে এল রামচরণ। তার সর্বাঙ্গ তখন থরথর করে কাঁপছে।

কী। কী হয়েছে রামচরণ? পুরন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

বাবু—বাবু বোধ হয় মরে গেছেন!

॥ আট ॥

কি বলছ রামচরণ! বাবু মরে গেছেন কি!

হ্যাঁ। আসুন, দেখবেন চলুন।

পুরন্দর চৌধুরী সোজা ঘরের মধ্যে ছুটে যান। প্রথমটায় তাঁর কিছুই চোখে পড়ে না। ল্যাবরেটারী ঘরে সব কটা জানলাই বন্ধ। এবং জানলার উপর সব ভারি কালো পর্দা ফেলা। সাধারণতঃ ল্যাবরেটারী ঘরে যে উজ্জ্বল হাজার পাওয়ারের বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে, তখনও ঘরে সেই আলোটা জ্বলছে। আর কাজ করবার লম্বা টেবিলটা, যার উপরে নানা ধরনের বিচিত্র সব কাচের যন্ত্রপাতি—মাইক্রোসকোপ, বুন্‌সেন বার্নার প্রভৃতি সাজানো—সেই লম্বা টেবিলটারই সামনে একটা বসবার উঁচু টুলটার পাশেই চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বৈজ্ঞানিক বিনয়েন্দ্র সান্ন্যালের নিথর নিস্পন্দ দেহটা।

পরিধানে তখনও তাঁর পায়জামা ও গবেষণাগারেব সাদা অ্যাপ্রন। ভূপতিত নিষ্কম্প দেহটা এবং তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টিমাত্রেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সে দেহে প্রাণের লেশমাত্রও আর নেই।

বহুক্ষণ পূর্বেই তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। এবং সমস্ত মুখখানা হয়ে গেছে নীলাভ। আতঙ্কিত, বিস্ফারিত দুটি চক্ষুতারকা। ঈষৎ বিভক্ত ও প্রসারিত নীলাভ দুটি ওষ্ঠের প্রান্ত দিয়ে ক্ষীণ একটা রক্তাক্ত ফেনার ধারা গড়িয়ে নেমেছে।

দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ।

মৃতদেহের পাশেই তখনও পড়ে রয়েছে একটি গ্লাস-বিকার। সেই গ্লাস-বিকারের তলদেশে তখনও সাদা মত কী সামান্য খানিকটা তরল পদার্থ অবশিষ্ট পড়ে আছে।

প্রথম দর্শনেই ব্যাপারটা মনে হবে বিনয়েন্দ্র যেন কিছু খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পুরন্দর চৌধুরীই দারোয়ান ধনবাহাদুরের হাতে চিঠি দিয়ে স্থানীয় থানায় সংবাদ প্রেরণ করেন। সংবাদ পাওয়ামাত্রই থানা-ইনচার্জ রামানন্দ সেন চলে আসেন। নীলকুঠিতে এসে ব্যাপারটা তদন্ত করে এবং মৃতদেহ পরীক্ষা করে থানা-ইনচার্জের মনে যেন কেমন একটা খটকা লাগে। তিনি তাড়াতাড়ি থানার এ. এস. আই.-কে একটা সংবাদ পাঠান, লালবাজার স্পেশাল ব্রাঞ্চে ফোন করে তখুনি ব্যাপারটা জানাবার জন্য।

মৃত্যুর ব্যাপারটা যে ঠিক সোজাসুজি আত্মহত্যা নয়, তিনটি কারণে থানা-ইনচার্জের সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমত ঘাড়ের ঠিক নীচেই ১—১।২"×১" পরিমাণ একটি কালসিটার চিহ্ন ছিল। দ্বিতীয়ত, সুদৃশ্য টেবিল-টাইম-পিস্‌টা ভগ্ন অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল এবং তৃতীয়ত, ল্যাবরেটারীর ঘরের দরজাটা ছিল খোলা।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বেলা দশটা নাগাদ ইন্সপেক্টার মিঃ বসাক লালবাজার থেকে চলে আসেন।

থানা-ইনচার্জ তখন নীলকুঠির সমস্ত লোকদের নীচের একটা ঘরে জড়ো করে পুলিস প্রহরায় একজন একজন করে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে জেরা করছেন।

নীলকুঠিতে লোকজনের মধ্যে এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য প্রৌঢ় রামচরণ, পাচক লছমন, বয়স তার ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে, বছর দুই হল এখানে চাকরিতে লেগেছে। আর একজন ভৃত্য বাইরের যাবতীয় বাজার ও ফাই-ফরমাস খাটবার জন্য, নাম রেবতী। পূর্ববঙ্গে বাড়ি। বয়েস ত্রিশ-বত্রিশই হবে। বছর পাঁচেক হল এ বাড়িতে কাজ করছে। দারোয়ান নেপালী ধনবাহাদুর থাপা। সেও এ বাড়িতে প্রায় বছর ছয়েক আছে। আর সফার ও ক্লীনার করালী। করালী এ বাড়িতে কাজে লেগেছে বছর খানেক মাত্র। তার আগে যে ড্রাইভার ছিল গাড়িতে অ্যাক্সিডেণ্ট করে এখন হাজত বাস করছে বছর দেড়েক ধরে।

বিরাট নীলকুঠি। ত্রিতল। তিনতলায় দুখানা ঘর, দোতলায় সাতখানা ও

একতলায় ছখানা ঘর। এছাড়া বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। একধারে গ্যারেজ ও দারোয়ানদের থাকবার ঘর।

গ্যারেজটা মস্ত বড়। এককালে সেখানে তিনটি জুড়ি গাড়ি ও চারটে ওয়েলার ঘোড়া থাকত।

অনাদি চক্রবর্তীর মৃত্যুর বছরখানেক বাদেই শেষ গাড়িখানি ও শেষ দুটি ঘোড়া বিক্রয় করে দিয়ে, সহিস ও কোচওয়ানকে তুলে দিয়ে মস্ত একটা ফোর্ড গাড়ি কিনেছিলেন বিনয়েন্দ্র।

মোটর গাড়িটা অবিশ্যি কেনা পর্যন্তই।

কারণ বেশির ভাগ সময়েই গ্যারেজে পড়ে থাকত, ক্বচিৎ কখনও বিনয়েন্দ্র গাড়িতে চেপে বের হতেন। ড্রাইভার বসে বসেই মোটা মাইনে পেত। বাড়ির পশ্চাৎ দিকেও মস্ত বড় বাগান, চারিদ্দিকে তার এক মানুষ সমান উঁচু লোহার রেলিং দেওয়া প্রাচীর। তারই ঠিক নীচে প্রবহমান জাহ্নবী। একটা বাঁধানো প্রশস্ত ঘাটও আছে চক্রবর্তীদেরই তৈরী তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য।

ঘাটের গায়েই একটা লোহার গেট। তবে গেটটা সদাসর্বদা বন্ধই থাকে। একদা ওই পশ্চাৎ দিককার বাগান অত্যন্ত সমারোহ ছিল, এখন অযত্নে ও অবহেলায় ঘন আগাছায় ভরে গেছে।

রামচরণ, রেবতী, লছমন ও করালী সকলেই খানতিনেক ঘর নিয়ে বাড়ির নীচের তলাতেই থাকে।

নীলকুঠিতে ওই চারজন লোক থাকলেও বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল একমাত্র রামচরণেরই। অন্যান্য সকলের সঙ্গে বাবুর দেখাসাক্ষাৎ ক্বচিৎ কখনও হত। তবে মাইনেপত্র নিয়মিত সকলে মাসের প্রথমেই বাড়ির পুরাতন সরকার প্রতুলবাবুর হাত দিয়েই পেত।

প্রতুলবাবু নীলকুঠিতে থাকতেন না। ঐ অঞ্চলেই কাছাকাছি একটা বাসা নিয়ে গত তের বৎসর ধরে পরিবার নিয়ে আছেন। অনাদি চক্রবর্তীর আমল থেকেই নাকি ঐ ব্যবস্থা বহাল ছিল। বিনয়েন্দ্র তার কোন অদলবদল করেননি তাঁর আমলেও।

প্রত্যহ সকালবেলা একবার প্রতুলবাবু নীলকুঠিতে আসতেন। বেলা দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ চলে যেতেন, তারপর আবার আসতেন গোটা পাঁচেকের সময়, যেতেন সেই রাত নটায়।

তাঁর আমলে অনেক কাজই প্রতুলবাবুকে করতে হত, অনেক

কিছুরই দেখাশোনা করতে হত, কিন্তু বিনয়েন্দ্র আসার পর ক্রমে ক্রমে তার দায়িত্ব ও কাজগুলো নিজেই তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

গতকাল প্রতুলবাবু উত্তরপাড়ায় ছিলেন না, তাঁর এক ভাইঝির বিবাহে শ্যামনগর দিন চারেকের জন্য গিয়েছেন।

ভৃত্য, পাচক, সফার ও দারোয়ান কাউকেই জিজ্ঞাসা করে এমন কোন কিছু জানতে পারা যায়নি, যা বিনয়েন্দ্রর মৃত্যু-ব্যাপারে আলোক-সম্পাত করতে পারে।

মিঃ বসাক শুধু একাই আসেন নি, তিনি আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন পুলিস সার্জেন ডাঃ বক্সীকেও।

থানা-ইনচার্জ রামানন্দবাবুও ওঁদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

চলুন। কোন্ ঘরে মৃতদেহ আছে, একবার দেখে আসা যাক।

॥ নয় ॥

মিঃ বসাক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, ব্যাপারটা আপনার তাহলে সুসাইড নয়, হোমিসাইড বলেই মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ স্যার।

মাথার নীচে ঘাড়ে abbression ছাড়া অন্য কিছু কি দেখতে পেয়েছেন, যাতে করে আপনার মনে হয়েছে ব্যাপারটা হোমিসাইডই?

হ্যাঁ, আরও একটা কারণ আছে স্যার।

কি?

মৃতদেহ দেখেই অবশ্য বোঝা যায় যে, বিষই মৃত্যুর কারণ এবং মৃতদেহের পাশে যে গ্লাস-বিকারটি পাওয়া গেছে, সেটার যে অবশিষ্টাংশ তরল পদার্থ এখনও বর্তমান আছে, সেটার chemical analysis হলে হয়তো সেটাও বিষই প্রমাণিত হবে। রামানন্দবাবু বললেন।

বসাক বললেন, কিন্তু বিষই যদি তিনি খেয়ে আত্মহত্যা করবেন, তাহলে মেঝেতে শুয়ে খেলেন কেন? তারপর ঘড়িটা ভাঙা অবস্থায় বা পাওয়া গেল কেন? বরং আমার যেন সব শুনে মনে হচ্ছে তাঁকে কেউ অতর্কিতে [illegible] পিছন দিক থেকে কোন ভারি বস্তু দিয়ে আঘাত করে তারপর হয়তো

স্থান অবস্থায়। আরও একটা কথা, ভেবে দেখেছেন কি ঘরের দরজা খোলাই ছিল! অথচ দেখা যায় আত্মহত্যার সময় সাধারণ লোক দরজা বন্ধ করেই রাখে।

থানা-অফিসার রামানন্দ সেনের কথার জবাবে মিঃ বসাক কোন সাড়া দি... না বা কোনরূপ মন্তব্য করলেন না।

ল্যাবরেটারী ঘরের দরজায় থানা-অফিসার ইতিমধ্যে তালা লাগিয়ে রেখেছিলেন। চাবি তাঁর কাছেই ছিল।

ঘরের তালা খুলে সকলে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মিঃ প্রশান্ত বসাক মাত্র বছর কয়েক পুলিস লাইনে প্রবেশ করলেও ইতিমধ্যেই তাঁর কর্মদক্ষতায় স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বয়স তাঁর বত্রিশ-তেত্রিশের মধ্যে হলেও ঐ ধরণের জটিল সব কেসে অদ্ভুত ও আশ্চর্য রকমের ঘটনা বিশ্লেষণের 'ন্যাক' ছিল তাঁর।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সর্বাগ্রে তিনি ঘরের চতুর্দিক একবার তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন।

বসাক ভাবছিলেন তখন থানা-অফিসারের অনুমান যদি সত্যিই হয়, সত্যিই যদি ব্যাপারটা একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডই হয় তো এই ঘরের মধ্যেই সেটা গত রাত্রেই সংঘটিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে হত্যাকারী কি তার কোন দুর্বল মুহূর্তে কোন চিহ্নই আর দুষ্কৃতি রেখে যায়নি! নিশ্চয়ই গিয়েছে। আজ পর্যন্ত জগতের কোথাও এমন কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় নি যার কিছু না কিছু চিহ্ন অকুস্থানে হত্যাকারীকে অনিচ্ছায় হোক বা অজ্ঞাতেই হোক ফেলে যেতে হয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক তাকাতে তাকাতে মিঃ বসাক লম্বা গবেষণার টেবিলটার সামনেই যেখানে তখনও মৃতদেহটা ভূপতিত ছিল তার অতি নিকটে এসে দাঁড়ালেন।

মৃত্যু! তবে আত্মহত্যা, না হত্যাই সেইটাই ভাববার কথা।

মৃতের দুটি বিস্ফারিত চক্ষু—প্রাণহীন হলেও বোঝা যায় তার মধ্যে রয়েছে একটা ভয়ার্ত বিস্ময়। যেন একটা আকস্মিক জিজ্ঞাসায় সন্ত্রস্ত হয়েই সেই অবস্থাতেই থেমে গিয়েছে

কিসের [illegible] আশঙ্কা মৃতের ঐ চোখের

দুটি [illegible] শেষ মুহূর্তটিতে কিছু কি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন!

কোন আশ্রয়ের সন্ধানে বা কোন অবলম্বনের শেষ প্রচেষ্টায় এখনও তাই হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হয়েই আছে।

একেবারে সোজা লম্বালম্বিভাবে দেহটা চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

কিন্তু কই! দেহের মধ্যে আত্মহত্যা করবার পরের শেষ ও প্রচণ্ড আক্ষেপ কোথায়! বিষ প্রক্রিয়ায় সাধারণত যা থাকে।

যে বিষ আচমকা দেহান্ত ঘটায়, সে বিষ আক্ষেপও দেয় পেশীতে পেশীতে প্রচণ্ড একটা।

নীচু হয়ে মৃতদেহের পাশে বসলেন মিঃ বসাক।

ঈষৎ বিস্ফারিত নীলাভ ওষ্ঠের প্রান্ত বেয়ে ক্ষীণ একটা লালা-মিশ্রিত রক্তের ধারা কালচে হয়ে জমাট বেঁধে আছে।

দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন মৃতের মুখখানি মিঃ বসাক।

দেখতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল নিচের ওষ্ঠটা যেন একটু ফোলা; ডান দিক এবং শুধু তাই নয় সেখানে একটা ক্ষতচিহ্নও আছে। যে ক্ষতচিহ্নে রক্ত একটু জমাট বেঁধে আছে এখনও।

কিসের ক্ষতচিহ্ন ঐ ওষ্ঠে? আর কেনই বা ক্ষতচিহ্ন? তবে কি? চিন্তা ও বিশ্লেষণ অতি দ্রুত মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত বহে যেতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনা মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠতে থাকে বসাকের।

একবার মুখ তুলে পার্শ্বেই দণ্ডায়মান থানা-অফিসারের দিকে তাকালেন মিঃ বসাক, ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর জেগে ওঠে নিঃশব্দ স্মিত হাসির একটা ক্ষীণ রেখা।

পুলিস সার্জেন ডাঃ বক্সীও ইতিমধ্যে পাশে দাঁড়িয়ে দেহটা লক্ষ্য করছিলেন। মৃতের হাতের শক্ত আঙুলগুলো এবার টেনে দেখলেন ডাঃ বক্সী।

কতক্ষণ মারা গেছে বলে আপনার মনে হয় ডাঃ বক্সী? বসাক প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে।

তা ঘণ্টা নয় দশ তো হবেই। মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন ডাঃ বক্সী।

তাহলে রাত একটা দেড়টা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে এই তো?

হ্যাঁ। ঐ রকমই মনে হচ্ছে।

মৃত্যুর কারণ কী বলে মনে হচ্ছে?

মনে তো হচ্ছে a case of poisoningই।

অতঃপর ডাঃ বক্সী মৃতদেহটাকে উল্টে দিলেন মেঝের উপরই।

Occipital protuberence-এর ঠিক নীচেই একটি ১½"×১" ইঞ্চি পরিমাণ একিমোসিসের চিহ্ন। হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন ডাঃ বক্সী। তারপর মৃদু অনুচ্চারিত কণ্ঠে মিঃ বসাককে সম্বোধন করে বললেন, শুধু একিমোসিসই নয় মিঃ বসাক, ল্যাসারেসনও আছে। আর মনে হচ্ছে base of the skull-এর ফ্র্যাকচারও সম্ভবতঃ আছে। আমার তো মনে হচ্ছে বেশ ভারি ও শক্ত কিছু—যেমন ধরুন কোন লোহার রড জাতীয় জিনিস দিয়েই ঘাড়ে আঘাত করা হয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে—

কী? মিঃ বসাক ডাঃ বক্সীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

ঐ আঘাতটাই primary cause or death না poisonই primary এবং আঘাতটা secondary এইটাই এখন ভাববার বিষয়।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে থানা-অফিসার রামানন্দবাবুর অনুমানই ঠিক। পরিষ্কার এটা একটা হত্যাকাণ্ড। এবং আঘাতটা primary আর secondary হচ্ছে poison। এখন কথা হচ্ছে হত্যাকারী প্রথমে মারাত্মক আঘাত হেনে পরে আরও sure হবার জন্য poison-এর ব্যবহার করেছিল, না হত্যা করে পরে poison দিয়েছিল ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ একটা অন্য light দেবার জন্য—

মানে, বলতে চাইছেন অন্যের চোখে ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বোঝাবার জন্য, তাইতো?

ঠিক তাই।

কিন্তু কেন আপনার সে কথা মনে হচ্ছে বলুন তো মিঃ বসাক। ডাঃ বক্সী প্রশ্ন করলেন।

চেয়ে দেখুন ভাল করে, মৃতের নীচের ওষ্ঠে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, এবং শুধু ক্ষতচিহ্নই নয়, জায়গাটা একটু ফুলেও আছে। তাতে করে কি মনে করতে পারি না আমরা যে, হয়তো কোন আঘাত দিয়ে অজ্ঞান করবার পর ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার light দেবার জন্যই metal tube বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর সাহায্যে মুখের মধ্যে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে এটা pure simple case of homicide নৃশংস হত্যা, আত্মহত্যা আদৌ নয়।

এবারে ডাঃ বক্সী একটু বিশেষ দৃষ্টি দিয়েই মৃতের ওষ্ঠটা আবার পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, সত্যিই তো, আপনার অনুমান হয়তো মিথ্যা নাও হতে পারে মিঃ বসাক। আমার মনে [illegible]তো you are right। হ্যাঁ, আপনিই

হয়তো ঠিক।

ভাঙা জার্মান টাইমপিসটা লম্বা টেবিলটার উপরেই রাখা ছিল। মিঃ বসাক ঘড়িটা হাতে তুলে নিলেন এবারে দেখবার জন্য।

ঘড়ির কাচটা ভেঙে শত চিড় খেয়ে গেলেও কাচের টুকরোগুলো খুলে পড়ে যায়নি। ঘড়িটা ঠিক একটা বেজে বন্ধ হয়ে আছে।

ঘড়িটা বার দুই নাড়াচাড়া করে মিঃ বসাক পুনরায় সেটা টেবিলের উপরেই রেখে দিলেন।

খুব সম্ভবতঃ ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে রাত একটায়।

যে কোন কারণেই হোক ঘড়িটা নিশ্চয়ই ছিটকে পড়েছিল এবং যার ফলে ঘড়ির কাচটা ভেঙেছে ও ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

ঘড়িটা কোথায় পেয়েছেন? মিঃ বসাক থানা-অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মেঝেতে পড়ে ছিল।

ভৃত্য রামচরণকে পরে জিজ্ঞাসা করে জানা গিয়েছিল ঘড়িটা ওই টেবিলটার উপরেই নাকি সর্বদা থাকত।

॥ দশ ॥

যদিচ থানা-অফিসার সকলেরই জবানবন্দি: নিয়েছিলেন, তথাপি মিঃ বসাক প্রত্যেককেই আবার পৃথক পৃথক ভাবে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষ করে একটা প্রশ্ন সকলকেই করলেন, রাত সাড়ে বারটা থেকে একটার মধ্যে কোনরূপ শব্দ বা চিৎকার শুনতে কেউ পেয়েছিল কিনা।

কিন্তু সকলেই জবাব দেয়, না। তারা কোনরূপ শব্দই শোনেনি। কারও কোন চিৎকারও শোনেনি।

সমস্ত গবেষণা-ঘরটা মিঃ বসাক চারদিক খুব ভাল করে দেখলেন অন্য কোন সূত্র অর্থাৎ clue পাওয়া যায় কিনা।

গবেষণা-ঘরটি প্রশস্ত একটি হলঘরের মতই বললে অত্যুক্তি হয় না। দরজা মাত্র দুটি; একটি বাইরের বারান্দার দিকে ও অন্যটি পাশের ঘরের যোগাযোগ রেখে। অতএব ওই দুটি দরজা ভিন্ন ওই ঘরে যাতায়াতের আর দ্বিতীয় কোন

রাস্তাই নেই।

বারান্দার দিকে তিনটি জানলা। সেগুলো বোধ হয় দীর্ঘ দিন পূর্বেই একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভিতর থেকে স্ক্রু এঁটে। অন্যদিকে যে জানলা-গুলো—সেগুলোতে পূর্বে খড়খড়ির পাল্লা ছিল। বিনয়েন্দ্রনাথ ঘরটিকে ল্যাবরেটারী করবার সময় সেগুলো খুলে ফেলে দিয়ে বড় বড় কাচের পাল্লা সেট করিয়ে নিয়েছিলেন। পাল্লাগুলো ফ্রেমের মধ্যে বসানো। তার দুটি অংশ। নীচের অংশটি ফিক্সড., উপরের অংশটি কব্জার উপরে ওঠানো নামানোর ব্যবস্থা আছে কর্ডের সাহায্যে।

ঘরের ভিতর থেকে জানলার সামনে আবার ভারী কালো পর্দা টাঙানো। সেই পর্দাও কর্ডের সাহায্যে ইচ্ছামত টেনে দেওয়া বা সরিয়ে দেওয়া যায়।

মধ্যে মধ্যে গবেষণার কাজের জন্য ডার্করুমের প্রয়োজন হত বলেই হয়তো জানলায় পর্দা দিয়ে বিনয়েন্দ্র ঐরূপ ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

ঘরের তিন দিকেই দেওয়াল ঘেঁষে সব লোহার র‍্যাক, আলমারি, রেফ্রিজ, কোল্ড স্টোরেজ। আলমারি ও র‍্যাকে নানাজাতীয় শিশি বোতল রং-বেরংয়ের ওষুধে সব ভর্তি। কোন কোন র‍্যাকে ভর্তি সব মোটা মোটা রসায়ন বিজ্ঞানের বই।

গবেষণা-ঘর নয়তো, জ্ঞানী কোন তপস্বীর জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ।

হত্যাকারী এই মন্দিরের মধ্যেও তার মৃত্যু-বীজ ছড়িয়ে যেন এর পবিত্রতাকে কলঙ্কিত করে গেছে।

কাচের জানলার ওদিকে বাড়ির পশ্চাৎ দিক। জানলার সামনে এসে দাঁড়ালে পশ্চাতের বাগান ও প্রবহমান গঙ্গার গৈরিক জলরাশি চোখে পড়ে।

ঘরের দুটি দরজা। দুটিই খোলা ছিল। অতএব হত্যাকারী যে কোন একটি দরজাপথেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে। তবে বারান্দার দরজাটা সাধারণতঃ যখন সর্বদা বন্ধই থাকত তখন মনে হয়, বিনয়েন্দ্রর শয়নঘর ও গবেষণাঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথেই সম্ভবতঃ হত্যাকারী ঐ ঘরে প্রবেশ করেছিল এবং হত্যা করে যাবার সময় দ্বিতীয় দরজাটা খুলে সেই পথে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

গবেষণাঘরের মেঝেটি সাদা ইটালীয়ান মার্বেল পাথরে তৈরী। মসৃণ চকচকে।

মৃতদেহের আশেপাশে মেঝেটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে করতে মিঃ বসাকের সহসা নজর পড়ে এক জায়গায়।

মেঝের উপরে খানিকটা অংশে যেন একটা হলদে ছোপ পড়ে আছে। মনে

হয় যেন কিছু তরল জাতীয় রঙীন পদার্থ মেঝেতে পড়েছিল, পরে মুছে নেওয়া হয়েছে।

মেঝেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মিঃ বসাকের দৃষ্টি একটা ব্যাপারে আকর্ষিত হয়। মৃতের পা একেবারে খালি। বিনয়েন্দ্র কি খালি পায়েই গবেষণা করতেন!

রামচরণ একটি পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। তাকে মিঃ বসাক প্রশ্ন করলেন, রামচরণ, তোমার বাবু কোন স্যাণ্ডেল বা স্লিপার ব্যবহার করতেন না বাড়িতে?

হ্যাঁ, বাবুর পায়ে সর্বদা একটা সাদা রবারের স্লিপার তো থাকত।

কিন্তু তাহলে গেল কোথায় স্লিপার জোড়া?

সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে ও পাশের শয়নঘরটি অনুসন্ধান করেও বিনয়েন্দ্রর নিত্যব্যবহৃত, রামচরণ-কথিত সাদা রবারের স্লিপার জোড়ার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

রামচরণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, আশ্চর্য! গেল কোথায় বাবুর স্লিপার জোড়া! বাবু তো এক মুহূর্তের জন্যও কখনও খালি পায়ে থাকতেন না!

সত্যি মৃত বিনয়েন্দ্রর পায়ের পাতা দেখে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তবে স্লিপার জোড়া দেখা গেল না। এবং বাথরুম থেকে বের হয়ে আসবার মুখে আর একটি ব্যাপারে মিঃ বসাকের দৃষ্টি পড়ল, গবেষণাগারের একটি জলের সিঙ্ক।

সিঙ্কের কলটি খোলা। কলের খোলা মুখ দিয়ে জল ঝরে চলেছে তখনও। এবং সেই জল সিঙ্কের নির্গম পাইপ দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে।

ভাঙা টাইমপিস, খোলা কল ও অপহৃত নিত্যব্যবহার্য স্লিপার, ঘরের দুটি দ্বারই খোলা এবং মেঝেতে কিসের একটা দাগ; এ ভিন্ন অন্য কোন কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত মিঃ বসাকের মনে লাগল না।

মনের মধ্যে কেবলই ঐ তিনটি ব্যাপার চক্রাকারে আবর্ত রচনা করে ফিরতে লাগল মিঃ বসাকের।

ঘড়িটা ভাঙল কি করে?

স্লিপার জোড়া কোথায় গেল?

সিঙ্কের কলটা খোলা ছিল কেন?

আর সর্বশেষে মেঝেতে ঐ দাগটা কিসের?

হত্যাকারী সম্ভবতঃ পশ্চাৎ দিক থেকে অতর্কিতে বিনয়েন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল। তার সঙ্গে বিনয়েন্দ্রর কোন struggle-এর সুযোগ মেলেনি।

আপাততঃ মৃতদেহটা ময়নাঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে মিঃ বসাক সকলকে নিয়ে নীচে নেমে এলেন।

থানা-অফিসার আবার ঘরে তালা দিয়ে দিলেন।

নীচে এসে ডাঃ বক্সী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সমস্ত বাড়িটা চারপাশ থেকে পাহারার ব্যবস্থা করবার জন্য মিঃ বসাক থানা-অফিসারকে নির্দেশ দিলেন।

থানা-অফিসারও তখনকার মত বিদায় নিলেন।

রামচরণের নিকট হতে রজত ও সুজাতার ঠিকানা নিয়ে মিঃ বসাকই জরুরী তার করে দিলেন তাদের, তার পেয়েই চলে আসবার জন্য নির্দেশ দিয়ে।

॥ এগারো ॥

সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে গেলেন মিঃ বসাক রজত ও সুজাতার জ্ঞাতার্থে।

চা পান করতে করতেই মিঃ বসাক সমগ্র দুর্ঘটনাটা বর্ণনা করছিলেন।

উপস্থিত সকলেই চা পান করছিলেন একমাত্র সুজাতা বাদে।

সুজাতা নীলকুঠিতে পা দিয়েই তার ছোট্‌কার মৃত্যু-সংবাদটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে কেমন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল এবং মাঝখানে একবার ঐ রাত্রেই কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কথাই বলেনি।

তার মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না যে, অকস্মাৎ যেন সে কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছে ঘটনা বিপর্যয়ে।

মিঃ বসাকের বর্ণনা প্রসঙ্গে রজত মধ্যে মধ্যে দু-একটা কথা বললেও সুজাতা একবারের জন্যও তার মুখ খোলেনি। চায়ের কাপটা সে মিঃ বসাকের অনুরোধে হাতে তুলে নিয়েছিল মাত্র, ওষ্ঠে কাপটা স্পর্শও করেনি।

ধূমায়িত চায়ের কাপটা ক্রমে ক্রমে একসময় ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে গেল, সেদিকেও যেন তার লক্ষ্য ছিল না।

রামচরণ এসে ঘরে আবার প্রবেশ করল।

ট্রের উপরে শূন্য চায়ের কাপগুলো তুলে নিতে নিতে বললে, আপনারা তাহলে রাত্রে এখানেই থাকবেন তো দাদাবাবু?

প্রশ্নটা রামচরণ রজতকে করলেও তার দৃষ্টি ছিল সুজাতার মুখের উপরেই নিবদ্ধ।

হ্যাঁ হ্যাঁ—এখানেই থাকবো বৈকি। তুমি সব ব্যবস্থা করে রেখো। রজত সুজাতার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে কথাগুলো বললে।

সুজাতা কোন জবাব দিল না।

উপরের তলার ঘরগুলো অনেকদিন তো ব্যবহার হয় না—

রামচরণকে বাধা দিয়ে রজত বললে, ওরই মধ্যে একটা যাহোক ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে দাও—আজকের রাতের মত। তারপর কাল সকালে দেখা যাবে।

সেই ভাল রামচরণ। আমার শোবার যে ঘরে ব্যবস্থা করেছ, তারই পাশের ঘর দুটোয ওদের থাকবার ব্যবস্থা করে দাও ভাই-বোনের। মিঃ বসাক বললেন।

রামচরণ ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সুজাতা ছাড়াও ঘরের মধ্যে উপস্থিত আর একজনও প্রায বলতে গেলে চুপচাপ বসেছিলেন, পুরন্দর চৌধুরী।

একটা বিচিত্র লম্বা বাঁকানো কালো পাইপে উগ্র কটুগন্ধী টোব্যাকো ভরে পুরন্দর চৌধুরী চেয়ারটার উপরে হেলান দিয়ে বসে নিঃশব্দে ধূমপান করছিলেন।

ঘরের বাতাসে টোব্যাকোর উগ্র কটু গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছিল।

রামচরণ ঘর থেকে চলে যাবার পর সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

ঘরের আবহাওয়াটা যেন কেমন বিশ্রী থমথমে হয়ে উঠেছে।

ইন্সপেক্টার বসাকই আবার ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

আজ দুপুরে অনেকক্ষণ ধরে ঐ রামচরণের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলে ও নানা প্রশ্ন করে বিনয়েন্দ্রবাবুর সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি, তার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা হচ্ছে, মাস চার-পাঁচ আগে একটি তরুণী একদিন সকালবেলা নাকি বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

তরুণী! বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল রজত মিঃ বসাকের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, তরুণীটি দেখতে নাকি বেশ সুশ্রীই ছিলেন। সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মত দেহের গঠন নয়। বরং বেশ উঁচু লম্বাই। বয়স ছাব্বিশ-আটাশের মধ্যেই নাকি হবে।

কিন্তু কেন এসেছিলেন তিনি জানতে পেরেছেন? প্রশ্ন করে আবার রজতই।

হ্যাঁ, [illegible]ম, তরুণীটি এসেছিলেন দেখা করতে, বিনয়েন্দ্রবাবু কাগজে তার

একজন ল্যাবরেটারী অ্যাসিস্টেণ্টের প্রয়োজন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সেই বিজ্ঞাপন দেখে।

তারপর ?

তরুণীটি এসে বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ায় রামচরণ তার বাবুকে সংবাদ দেয়।

মিঃ বসাক বলতে লাগলেন, বিনয়েন্দ্র তাঁর ল্যাবরেটারীর মধ্যে ওই সময় কাজ করছিলেন। সংবাদ পেয়ে রামচরণকে তিনি বলেন আগন্তুক তরুণীকে তাঁর ল্যাবরেটারী ঘরেই পাঠিয়ে দিতে। তরুণী ল্যাবরেটারী ঘরে গিয়ে ঢোকেন।

ঘণ্টা দুই বাদে আবার তরুণী চলে যান। এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বিনয়েন্দ্র রামচরণকে ডেকে বলেন, যে তরুণীটি ওই দিন সকালবেলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আগামী পরশু সকালে আবার সে আসবে। তরুণীটির জন্য রামচরণ যেন দোতলার একটা ঘর ঠিক করে রাখে, কারণ এবার থেকে সে এ বাড়িতেই থাকবে।

তারপর রজত আবার প্রশ্ন করল, নির্দিষ্ট দিনে তরুণীটি এলেন এবং এখানে থাকতে লাগলেন ? কি নাম তাঁর ?

জানতে পারা যায়নি। রামচরণও তাঁর নাম বলতে পারেনি, মেমসাহেব বলেই রামচরণ তাঁকে ডাকত। তরুণী অত্যন্ত নির্বিরোধী ও স্বল্পবাক ছিলেন। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে নাকি কারও সঙ্গেই বড় একটা কথা বলতেন না। দিনে রাত্রে বেশির ভাগ সময়ই তাঁর কাটত বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গবেষণাগারের মধ্যে। যে চার মাস এখানে তিনি ছিলেন, মাসের মধ্যে একবার কি দুবার ছাড়া তিনি কখনও একটা বাড়ির বাইরেই যেতেন না।

আর একজন নতুন লোক যে এ বাড়িতে এসেছে বাইরে থেকে কারও পক্ষে তা বোঝবারও উপায় ছিল না।

সারাটা দিন এবং প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দুজনেই যে যাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এবং সে সময়টা বিশেষ কাজের এবং প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া দুজনের মধ্যে কোন কথাই নাকি হত না।

একমাত্র দুজনের মধ্যে সামান্য যা কথাবার্তা মধ্যে মধ্যে হত—সেটা ওই খাবার টেবিলে বসে।

বিনয়েন্দ্রকে নিয়ে এক টেবিলে বসেই তিনি খেতেন।

সেই সময় বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে শুনেছে রামচরণ, কিন্তু তা

সে সব কথাবার্তার কিছুই প্রায় সে বুঝতে পারেনি কারণ খাওয়ার টেবিলে বসে যা কিছু আলাপ তাঁর বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে চলত, তা সাধারণতঃ তাও ইংরেজীতেই হত।

এমনি করে চলছিল, তারপর হঠাৎ একদিন আবার যেমন তরুণীর ওই গৃহে আবির্ভাব ঘটেছিল তেমনি হঠাৎই একদিন আবার তরুণী যেন কোথায় চলে গেলেন।

নিয়মিত খুব ভোরে গিয়ে রামচরণ তরুণীকে তাঁর প্রভাতী চা দিয়ে আসত, একদিন সকালবেলা তাঁর প্রাত্যহিক প্রভাতী চা দিতে গিয়ে রামচরণ তাঁর ঘরে আর তাঁকে দেখতে পেল না।

একটিমাত্র বড় সুটকেশ কেবল যা সঙ্গে এনেছিলেন তিনি, সেইটিই ডালা-খোলা অবস্থায় ঘরের একপাশে পড়ে ছিল।

রামচরণ প্রথমে ভেবেছিল, তিনি বোধ হয় ল্যাবোরেটারী ঘরেই গেছেন কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে বিনয়েন্দ্র অ্যাপ্রন গায়ে একা একাই কাজ করছেন।

সকালবেলার পরে দ্বিপ্রহরেও খাওয়ার টেবিলে তাঁকে না দেখে রামচরণ বিনয়েন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে, মেমসাহেবকে দেখছি না বাবু? তিনি খাবেন না?

না।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে রামচরণেরও যেমন সাহস হয়নি, বিনয়েন্দ্রও আর তাকে সেই তরুণী সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন কথা বলেননি নিজে থেকে।

তবে তরুণীকে আর তারপর এ বাড়িতে রামচরণ দেখেনি।

চার মাস আগে অকস্মাৎ একদিন যেমন তিনি এসেছিলেন, চার মাস বাদে অকস্মাৎই তেমনি আবার যেন উধাও হয়ে গেলেন।

কোথা থেকেই বা এসেছিলেন আর কোথাই বা চলে গেলেন, কে জানে!

রামচরণ তাঁকে আবার দেখলে হয়তো চিনতে পারবে, তবে তাঁর নাম-ধাম কিছুই জানে না।

তরুণী চলে যান আজ থেকে ঠিক দশ দিন আগে।

এই একটি সংবাদ। এবং দ্বিতীয় সংবাদটি ওই তরুণীটি ছাড়াও আর একজন রুব আগন্তুক বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে গত এক বছরের মধ্যে বার দুই দেখা করেছেন।

আগন্তুক সম্ভবতঃ একজন ইউ. পি.-বাসী।

লম্বা-চওড়া চেহারা, মুখে গুর দাড়ি, চোখে কালো কাচের চশমা ছিল াগন্তুকের। এবং পরিধানে ছিল কেনা পায়জামা, শেরওয়ানী ও মাথায় গান্ধী

তিনি নাকি প্রথমবার এসে বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে তাঁর ল্যাবোরেটারী ঘরে বসে আধঘণ্টাটাক আলাপ করে চলে যান।

দ্বিতীয় বার তিনি আসেন দুর্ঘটনার মাস চারেকের কিছু আগে।

তৃতীয় সংবাদ যা ইন্সপেক্টার সংগ্রহ করেছেন রামচরণের কাছ থেকে তা এই : পুরন্দর চৌধুরী গত দু-বছর থেকে মধ্যে মধ্যে চার-পাঁচ মাস অন্তর অন্তর বার পাঁচেক নাকি এ বাড়িতে এসেছেন। এবং রামচরণ তাঁকে চেনে। পুরন্দর চৌধুরী এখানে এলে নাকি দু-পাঁচদিন থাকতেন।

চতুর্থ সংবাদটি হচ্ছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, একটু রহস্যপূর্ণও।

গত দেড় বছর ধরে ঠিক দু মাস অন্তর অন্তর সিঙ্গাপুর থেকে বিনয়েন্দ্রর নামে একটি করে নাকি রেজিস্টার্ড পার্সেল আসত।

পার্সেলের মধ্যে কি যে আসত তা রামচরণ বলতে পারে না। কারণ পার্সেলটি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই রসিদে সই করেই বিনয়েন্দ্র পার্সেলটি নিয়েই ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতেন। কখনও তিনি রামচরণের সামনে পার্সেলটি খোলেননি।

এবং একটা ব্যাপার রামচরণ লক্ষ্য করেছিল, পার্সেলটি আসবার সময় হয়ে এলেই বিনয়েন্দ্র যেন কেমন বিশেষ রকম একটু চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠতেন। বার বার সকালবেলা পিয়ন আসবার সময়টিতে একবার ঘর একবার বারান্দা করতেন।

যদি কখনও দু-একদিন পার্সেলটি আসতে দেরি হত বিনয়েন্দ্রর মেজাজ ও ব্যবহার যেন কেমন খিটখিটে হয়ে উঠত। আবার পার্সেলটি এসে গেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন।

শান্ত ধীর যেমন তাঁর স্বভাব।

ছোট একটি চৌকো বাক্সে পার্সেলটি আসত।

সিঙ্গাপুর থেকে যে পার্সেলটি আসত রামচরণ তা জেনেছিল একদিন বাবুর কথাতেই কিন্তু জানত না কে পাঠাত পার্সেলটি এবং পার্সেলটির মধ্যে কি থাকতই বা।

॥ বারো ॥

দরজার বাইরে এমন সময় জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল।

কেউ আসছে এ ঘরের দিকে।

ইন্সপেক্টার বসাক চোখ তুলে খোলা দরজাটার দিকে তাকালেন।

ভিতরে আসতে পারি স্যার? বাইরে থেকে ভারী পুরুষ-কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

কে? সীতেশ? এস এস—

চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। পরিধানে তার ক্যালকাটা পুলিসের সাদা ইউনিফর্ম।

কী খবর সীতেশ?

জামার পকেট থেকে একটি মুখ-আঁটা 'অন হিজ ম্যাজেসটিস সার্ভিস' ছাপ দেওয়া লম্বা খাম বের করে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট স্যার।

আগ্রহের সঙ্গে খামটা হাতে নিয়ে ইন্সপেক্টার বসাক বললেন, থ্যাঙ্কস্। আচ্ছা তুমি যেতে পার সীতেশ।

সার্জেণ্ট সীতেশ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টার বসাক খামটা ছিঁড়ে রিপোর্টটা বের করলেন।

বিনয়েন্দ্রর মৃতদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট।

ডাঃ বক্সীই ময়না তদন্ত করেছেন নিজে।

দেখলেন মৃতদেহে বিষই পাওয়া গেছে তবে সে সাধারণ কোন কেমিকেল বিষ নয়, স্নেক-ভেনম্। সর্প-বিষ!

বিষ প্রয়োগও যে বিনয়েন্দ্রকে হত্যার চেষ্টায় করা হয়েছিল সেটা ইন্সপেক্টার বসাক সকালে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন।

কিন্তু বুঝতে পারেননি সেটা সর্প-বিষ হতে পারে। ঘাড়ের নিচে যে রক্ত জমার (একিমোসিস্) চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল মৃতদেহে, সেটাও কোন ভারি বস্তুর দ্বারা আঘাতই প্রমাণ করছে। এবং শুধু রক্ত জমাই নয়, base of the skull-এ ফ্র্যাকচারও পাওয়া গিয়েছে। সে আঘাতে মৃত্যুও ঘটতে পারত।

এদিকে দেহের সর্প-বিষ প্রয়োগের চিহ্নও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে।

মৃত্যুর কারণ তাই ওই সর্প-বিষ বা আঘাতের যে কোন একটিই হতে পারে

অথবা একসঙ্গে দুটিই হতে পারে। ডাঃ বক্সীর অন্ততঃ তাই ধারণা। কাজেই বলা শক্ত এক্ষেত্রে উক্ত দুটি কারণের কোন্‌টি প্রথম এবং কোন্‌টি দ্বিতীয়।

তবে এ থেকে আরও একটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ব্যাপারটি আদৌ আত্মহত্যা নয়, নিষ্ঠুর হত্যা।

ময়না তদন্তে কি পাওয়া গেল মিঃ বসাক? প্রশ্ন করে রজতই।

ইন্সপেক্টার ময়না তদন্তের রিপোর্টটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন।

সে কি! স্নেক-ভেনম্! সর্প-বিষ! বিস্মিত কণ্ঠে রজত বলে।

হ্যাঁ।

কিন্তু সর্প-বিষ কাকার শরীরে এল কি করে! তবে কি সর্প-দংশনেই তাঁর মৃত্যু হল?

সম্ভবতঃ না, গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন ইন্সপেক্টার।

সর্প-দংশন নয়?

না।

তবে সর্প-বিষ তাঁর দেহে এল কোথা থেকে?

সেটাই তো বর্তমান রহস্য। কিন্তু সর্প-দংশন যে নয় বুঝলেন কি করে?

কারণ সর্প-দংশনে মৃত্যু হলে প্রথমতঃ শরীরের কোথাও না কোথাও বিনয়েন্দ্রবাবুর সর্প-দংশনের চিহ্ন নিশ্চয়ই পাওয়া যেত, এবং দ্বিতীয়তঃ কাউকে সর্প-দংশন আচমকা করলে তার পক্ষে নিঃশব্দে ওইভাবে মরে থাকা সম্ভবপর হত না। শুধু তাই নয়, সর্প-দংশনেই যদি মৃত্যু হবে তবে মৃতের ঘাড়ের নীচে সেই কালসিটার দাগ অর্থাৎ একটা শক্ত আঘাতের চিহ্ন এল কোথা থেকে! নিজে নিজে তিনি নিশ্চয়ই ঘাড়ে আঘাত করেননি বা পড়ে গিয়েও ওইভাবে আঘাত পাননি। পেতে পারেন না।

তবে?

আমার যতদূর মৃতের ঘাড়ের ও ঠোঁটের ক্ষতচিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে রজতবাবু, হত্যাকারী হয়তো তাঁকে অতর্কিত আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলে, পরে মুখ দিয়ে সর্পবিষ কোন নল বা ওই জাতীয় কিছুর সাহায্যে তাঁর শরীরের মধ্যে প্রয়োগ করেছিল।

তাহলে আপনি স্থিরনিশ্চিত যে ব্যাপারটা হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়?

হ্যাঁ। **Clean murder**। নৃশংস হত্যা।

Clean murder তাই বা অমন জোর গলায় আপনি বলছেন কি করে

ইন্সপেক্টার ?

এতক্ষণে এই প্রথম পুরন্দর চৌধুরী পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে কথা বললেন।

সকলে যুগপৎ পুরন্দর চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল।

কি বলছেন মিঃ চৌধুরী ? ইন্সপেক্টার বসাক প্রশ্ন করলেন।

বলছিলাম আপনার পোস্ট মর্টেম্ রিপোর্টের ওই findingsটুকুই কি আপনার ওই ধরনের উক্তির অবিসংবাদী প্রুফ ? ব্যাপারটা তো আগাগোড়া pure and simple একটা accidentও হতে পারে ?

পুরন্দর চৌধুরীর দ্বিতীয়বারের কথাগুলো শুনেই সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টার বসাক জবাব দিতে পারলেন না, তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে রইলেন।

পুরন্দর চৌধুরীও ইন্সপেক্টার বসাকের দিকেই তাকিয়েছিলেন। পুরন্দর চৌধুরীর চোখের উপরের ও নীচের পাতা দুটো যেন একটু কুঁচকে আছে, তথাপি সেই কোঁচকানো চোখের ফাঁক দিয়ে যে দৃষ্টিটা তাঁর প্রতি স্থিরনিবদ্ধ তার মধ্যে যেন সুস্পষ্ট একটা চ্যালেঞ্জের আহ্বান আছে বলে বসাকের মনে হয় ঐ মুহূর্তে।

কয়েকটা মুহূর্ত একটা গুমোট স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

হঠাৎ ইন্সপেক্টারের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ একটা বঙ্কিম হাসির রেখা জেগে উঠল; এবং তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, না মিঃ চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমি ঠিক একমত হতে পারছি না। ঘাড়ের নীচে একটা বেশ জোরালো আঘাত ও সেই সঙ্গে সর্পবিষ ব্যাপারটাকে ঠিক আকস্মিক একটা দুর্ঘটনার পর্যায়ে ফেলতে পারছি না।

কেন বলুন তো ?

আমার position-এ আপনি থাকলেও কি তাই বলতেন না মিঃ চৌধুরী ? ধরুন না যদি ব্যাপারটা আপনি যেমন বলছেন simple একটা accident-ই হয়, আঘাতটা ঠিক ঘাড়ের নীচেই লাগল—শরীরের আর কোথায়ও আঘাত এতটুকু লাগল না, তা কেমন করে হবে বলুন ? তারপর সর্পবিষের ব্যাপারটা—সেটাই বা accident-এর সঙ্গে খাপ খাওয়াচ্ছেন কি করে ? সেটা সর্প-দংশনও হতে পারে। সর্প-দংশনের জায়গাটা হয়তো আপনাদের ময়না তদন্তে এড়িয়ে গিয়েছে। তদন্তের সময় ডাক্তারের চোখে পড়েনি।

তারপর একটু থেমে বলেন, এবং যেটা এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়। সাপ দংশন করলেও তো এমন একটা বড় রকমের কিছু তার দন্ত-দংশন চিহ্ন রেখে যাবে না যেটা সহজেই নজরে পড়তে পারে

মৃদু হেসে ইন্সপেক্টার বসাক আবার বললেন, আপনার কথাটা হয়তো ঠিক, এবং যুক্তি যে একেবারেই নেই তাও বলছি না। কিন্তু কথা হচ্ছে একটা লোককে সাঁপে দংশন করল অথচ বাড়ির কেউ তা জানতেও পারলে না তাই বা কেমন করে সম্ভব বলুন ?

রামচরণ এমন সময় আবার এসে ঘরে প্রবেশ করল, রান্না হয়ে গেছে। টেবিলে কি খাবার দেওয়া হবে ?

ইন্সপেক্টার বসাক বললেন, হ্যাঁ, দিতে বল।

দোতলার একটি ঘরই বিনয়েন্দ্র ডাইনিং রুম হিসাবে ব্যবহার করতেন।

রামচরণ সকলকে সেই ঘরে নিয়ে এল।

মাঝারি গোছের ঘরটি।

ঘরের মাঝখানে লম্বা একটি ডাইনিং টেবিল, তার উপরে ধবধবে একটি চাদর পেতে দেওয়া হয়েছে। মাথার উপরে সিলিং থেকে ঝুলন্ত সুদৃশ্য ডিম্বাকৃতি সাদ ডোমের মধ্যে উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে। ঘরের একধারে একটি ফ্রিজ, তার উপরে বসানো একটি সুদৃশ্য টাইমপিস। ঘড়িটা দশটা বেজে বন্ধ হয়ে আছে।

টেবিলের দু পাশে গদি-মোড়া সুদৃশ্য সব আরামদায়ক চেয়ার।

টেবিলের একদিকে বসলেন ইন্সপেক্টার বসাক ও পুরন্দর চৌধুরী, অন্যদিকে বসল রজত ও সুজাতা।

পাচক কাচের প্লেটে করে পরিবেশন করে গেল আহার্য।

কিন্তু আহারে বসে দেখা গেল, কারোরই আহারে যেন তেমন একটা উৎসাহ বা রুচি নেই। খেতে হবে তাই যেন সব খেয়ে চলেছে।

বিশেষ করে সুজাতা যেন একেবারেই কোন খাওয়ার স্পৃহা বোধ করছিল না।

ঘটনার আকস্মিকতায় সে যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। বার বার তার কাকা বিনয়েন্দ্রর কথাটা ও তাঁর মুখখানাই যেন মনের পাতায় ভেসে উঠছিল।

বছর দশেক হবে তার কাকার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। কাকার অকস্মাৎ এখানে তাদের ছেড়ে চলে আসাটা তার জেঠিমা ও দাদা রজত কাকার কর্তব্যের মস্ত বড় একটা ত্রুটি বলেই কোনদিন যেন ক্ষমা করতে পারেননি।

কিন্তু সুজাতা কাকার চলে আসা ও এখানে থেকে যাওয়াটাকে তত বড় একটা ত্রুটি বলে মনে করতে পারেনি কোনদিনই।

কারণ কাকা বিনয়েন্দ্রর সে ছিল অশেষ স্নেহের পাত্রী।

অনেক সময় কাকার সঙ্গে তার অনেক মনের কথা হত। কাকা ও ভাইঝিতে পরস্পরের ভবিষ্যৎ ও কর্মজীবন নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা হত। কাকার মনের মধ্যে ছিল একটা সত্যিকারের জ্ঞানলিপ্সু বিজ্ঞানী মানুষ। সে মানুষটা ছিল যেমনি সহজ তেমনি শিশুর মত সরল।

কোনপ্রকার ঘোরপ্যাঁচই তাঁর মনের কোথায়ও ছিল না।

এ কথা সাদা কাগজের পৃষ্ঠার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কাকা ভাইঝিতে কতদিন আলোচনা হয়েছে, যদি বিনয়েন্দ্রর টাকা থাকত প্রচুর তবে সে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে তৈরী করত একটি মনের মত ল্যাবরেটারী—গবেষণাগার। দিন রাত সেই গবেষণাগারের মধ্যে বসে সে তার আপন ইচ্ছা ও খুশিমত গবেষণা করে যেত। কোন ঝামেলা নেই, সংসারের কোন দুশ্চিন্তা নেই। নেই কোন দায়িত্ব।

কাকার কথায় হাসতে হাসতে সুজাতা বলত, এক কাজ কর না কেন ছোট্‌কা, লটারির টিকিট একটা একটা করে কিনতে থাক। হঠাৎ যদি ভাগ্যে একটা মোটা টাকা পেয়ে যাও তো আর কোন অভাবই তোমার থাকবে না। দিব্যি মনের খুশিতে মনোমত এক গবেষণাগার তৈরী করে দিনরাত বসে বসে গবেষণা চালাতে পারবে তখন।

হেসে বিনয়েন্দ্র জবাব দিয়েছেন, ঠাট্টা নয় রে সুজাতা, এক মস্ত বড় জ্যোতিষী আমার হস্তরেখা বিচার করে বলেছে হঠাৎই আমার নাকি ধনপ্রাপ্তি একদিন হবে।

তবে আর কি! তবে তো নির্ভাবনায় লটারির টিকিট কিনতে শুরু করতে পার ছোট্‌কা।

না। লটারিতে আমার বিশ্বাস নেই।

তবে আর হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি হবে কি করে?

কেন, অন্য ভাবেও তো হতে পারে।

হ্যাঁ—হতে পারে যদি তোমার দাদামশাই তোমাকে তার বিষয়সম্পত্তি মরবার আগে দিয়ে যান।

সে গুড়ে বালি।

কেন?

আমাদের ওপরে দাদামশাইয়ের যে কি প্রচণ্ড আক্রোশ আর ঘৃণা তা তো তুই জানিস না।

সে আর সকলের যার ওপরেই থাক তোমার ওপরে তো ছোটবেলায় বুড়ো খুব খুশিই ছিল।

সে তো অতীত কাহিনী। সেখান থেকে চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্নেহ সব উবে গেছে কবে, তার কি আর কিছু অবশিষ্ট আছে রে?

তাহলে তো কটা বছর তোমার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখছি না ছোট্‌কা।

কী রকম?

চাকরিবাকরি করি আমি, তারপর মাসে মাসে তোমাকে টাকা দিতে শুরু করব, তুমি সেই টাকা জমিয়ে ল্যাবরেটারী তৈরী করবে।

তা হলেই হয়েছে। ততদিনে চুলে পাক ধরবে, মাথার ঘিলু আসবে শুকিয়ে; তাছাড়া তোকে চাকরি করতে আমি দেবই বা কেন? চমৎকার একটা ছেলে দেখে তোর বিয়ে দেব, তারপর বুড়ো বয়েসে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তোর বাড়িতে তোর ছেলেমেয়েদের নিয়ে—

খিলখিল করে হেসে উঠেছে সুজাতা।

হাসছিস যে?

তা কি করব বল? বিয়েই আমি করব না ঠিক করেছি।

মেয়েছেলে বিয়ে করবি না কি রে?

কেন, ছেলে হয়ে তুমি যদি বিয়ে না করে থাকতে পার তো মেয়ে হয়ে আমিই বা বিয়ে না করে কেন থাকতে পারব না?

দূর পাগলী! বিয়ে তোকে করতে হবে বৈকি।

না ছোট্‌কা, বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না।

কেন রে?

বিয়ে করলে তোমার বুড়ো বয়সে তোমাকে দেখবে কে?

কেন, বিয়ে হলেও তো আমাকে দেখাশুনা করতে পারবি।

না কাকামণি, তা হয় না। বিয়ে হয়ে গেলে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা আর থাকে না।

সেই ছোট্‌কা যখন হঠাৎ একদিন কলেজ থেকেই সেই যে তাদের কাউকে কোন কিছু না জানিয়ে চলে গেল তার দাদামশাইয়ের ওখানে এবং আর ফিরে এল না, সুজাতার অভিমানই হয়েছিল তার ছোট্‌কার উপরে খুব বেশি।

...জেঠিমার মত অভিমানমিশ্রিত আক্রোশ বা তারকনাথের মত শুধু আক্রোশই হয়নি।

সে তার ছোট্‌কার মনের কথা জানত বলেই ভেবেছিল, ছোট্‌কার একদিনকার মনের সাধটা বোধ হয় মিটতে চলেছে, তাই আপাততঃ ছোট্‌কা কটা দিন চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছেন মাত্র।

তাদের পরস্পরের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায়নি। হবেও না কোনদিন।

ফলতঃ সুজাতা যেমন তার জেঠিমাকে লেখা বিনয়েন্দ্রর দুখানা চিঠির কথাই ঘুণাক্ষরেও জানত না তেমনি এও জানতে পারেনি যে, কী কঠোর শর্তে বিনয়েন্দ্রর দাদামশাই তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিনয়েন্দ্রকে একা দান করে গেছেন।

তারপর পাস করার পরেই লক্ষ্ণৌয়ে চাকরি পেয়ে সুজাতা চলে গেল ছোট্‌কার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ বা পত্র মারফত কোনরূপ যোগাযোগ না থাকলেও ছোট্‌কাকে সে একটি দিনের জন্যও ভুলতে পারেনি বা তার কথা না মনে করে থাকতে পারেনি।

এমন কি ইদানীং কিছুদিন থেকেই সে ভাবছিল, এবারে ছোট্‌কাকে একটা চিঠি দেবে। কিন্তু নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে সময় করে উঠতে পারছিল না। ঠিক এমনি সময় বিনয়েন্দ্রর জরুরী চিঠিটা হাতে এল। একটা মুহূর্তও আর সুজাতা দেরি করল না। চিঠি পাওয়ামাত্রই ছুটি নিয়ে সে রওনা হয়ে পড়ল।

এখানে পৌঁছেই অকস্মাৎ ছোট্‌কার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাই বোধ হয় সবচাইতে বেশী আঘাত পেল সুজাতা।

নেই! তার ছোট্‌কা আর নেই!

অত দূর থেকে এতদিন অদর্শনের পর তীব্র একটা দর্শনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেও ছোট্‌কার সঙ্গে তার দেখা হল না। শুধু যে দেখাই হল না তাই নয়, এ জীবনে আর কখনো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।

মৃত্যু! নিষ্ঠুর মৃত্যু চিরদিনের মতই তার ছোট্‌কাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাদের নাগালের বাইরে।

নিরুপায় কান্নায় বুকের ভিতরটা সুজাতার গুমরে গুমরে উঠছিল অথচ চোখে তার এক ফোঁটা জলও নেই।

সে কাঁদতে চাইছে, অথচ কাঁদতে পারছে না।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন এখনো কেমন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হচ্ছে। তার ছোট্‌কাকে কেউ নাকি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। অমন শান্ত সরল স্নেহময়

লোকটিকে কে হত্যা করল! আর কেনই বা হত্যা করল! কেউ তো ছোট্‌কার এমন শত্রু ছিল না!

কি নিষ্ঠুর হত্যা! সর্পবিষ প্রয়োগে হত্যা! রামচরণের নিকট হতে সংগৃহীত ইন্সপেক্টার বসাকের মুখে শোনা ক্ষণপূর্বের সেই কাহিনীটাই মনে মনে সুজাতা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছিল।

কে সেই রহস্যময়ী তরুণী!

কোথা থেকে এসেছিল সে বিনয়েন্দ্রর কাছে! আর হঠাৎই বা কেন সে কাকামণির মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে অমন করে চলে গেল!

ছোট্‌কার এই নিষ্ঠুর হত্যা-ব্যাপারের মধ্যে তার কোন হাত নেই তো!

॥ তেরো ॥

হঠাৎ ইন্সপেক্টার বসাকের প্রশ্নে সুজাতার চমক ভাঙল, সুজাতা দেবী, আপনি তো কিছুই খেলেন না?

একেবারেই ক্ষিধে নেই।

ইন্সপেক্টার বসাক বুঝতে পারেন, একে দীর্ঘ ট্রেণ-জার্নি, তার উপর এই আকস্মিক দুঃসংবাদ, নারীর মন স্বভাবতঃই হয়তো মুষড়ে পড়েছে।

কিছু আর বললেন না ইন্সপেক্টার।

আহারপর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। সকলে উঠে পড়লেন।

রামচরণ ইতিমধ্যেই সকলের শয়নের ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

দোতলায় চারটি ঘরের একটি ঘরে পুরন্দর চৌধুরীর, একটি ঘরে রজতের, একটি ঘরে সুজাতার ও অন্য একটি ঘরে ইনস্‌পেক্টার বসাকের।

সকলেই শ্রান্ত। তাছাড়া রাতও অনেক হয়েছিল। একে একে তাই সকলেই আহারের পর যে যার নির্দিষ্ট শয়নঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

নীলকুঠির আশেপাশে একমাত্র, বামপাশে প্রায় লাগোয়া দোতলা একটি বাড়ি ছাড়া অন্য কোন বাড়ি নেই।

ডানদিকে অপ্রশস্ত একটি গলিপথ, তারপর একটা চুণ-সুরকির আড়ৎ। তার ওদিকে আবার বাড়ি।

নিজের নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বাগানের দিককার জানলাটা খুলে

বসাক জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে সিগারেট-কেসটা বের করে, কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন।

মিঃ বসাক খুব বেশি ধূমপান করেন না। রাত্রে দিনে হয়তো চার-পাঁচটার বেশি সিগারেট নয়।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে।

ক্ষীণ এককালি চাঁদ আকাশে উঠেছে। তারই ক্ষীণ আলো বাগানের গাছপালায় যেন একটা ধূসর চাদর টেনে দিয়েছে। গঙ্গায় বোধ হয় এখন জোয়ার। বাগানের সামনে ঘাটের সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত নিশ্চয়ই স্ফীত জলরাশি উঠে এসেছে।

কলকল ছলছল শব্দ কানে আসে।

গঙ্গার ওপারে মিলের আলোকমালা অন্ধকার আকাশপটে যেন সাতনরী মত দোলে।

বিনয়েন্দ্রর হত্যার ব্যাপারটাই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল তখন বসাকের। আসলে মৃত্যুর কারণ কোন্‌টা। ঘাড়ের নীচে আঘাত, না সর্পবিষ! দুটি কারণের যে কোন একটিই পৃথক পৃথক ভাবে মৃত্যু ঘটিয়ে থাকতে পারে। আবার দুটি একত্রেও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আর চোখে যা দেখা গেছে ও হাতের কাছে যে-সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয় ঘাড়ে কোন ভারি শক্ত বস্তু দিয়ে আঘাত করাতেই বিনয়েন্দ্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল, তারপর সেই অবস্থাতেই সম্ভবতঃ বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে তাকে।

আরও কতকগুলো ব্যাপার যার কোন সঠিক উত্তর যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনয়েন্দ্রর সর্বদা ব্যবহৃত সাদা রবারের চপ্পলজোড়া কোথায় গেল? ঘড়িটা ভাঙা অবস্থাতেই ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল কেন?

ল্যাবরেটারী ঘরের দরজাটি খোলা ছিল কেন?

যে তরুণী মহিলাটি বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল, মাস চারেক কাজ করবার পর হঠাৎই বা সে কাউকে কোন কিছু না জানিয়ে বিনয়েন্দ্রর নিহত হবার দিন দশেক আগে চলে গেল কেন?

যে নূর দাড়ি, চোখে চশমা সম্ভবতঃ ইউ. পি. হতে আগত ভদ্রলোকটি দুবার বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনিই বা কে?

কি তাঁর পরিচয়?

সিঙ্গাপুর থেকে যে পার্সেলটি নিয়মিত বিনয়েন্দ্রর কাছে আসত তার মধ্যেই বা কি থাকত ?

আর কেই বা পাঠাত পার্সেলটি ?

হঠাৎ চকিতে একটা কথা মনের মধ্যে উদয় হয়।

পুরন্দর চৌধুরী !

পুরন্দর চৌধুরী সিঙ্গাপুরেই থাকেন। এবং সেখান থেকেই বিনয়েন্দ্রর চিঠি পেয়ে এসেছেন। পুরন্দর চৌধুরী বিনয়েন্দ্রর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সিঙ্গাপুর হতে প্রেরিত সেই রহস্যময় পার্সেলের সঙ্গে ওই পুরন্দর চৌধুরীর কোন সম্পর্ক নেই তো !

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাটা যেন পুরন্দর চৌধুরীকে কেন্দ্র করে ক খেতে শুরু করে বসাকের মাথার মধ্যে।

পুরন্দর চৌধুরী।

লোকটির চেহারাটা আর একবার বসাকের মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কি করেন ভদ্রলোক সিঙ্গাপুরে তাও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ঘনিষ্ঠতা ছিল পুরন্দর চৌধুরীর সঙ্গে বিনয়েন্দ্রর অনেককাল, কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা সত্যিকারের কতখানি ছিল তা এখনও জানা যায়নি।

তারপর ওই চিঠি।

পুরন্দর চৌধুরী, সুজাতা দেবী ও রজতবাবু প্রত্যেকেই চিঠি পেয়ে এখানে আসছেন।

চিঠির তারিখ কবেকার ?

তিনখানি চিঠিই মিঃ বসাকের পকেটে ছিল। ঘরের আলো জ্বেলে তিনখানি চিঠিই পকেট থেকে টেনে বের করলেন মিঃ বসাক।

আজ মাসের সতের তারিখ। ১৬ই তারিখে রাত্রি একটা থেকে সোয়া একটার মধ্যে বিনয়েন্দ্র নিহত হয়েছেন। এবং চিঠি লেখার তারিখ দেখা যাচ্ছে ১২ই।

হঠাৎ মনে হয় সুজাতা দেবী বা রজতবাবুর হয়তো চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হয়ে এখানে আজ এসে পৌছনো সম্ভবপর হয়েছে, কিন্তু পুরন্দর চৌধুরীর পক্ষে সিঙ্গাপুরে চিঠি পেয়ে আজ সকালেই এসে পৌছনো সম্ভব হল কি করে ?

হঠাৎ এমন সময় খুট করে একটা অস্পষ্ট শব্দ মিঃ বসাকের কানে এল।

চকিতে শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁর সজাগ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলেন মিঃ বসাক।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তে।

সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকেন মিঃ বসাক।

স্পষ্ট শুনেছেন তিনি খুট করে একটা শব্দ—মৃদু কিন্তু স্পষ্ট।

মুহূর্ত পরে আবার সেই মৃদু অথচ স্পষ্ট শব্দটা শোনা গেল।

মুহূর্তকাল অতঃপর বসাক কি যেন ভাবলেন, তারপরই এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে হাত দিয়ে চেপে ধরে ধীরে ধীরে ঘরের খিলটা খুলে দরজাটা ফাঁক করে বারান্দায় দৃষ্টিপাত করলেন।

লম্বা টানা বারান্দাটা ক্ষীণ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট না হলেও বেশ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল।

আবার সেই শব্দটা শোনা গেল।

তাকিয়ে রইলেন মিঃ বসাক।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, তৃতীয় ঘর থেকে সর্বাঙ্গ একটা সাদা চাদরে আবৃত দীর্ঘকায় একটা মূর্তি যেন পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রুদ্ধশ্বাসে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকেন মিঃ বসাক সেই দিকে।

॥ চৌদ্দ ॥

আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে আবৃত দীর্ঘ মূর্তিটি ঘর থেকে বের হয়ে ক্ষণেকের জন্য মনে হল যেন বসাকের বারন্দায় দাঁড়িয়ে বারান্দাটার এক প্রান্ত হতে অন্য এক প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিল সতর্কভাবে।

তারপর ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে তাঁরই ঘরের দিকে যেন এগিয়ে আসতে লাগল সেই মূর্তি।

বারান্দায় যেটুকু ক্ষীণ চাঁদের আলো আসছিল তাও হঠাৎ যেন অন্তর্হিত হয়। বোধ হয় মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছে।

মিঃ বসাক তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে।

মূর্তিটা খুব অস্পষ্ট দেখা যায়, এগিয়ে আসছে।

অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে মিঃ বসাক অগ্রবর্তী মূর্তির দিকে নজর রাখলেন। ক্রমশঃ

পায়ে পায়ে মূর্তি দাঁড়াল ঠিক গিয়ে ল্যাবরেটারী ঘরের বন্ধ দরজার সামনে।

মিঃ বসাকের মনে পড়ল বাড়িতে আর বড় মজবুত তালা না খুঁজে পাওয়ায় একতলা ও দোতলার সংযোজিত সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেটটাতে ওই ল্যাবরেটারী ঘরের দরজার তালাটাই রাত্রে খুলিয়েই লাগিয়েছিলেন রামচরণকে দিয়ে।

ল্যাবোরেটারীটা এখন খোলাই রয়েছে।

দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল অত্যন্ত মৃদু হলেও স্পষ্ট। মূর্তি ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হল।

কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন রুদ্ধশ্বাসে ইন্সপেক্টার বসাক।

তারপর ঘর থেকে বের হয়ে এগিয়ে গেলেন ল্যাবরেটারী ঘরের দরজাটার পা টিপে অতি সন্তর্পণে।

দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন, তারপর পকেট থেকে রুমালটা বের করে দরজার কড়া দুটো সেই রুমাল দিয়ে বেশ শক্ত করে গিঁট দিয়ে বাঁধলেন।

এবং সোজা নিজের ঘরে ফিরে এসে তাঁর ঘর ও বিনযেন্দ্রর শয়নঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে সেই শয়নঘরে প্রবেশ করলেন। পকেটে পিস্তল ও শক্তিশালী একটা টর্চ নিতে ভুললেন না।

এ বাড়ির সমস্ত ঘর ও ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহ্ণেই তিনি ভাল করে সব পরীক্ষা করে জেনে নিয়েছিলেন।

বিনয়েন্দ্রর শয়নঘর ও ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা এবারে খুলে ফেলে ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলেন।

একটা আলোর সন্ধানী রশ্মি অন্ধকার ল্যাবরেটারী ঘরটার মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হচ্ছে। বুঝতে কষ্ট হল না বসাকের, ক্ষণপূর্বে যে বস্ত্রাবৃত মূর্তি ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে তারই হাতের সন্ধানী আলোর সঞ্চরণশীল রশ্মি ওটা।

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চললেন মিঃ বসাক ঘরের দেওয়ালের সুইচ বোর্ডটার দিকে। খুট্ করে সুইচ টেপার একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরের অন্ধকার অপসারিত হল।

অস্ফুট একটা শব্দ শোনা গেল।

নড়বেন না। দাঁড়ান—যেমন আছেন। কঠিন নির্দেশ যেন উচ্চারিত হল ইন্সপেক্টার বসাকের কণ্ঠ থেকে।

দিনের আলোর মতই সমস্ত ঘরটা চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাত্র হাত পাঁচেক ব্যবধানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত মূর্তি তখন। শ্বেতবস্ত্রে আবৃত যেন একটি প্রস্তরমূর্তি।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত কেটে গেল।

ইন্সপেক্টারই আবার কথা বললেন, পুরন্দরবাবু, ঘুরে দাঁড়ান।

পুরন্দর চৌধুরী ঘুরে দাঁড়ালেন। নিজেই গায়ের চাদরটা খুলে ফেললেন।

বসুন পুরন্দরবাবু, কথা আছে আপনার সঙ্গে। বসুন ওই টুলটায়।

পুরন্দর চৌধুরী যেন যন্ত্রচালিতের মতই সামনের টুলটার উপরে গিয়ে বসলেন।

ঘরে একটা আরামকেদারা একপাশে ছিল, সেটা টেনে এনে সামনাসামনি উপবেশন করলেন ইন্সপেক্টার প্রশান্ত বসাক, তারপর প্রশ্ন শুরু করলেন।

এবারে বলুন শুনি, কেন এই মাঝরাত্রে চোরের মত লুকিয়ে এ ঘরে এসেছেন

ইন্সপেক্টার বসাক প্রশ্ন করা সত্ত্বেও পুরন্দর চৌধুরী চুপ করে রইলেন। কো জবাব দিলেন না।

পুরন্দরবাবু? আবার ডাকলেন মিঃ বসাক।

পুরন্দর চৌধুরী মুখ তুলে তাকালেন ইন্সপেক্টারের মুখের দিকে। তারপর যেন মনে হল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে এল।

কথা বললেন পুরন্দর চৌধুরী অতঃপর অত্যন্ত মৃদু শান্ত কণ্ঠে, আপনি কি ভাবছেন জানি না ইন্সপেক্টার। কিন্তু বিশ্বাস করুন বিনয়েন্দ্রকে আমি হত্যা করিনি। সে আমার বন্ধু ছিল। সেই কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি তো বলিনি মিঃ চৌধুরী যে আপনিই তাঁকে হত্যা করেছেন। জবাব দিলেন ইন্সপেক্টার শান্ত মৃদু কণ্ঠে।

বিশ্বাস করুন মিঃ বসাক, আমি নিজেও কম বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যাইনি তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে। পুরন্দর চৌধুরী আবার বলতে লাগলেন, চিঠিটা তার পাওয়ামাত্রই এরোপ্লেনে আমি রওনা হই—

কথার মাঝখানে হঠাৎ বাধা দিলেন ইন্সপেক্টার, কিন্তু সিঙ্গাপুরের প্লেন তো রাত দশটায় কলকাতায় পৌছয়। সে ক্ষেত্রে চিঠিটা জরুরী মনে করে চিঠিটা পাওয়া মাত্রই যদি রওনা হয়ে এসে থাকেন তো সেই রাত্রেই সোজা এখানে আপনার বন্ধুর কাছে চলে না এসে পরের দিন সকালে এলেন কেন মিঃ চৌধুরী?

ইন্সপেক্টারের আকস্মিক প্রশ্নে পুরন্দর চৌধুরী সত্যিই মনে হল কেমন যেন

একটু বিব্রত বোধ করেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে বিব্রত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন, অত রাত্রে আর এসে কি হবে, তাই রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন সকালেই চলে আসি।

যদি কিছু না মনে করেন তো কোন্ হোটেলে রাত্রে উঠেছিলেন?

হোটেল স্যাভয়ে।

হুঁ। আচ্ছা মিঃ চৌধুরী?

বলুন।

একটা কথা আপনি শুনেছেন, বিনয়েন্দ্রবাবুর নামে নিয়মিতভাবে সিঙ্গাপুর থেকে কিসের একটা পার্সেল আসত?

হ্যাঁ।

আপনি বলতে পারেন সে পার্সেল সম্পর্কে কিছু? সিঙ্গাপুরে কার কাছ থেকে র্সেলটা আসত? আপনিও তো সিংগাপুরেই থাকেন।

পুরন্দর চৌধুরী চুপ করে থাকেন।

কি, জবাব দিচ্ছেন না যে? পার্সেলটা সম্পর্কে আপনি তাহলে কিছু জানেন বোধ হয়?

পার্সেলটা আমিই পাঠাতাম তাকে। মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন পুরন্দর চৌধুরী বারে।

আপনি! আপনিই তাহলে পার্সেলটা পাঠাতেন!

হ্যাঁ।

ও, তা কি পাঠাতেন পার্সেলের মধ্যে করে, জানতে পারি কি?

একটা tonic।

টনিক! কিসের tonic পাঠাতেন মিঃ চৌধুরী বন্ধুকে আপনার?

পুরন্দর চৌধুরী আবার চুপ করে থাকেন।

মিথ্যে আর সব কথা গোপন করবার চেষ্টা করে কোনই লাভ নেই পুরন্দরবাবু। আপনি না বললেও সব কথা আমরা সিঙ্গাপুর পুলিসকে তার করলেই তারা খোঁজ নিয়ে আমাদের জানাবে।

একপ্রকার মাদক দ্রব্য তার মধ্যে থাকত।

মাদক দ্রব্য! হুঁ, আমি ওই রকমই কিছু অনুমান করেছিলাম রামচরণের মুখে সব কথা শুনে। কিন্তু কি ধরনের মাদক দ্রব্য তার মধ্যে থাকত বলবেন কি?

দু-তিন রকমের বুনো গাছের শিকড়, বাকল আর—

আর—আর কি থাকত তার মধ্যে?

সর্প-বিষ।

কি? কি বললেন?

সর্প-বিষ। স্নেক-ভেনম্।

আপনি! আপনি পাঠাতেন সেই বস্তুটি! তাহলে আপনিই বোধ হয় বন্ধুটিকে আপনার ওই বিষের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন?

কতকটা হ্যাঁও বটে, আবার নাও বলতে পারেন।

মানে?

তাহলে আপনাকে সব কথা খুলে বলতে হয়।

বলুন।

ইন্সপেক্টার বসাকের নির্দেশে পুরন্দর অতঃপর যে কাহিনী বিবৃত করলেন যেমন বিস্ময়কর তেমনি চমকপ্রদ।

॥ পনের ॥

আই. এস-সি. ও বি. এস-সি.-তে এক বছর কলকাতার কলেজে পুরন্দর চৌধুরী ও বিনয়েন্দ্র সহপাঠী ছিলেন।

সেই সময়েই উভয়ের মধ্যে নাকি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়।

উভয়েরই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ধৈর্য বা একনিষ্ঠতা যা বিনয়েন্দ্রর চরিত্রে সবচাইতে বড় গুণ ছিল, সে দুটির একটিও ছিল না পুরন্দরের চরিত্রে।

শুধু তাই নয়, পুরন্দরের চিরদিনই প্রচণ্ড একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যেমন করেই হোক, যে কোন উপায়ে বড়লোক বা ধনী হবার। ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে পুরন্দর মানুষ হয়েছিলেন এক গরীব কেরানী মাতুলের আশ্রয়ে।

থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই হঠাৎ সেই মাতুল মারা গেলেন। সংসার হল অচল। পুরন্দরের পড়াশুনাও বন্ধ হল।

কলেজ ছেড়ে পুরন্দর এদিক-ওদিক কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোথাও বিশেষ কিছু সুবিধা হল না।

এমন সময় হঠাৎ ডকে এক জাহাজের মেটের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পুরন্দরের আলাপ হয়।

ইদ্রিস মিঞা।

বর্মা মুলুকে গিয়ে অনেকের বরাতের চাকা নাকি ঘুরে গেছে। এ ধরনের দু-চারটে সরস গল্প এ-ওর কাছে পুরন্দর চৌধুরী শোনা অবধি ওই সময় প্রায়ই তিনি ডক অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, যদি কাউকে ধরে কোনমতে জাহাজে চেপে বিনা পয়সায় সেই সব জায়গায় যাওয়া যায় একবার।

কোনক্রমে একবার সেখানে গিয়ে সে পৌছতে পারলে সে ঠিক তার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরিয়ে দেবে।

ইদ্রিস মিঞা জাহাজে বয়লারের খালাসীর চাকরি দিয়ে বর্মায় নিয়ে যাবার নাম করে পুরন্দরকে। পুরন্দর সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান এবং নির্দিষ্ট দিনে জাহাজে উঠে পড়েন। সেবার জাহাজটা চায়নায় যাচ্ছিল মাল নিয়ে। জাহাজটা ছিল মালটানা জাহাজ। কার্গো জাহাজ। জাহাজটা সিঙ্গাপুর ঘুরে যাচ্ছিল, সিঙ্গাপুরে থামতেই পুরন্দর কিন্তু বন্দরে নেমে গেলে আর উঠলেন না জাহাজে, কেন না, দিন দশেক বয়লার ঘরের প্রচণ্ড তাপের মধ্যে কয়লা ঠেলে ঠেলে হাতে ফোস্কা তো পড়েছিলই, শরীরও প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল গরমে আর পরিশ্রমে। হাতে মাত্র পাঁচটি টাকা, গায়ে খালাসীর নীল পোশাক। পুরন্দর পথে পথে ঘুরতে লাগলেন যা হোক কোন একটা চাকরির সন্ধানে।

কিন্তু একজন বিদেশীর পক্ষে চাকরি পাওয়া অত সহজ নয়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন হোটেলে এক বাঙালী প্রৌঢ়ের সঙ্গে আলাপ হয়। শোনা গেল, সেও নাকি একদা এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে সিঙ্গাপুরে। সেই তাকে এক রবার গুডসের ফ্যাক্টরীতে চাকরি করে দেয়। এবং সেখানেই আলাপ হয় বছর দেড়েক বাদে এক চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে। নাম তার লিং সিং।

লিং সিংয়ের দেহে পুরোপুরি চীনের রক্ত ছিল না। তার মা ছিল চীনা, আর বাপ ছিল অ্যাংলো মালয়ী। শহরের মধ্যেই লিং সিংয়ের ছিল একটা কিউরিও শপ। লোকজনের মধ্যে লিং সিং ও তার স্ত্রী—কু-সি। দুজনেরই বয়স হয়েছে।

শহরের একটা হোটেলে সাধারণতঃ যেখানে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই যাতায়াত করত, লিং সিং-ও সেখানে যেত। পুরন্দর চৌধুরীও সেই হোটেলে মধ্যে মধ্যে যেতেন। সেইখানেই আলাপ হয় দুজনের।

লিং সিংকে মধ্যে মধ্যে পুরন্দর চৌধুরী কোথাও একটা ভাল চাকরি করে দেবার জন্ম বলতেন।

লিং সিং আশ্বাস দিত সে চেষ্টা করবে।

শেষে একদিন লিং সিং তাঁকে বললে, সত্যিই যদি সে চাকরি করতে চায় তো যেন সে আজ সন্ধ্যার পর তার কিউরিও শপে যায়। ঠিকানা দিয়ে দিল লিং সিং পুরন্দরকে তার দোকানের।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর পুরন্দর লিং সিংয়ের কিউরিও শপে গেলেন তার সঙ্গে দেখা করতে।

এ-কথা সে-কথার পর লিং সিং এক সময় বললে, সে এবং তার স্ত্রী দুজনেরই বয়স হয়েছে। তাদের কোন ছেলেমেয়ে বা আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। তারা একজন পুরন্দরের মতই বিশ্বাসী ও কর্মঠ লোক খুঁজছে, তাদের দোকানে থাকবে, দোকান দেখাশোনা করবে, খাওয়া থাকা ছাড়াও একশো ডলার করে মাসে মাইনে পাবে।

মাত্র পঞ্চাশ ডলার করে মাইনে পাচ্ছিলেন পুরন্দর ফ্যাক্টরীতে; সান তিনি রাজী হয়ে গেলেন। এবং পরের দিন থেকেই লিং সিংয়ের কিউরিও কাজে লেগে গেলেন।

তারপর? মিঃ বসাক শুধালেন।

তারপর?

হ্যাঁ।

॥ ষোল ॥

পুরন্দর চৌধুরী আবার বলতে লাগলেন।

মাসখানেকের মধ্যেই পুরন্দর চৌধুরী দেখলেন এবং বুঝতেও পারলেন, লিং সিংয়ের দোকানটা বাইরে থেকে একটা কিউরিও শপ মনে হলেও এবং সেখানে বহু বিচিত্র খরিদ্দারদের নিত্য আনাগোনা থাকলেও, আসলে সেটা একটা কোন দুষ্প্রাপ্য অথচ রহস্যপূর্ণ চোরাই মাদক দ্রব্য কারবারেরই আড্ডা।

লিং সিংয়ের কিউরিওর বেচা-কেনাটা একটা আসলে বাইরের ঠাট মাত্র। এবং চোরাই মাদক দ্রব্যের কারবারটাই ছিল লিং সিংয়ের আসল কারবার। কিন্তু সদা সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেও পুরন্দর কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত জানতেই পারেননি যে, লিং সিংয়ের সেই মাদক দ্রব্যটি আসলে কি? এবং কোথায় তা রাখা হয় বা কি ভাবে বিক্রি করা হয়।

মধ্যে মধ্যে পুরন্দর কেবল শুনতেন, এক-আধজন খরিদ্দার এসে বলত আসল সিঙ্গাপুরী মুক্তা চায়।...

লিং সিং তখন তাঁকে দোতলায় তার শয়নঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একটি কামরার মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিত। মিনিট পনের-কুড়ি পরে খরিদ্দার ও লিং সিং কামরা থেকে বের হয়ে আসত।

অবশেষে পুরন্দরের কেমন যেন সন্দেহ হয় ওই সিঙ্গাপুরী মুক্তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য রয়েছে। নচেৎ ওই মুক্তার ব্যাপারে লিং সিংয়ের অত সতর্কতা কেন।

ফলে পুরন্দর কাজ করতেন, কিন্তু তাঁর সজাগ সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা মেলে রাখতেন যেমন করেই হোক সিঙ্গাপুরী আসল মুক্তা রহস্যটা জানবার জন্য।

আরও একটা ব্যাপার পুরন্দর লক্ষ্য করেছিলেন, লিং সিংয়ের কিউরিও শপে কেনা যা হত, সেটা এমন বিশেষ কিছুই নয় যার দ্বারা লিং সিংয়ের একটা টা রকমের আয় হতে পারে। এবং লিং সিংয়ের অবস্থা যে বেশ সচ্ছল, সেটা াতে অন্ধেরও কষ্ট হত না।

পুরন্দর চৌধুরী লক্ষ্য করেছিলেন, মুক্তা সন্ধানী যারা সাধারণতঃ কিউরিও শপে লিং সিংয়ের কাছে আসত তারা সাধারণতঃ স্থানীয় লোক নয়।

. মালয়, জাভা, সুমাত্রা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি জায়গা থেকেই সব খরিদ্দারেরা আ.. ।

তারা আসত জাহাজে চেপে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে থাকত না তারা।

পুরন্দর চৌধুরী চাকরি করতেন বটে লিং সিংয়ের ওখানে, কিন্তু একতলা ছেড়ে দোতলায় ওঠবার তাঁর কোন অধিকার ছিল না। লিং সিংয়ের বউই সাধারণতঃ নীচে পুরন্দরের খাবার পৌঁছে দিয়ে যেত প্রত্যহ।

যেদিন তিনি আসতেন না, যে ছোকরা মালয়ী চাকরটা ওখানে কাজ করত সেই-ই নিয়ে আসত তাঁর খাবার।

এমনি করে দীর্ঘ আট মাস কেটে গেল।

এমন সময় হঠাৎ লিং সিং অসুস্থ হয়ে পড়ল ক'দিন। লিং সিং আর নীচে নামে না। পুরন্দর একা একাই লিং সিংয়ের কিউরিও শপ দেখাশোনা করেন।

সকাল থেকেই সেদিন আকাশটা ছিল মেঘলা, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পুরন্দর একা কাউণ্টারের ওপাশে বসে একটা ইংরেজী নভেল পড়ছেন। এমন সময় দীর্ঘকায় এক সাহেবী পোশাক পরিহিত, মাথায় ফেল্টক্যাপ, গায়ে বর্ষাতি এক আগন্তুক এসে দোকানে প্রবেশ করল।

গুড মর্ণিং !

পুরন্দর বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন। আগন্তুকের তামাটে মুখের রঙ সাক্ষ্য দিচ্ছে বহু রৌদ্র-জলের ইতিহাসের। মুখে তামাটে রঙের চাপদাড়ি।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল, লিং সিং কোথায় ?

পুরন্দর বললেন, যা বলবার তিনি তার কাছেই বলতে পারেন, কারণ লিং সিং অসুস্থ।

আগন্তুক বললে, তার কিছু সিঙ্গাপুরী মুক্তার প্রয়োজন।

সিঙ্গাপুরী মুক্তা ! সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব পুরন্দরের মনের মধ্যে স্থান পায়।

আগন্তুককে অপেক্ষা করতে বলে পুরন্দর এগিয়ে গিয়ে দরজার পাশে কলিং বেলটা টিপলেন।

একটু পরেই লিং সিংয়ের স্ত্রীর মুখ সিঁড়ির উপরে দেখা গেল।

পুরন্দর বললেন, তোমার স্বামীকে বল সিঙ্গাপুরী মুক্তার একজন খরি এসেছে।

খানিক পরে লিং সিংয়ের স্ত্রী এসে আগন্তুক ও পুরন্দর দুজনকেই উপরে ডে নিয়ে গেল লিং সিংয়ের শয়নঘরে। এই সর্বপ্রথম লিং সিংয়ের বাড়ির দোতলা উঠলেন পুরন্দর এখানে আসবার পর। শয্যার উপরে লিং সিং শুয়ে ছিল।

পুরন্দরের সামনেই লিং সিং তার শয্যার তলা থেকে একটা চৌকো ...ঠের বাক্স বের করে ডালাটা খুলতেই পুরন্দর দেখলেন সত্যিই বাক্সে ভর্তি ছোট ছোট সব সাদা মুক্তা। একটা প্যাকেটে করে কিছু মুক্তা নিয়ে পরিবর্তে একগোছা নোট গুনে দিয়ে আগন্তুক চলে গেল।

সেই রাত্রেই আবার পুরন্দরের ডাক এল লিং সিংয়ের শয়নঘরে দোতলায়।

আমাকে ডেকেছ ?

হ্যাঁ, বসো। শয্যার পাশেই লিং সিং একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিল পুরন্দরকে বসবার জন্য।

পুরন্দর বসলেন।

ঘরের মধ্যে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। বাইরে শুরু হয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। ঘরের বন্ধ কাচের জানলা সেই হাওয়ায় থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

লিং সিংয়ের পায়ের কাছে তার প্রৌঢ়া স্ত্রী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঈষৎ হলদে চ্যাপ্টা মুখে বাতির আলো কেমন ম্লান দেখায়।

দেখ পুরন্দর, লিং সিং বলতে লাগল, তোমাকে আমি এখানে এনেছিলাম সামান্য ঐ একশো ডলার মাইনের চাকরির জন্যে নয়। আমার এবং আমার স্ত্রীর বয়স হয়েছে, ক্রমশঃ দেহের শক্তিও আমাদের কমে আসছে। আমাদের কোন ছেলেপিলে নেই। তাই আমি এমন একজন লোক কিছুদিন থেকে খুঁজছিলাম যাকে পুরোপুরি আমরা বিশ্বাস করতে পারি। হোটেলে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তোমার উপরে আমার নজর পড়েছিল। তোমাকে আমি যাচাই করছিলাম। দেখলাম, তোমার মধ্যে একটা সৎ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কষ্টসহিষ্ণু মানুষ আছে। আমাদেরও একজন দেখাশোনা করবার মত সৎ ও বিশ্বাসী লোক চাই। মনে হল, তোমাকে দিয়ে হয়তো আমাদের সে আশা যেন মিটতে পারে। চাকরি দিয়ে তোমাকে তাই নিয়ে এলাম। দীর্ঘ আটমাস কে দিনের পর দিন আমি পরীক্ষা করেছি। বুঝেছি, লোক নির্বাচনে ঠকি নি।

এই পর্যন্ত একটানা কথাগুলো বলে লিং সিং পরিশ্রমে যেন হাঁপাতে লাগল।

পুরন্দর বললেন, লিং সিং, তুমি এখন অসুস্থ। পরে এসব কথা হবে। আজ ক।

আমার যা বলবার আজই আগাগোড়া সব তোমাকে আমি বলব বলেই তকে এনেছি এখানে। শোন পুরন্দর। কিওরিও শপটাই আমার আসল ব্যবসা নয়। আমার আসল ব্যবসাটি হচ্ছে বিচিত্র এক প্রকার মিশ্র মাদক দ্রব্য বেচা। বিশেষ সেই দ্রব্যটি এমনি প্রক্রিয়ায় তৈরী যে, একবার তাতে মানুষ অভ্যস্ত হলে পরবর্তী জীবনে আর তাকে ছাড়তে পারবে না। এবং তখন যে কোন মূল্যের বিনিময়েও তাকে সেই মাদক দ্রব্যটি সংগ্রহ করতেই হবে। বিশেষ ঐ বিচিত্র মাদক দ্রব্যটির তৈরীর প্রক্রিয়া আমি শিখেছিলাম আমার ঐ স্ত্রীর বাপের কাছ থেকে। মরবার আগে সে আমাকে প্রক্রিয়াটি শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেইটি তোমাকে আমি শিখিয়ে দিয়ে যাব, কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যতদিন আমরা বেঁচে থাকব আমাদের দেখাশোনা তুমি করবে। আমাদের মৃত্যুর পর অবশ্য তুমি হবে সব কিছুর মালিক।

পুরন্দর জবাবে বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দেখব। তুমি আমাকে বিশেষ ওই মাদক দ্রব্য তৈরীর প্রক্রিয়া শিখিয়ে না দিলেও তোমাদের আমি দেখতাম এবং দেখবও।

আমি জানি পুরন্দর। তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি বলেই তোমাকে

আমার ঘরে এনে আমি স্থান দিয়েছি, হ্যাঁ শোন, যে মাদক দ্রব্যটির কথা বলছিলাম তারই নাম সিংগাপুরী মুক্তা। কয়েক প্রকার বুনো গাছের ছাল, শিকড়, আফিং ও সর্পবিষ দিয়ে তৈরী করতে হয় সেই বিশেষ আশ্চর্য মাদক দ্রব্যটি। এবং পরে জিলাটিন দিয়ে কোটিং দিয়ে তাকে মুক্তার আকার দিই।

পুরন্দর চৌধুরী বলতে লাগলেন, লিং সিংয়ের মৃত্যুর পর সেই মাদক দ্রব্য বেচে আমি অর্থোপার্জন করতে লাগলাম।

ঐভাবে ব্যবসা করতে করতে একদিন আমার মনে হল, শুধু ঐ সিংগাপুরে বসে কেন, আমি তো মধ্যে মধ্যে কলকাতা এসেও ঐ মাদক দ্র ব্যবসা করতে পারি। তাতে করে আমার আয় আরও বেড়ে যাবে। এ কলকাতা। কলকাতায় এসেই কয়েকটি শাঁসালো পুরাতন বন্ধুকে খুঁজে খুঁজে করলাম। যাদের অর্থ আছে, শখ আছে। ঠিক সেই সময় একদিন মার্কে বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে বহুকাল পরে আমার দেখা হল।

বহুদিন পরে দুই পুরোন দিনের বন্ধুর দেখা। সে আমায় তার এই বাড়িতে টেনে নিয়ে এলো। দেখলাম বিনয়েন্দ্র প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে তার মাতামহের দৌলতে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, এই বিনয়েন্দ্রকে যদি আমি গাঁথতে পারি তো বেশ মোটা টাকা উপার্জ্জন করতে পারব। বিনয়েন্দ্র দিবারাত্রই বলতে গেলে তার গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। এবং প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় বলে রাত্রে শয়নের পূর্বে সে সামান্য একটু ড্রিঙ্ক করত। তাকে বোঝালাম, নেশাই যদি করতে হয় তো লিকার কেন। লিকার বড় বদ নেশা। ক্রমে ক্রমে লিভারটি একেবারে নষ্ট করে ফেলবে। বিনয়েন্দ্র তাতে জবাব দিল, কি করি ভাই বল। শুধু যে পরিশ্রমের জন্যই আমি ড্রিঙ্ক করি তা নয়। যতক্ষণ নিজের গবেষণা ও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, বেশ থাকি। কিন্তু নির্জন অবসর মুহূর্তগুলি যেন কাটতেই চায় না। নিজের এমন একাকীত্ব যেন জগদ্দল পাথরের মত আমাকে চেপে ধরে। আপন জন থেকেও আমার কেউ নেই। জীবনে বিয়ে-থা করি নি, একদিন যারা ছিল আমার আপনার, যাদের ভালবেসে, যাদের নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম, যাদের আঁকড়ে ধরে ভেবেছিলাম এ জীবনটা কাটিয়ে দেব, তারাও আজ আমাকে ভুল

বুঝে দূরে সরে গিয়েছে। দেখা করা তো দূরে থাক, একটা খোঁজ পর্যন্ত তারা আমার নেয় না, বেঁচে আছি কি মরে গেছি। এও একপক্ষে আমার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। না হলে দাদামশাই বা তাঁর উইলটা বিচিত্র করে যাবেন কেন! আর করেই যদি গেলেন তো তারাই বা আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরে যাবে কেন! আমাকে অনাত্মীয়ের মত ত্যাগ করবে কেন! অথচ তারা ছাড়া তো আমার এ সংসারে আপনার জনও আর কেউ নেই। আমার মৃত্যুর পর তারাই তো সব কিছু পাবে। সবই হবে, অথচ আমি যতদিন বেঁচে থাকব তারা আমার কাছেও আসবে না। এই সব নানা কারণেই ড্রিঙ্ক করে আমি ভুলে থাকি অবসর সময়টা। আমি তখন তাকে বললাম, বেশ তো, ঐ লিকার ছাড়া ভুলে থাকবার আরও পথ আছে। তখন আমিই নিজের তাগিদে তাকে .পুরী মুক্তার সঙ্গে পরিচয় করালাম। প্রথমটায় অনিচ্ছার সঙ্গেই সে আমার .বে ঠিক রাজী নয়, তবে নিমরাজী হয়েছিল। পরে হল সে ক্রমে ক্রমে আমার তদাস। সম্পূর্ণ আমার মুঠোর মধ্যে সে এল। ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করতে করলাম। কলকাতায় তিনখানা বাড়ি তো গেলই—নগদ টাকাতেও টান ড়ল তার।

বসাক পুরন্দর চৌধুরী বর্ণিত কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। লোকটা শুধু শয়তানই নয়, পিশাচ। অবলীলাক্রমে সে তার দুষ্কৃতির নোংরা কাহিনী বর্ণনা করে গেল।

পুরন্দর চৌধুরী তাঁর কাহিনী শেষ করে নিঃশব্দে বসেছিলেন।

ধীরে ধীরে আবার একসময় মাথাটা তুললেন, অর্থের নেশায় বুঁদ হয়ে অন্যায় ও পাপের মধ্যে বুঝতে পারে নি এতদিন যে, আমার সমস্ত অন্যায়, সমস্ত দুষ্কৃতি একজনের অদৃশ্য জমাখরচের খাতায় সব জমা হয়ে চলেছে। সকল কিছুর হিসাবনিকাশের দিন আমার আসন্ন হয়ে উঠেছে। কড়ায় গণ্ডায় সব—সব আমাকে শোধ দিতে হবে।

কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে পুরন্দর চৌধুরীর গলাটা ধরে এল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন তিনি বুকের মধ্যের উদ্বেলিত ঝড়টাকে একটু প্রশমিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, জন্মের পর জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখ ও দারিদ্র্য আমার পদে পদে পথ রোধ

করেছে। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক অর্থ উপার্জন করতেই হবে। আশ্রয়দাতা লিং সিংয়ের দয়ায় সেই অর্থ যখন আমার হাতে এল, বাংলা দেশে এসে বেলাকে আমি বিবাহ করে সঙ্গে করে সিংগাপুরে নিয়ে গেলাম।

বেলা আমার প্রতিবেশী গাঁয়ের এক অত্যন্ত গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে। বেলাকে আমি ভালবাসতাম এবং বেলাও আমাকে ভালবাসত। চিরদিনের মত শেষবার গ্রামে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে যখন চলে আসি, তাকে বলে এসেছিলাম, যদি কোনদিন ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে ফেলতে পারি এবং তখনও সে যদি আমার জন্য অপেক্ষা করে তো ফিরে এসে তাকে আমি তখন বিয়ে করব।

কলকাতা ছাড়বার চার বছর পরে ভাগ্য যখন ফিরল বেলার বাবাকে একটি চিঠি দিলাম। চিঠির জবাবে জানলাম, বেলার বাপ মারা গেছে, সে তখন তার এক দূর-সম্পর্কীয় কাকার সংসারে দাসীবৃত্তি করে দিন কাটাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে এলাম কলকাতায় ও গ্রামে গিয়ে বেলাকে বিবাহ করলাম।

জীবন আমার আনন্দে ভরে উঠল। দু'বছর বাদে আমাদের খোকা হল সুখের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠল। ভেবেছিলাম, এমনি করেই বুঝি আনন্দ আর সৌভাগ্যের মধ্যে বাকি জীবনটা আমার কেটে যাবে।

বেলা কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমাকে বলতো, ওই মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ছেড়ে দিতে। কিন্তু দুষ্কৃতির নেশা তখন মদের নেশার মতই আমার দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে গিয়েছে। তা থেকে তখন আর মুক্তি কোথায়! তাছাড়া পাপের দণ্ড। কতকজনকে হৃতসর্বস্ব করেছি, কতকজনকে জোঁকের মত শুষে শুষে রক্তশূন্য করে তিলে তিলে চরম সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি, তার ফল ভোগ করতে হবে না!

আবার একটু থেমে যেন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পুরন্দর বলতে লাগলেন, পূর্বেই আপনাকে বলেছি ইনস্পেক্টার, ওই সিংগাপুরী মুক্তা তৈরী করবার জন্য সর্পবিষ বা স্নেক-ভেনমের প্রয়োজন হতো। সেই কারণে জ্যান্ত সাপই খাঁচায় রেখে দিতাম।

সাপের বিষ-থলি থেকে বিষ সংগ্রহ করতাম। সিংগাপুরে ভাল বিষাক্ত সাপ তেমন মিলত না বলে জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিয়োর জঙ্গল থেকে বিষধর সব সাপ একজন চীনা মধ্যে মধ্যে ধরে এনে আমার কাছে বিক্রি করে যেত। সেবারে সে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ দিয়ে গেল। অত বড় জাতের গোখরো

ইতিপূর্বে আমি বড় একটা দেখি নি। খাঁচার মধ্যে সাপটার সে কি গর্জন। মনে হচ্ছিল ছোবল দিয়ে খাঁচাটা বুঝি ভেঙেই ফেলবে।

চীনাটা বারবার আমাকে সতর্ক করে গিয়েছিল যে সাপটা একটু নিস্তেজ না হওয়ায় আগে যেন তার বিষ সংগ্রহের আমি চেষ্টা না করি।

উপরের তলার একটা ছোট ঘরে সিংগাপুরী মুক্তা তৈরীর সব মালমশলা ও সাপের খাঁচাগুলো থাকত। সাধারণতঃ সে ঘরটা সর্বদা তালা দেওয়াই থাকতো।

যে দিনকার কথা বলছি সে দিন কি কাজে সেই ঘরে ঢুকছি এমন সময় একজন খরিদ্দার আসায় তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেছি এবং তাড়াহুড়ায় সেই র তালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি। খরিদ্দারটি আমার অনেক দিনকার াশোনা। সে মধ্যে মধ্যে এসে অনেক টাকার মুক্তা নিয়ে যেত। সে বললে, ুনি তার সঙ্গে যেতে হবে একটা হোটেলে। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের ঙ্গ আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে, যে লোকটি আমার সঙ্গে মুক্তার কারবার রতে চায়। গাড়ি নিয়েই এসেছিল খরিদ্দারটি। আমার স্ত্রী রান্নাঘরে ছিল, ল খরিদ্দারটির সঙ্গে বের হয়ে গেলাম।

হবার সময়ও ভুলে গেলাম যে সেই ঘরটায় তালা দিতে হবে। ফিরতে প্রায় ঘণ্টা দুই দেরী হয়ে গেল। যে কাজে গিয়েছিলাম তাতে সফল হয়ে পকেট ভর্তি নোট নিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম এবারে আর মাসকয়েক কারবার করে স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসব এবং কারবার একেবারে গুটিয়ে ফেলব। কিছুদিন থেকেই বেলা বলছিল কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য। এখানে তার কোন সঙ্গী সাথী ছিল না, একা একা। তার দিন যে খুব কষ্টে কাটে তা বুঝতে পেরেছিলাম।

বাড়িতে ঢুকেই উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম, বেলা! বেলা!

কিন্তু বেলার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বাচ্চা চাকরটা আমার ডাক শুনে উপর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। দেখবেন চলুন।

সে বেচারীও কিছু জানত না। বেলা তাকে কি কিনতে যেন বাজারে পাঠিয়েছিল, সে আমার মিনিট পনের আগে মাত্র ফিরেছে।

চাকরটার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে উপরে গেলাম।

কি থেকে কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সে-ও জানে না, আমিও আজ পর্যন্ত

জানি না। তবে যে ঘরে সাপগুলো থাকত সে ঘরে ঢুকে দেখি, বেলা আর খোকন মেঝেতে মরে পড়ে আছে।

সর্বাঙ্গ তাদের নীল হয়ে গেছে। আর নতুন কেনা গোখরো সাপটা যে খাঁচার মধ্যে ছিল, সেটা মেঝেতে উল্টে পড়ে আছে এবং সেই সাপটা ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

কয়েকটা মুহূর্ত আমার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না।

ঘটনার আকস্মিকতায় ও আতঙ্কে আমি যেন একদম বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

কাঁদবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাঁদতে পারলাম না।

সমস্ত জীবনটাই এক মুহূর্তে আমার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার যেন একেবারে শেষ হয়ে গেল। গত সাত বছর এই যে তিলে তিলে অর্থ সংগ্রহ করে ভাগ্যকে জয় করবার দুস্তর প্রচেষ্টা সব—যেন মনে হল শেষ হয়ে গেছে।

বেলাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে জীবন আমার ভরে গিয়েছিল। জীবনে খো[illegible] এনেছিল এক অনাস্বাদিত আনন্দ, এক মুহূর্তে ঈশ্বর যেন তাদের দুজনকে আ[illegible] কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে জগতের সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব ও রি[illegible] ভিক্ষুকেরও অধম করে দিয়ে গেলেন। সমস্ত দিন সেই দুটি বিসর্জন[illegible] মৃতদেহকে সামনে নিয়ে হতবাক, মুহ্যমানের মত বসে রইলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল।

ছোকরা চাকরটাও বোধ হয় কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। উপরের সিঁড়িতে রেলিংয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ধীরে ধীরে মৃতদেহের পাশ থেকে এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে বেলা ও খোকনের। পুলিস জানতে পারলে ময়না ঘরে টেনে নিয়ে যাবে। নিষ্ঠুরের মত ডাক্তার বেলার ঐ দেহে এবং আমার এত সাধের খোকনের নবনীত ঐ দেহে ছুরি চালাবে। সহ্য করতে পারব না।

তারপর শুধু তাই নয়, ক্রিমেশন গ্রাউণ্ডে নিয়ে গিয়ে তাদের শেষ কাজ করতে হবে। তার জন্যও তো কোন ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। এবং আরও আছে, জানাজানি হলে ব্যাপারটা পুলিস আসবে। তখন নানা গোলমালও শুরু হবে। তার চাইতে এই বাড়ির উঠানেই মা ও ছেলেকে মাটির নিচে শুইয়ে রেখে দিই।

আমার জীবনের সবচাইতে দুটি প্রিয়জন আমার বাড়ির মধ্যেই মাটির নিচে শুয়ে থাক। ঘুমিয়ে থাক।

চাকরটাকে জাগিয়ে নীচে নেমে এলাম।

কখন এক সময় বৃষ্টি থেমে গেছে। বর্ষণক্লান্ত আকাশে এখনও এদিক-ওদিক টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি তারা উঁকি দিচ্ছে।

চাকরটার সাহায্যে দুজনে মিলে উঠানের এক কোণে যে বড় ইউক্যালিপটাস গাছটা ছিল তার নীচে পাশাপাশি দুটি গর্ত খুঁড়লাম। তারপর সেই গর্তের মধ্যে শুইয়ে দিলাম বেলা আর খোকনকে।

মাটি চাপা দিয়ে গর্ত দুটো যখন ভরাট হয়ে গেল, তখন রাত্রি-শেষের আকাশ ফিকে আলোয় আসন্ন প্রভাতের ইঙ্গিত জানাচ্ছে।

তারপর সাতটা দিন সাতটা রাত কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেল তেও পারলাম না। সমস্ত জীবনটাই যেন মিথ্যা হয়ে গেছে। কিছুই আর ল লাগে না। আর কি হবে এই দূর দেশে একা একা পড়ে থেকে। ব্যবসা-পত্র ব বন্ধ করে দিয়েছি।

মাঝে মাঝে খরিদ্দার এলে তাদের ফিরিয়ে দিই।

দোকান সর্বদা বন্ধই থাকে।

র যখন এই রকম অবস্থা, উত্তরপাড়া থেকে বিনয়েন্দ্রর চিঠি পেলাম। জরুরী চিঠি চলে আসবার জন্য।

পরের দিনই প্লেনে একটা সীট পেয়ে গেলাম। রওনা হয়ে পড়লাম। মনে মনে ঠিক করলাম, এখানে এসে একটা ব্যবস্থা করে দু-চারদিনের মধ্যেই আবার সিঙ্গাপুর ফিরে সেখানকার সব কাজ-কারবার বন্ধ করে চিরদিনের মত এখানে চলে আসব।

কিন্তু হায়! তখন কি জানতাম যে, এখানে এসে এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাব!

এই পর্যন্ত বলে পুরন্দর চৌধুরী যেন একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস কোনমতে রোধ করলেন।

॥ আঠেরো ॥

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার এক সময় পুরন্দর চৌধুরী বললেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না ইন্সপেক্টার, সত্যি কথা বলতে কি, এ দুর্ঘটনা কি করে ঘটল।। আপনি বলছেন, বিনয়েন্দ্রকে কেউ হত্যা করেছে। কিন্তু আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না বিনয়েন্দ্রকে কেউ হত্যা করতে পারে। এ যেন কেমন অবিশ্বাস্য বলে এখনও আমার মনে হচ্ছে।

কেন বলুন তো? ইন্সপেক্টার প্রশ্ন করলেন।

প্রথমতঃ বিনয়েন্দ্রকে আমি খুব ভাল করেই জানতাম। ইদানীং বি... আমার প্ররোচনায় মুক্তার নেশায় জড়িয়ে পড়েছিল সত্য, কিন্তু ওই একটি ... নেশার বদ অভ্যাস ছাড়া তার চরিত্রে আর কোন দোষই তো ছিল না। মিতভাষ... সংযমী, স্নেহপ্রবণ, সমঝদার এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক ছিল সে। এবং যতদ... জানি, তার কোন শত্রুও এ দুনিয়ায় কেউ ছিল বলে তো মনে হয় না। তা... জীবনের অনেক গোপন কথাও আমার অজানা নয়—তবু বলব, তাকে ... হত্যা করতে পারে এ যেন সম্পূর্ণই অবিশ্বাস্য।

আচ্ছা পুরন্দরবাবু, ইন্সপেক্টার প্রশ্ন করলেন, এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য রামচরণের মুখে যে বিশেষ একটি মহিলার কথা শুনলাম, তার সম্পর্কে কোন কিছু আপনি বলতে পারেন?

কি আপনি ঠিক জানতে চাইছেন ইন্সপেক্টার?

কথাটা আমার কি খুব অস্পষ্ট বলে বোধ হচ্ছে পুরন্দরবাবু?

মিঃ বসাকের কথায় কিছুক্ষণ পুরন্দর চৌধুরী তাঁর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, না ইন্সপেক্টার।

আপনি যা সন্দেহ করছেন বিনয়েন্দ্রর সে রকম কোন দুর্বলতাই ছিল না।

প্রত্যুত্তরে এবারে ইন্সপেক্টার আর কোন কথা বললেন না, কেবল মৃদু একটা হাসি তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠল।

পুরন্দর চৌধুরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না ইপেক্টারের ওষ্ঠপ্রান্তের ক্ষীণ হাসির আভাসটা।

তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না ইন্সপেক্টার। কিন্তু সত্যিই আমি বলছি দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আমাদের।

তাকে আমি খুব ভালভাবেই জানতাম। স্ত্রীলোকের ব্যাপারে তার, সত্যি বলছি, কোন প্রকার দুর্বলতাই ছিল না।

এবারে মৃদু কণ্ঠে বসাক বললেন, তবু আপনার কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলাম না পুরন্দরবাবু।

কেন বলুন তো?

নেশার কাছে যে মানুষ নিজেকে বিক্রি করতে পারে তার মধ্যে আর যে গুণই থাক না কেন, নারীর প্রতি তার দুর্বলতা কখনও জাগবে না এ যেন বিশ্বাস করতেই মন চায় না। কিন্তু যাক সে কথা। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, সেই মিস্টিরিয়াস স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা।

বেশী জানবার অবকাশও আমার হয়নি। কারণ বেশীক্ষণ তাকে দেখবার অবকাশও হয়নি এবং তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও আমি পাইনি।

আপনি তাকে এ বাড়িতে দেখেছিলেন তা হলে?

হ্যাঁ।

কবে?

দেড়েক আগে বিশেষ একটা কাজে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে কলকাতায় আস... য় সেই সময়।

তাহলে মাসদেড়েক আগে আপনি আর একবার কলকাতায় এসেছিলেন এর আগে?

হ্যাঁ।

তারপর?

সেই সময় রাত, বোধ করি, তখন দশটা হবে। বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসি।

অত রাত্রে এসেছিলেন যে?

পরের দিনই ভোরের প্লেনে চলে যাব, তাছাড়া সমস্ত দিনটাই কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই রাত্রে ছাড়া সময় করে উঠতে পারিনি।

আচ্ছা, আপনি যে সে দিন রাত্রে এসেছিলেন এ বাড়িতে রামচরণ জানত?

হ্যাঁ। জানে বৈকি। সে-ই তো আমার আসার সংবাদ বিনয়েন্দ্রকে দেয় রাত্রে।

যাক। তারপর বলুন।

বিনয়েন্দ্র আমাকে এই ঘরেই ডেকে পাঠায়। ইদানীং বৎসর খানেক ধরে

বিনয়েন্দ্র একটা বিশেষ কি গবেষণা নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থাকত, কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলাম—

এই পর্যন্ত বলে পুরন্দর চৌধুরী যেন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

বলুন। থামলেন কেন ?

এই ঘরে ঢুকে দেখলাম ঘরের এক কোণে একটা আরাম-কেদারার উপর বিনয়েন্দ্র গা এলিয়ে দিযে চোখ বুজে পড়ে আছে। আর একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণী অ্যাপ্রন গায়ে ঐ টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছেন হাতে একটা তরল পদার্থপূর্ণ টেস্ট টিউব নিয়ে। আমার প্রবেশ ও' পদশব্দ পেয়েও বিনয়েন্দ্র কোন সাড়া না দেওয়ায় আমিই তার সামনে এগিয়ে গেলাম। ডাকলাম, বিনু !

কে ? ও, পুরন্দর। এস। তারপর কী সংবাদ ? বলে অদূরে ক তরুণীকে সম্বোধন করে বললে, লতা, সল্যুশনটা হল ?

সম্বোধিতা তরুণী বিনয়েন্দ্রর ডাকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, না। এ সেডিমেণ্ট পড়ছে।

কথাটা বলে তরুণী আবার নিজের কাজে মনঃসংযোগ করলেন।

বস পুরন্দর। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বিনয়েন্দ্র বললে।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় বিনয়েন্দ্রর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

চোখ দুটো বোজা। সমস্ত মুখখানিতে যেন একটা ক্লান্ত অবসন্নতা। চোখ খুলে যেন তাকাতেও তার কষ্ট হচ্ছে।

বুঝতে আমার দেরি হল না, আমারই জোগান দেওয়া সিংহলী মুক্তার নেশায় আপাততঃ বিনয়েন্দ্র বুঁদ হয়ে আছে।

শুধু তাই নয়, মাসচারেক আগে শেষবার যে বিনয়েন্দ্রকে আমি দেখেছিলাম এ যেন সে বিনয়েন্দ্র নয়। তার সঙ্গে এর প্রচুর প্রভেদ আছে।

আরো একটু কৃশ, আরো একটু কালো হয়েছে সে। চোখের কোলে একটা কালো দাগ গভীর হয়ে বসেছে। কপালের দুপাশে শিরাগুলো একটু যেন স্ফীত। নাকটা যেন আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেন জানি না ঠিক ঐ মুহূর্তে বিনয়েন্দ্রকে দেখে আনন্দ হওয়ার চাইতে মনে আমার একটু যেন দুঃখই হল।

বুঝলাম, পুরোপুরি ভাবেই আজ বিনয়েন্দ্র নেশায় কবলিত। এর আগে

দেখেছি, সে রাত বারটা সাড়ে বারটার পর শুতে যাবার পূর্বে সাধারণতঃ নেশা করত কিন্তু এখন দেখছি সে সময়ের নিয়ম-পালন বা মর্যাদা আর অক্ষুণ্ণ নেই। এতদিন নেশা ছিল তার সময়বাঁধা, ইচ্ছাধীন। এখন সেই হয়েছে নেশার ইচ্ছাধীন। নেশার গ্রাসে সে আজ কবলিত।

বিনয়েন্দ্র আমাকে বসতে বললে বটে, কিন্তু তার তখন আলোচনা কিছু করবার বা কথা বলবার মত অবস্থা নয়।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার ডাকলাম, বিনু!

অ্যাঁ? অতি কষ্টে যেন চোখ মেলে তাকাল বিনয়েন্দ্র। তারপর বললে, তুমি তো রাতটা আছ। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও। কাল সকালে শুনব তোমার

...লাম, না, রাত্রে আমি থাকব না। এখুনি চলে যাব।

ও, চলে যাবে। যাও—এবারে কিছু বেশী করে পার্শেল পাঠিয়ে দিও তো, টা দুটোয় আজকাল আর শানাচ্ছে না হে।

বিনয়েন্দ্রর কথায় চমকে উঠলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ফিরে তাকালাম ...শায়মান সেই তরুণীর দিকে।

...র দিকে তাকাতেই স্পষ্ট দেখলাম, সে যেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল, অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। সে যে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল বুঝতে আমার কষ্ট হল না।

নেশার ঘোরে আবার হয়তো বেফাঁস কি বলে বসবে বিনয়েন্দ্র, তাই আর দেরি না করে ফিরে আসবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বিনয়েন্দ্র আবার চোখ মেলে তাকিয়ে বললে, চললে নাকি পুরন্দর?

হ্যাঁ। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। তাছাড়া কাল খুব ভোরে আমার প্লেন ছাড়ছে।

তা যাও। তবে বলছিলাম—

কী?

দামটা কিছু কমাও না। একেবারে যে চীনে জোঁকের মত শুষে নিচ্ছ। এমন বেকায়দায় তুমি ফেলবে জানলে কোন্ আহম্মক তোমার ঐ ফাঁদে পা দিত!

ছেড়ে দিলেই তো পার। কথাটা কেমন যেন আমার আপনা থেকেই মুখ দিয়ে হঠাৎ বের হয়ে গেল।

কি বললে! ছেড়ে দেব? হ্যাঁ, এইবার খাঁটি ব্যবসাদারী কথা বলেছ।

কি করব, অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই নেশাটা ছাড়তে পারলাম না। নইলে দেখিয়ে দিতাম তোমায়।

বিনয়েন্দ্রর কথায় দুঃখও হল, হাসিও পেল।

কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ঘরের মধ্যে উপস্থিত ঐ মুহূর্তে তৃতীয় ব্যক্তিটি আর যাই করুক, কাজের ভান করলেও তার সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় প্রখর করে আমাদের উভয়ের কথাগুলো শুনছে।

তাড়াতাড়ি তাই কথা আর না বাড়তে দিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম।

দরজা বরাবর এসে কি জানি কেন নিজের কৌতূহলকে আর দাবিয়ে রাখতে পারলাম না। ফিরে তাকালাম।

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম একজোড়া শাণিত ছুরির ফলার মত দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ। দরজা খুলে বের হয়ে এলাম, কিন্তু মনে হতে লাগল, সেই শাণিত ফলার মত চোখের দৃষ্টিটা যেন আমার পিছনে পিছনে আসছে।

কথাগুলো একটানা বলে পুরন্দর চৌধুরী থামলেন।

তারপর ?

তারপর ? আবার বলতে শুরু করলেন, সেই কয়েক মুহূর্তের জ দেখেছিলাম। আর দেখিনি। এবং ঐ কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখাই। ।রচয় হয়নি। এবং পরিচয়ের অবকাশও ঘটেনি। তারপর তো এবারে এসে শুনলাম, কিছুদিন আগে হঠাৎ তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

এবারে ইন্সপেক্টার কথা বললেন, যাক। তবু সেই মিষ্টিরিয়াস ভদ্রমহিলাটির নামের একটা হদিস পাওয়া গেল। আর একটা কথা মিঃ চৌধুরী ?

বলুন।

এত রাত্রে আপনি এ ঘরে এসেছিলেন কেন চোরের মত গোপনে, সন্তর্পণে ?

সবই যখন আপনাকে বলেছি সেটুকু বলবারও আমার আর আপত্তি থাকবার কি থাকতে পারে ইন্সপেক্টার। বুঝতেই হয়তো পারছেন, আমি এসেছিলাম সেই সিংহলী মুক্তা যদি এখনও কিছু অবশিষ্ট পড়ে থাকে তো সেগুলো গোপনে সরিয়ে ফেলবার জন্য। কারণ মাত্র দিন কুড়ি আগে একটা পার্সেল ডাকযোগে আমি পাঠিয়েছিলাম। ঠিক আমার স্ত্রী ও পুত্র যেদিন সর্পাঘাতে মারা যায় তারই আগের দিন সকালবেলা।

পুরন্দর চৌধুরীর কথা শুনে ইন্সপেক্টার কয়েকটা মুহূর্ত আবার ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, কিন্তু আপনার মুখেই একটু আগে

শুনেছি মিঃ চৌধুরী, সেগুলো এমনি হঠাৎ দেখলে কারও পক্ষেই সাধারণ বড় আকারের মুক্তা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবা সম্ভব নয় ; তবে আপনি সেগুলো সরাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন ? আর এ ঘরেই যে সেগুলো পাবেন তাই বা আপনি ভাবলেন কি করে ?

এ তো খুব স্বাভাবিক ইন্সপেক্টার। এই ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যেই তার বেশীর ভাগ সময় দিন ও রাত্রি কাটত। তাছাড়া এই ঘরে আলমারিতে তার গবেষণার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ওষুধপত্র থাকত, সেদিক দিয়ে সেগুলো এখানে রাখাই তো স্বাভাবিক।

হুঁ। একেবারে অসম্ভব নয়।

আর তাছাড়া হঠাৎ ওষুধপত্রের মধ্যে ঐ মুক্তা জাতীয় বস্তুগুলো কেউ দেখতে ...লিসের পক্ষে সন্দেহ জাগাও কি স্বাভাবিক নয় ?

...ন্দর চৌধুরীর যুক্তিটা খুব ধারালো না হলেও ইন্সপেক্টার আর কোন তর্কের ...গেলেন না। ইতিমধ্যে রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

...লা জানালাপথে অন্ধকারমুক্ত আকাশের গায়ে আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে। ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে দুজনে বাইরের বারান্দায় এসে ... বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই ঝিরঝিরে প্রথম ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া জাগরণ... চোখে-মুখে যেন স্নিগ্ধ চন্দনস্পর্শের মত মনে হল ইন্সপেক্টারের।

ক্ষণপূর্বে শোনা পুরন্দর চৌধুরীর বিচিত্র কাহিনীটা তখনও তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সত্যিই পুরন্দর চৌধুরীর কাহিনী বিচিত্র।

বাড়ির কেউ হয়তো এখনও জাগেনি। সকলেই যে যার শয্যায় ঘুমিয়ে।

পুরন্দর চৌধুরীকে সত্যিই বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তিনি ইন্সপেক্টারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীর মন্থর পদে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি মাথার মধ্যে তখনও যেন কেমন দপ দপ করছে। একাকী দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ইন্সপেক্টার আগাগোড়া সমগ্র ঘটনাটা যেন পুনরায় ভাববার চেষ্টা করতে লাগলেন। এবং তখনও সেই চিন্তার সবটুকু জুড়েই যেন পুরন্দর চৌধুরীর বর্ণিত কাহিনীটাই আনাগোনা করতে থাকে।

বিনয়েন্দ্র রায়ের হত্যার ব্যাপারটা মিঃ বসাক যতটা সহজ ভেবেছিলেন, এখন

যেন ক্রমেই মনে হচ্ছে ততটা সহজ নয়। রীতিমত জটিল।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে কেটে যাচ্ছিল দিন, অবিবাহিত বিনয়েন্দ্রর এবং একটিমাত্র রহস্যময়ী নারীর মাস দুয়েকের সংস্পর্শ ব্যতীত অন্য কোন নারীঘটিত ব্যাপারের কোন হদিসই আপাততঃ পাওয়া যাচ্ছে না। এবং সেই রহস্যময়ী নারীটির সঙ্গে তার কতখানি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং আগে কোন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কিনা তারও কোন সঠিক সংবাদ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বিনয়েন্দ্রর অর্থের অভাব ছিল না। এবং বিশেষ করে ব্যাচিলর অবস্থায় প্রচুর অর্থ হাতে থাকায় সাধারণতঃ যে দুটি দোষ সংক্রামক ব্যাধির মতই সঙ্গে দেখা দেয় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারী ও নেশা, তার প্রথমটি সম্পর্কে কোন কিছু এখন পর্যন্ত সঠিক না জানা গেলেও শেষোক্তটি সম্পর্কে জানা যাচ্ছে সে-ব্যাধিটির কবলিত বেশ রীতিমত ভাবেই হয়েছিলেন বিনয়েন্দ্র। এবং সে ব্যাপারের জন্য মূলতঃ তারই অন্যতম কলেজ-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঐ পুরন্দর চৌধুরী।

পুরন্দর চৌধুরী!

সঙ্গে সঙ্গেই যেন নতুন করে আবার পুরন্দর চৌধুরীর চিন্তাটা মনের জেগে ওঠে ইন্সপেক্টারের। লোকটার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, ধূর্ত, সতর্ক এবং সুবিধাবাদী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

প্রথম দিকে ভদ্রলোক একেবারেই মুখ খোলেননি বা খুলতে চাননি।

অতর্কিতে ল্যাবরেটারী ঘরে রাত্রির অভিসারে ধরা পড়ে গিয়েই তবে মুখ খুলেছেন। এবং শুধু মুখ খোলাই নয়, বিচিত্র এক কাহিনীও শুনিয়েছেন।

লোকটা কিন্তু তথাপি এত সহজ বা সরল মনে হচ্ছে না ইন্সপেক্টারের।

সহসা এমন সময় ইন্সপেক্টারের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল সিঁড়িতে একটা দ্রুত স্খলিত পদশব্দ শুনে। কে যেন সিঁড়িপথে উঠে আসছে।

ফিরে তাকালেন ইন্সপেক্টার সিঁড়ির দিকে।

॥ উনিশ ॥

যে ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভোরের আলোয় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল সে আর কেউ নয় ঐ বাড়িরই একজন ভৃত্য রেবতী।

রেবতীর চোখে মুখে একটা স্পষ্ট ব্যস্ততা ও আতঙ্ক।

রেবতীই কথা বললে প্রথমে উত্তেজিত কণ্ঠে, ইন্সপেক্টার সাহেব, রামচরণ বোধ হয় মারা গেছে।

কথাটা শুনেই মিঃ বসাক রীতিমত যেন চমকে ওঠেন। তাঁর বিস্মিত কণ্ঠ হতে আপনা হতেই যে কথাগুলো বের হয়ে এল, মারা গেছে রামচরণ! সে কি!

হ্যাঁ। আপনি একবার শীগগিরই নীচে চলুন।

চল্ তো দেখি।

কোনরূপ সময়ক্ষেপ না করে রেবতীর পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন ইন্সপেক্টার। একতলার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরটির দরজাটা তখনও খোলাই ছিল।

রেবতীই প্রথমে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল খোলা দরজাপথে।

মিঃ বসাক তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

ঘরের আলোটা তখনও জ্বলছে। যদিও পশ্চাতের বাগানের দিককার খোলা জানালাপথে ভোরের পর্যাপ্ত আলো ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে।

ভোরের সেই স্পষ্ট আলোয় যে দৃশ্যটি ইন্সপেক্টারের চোখে পড়ল ঘরে প্রবেশ করেই, তা যেমন বীভৎস তেমনি করুণ।

...র প্রায় লাগোয়া একটা চৌকির উপরে রামচরণের দেহটা চিত হয়ে পড়ে আছে।

মুখটা দরজার দিকেও একটু কাত হয়ে আছে।

চোখের পাতা খোলা, চোখের মণি দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে এসেছে।

মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। এবং সেই দ্বিধাবিভক্ত, হাঁ করা ওষ্ঠের প্রান্ত বেয়ে নেমে এসেছে লালামিশ্রিত ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা।

সমস্ত মুখখানা যেন নীল হয়ে আছে। খালি গা, পরিধানে একটি পরিষ্কার ধুতি, প্রসারিত দুটি বাহু শয্যার উপরে মুষ্টিবদ্ধ।

প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় সে দেহে প্রাণ নেই।

কয়েকটা মুহূর্ত সেই বীভৎস দৃশ্যের সামনে নির্বাক স্থাণুর মতই দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ বসাক।

এ যেন সেই গতকাল সকালের বীভৎস করুণ দৃশ্যেরই হুবহু পুনরাবৃত্তি।

আশ্চর্য, চব্বিশ ঘণ্টাও গেল না প্রথম বাড়ির মালিক তারপর বাড়ির পুরাতন ভৃত্য সম্ভবতঃ একই ভাবে নিষ্ঠুর হত্যার কবলিত হল।

কে জানত গতকাল রাত্রে এগারটার সময় সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে যে লোকটা

সকলের শয়নের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়ে বিদায় নিয়ে এসেছিল তার মৃত্যু এত নিকটে ঘনিয়ে এসেছে !

কে জানত মৃত্যু তার একেবারে ঠিক পশ্চাতে এসে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়েছে ! প্রসারিত করেছে তার করাল বাহু !

আকস্মিক ঘটনা পরিস্থিতির বিহ্বলতাটা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টার তাঁর প্রায় পার্শ্বেই দণ্ডায়মান রেবতীর দিকে।

রেবতী, কখন তুমি জানতে পেরেছ এই ব্যাপারটা ?

সকালে উঠেই এ ঘরে ঢুকে।

সকালে উঠেই এ ঘরে এসেছিলে কেন ?

উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করব কিনা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল ?

হ্যাঁ। তবে কপাট দুটো ভেজানো ছিল।

রামচরণ কি সাধারণতঃ ঘরের দরজা খুলেই শুত রেবতী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি কোন্ ঘরে থাক ?

ঠিক এর পাশের ঘরটাতেই।

কাল রাত্রে শেষ কখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রামচরণের, রেবতী?

কত রাত তখন ঠিক আমি বলতে পারব না, আপনাদের খাওয়াদাওয়ার পরই রামচরণ রান্নাঘরে আসে, আমি তখন রান্নাঘর পরিষ্কার করছিলাম। আমাকে ডেকে বললে, তার শরীরটা নাকি তেমন ভাল নয়, আর ক্ষুধাও নেই, সে শুতে যাচ্ছে।

বলেছিল তার শরীরটা ভাল নয় ?

হ্যাঁ। অবিশ্যি কথাটা শুনে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম সাহেব।

কেন বল তো ?

তা আজ্ঞে, আজ পাঁচ বছর হল এ বাড়িতে আমি আছি, কখনও তো রামচরণকে অসুস্থ হতে দেখিনি। তবে কাল রাত্রে বোধ হয়—

কথাটা সম্পূর্ণ শেষ না করে যেন একটু ইতস্ততঃ করেই থেমে গেল রেবতী।

কাল রাত্রে বোধ হয় কী রেবতী ? চুপ করলে কেন ?

আজ্ঞে, রামচরণ নেশা করত।

নেশা করত ? কতকটা যেন চমকিত ভাবেই ইন্সপেক্টার প্রশ্নটা করলেন

রেবতীকে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল সিংহলী মুক্তার কথা।

প্রভু ভৃত্য দুজনেই কি তবে মুক্তার নেশায় অভ্যস্ত ছিল নাকি!

কি নেশা করত রামচরণ?

আজ্ঞে, রামচরণ আফিং খেত।

আফিং! কথাটা বলে মিঃ বসাক তাকালেন রেবতীর মুখের দিকে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধ্যার দিকে তাকে রোজ একটা মটরের দানার মত আফিং খেতে দেখতাম। তবে কাল রাত্রে বোধ হয় তার আফিংয়ের মাত্রাটা একটু বেশীই হয়েছিল আমার মনে হয়।

কি করে বুঝলে?

কাল যেন রামচরণের একটু ঝিমঝিম ভাব দেখেছি।

ইন্সপেক্টার কিছুক্ষণ অতঃপর চুপ করে কি যেন ভাবলেন।

তারপর আবার প্রশ্ন শুরু করলেন, তুমি তো পাশের ঘরেই ছিলে রেবতী. কোনরকম শব্দ বা গোলমাল কিছু শুনেছ?

আজ্ঞে না।

কোন কিছুই শোননি?

কাল কত রাত্রে শুতে গিয়েছিলে ঘরে?

রামচরণ কথা বলে চলে আসবার পরই খাওয়াদাওয়া সেরে এসে শুয়ে পড়ি।

॥ কুড়ি ॥

একটা চাদর দিয়ে রামচরণের মৃতদেহটা ঢেকে রেবতীকে নিয়ে ইন্সপেক্টার বসাক ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

দরজাটা বন্ধ করে রেবতীকে বললেন, ঠাকুর আর করালীকে ডেকে নিয়ে তুমি ওপরে এস রেবতী।

দোতলায় এসে ইন্সপেক্টার দেখলেন মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। উভয়ের চোখাচোখি হল। দোহারা চেহারা হলেও বেশ বলিষ্ঠ গঠন ভদ্রলোকের।

মাথার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বেশ মসৃণ চকচকে একখানি টাক।

মাথার বাকি অংশে যে কেশ তাও বিরল হয়ে এসেছে

উঁচু খাঁড়ার মত নাক। প্রশস্ত কপাল। ভাঙা গাল, গালের হনু দুটো যেন 'ব'য়ের আকারে ঠেলে উঠেছে। গোল গোল চোখ। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের সেলুলয়েডের চশমা। পুরু লেন্সের ওধার হতে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক। উপরের ওষ্ঠ পুরু একজোড়া গোঁফে প্রায় ঢাকা বললেও অত্যুক্তি হয় না। নীচের পুরু কালচে বর্ণের ওষ্ঠটা যেন একটু উল্টে আছে। পুরুষ্টু গোঁফের অন্তরাল হতেও দেখা যায় উপরের. দাঁতের সারি। উঁচু দাঁত। পরিধানে ধুতি ও গলাবন্ধ মুগার চায়না কোট। পায়ের চকচকে কালো রংয়ের ডার্বি শু।

আপনি? প্রথমেই প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টার।

আমার নাম প্রতুল বোস। এ বাড়ির সরকার। আপনি বোধ হয় পুলিসের কেউ হবেন?

হ্যাঁ। পুলিস ইন্সপেক্টার প্রশান্ত বসাক।

গেটেই পুলিস প্রহরী মোতায়েন দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। মুখেই একটু আগে সব শুনে এলাম, কিন্তু ব্যাপারটা যে কিছুতেই এখনও করে উঠতে পারছি না ইন্সপেক্টার। সত্যই কি বিনয়েন্দ্রবাবুকে কেউ করেছে?

হ্যাঁ। ব্যাপারটা যতই অবিশ্বাস্য হোক, সত্যি। আর শুধু তাই নয় প্রতুলবাবু, গত রাত্রে ইতিমধ্যেই আরও একটি হত্যাকাণ্ড এ বাড়িতে সংঘটিত হয়েছে।

তার মানে! কী আপনি বলছেন ইন্সপেক্টার? আবার কাকে কে হত্যা করল কাল রাত্রে এ বাড়িতে!

কে হত্যা করেছে তা জানি না। তবে হত্যা করেছে এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্যকে।

কে! রামচরণ!

হ্যাঁ। সে-ই নিহত হয়েছে।

এ সব আপনি কি বলছেন ইন্সপেক্টার! বাড়ির চার পাশে পুলিস প্রহরী, আপনি নিজে উপস্থিত ছিলেন এখানে; এমন দুঃসাহস!

দুঃসাহসই বটে প্রতুলবাবু।

ইন্সপেক্টার বসাকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজা খুলে প্রথমে রজত ও তারপরেই সুজাতা যে-যার নির্দিষ্ট ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে

দাঁড়াল।

বসাকের শেষের কথাটা রজতের কানে গিয়েছিল, সে এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করল, কি দুঃসাহসের কথা বলছিলেন ইন্সপেক্টার ?

এই যে রজতবাবু! আসুন—কাল রাত্রেও আবার একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এ বাড়িতে।

সে কি! অর্ধস্ফুট আর্ত চিৎকারে কথাটা বলে রজত, আবার! আবার কে নিহত হল ?

রামচরণ।

রামচরণ!

হ্যাঁ।

সুজাতার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে সজল চোখে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এবং হঠাৎ যেন কেমন তার মাথা ঘুরে ওঠে। ঢুলে পড়ে যাচ্ছিল সুজাতা, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সঙ্গে ইন্সপেক্টার বসাক চকিতে এগিয়ে এসে দু'হাত বাড়িয়ে সুজাতার পতনোন্মুখ দেহ সযত্নে ধরে ফেললেন।

কী হল সুজাতা! সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে রজতও। সুজাতার দু চোখের পাতা যেন নিমীলিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল। ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টার বসাক পাঁজা-কোলে সুজাতার শিথিল দেহটা প্রায় বুকের উপর তুলে নিয়ে এগিয়ে যান সামনের খোলা দরজাপথে ঘরের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে খাটের উপরে পাতা শয্যাটার উপরে এসে সযত্নে ইন্সপেক্টার সুজাতার দেহটা শুইয়ে দিলেন।

রজত পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টার বললেন, দেখুন তো ঘরের কোণে ঐ কুঁজোতে বোধ হয় জল আছে।

কুঁজোর পাশেই একটা কাচের গ্লাস ছিল, প্রতুলবাবুই গ্লাসে করে তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে জল ঢেলে এনে দিলেন।

কী হল! একজন ডাক্তার কাউকে ডাকলে হত না? রজত ব্যগ্র কণ্ঠে বলে।

গ্লাস থেকে জল নিয়ে শায়িত সুজাতার চোখে-মুখে জলের মৃদু ঝাপটা দিতে দিতে সুজাতার নিমীলিত চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ইন্সপেক্টার বসাক বললেন, না। ব্যস্ত হবেন না রজতবাবু। একে গতকালের ব্যাপার থেকে

হয়তো স্ট্রেন যাচ্ছিল, তার উপর আজকের নিউজটা একটা শক্ দিয়েছে। তাই হয়তো জ্ঞান হারিয়েছেন। আপনি বরং পাখার সুইচটা অনুগ্রহ করে অন্ করে দিন।

রজত এগিয়ে গিয়ে পাখার সুইচটা অন্ করে দিল।

মৃদু মিষ্টি একটা ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করছে। জলবিন্দু-শোভিত কোমল চারু কপালটি, তার আশেপাশে চূর্ণকুন্তলের দু'-এক গাছি স্থানভ্রষ্ট হয়ে জলের সঙ্গে কপালে জড়িয়ে গিয়েছে। নিমীলিত আঁখির জলসিক্ত পাতা দুটি মৃদু মৃদু কাঁপছে। বাম গণ্ডের উপরে কালো ছোট্ট তিলটি।

অনিমেষে চেয়ে থাকেন ইন্সপেক্টার বসাক মুখখানির দিকে। শুধু কি মুখখানিই! নিটোল চিবুক, ঠিক তার নীচে শঙ্খের মত সুন্দর গ্রীবা। গ্রীবাকে বেষ্টন করে চিকচিক করছে সরু সোনার একটি বিছে হার। গলাকাটা ব্লাউজের সীমানা ভেদ করে থেকে থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে—সুধাভরা দুটি স্বর্ণকুম্ভ।

চোখের দৃষ্টি যেন ঘুরিয়ে নিতে পারেন না ইন্সপেক্টার বসাক। সত্যিই \ বুঝি সুপ্রভাত।

সব কিছু ভুলে গিয়ে যেন ইন্সপেক্টার চেয়ে রইলেন বসে সেই মুখখানি

এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে কম্পিত ভীরু চোখের পাতা দুটি খুলে তাকাল সুজাতা।

সুজাতা দেবী! স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকেন ইন্সপেক্টার বসাক।

বিভ্রান্ত বেশ ঠিক করে উঠে বসবার চেষ্টা করে সুজাতা, কিন্তু বাধা দেন ইন্সপেক্টার বসাক, উঠবেন না, আর একটু শুয়ে থাকুন। চলুন রজতবাবু, আমরা বাইরে যাই। উনি একটু বিশ্রাম নিন।

ইন্সপেক্টার বসাকের ইঙ্গিতে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিলেন বসাক।

॥ একুশ ॥

গত রাত্রে নীচের তলায় যে ঘরে বসে সকলের কথাবার্তা হয়েছিল ইন্সপেক্টার বসাক সেই ঘরেই এসে প্রতুল বোস ও রজতকে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

রেবতীর মুখেই ইতিমধ্যে সংবাদটা ড্রাইভার করালী, পাচক লছমন ও দরোয়ান ধনবাহাদুর জানতে পেরেছিল।

তারাও এসে দরজার বাইরে ভিড় করে দাঁড়ায় ইতিমধ্যে। ঐ সঙ্গে প্রহরারত একজন বাঙালী কনেস্টবল মহেশও দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

সর্বাগ্রে মহেশকে ডেকে মিঃ বসাক থানায় রামানন্দ সেনকে তখুনি একটা সংবাদ দিতে বললেন, সংবাদ পাওয়া মাত্রই নীল কুঠীতে চলে আসবার জন্য।

দেহটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

রেবতীকে যা জিজ্ঞাসাবাদ করবার করা হয়ে গিয়েছিল বলে ইন্সপেক্টার বসাক ই ডাকলেন লছমনকে। লছমন সাধারণতঃ একটু ভীতু প্রকৃতির লোক। উপরে রেবতীর মুখে রামচরণের খুন হবার সংবাদ পাওয়া অবধি সে যেন ধ্যেই ছিল না। ইন্সপেক্টারের আহ্বানে সে যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল তার গলা দিয়ে স্বর বেরুবার মত অবস্থাও তখন আর তার নেই।

নাম কি তোর?

গোটা দুই ঢোঁক গিলে কোনমতে লছমন নামটা তার উচ্চারণ করে।

কাল রাত্রে কখন শুতে গিয়েছিলি?

লছমনের যদিও মুঙ্গের জিলায় বাড়ি, দশ বছর বাংলাদেশে থেকে বেশ ভালই বাংলা ভাষাতে কথাবার্তা বলতে পারে।

সে আবার কোনমতে একটা ঢোঁক গিলে বললে, রাত এগারোটার পরই হবে সাহেব।

শুনলাম, কাল রাত্রে নাকি রামচরণ কিছু খায়নি সত্যি

হ্যাঁ সাহেব। রামচরণ কাল রাত্রে কিছুই খায়নি।

কেন খায়নি জানিস কিছু?

না। বলতে পারি না সাহেব।

রামচরণ রোজ আফিম খেত, জানিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি তাকে খেতে।

তুই দেখেছিস ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হুঁ, কাল রাত্রে তুই একটানাই ঘুমিয়েছিলি না এক-আধবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ?

একবার মাঝরাত্রে উঠেছিলাম বাইরে যাবার জন্য।

সেই সময় কোন শব্দ বা কিছু শুনেছিস ?

আজ্ঞে—

লছমন যেন কেমন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

এবারে একটু চড়া স্বরে মিঃ বসাক বললেন, চুপ করে রইলি কেন? যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দে।

আজ্ঞে আমি যখন বাইরে থেকে ঘুরে আবার ঘরে ঢুকতে যাব—

কী? আবার থামল দেখ। বল্—

তখন যেন মনে হল কে একজন সাদা চাদরে গা ঢেকে রামচরণের ঘর থেকে বের হয়ে রান্নাঘরের সামনে যে সরু ফালি বারান্দাটা সেই দিকে চট্ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভয়ে বাবু তখন আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি কোনমতে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল তুলে দিই।

কেন, ভেবেছিলি বুঝি ভূত ?

আজ্ঞে সাহেব। গত মাসখানেক ধরে রামচরণের মুখে যে শুনেছি—

কি শুনেছিস ?

বুড়োকর্তাবাবু নাকি ভূত হয়ে এ বাড়িতে রাত্রে ঘুরে বেড়ায় মধ্যে মধ্যে।

কি বললি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বাবুও নাকি তাকে—ঐ বুড়োকর্তাবাবুর ভূতকে অনেক রাত্রে উপরের বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন।

রামচরণ তোকে ঐ কথা বলেছিল ?

হ্যাঁ।

শুধু তোদের কর্তাবাবুই বুড়োকর্তার ভূত দেখেছিলেন না তোরাও কেউ কেউ এর আগে দেখেছিস ?

আমি বা রামচরণ কখনও দেখিনি তবে করালী নাকি বার দু-তিন দেখেছিল।

ভূত তুই বিশ্বাস করিস ?

কি যে বলেন বাবু! সিয়ারাম! সিয়ারাম! ভূত প্রেত তেনারা আছেন

বৈকি !

রেবতী, করালী ওদের তোর কেমন লোক বলে মনে হয় ?

রেবতীও আমারই মত ভীতু বাবু, তবে করালীর খুব সাহস।

মৃদু হেসে ইন্সপেক্টার এবারে বললেন, আচ্ছা যা। করালীকে এ ঘরে পাঠিয়ে দে।

নমস্কার জানিয়ে লছমন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তার মুখ দেখে মনে হল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ইন্সপেক্টার বসাক লছমনকে প্রশ্ন করতে করতে তাঁর ডাইরীতে মধ্যে মধ্যে নোট করে নিচ্ছিলেন।

রজত স্তব্ধ হয়ে পাশেই একটা চেয়ারে বসেছিল।

এমন সময় আবার ঘরের বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ;ত গেলে স্থানীয় থানা-ইনচার্জ রামানন্দ সেন ঘরের মধ্যে এসে 'প্রবেশ করলেন।

॥ বাইশ ॥

আবার কি হল স্যার? রামানন্দ সেন প্রশ্ন করলেন।

এই যে মিঃ সেন, আসুন। বসুন—

মুখ তুলে আহ্বান জানালেন ইন্সপেক্টার রামানন্দ সেনকে।

রামানন্দ সেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

This time poor রামচরণ।

বলেন কি, মানে সেই বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য—সত্যি—

হ্যাঁ। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, কিছুটা এখন অবশ্য বুঝতে পারছি আমারই অসাবধানতার জন্যে বেচারীকে প্রাণ দিতে হল।

কি বলছেন স্যার !

ঠিকই বলছি মিঃ সেন। রামচরণের কথাবার্তা শুনেই কাল মনে হয়েছিল স্বেচ্ছায় আমার প্রশ্নের জেরায় পড়ে যতটুকু সে স্বীকার করেছে, সেটাই সব নয়। যে কোন কারণেই হোক অনেক কথাই সে গোপন করে গিয়েছে। তাই কাল মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম একদিনেই আর বেশি চাপ দেব না। আজ রইয়ে সইয়ে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করব। এবং আমার অনুমান যে একেবারে মিথ্যা নয়,

তার মৃত্যুই সেটা প্রমাণ করে দিয়ে গেল। তাই বলছিলাম কাল যদি একটু রামচরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতাম এবং তার উপরে আরো একটু নজর রাখতাম, তবে হয়তো এমনি কার তাকে নিহত হতে হত না।

আপনি কি বলতে চান স্যার বিনয়েন্দ্রবাবুর হত্যাকারীই তবে রামচরণকেও হত্যা করেছে!

নিশ্চয়ই। একই কালো হাতের কাজ। এবং এ বিষয়ও আমি স্থির নিশ্চয়ই যে বিনয়েন্দ্রর হত্যার ব্যাপার অনেক কিছু জানত বলেই সেই বেচারীকে হত্যাকারীর হাতে এইভাবে এত তাড়াতাড়ি প্রাণ দিতে হল। অনেক কথাই বিনয়েন্দ্রবাবু সম্পর্কে আমাকে সে গতকাল বলেছিল, আরও বেশী কিছু না প্রকাশ করে বসে যাতে করে হত্যাকারীর বিপদ ঘটতে পারে, সেই আশঙ্কাতেই হয়তো হত্যাকারী এত তাড়াতাড়ি তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলল। এবং—

কথাটা ইন্সপেক্টার শেষ করতে পারলেন না হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন বললেন, কে?

একটা মুখ দরজাপথে উঁকি দিয়েছিল।

ইন্সপেক্টারের প্রশ্নে ঘরের অন্যান্য সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষিত হয়।

একটা ভাঙা কর্কশ গলায় প্রশ্নোত্তর এল, আজ্ঞে, আমি করালী।

এস, ভেতরে এস।

করালী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

লোকটা দেখতে রোগা লম্বা। কালো পালিশ করা গায়ের রং। মুখভর্তি বসন্তের বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন। নাকটা একটু চাপা। পুরু ঠোঁট অত্যধিক ধূমপানে একেবারে কালচে হয়ে গেছে। মাথার চুল পর্যাপ্ত, তেল চকচকে করছে। এলবার্ট তেড়ি। পরিধানে সাধারণ একটা ধোপ-দুরস্ত ধুতি ও গায়ে একটা সাদা অনুরূপ সিল্ক টুইলের হাফসার্ট।

আমাকে ডেকে ছিলেন স্যার?

হ্যাঁ। কিন্তু ঘরে না ঢুকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারছিলে কেন?

আজ্ঞে উঁকি তো মারিনি, ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম আপনারা কথা বলছেন, তাই ঢুকতে একটু ইতস্তত: করছিলাম।

হুঁ, তুমি তো এই নীচের তলাতেই লছমনের ঘরের পাশের ঘরটাতেই থাক?

আজ্ঞে।

কাল রাত্রে কখন ঘুমিয়েছিলে?

আজ্ঞে, শরীরটা আমার কয়দিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না বলে কাল রাতে আর কিছু খাইনি, সাড়ে ন'টার মধ্যেই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?

আজ্ঞে একরকম তাই, আমার তো বিছানায় শোওয়া আর ঘুমানো।

রাত্রে আর ঘুম ভাঙেনি ?

না।

কিন্তু ওই একটি মাত্র উচ্চারিত শব্দও যেন ইন্সপেক্টারের মনে হল, করালী একটু ইতস্ততঃ করেই উচ্চারণ করল।

কাল রাত্রে তাহলে কোন রকম শব্দ বা চিৎকার শোননি ?

শব্দ ? চিৎকার ? কই না।

হুঁ। ইন্সপেক্টার কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ আবার প্রশ্ন শুরু করলেন, করালী, তুমি তো বছরখানেক মাত্র এখানে চাকরি নিয়েছ, তাই না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এর আগে কোথায় কাজ করতে ?

কোথাও দু'-চার দিনের বেশি একটা ঠিকে কাজ ছাড়া করিনি, একমাত্র এই বাড়িতেই এই একবছর একটানা কাজ করছি।

তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স কত দিনের ?

চার বছরের।

চার বছর লাইসেন্স পেয়েছ, অথচ কোথাও এর আগে বড় একটা কাজ করোনি। কি করে তাহলে দিন চালাতে ?

তা আর চলত কই স্যার। আজকাল ভাল সুপারিশপত্র না হলে প্রাইভেট গাড়ি চালাবার কাজ কি বিশ্বাস করে কেউ দিতে চায় স্যার ? কাজের সন্ধান নিয়ে কারও কাছে গেলেই অমনি সকলে প্রশ্ন করবেন, আগে কোথায় কাজ করেছ, কেমন কাজ করতে তার সার্টিফিকেট দেখাও।

হুঁ। তা বিনয়েন্দ্রবাবু সে রকম কিছু দেখতে চাননি তোমার কাছে ?

আজ্ঞে না। আজ্ঞে তিনি ছিলেন সত্যিকারের গুণী। বললেন, ড্রাইভ কর দেখি, কাজ দেখে তবে কাজে বহাল করব। বললাম, এই তো বাবু কথার মত কথা। নিয়ে গেলাম গাড়িতে চাপিয়ে। আপনাদের আশীর্বাদে স্যার যে কোন মেক্ বা মডেলের গাড়ি দিন না, জলের মত চালিয়ে নিয়ে যাব। আমার

গাড়ি চালানো দেখে বাবুও খুশী হয়ে গেলেন। তিনি সেই দিনই কাজে বহাল করে নিলেন আমাকে।

ইন্সপেক্টার বুঝতে পারেন, লোকটা একটু বেশীই কথা বলে।

বাবু তাহলে তোমার গাড়ি চালানোয় খুশী ছিলেন বল?

আজ্ঞে, নিজমুখে আর কি বলব স্যার, বলবেন অহঙ্কার, দেমাক; তবে হ্যাঁ, বাবু বেঁচে থাকলে তাঁরই মুখে শুনতে পারতেন। তবে তিনি বলতেন, করালী, তোমার হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানো যায়।

হুঁ। ভাল কথা। দেখ করালী, কাল তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

বলুন স্যার।

তোমার আপনার জন আর কে কে আছে?

আজ্ঞে স্যার, সে কথা আর বলবেন না। ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই মা বাপকে হারিয়েছি; তারপর লালন-পালন করলে এক পিসি; তা সেও বছর দশেক আগে মারা গেছে। সব ধুয়ে মুছে গেছে। একা স্যার—একেবারে একা।

বিয়ে করনি?

বিয়ে-থা আর কে দেবে বলুন স্যার। এতদিন তো ক্যাঁ ক্যাঁ করে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছি—এই তো সবে যাহোক একটা কাজ জুটেছিল। দেখুন না, তাও বরাতে সইল না। এবারে আবার সেই রাস্তা আর কলের জল।

কেন হে, এখানে তো শুনলাম দেড়শো টাকা মাইনে পেতে, থাকা খাওয়া লাগত না, এ ক' বছরে কিছুই জমাতে পারনি?

আজ্ঞে না স্যার। জমল আর কোথায়! আগের কিছু ধার-দেনা ছিল, তাই শোধ দিতে দিতেই সব বেরিয়ে যেত মাসে মাসে—জমাব কি করে আর।

আচ্ছা করালী, তুমি যেতে পার। হ্যাঁ, ভাল কথা, না বলে কোথায় বেরিও না যেন।

আজ্ঞে না স্যার, কোথাও বড় একটা আমি বের হই না।

করালী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

॥ তেইশ ॥

ইন্সপেক্টার বসাক থানা-ইনচার্জ রামানন্দ সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু বুঝতে পারলেন সেন?

একেবারেই যে কিছু বুঝিনি তা নয় স্যার। বেশ গভীর জলের মাছ বলেই মনে হল।

হঠাৎ রজত কথা বললে, ঠিকই বলেছেন মিঃ সেন। লোকটার চোখ দুটো যেন ঠিক সাপের চোখের মত। একেবারে পলক পড়ে না। তা ছাড়া লোকটার মুখের দিকে তাকালেই যেন কেমন গা ঘিনঘিন করে। আশ্চর্য! লোকটাকে ছোট্‌কা যে কি করে টলারেট করতেন তাই ভাবছি।

ইন্সপেক্টার রজতের কথায় মৃদু হাসলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না।

হাসিটা রজতের দৃষ্টি এড়ায় না। সে বলে, হাসছেন আপনি ইন্সপেক্টার, কিন্তু লোকটার মুখের দিকে তাকালেই কি মনে হয় না—ঠিক যেন একটা snake!

ইন্সপেক্টার রজতের প্রশ্নের এবারেও কোন জবাব দিলেন না, কেবল রামানন্দ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, মৃতদেহটা একবার দেখবেন নাকি?

হ্যাঁ। একবার যাই, দেখে আসি। একটা ডাইরী আবার পাঠাতে হবে তো!

যান।

রামানন্দ সেন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টার এবারে রজতের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আপনারা যখন এসে গেছেন রজতবাবু, মৃতদেহের মানে আপনাদের কাকার সৎকার করবেন তো?

তা করতে হবে বইকি।

তাহলে আর দেরি করবেন না। রামানন্দবাবুর কাছ থেকে একটা Order নিয়ে কলকাতায় চলে যান।

রামচরণের মৃতদেহটা মর্গে পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করে রামানন্দ সেন থানায় ফিরে গেলেন। চা পান করে রজতও বিনয়েন্দ্রবাবুর মৃতদেহ কলকাতার মর্গ থেকে নিয়ে সৎকারের একটা ব্যবস্থা করবার জন্য বের হয়ে গেল।

একজন কনস্টেবলকে নিচের তলায় প্রহরায় রেখে ইন্সপেক্টার বসাক উপরে

চললেন।

প্রথমেই পুরন্দর চৌধুরীর সংবাদ নেবার জন্য তাঁর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। পুরন্দর চৌধুরী শয্যার উপরে শুয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখনও।

ধীরে ধীরে ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে, ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ইন্সপেক্টার।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। সুজাতা দেবীর একটা সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন।

এগিয়ে চললেন ইন্সপেক্টার সুজাতার ঘরের দিকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুটা ইতস্তত: করলেন, তারপর আঙুল দিয়ে টুকটুক করে ভেজানো দরজার গায়ে মৃদু 'নক্' করলেন।

কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। প্রথমে ভাবলেন সুজাতা ঘুমচ্ছে হয়তো, তারপরেই আবার কি ভেবে মৃদু একটু ঠেলা দিয়ে ভেজানো দরজাটা ঈষৎ একটু ফাঁক করে ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করলেন।

দেখতে পেলেন, সুজাতা নিঃশব্দে খোলা জানলার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্রস্ত চুলের রাশ সারা পিঠ ব্যেপে ছড়িয়ে আছে। হাওয়ায় চূর্ণ কুন্তল উড়ছে। বেশেও কেমন একটা শিথিল এলোমেলো ভাব।

আবার দরজার গায়ে নক্ করলেন টুকটুক করে।

কে? ভিতর থেকে সুজাতার গলার প্রশ্ন ভেসে এল।

ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন।

দরজা ঠেলে ইন্সপেক্টার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সুজাতা ঘুরে দাঁড়াল: আসুন।

এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন তো মিস রয়?

হ্যাঁ।

একটু চা বা গরম দুধ এক গ্লাস খেলে পারতেন। বলি না দিতে রেবতীকে ডেকে?

বলতে হবে না। রেবতী কিছুক্ষণ আগে নিজেই এসে আমাকে চা দিয়ে গিয়েছে। চা খেয়েছি। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিঃ বসাক? বসুন না ঐ চেয়ারটার ওপরে।

হ্যাঁ, বসি। পাশেই একটা চেয়ার ছিল, টেনে নিয়ে ইন্সপেক্টার উপবেশন

করলেন : আপনিও বসুন মিস রয়।

সুজাতা খাটের উপরেই শয্যায় উপবেশন করে।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কোন কথা বলে না। স্তব্ধতার মধ্যেই কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। এবং স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথমেই কথা বললেন ইন্সপেক্টার, আপনি কি তাহলে কলকাতায়ই ফিরে যাবেন ঠিক করলেন, মিস রয়?

সুজাতা নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকাল ইন্সপেক্টারের মুখের দিকে।

রজতদা কোথায়? সুজাতা প্রশ্ন করে।

রজতবাবু তো এই কিছুক্ষণ আগে কলকাতায় গেলেন।

কলকাতায় কেন?

বিনয়েন্দ্রবাবুর মৃতদেহের সৎকারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো, তাই।

সুজাতা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আমি যদি লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে যাই, আপনার কোন আপত্তি আছে কি?

না। আপত্তি আর কি, তবে আপনার কাকার সলিসিটারকে একটা সংবাদ পাঠাতে বলেছি প্রতুলবাবুকে, আজই সন্ধ্যার সময় এখানে এসে একবার দেখা করবার জন্য।

সলিসিটারকে কেন?

আপনার কাকার উইল-টুইল যদি কিছু থাকে, তা সেটা তো আপনাদের জানা প্রয়োজন।

থাকলেও আমার সে বিষয়ে কোন interestই নেই জানবেন, মিঃ বসাক। সুজাতা যেন মৃদু ও নিরাসক্ত কণ্ঠে কথাটা বললে।

বিস্মিত ইন্সপেক্টার সুজাতার মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ। তাঁর সম্পত্তি যার ইচ্ছা সে নিক। আমার তাতে কোন প্রয়োজনই নেই। চাই না আমি সেই অর্থের এক কপর্দকও, এবং নেবও না। পূর্ববৎ নিরাসক্ত কণ্ঠেই কথাগুলো বলে গেল সুজাতা।

সে তো পরের কথা পরে। আগে দেখুন তাঁর কোন উইল আছে কিনা। উইলে যদি আপনাদেরই সব দিয়ে গিয়ে থাকেন তো ভালই, নচেৎ উইল না থাকলেও তাঁর সব কিছুর একমাত্র ওয়ারিশন তো আপনারাই, আর কিছু যদি আপনি না নেনই—যাকে খুশি সব দানও করতে পারবেন।

না না। তাঁর স্বোপার্জিত অর্থ তো নয়, সবই তো সেই বাবার দাদামশাইয়ের অর্থ। যে লোক মরবার সময় পর্যন্ত তাঁর নাতি-নাতিনীদের মুখ দেখেননি, তাঁর

সম্পত্তি লাখ টাকা হলেও আর যেই নিক আমি একটি কপর্দকও স্পর্শ করব না। তা জানবেন।

কি বলছেন আপনি মিস রয়?

ঠিকই বলছি। আপনি তো জানেন না আমার পিতামহকে। অনাদি চক্রবর্তী তাঁর একমাত্র জামাই হওয়া সত্বেও সব কিছু থেকে তাঁকে তিনি বঞ্চিত করে গিয়েছিলেন। আর শুধু কি তিনিই, শুনেছি আমার পিতামহীরও এমন অহমিকা ছিল ধনী-কন্যা বলে যে, আমার পিতামহকে যাচ্ছেতাই করে অপমান করতেও একদিন দ্বিধাবোধ করেননি। বাবা বলেছিলেন একদিন, সুজাতা, যদি কখনও ভিক্ষা করেও খেতে হয় তবু যেন অনাদি চক্রবর্তীর এক কপর্দকও গ্রহণ কোরো না। এমন কি তিনি যেচে দিতে এলেও জেনো যে অর্থ বিবাহিতা স্ত্রীকে পর্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, সে অর্থ মানুষের জীবনে আর যাই দিক মঙ্গল আনতে পারে না। আমি এখানে এসেছিলাম শুধু তাকে একটিবার দেখব বলে, অন্যথায় আসতামই না।

॥ চব্বিশ ॥

একটানা সুজাতা কথাগুলো বলে গেল।

মিঃ বসাকের বুঝতে কষ্ট হয় না, সুজাতা দেবী সত্যি সত্যিই তার মৃত ছোট্‌কাকে গভীর শ্রদ্ধা ও স্নেহ করত। এবং তাই ছোট্‌কার মৃত্যু-সংবাদটা তাঁর বুকে শেলের মতই আঘাত হেনেছে।

একটু থেমে সুজাতা আবার বলতে লাগল, আমার ও ছোট্‌কার মধ্যে ঠিক যে কি সম্পর্ক ছিল, আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না মিঃ বসাক। তাছাড়া আপনি হয়তো বুঝবেনও না। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। মানুষ হয়েছি রজতদার মা-জেঠাইমার স্নেহ ও ভালবাসাতেই। কিন্তু সেদিনকার আমার বালিকা মনের খুব নিকটে যাকে আপনার করে পেয়েছিলাম, সে হচ্ছে আমার ছোট্‌কাই।

বলতে বলতে সুজাতার গলাটা যেন কেমন জড়িয়ে আসে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করে, ছোট্‌কা ছিল আমাদের, বিশেষ করে আমার, জীবনে একাধারে বন্ধু ও সর্ব ব্যাপারে একমাত্র সাথী। তাই

যেদিন তিনি তাঁর দাদামশাইয়ের জরুরী একটা চিঠি পেয়ে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়েই ঐ বাড়িতে চলে এলেন, এবং তারপর যে কারণেই হোক আর তিনি আমাদের কাছে ফিরে গেলেন না, তার পর থেকে রজতদা ও জেঠাইমা তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেও আমি তা পারিনি। তাঁদের সঙ্গে একমত না হতে পারলেও অবিশ্যি তাঁদের বিরুদ্ধেও যেতে পারিনি। তাই মনে মনে ছোট্‌কার সঙ্গে দেখা করবার খুব বেশী একটা ইচ্ছা থাকলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি সেদিন।

একটু থেমে সুজাতা আবার বলতে লাগল, তারপর হঠাৎ এমন কতকগুলো কথা ছোট্‌কার নামে আমার কানে গেল যে, পরে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে ইচ্ছাও হয়নি।

কিছু যদি না মনে করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুজাতা দেবী। এমন কথা আপনার ছোট্‌কার সম্পর্কে, কার মুখে আপনি শুনেছিলেন বলতে আপনার যদি আপত্তি না থাকে—

না। আপত্তি কি। কথাটা শুনেছিলাম রজতদার মুখেই। তাঁর সঙ্গে নাকি ৎ একদিন ছোট্‌কার রাস্তায় দেখা হয়েছিল, তখন ছোট্‌কা নাকি রজতদা কথা বলা সত্ত্বেও তাকে চিনতে পারেনি। তাই ভয় হয়েছিল রজতদার মত আমাকেও যদি ছোট্‌কা আর না চিনতে পারেন!

সুজাতার মুখে কথাটা শুনে মিঃ বসাক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একটা কথা সুজাতাকে ঐ সম্পর্কে খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল বলবার কিন্তু ইচ্ছা করেই শেষ পর্যন্ত বললেন না। এমন সময় রেবতী এসে ঘরে ঢুকল।

কি খবর রেবতী?

বাবু, ঠাকুর বলল খাবার তৈরী।

ঠিক আছে, ঠাকুরকে টেবিলে খাবার দিতে বল। আর অমনি দেখ পুরন্দর-বাবু উঠেছেন কিনা।

রেবতী চলে গেল।

উঠুন সুজাতা দেবী। স্নান করবেন তো করে নিন।

হ্যাঁ, আমি স্নান করব।

খাবার টেবিলে বসে সুজাতা কিন্তু এক গ্লাস সরবৎ ছাড়া কিছুই খেতে চাইল না। না খেলেও খাবার টেবিলেই বসে রইল।

মিঃ বসাক ও পুরন্দর চৌধুরী খেতে লাগলেন।

এক সময় মিঃ বসাক বললেন, আপনি কি তাহলে আজই চলে যেতে চান, মিস রয় ?

রঞ্জতদা ফিরে আসুক। কাল সকালেই যাব।

কালই তাহলে লক্ষ্ণৌ রওনা হচ্ছেন ?

না। দু-একদিন পরে রওনা হব।

আহারাদির পর সুজাতা ও পুরন্দর চৌধুরী যে যার ঘরে বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন। মিঃ বসাক নীচে এলেন।

যে ঘরে রামচরণ নিহত হয়েছিল সেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

ঘণ্টাখানেক আগে মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘরটা খালি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। ঘরের জানলাগুলো ভেজানো ছিল, এগিয়ে গিয়ে ঘরের পশ্চাতে বাগানের দিককার দুটো জানলাই খুলে দিলেন। দ্বিপ্রহরের পর্যাপ্ত আলোয় স্বল্পান্ধকার ঘরটা আলোকিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ঘরের দেওয়ালে পেরেকের সাহায্যে দড়ি টাঙিয়ে তার উপরে খান দুই পরিষ্কার পাট করা ধুতি ঝুলছে। একপাশে একটা তোয়ালে। একটা সার্ট ও গোটা গেঞ্জিও দড়িতে ঝোলানো রয়েছে।

এক কোণে একটা কালো মাঝারি আকারের রঙ-ওঠা স্টীল ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে একটা আরশি ও তার পিছনে গোঁজা একটি চিরুনি। আরশিটার পাশেই দেওয়ালে টাঙানো একটি ফোটো। ফোটোটার সামনে এগিয়ে গেলেন মিঃ বসাক।

পাঁচ-ছ বছরের একটি শিশুর ছোট ফোটো। অনেক দিন আগেকার তোলা ফোটো হবে। কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ফোটোটা দেখতে দেখতে হঠাৎ তার পাশেই দেওয়ালে টাঙানো আরশিটার পিছনে গোঁজা চিরুনিটার দিকে নজর পড়তেই একটা জিনিস তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

চিরুনিটার সরু দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকগাছি কেশ তখনও আটকে আছে। বিশেষ করে কয়েকগাছি কেশই তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

॥ পঁচিশ ॥

হাত বাড়িয়ে চিরুনিটা হাতে নিলেন মিঃ বসাক।

চার-পাঁচগাছি কেশ আটকে রয়েছে চিরুনির সরু দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে। এবং কেশগুলি লম্বায় হাতখানেকের চাইতে একটু বেশীই হবে। আর সেগুলো সামান্য একটু কোঁকড়ানো এবং রংও তার ঠিক কালো নয়, কেমন একটু কটা কটা।

ধীরে ধীরে কেশগুলি চিরুনির দাঁত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন মিঃ বসাক।

রামচরণের নিত্যব্যবহৃত এই চিরুনি তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে এখনও মিঃ বসাকের, রামচরণের কেশের রং কুচকুচে কালোই ছিল; যদিচ অনেক কেশেই তার পাক ধরেছিল। বিশেষ করে, তার কেশ দৈর্ঘ্যে হাতখানি হওয়াও অসম্ভব। মোট কথা, চিরুনির এই কেশ আদপেই রামচরণের মাথার নয়। এবং কেশের দৈর্ঘ্য দেখে মনে হয়, এ কোন রমণীর মাথার কেশ হবে। কোন পুরুষের মাথার কেশ এ নয়। এবং কোন নারীরই মাথার কেশ যদি হবে, তবে এই চিরুনিতে এ কেশ এল কোথা থেকে?

এ বাড়িতে তো কোন নারীর অস্তিত্বই নেই এবং ছিল না বলেই তো তিনি জেনেছেন। একমাত্র লতা, তাও সেদিন যার আগেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। সে ক্ষেত্রে চিরুনির দাঁতে নারীর কেশ দেখে মনে হচ্ছে, গতকাল দিনে বা রাত্রে নিশ্চয়ই কেউ এক সময়ে এই চিরুনির সাহায্যে তাঁর কেশ প্রসাধন করেছিলেন যিনি কোন পুরুষই নন, নারীই। এ বাড়িতে একমাত্র বর্তমানে উপস্থিত নারী সুজাতা দেবীই। সুজাতা দেবী নিশ্চয়ই রামচরণের ঘরে এসে তাঁর চিরুনি দিয়ে কেশ প্রসাধন করেননি। আর করলেও সুজাতা দেবীর কেশ এ ধরনের নয়। তাঁর কেশ দৈর্ঘ্যে আরও বড় ও কালো কুচকুচে। আদপেই কোঁকড়ানো নয়।

তবে কে সেই নারী যার কেশ প্রসাধনের চিহ্ন এখনও এই চিরুনির দাঁতে রয়ে গিয়েছে!

আরও মনে হয়, যেই কেশ প্রসাধন করে থাকুক—রামচরণের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পড়েনি, নচেৎ রামচরণের মত ছিমছাম প্রকৃতির লোকের চিরুনিতে কেশগুলো আটকে থাকা সম্ভব হত না একবার তার দৃষ্টি চিরুনিতে আকৃষ্ট হলে।

তবে কি রামচরণের অজ্ঞাতেই কেউ তার চিরুনির সাহায্যে কেশ প্রসাধন করেছিল! সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হয় মিঃ বসাকের, গত রাত্রে রামচরণ যখন তাঁদের আহার্য পরিবেশন করছিল তখনও তো তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার মাথার কেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো ছিল। যাতে করে তাঁর মনে হয়েছিল, বিকালের পরে কোন এক সময় সে তার কেশ প্রসাধন করেছিল। অতএব কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে?

সন্ধ্যার পর রাত্রে কোন এক সময়ে কোন না কোন নারীই এই ঘরে এসে রামচরণের এই চিরুনির সাহায্যে তার কেশ প্রসাধন নিশ্চয়ই করেছিল। যার সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রমাণ এখনো এই চিরুনির দাঁতে কয়েকগাছি কেশে বর্তমান। এবং এ থেকে সহজেই অনুমান হয় কোন নারী তাহলে গতরাত্রে এ কক্ষে এসেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে, রামচরণের জ্ঞাতে না অজ্ঞাতে।

আরও একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, যে নারী গত রাত্রে এই ঘরে এসেছি সে রামচরণের পরিচিতও হতে পারে, অপরিচিতও হতে পারে। এবং শুধু তা নয় রামচরণের হত্যার ব্যাপারে সেই নারীর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোন যোগাযে ছিল কিনা তাই বা কে জানে!

মোট কথা, কোন এক নারীর এই কক্ষমধ্যে গত রাত্রে পদার্পণ ঘটেছিল। এবং সে বিষয়ে যখন কোন সন্দেহই থাকছে না তখন সেই নারীর এই কক্ষমধ্যে আবির্ভাবের ব্যাপারটাই রামচরণের হত্যার মতই বিস্ময়কর মনে হয়।

বাড়ির চারদিকে কাল সতর্ক পুলিস প্রহরী ছিল, তার মধ্যেই অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে কী করে এক নারীর এ বাড়িতে প্রবেশ সম্ভবপর হয়!

তবে কি সেই নারীই রামচরণের হত্যাকারী!

কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন মিঃ বসাকের লজ্জার অবধি থাকে না। তাঁদে এতগুলো পুরুষের জাগ্রত ও সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা সামান্য এব নারী নিঃশব্দে এসে রামচরণকে হত্যা করে চলে গেল! এতগুলো লোক কেউ কিছু জানতেও পারল না!

কিন্তু এলই বা সে এ বাড়িতে কোন্ পথে, আবার ফিরে গেলই বা কো পথে?

অথচ কিছুক্ষণ পূর্বে পর্যন্ত কেন যেন মিঃ বসাকের ধারণা হয়েছিল, গত রা রামচরণের হত্যাকারী এ বাড়ির মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল গত রাত্রে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে তা নাও হয়তো হতে পারে।

ভাবতে ভাবতে চকিতে মিঃ বসাকের মনে আর একটা সম্ভাবনার উদয় হয়। এই কেশ যার সেই নারী ও বিনয়েন্দ্রর জীবনে তার ল্যাবরেটারী অ্যাসিস্টেণ্ট হিসাবে যে রহস্যময়ী নারীর অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটেছিল—উভয়েই এক নয় তো!

কিন্তু কথাটার মধ্যে যেন বেশ কোন যুক্তি খুঁজে পান না মিঃ বসাক।

সে না হলেও, কোন এক নারী কাল রাত্রে এ ঘরে এসেছিল ঠিকই এবং যে প্রমাণ একমাত্র যার পক্ষে আজ দেওয়া সম্ভব ছিল সে রামচরণ, কিন্তু সে আজ মৃত।

যে রহস্যের উপর আলোকপাত সম্ভব হত আজ আর তার কাছ থেকে পাওয়ার কোন উপায়ই নেই, তার মুখ আজ চিরদিনের জন্যই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর সে কথা বলবে না।

আবার মনে হয়, তবে কি বিনয়েন্দ্রবাবুর হত্যাকারীও সে-ই! তাই সে এত তাড়াতাড়ি রামচরণের কণ্ঠও চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে গেল, পাছে রামচরণ তার সমস্ত রহস্য ফাঁস করে দেয়!

আবার সেই রহস্যময়ীর কথাই মনের মধ্যে নূতন করে এসে উদয় হয়।

সমস্ত ব্যাপারটাই ক্রমে যেন আরো জটিল হয়ে উঠছে। সব যেন কেমন বিশ্রী ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে যাই হোক, এই কয়েকগাছি কেশের মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

যত্নসহকারে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করেন মিঃ বসাক। এবং কাগজের মধ্যে কেশ ক'গাছি রেখে ভাঁজ করে সযত্নে পকেটের মধ্যে রেখে দিলেন।

তারপর রামচরণের স্টীল ট্রাঙ্কটা খুলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তালা দেওয়া। খোলা গেল না। চাবিটা কিন্তু বিশেষ খুঁজতে হল না। রামচরণের শয্যার নীচে তোশকের তলাতেই পাওয়া গেল। চাবির সাহায্যে মিঃ বসাক তালা খুলে ফেললেন।

বাক্সটা খুলে ডালাটা তুললেন। ট্রাঙ্কের মধ্যে বিশেষ কিছু এমন পাওয়া গেল না। খানকয়েক ধুতি পাট করা, গোটা দুই জামা। একটা ব্যাগের মধ্যে গোটা ত্রিশেক টাকা ও কিছু খুচরো পয়সা। একটা ছোট কৌটোর মধ্যে খানিকটা আফিং এবং খানকয়েক চিঠি ও মনিঅর্ডারের রসিদ।

রসিদগুলো ফেরত আসছে কোন এক শ্যামসুন্দর ঘোষের কাছ থেকে।

চিঠিগুলোও সেই শ্যামসুন্দরেরই লেখা। চিঠি পড়ে বোঝা গেল, সম্পর্কে সেই শ্যামসুন্দর রামচরণের ভাইপো হয়। থাকে মেদিনীপুর। আর পাওয়া গেল

একটা পোস্ট-অফিসের পাস-বই।

পাস-বইটা উলটে-পালটে দেখা গেল, তার মধ্যে প্রায় শ-চারেক টাকা আজ পর্যন্ত জমা দেওয়া আছে। মধ্যে মধ্যে অবিশ্যি পাঁচ-দশ করে তোলার নিদর্শনও আছে। লোকটা দেখা যাচ্ছে তাহলে কিছুটা সঞ্চয়ীও ছিল।

বাক্সটা বন্ধ করে পুনরায় তালায় চাবি দিয়ে মিঃ বসাক রামচরণের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপ তখন অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছে।

প্রশান্ত বসাক নীচের তলায় যে ঘরটায় গত দুদিন ধরে অফিস করেছিলেন সেই ঘরেই এসে প্রবেশ করলেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই চোখাচোখি হয়ে গেল প্রতুলবাবুর সঙ্গে।

প্রতুলবাবু বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে এসেছেন, ঐ ঘরে ইন্সপেক্টারের অপেক্ষায় বসেছিলেন।

প্রতুলবাবুর পাশেই চেয়ারে স্যুট পরিহিত সুশ্রী আর একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বসেছিলেন।

এই যে প্রতুলবাবু! কতক্ষণ এসেছেন?

এই কিছুক্ষণ হল। আলাপ করিয়ে দিই ইন্সপেক্টার সাহেব, ইনি মিঃ চট্টরাজ, বিনয়েন্দ্রবাবুর অ্যাটর্নী। আর ইনি ইন্সপেক্টার মিঃ প্রশান্ত বসাক।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার জানান।

কথা বললেন তারপর প্রথমে মিঃ চট্টরাজই, আমাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন মিঃ বসাক?

হ্যাঁ। বিনয়েন্দ্রবাবুর কোন উইল আছে কিনা সেইটাই আমি জানবার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম মিঃ চট্টরাজ।

না। উইল তিনি কোন কিছু করে যাননি।

কোন উইলই নেই?

না।

উইলের কোন কথাবার্তাও হয়নি কখনও তাঁর আপনার সঙ্গে?

মাস পাঁচ-ছয় আগে একবার তিনি আমাদের অফিসে যান, সেই সময় কথায় কথায় একবার বলেছিলেন উইল একটা তিনি করবেন—

সে উইল কী ভাবে হবে সে সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হয়নি ?

হ্যাঁ, বলেছিলেন, তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি একমাত্র হাজার দশেক নগদ টাকা ছাড়া তিনি তাঁর ভাইঝি কে এক সুজাতা দেবীকেই নাকি দিয়ে যেতে চান।

একমাত্র দশ হাজার টাকা ব্যতীত সব কিছু সুজাতা দেবীকেই দিয়ে যাবেন বলেছিলেন ?

হ্যাঁ।

রজতবাবু তাঁর একমাত্র ভাইপোর সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি ?

হ্যাঁ, করেছিলেন, ঐ নগদ দশ হাজার টাকা মাত্র। আর কিছু নয়।

হুঁ। ক্ষণকাল চুপচাপ বসে কি যেন ভাবলেন মিঃ বসাক, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, একটা কথা মিঃ চট্টরাজ, বিনয়েন্দ্রবাবুর প্রপার্টির ভ্যালুয়েশন কত হবে, নিশ্চয়ই জানেন ?

ইদানীং অনেক কিছুই হস্তান্তরিত হয়েছিল। কলকাতার তিনখানা বাড়ি, ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ বাবদ যা পেয়েছেন সবই গিয়েছিল খরচ হয়ে—তা হলেও এখনও যা প্রপার্টি আছে তার ভ্যালুয়েশন তা ধরুন, লাখ দুয়েক তো হবেই। তাছাড়া ব্যাঙ্কেও নগদ হাজার পঞ্চাশ এখনও আছে।

সম্পত্তির পরিমাণ তাহলে নেহাত কম নয়। বেশ লোভনীয়ই যে যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে।

মিঃ চট্টরাজ বললেন, এ আর কি, একদিন চক্রবর্তীদের সম্পত্তির পরিমাণ পনের বিশ লাখ টাকা ছিল ; যা কাগজপত্রে পাওয়া যায়। নানা ভাবে কমতে কমতে এখন কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি, এই নীলকুঠি ও টালিগঞ্জ অঞ্চলে কিছু জমি ও ব্যাঙ্কে যা নগদ আছে।

এখন তাহলে বিনয়েন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তি কে পাচ্ছে মিঃ চট্টরাজ ?

উইল যখন কিছু নেই তখন রজতবাবু ও সুজাতা দেবীই সব সমান ভাগে পাবেন ; কেন না একমাত্র ওঁরাই দুজনে আজ বিনয়েন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

রেবতী এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং প্রতুলবাবুকে সম্বোধন করে বললে, বাবু চাল ডাল তেল ঘির ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন।

এতদিন, এমন কি কাল রাত পর্যন্তও রামচরণের ঘাড়েই ঐ সব কিছুর দায়িত্ব গত বিশ বছর ধরে চাপানো ছিল। এখন অন্য কোন রকম ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রেবতীকেই চালাতেই হবে।

প্রতুলবাবু বললেন, যাবার আগে টাকা দিয়ে যাব। এখন যা যা দরকার মতি স্টোর্স থেকে এ বাড়ির অ্যাকাউণ্টে গিয়ে নিয়ে আয়।

রেবতী মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রতুলবাবু তখন চট্টরাজকে সম্বোধন করে বললেন, টাকার ব্যবস্থা কিছু আপনাকে শীগগিরই করতে হবে মিঃ চট্টরাজ। আমার ক্যাশেও সামান্যই আছে আর।

সামনের মাসের টাকাটা এ মাসের দশ তারিখেই তুলে রেখেছিলাম ব্যাঙ্ক থেকে। কাল সে টাকাটা পাঠিয়ে দেব। তারপর রেবতীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, এঁদের চা দাও রেবতী।

রেবতী বললে, চা প্রায় হয়ে এসেছে। এখুনি আনছে।

রেবতী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

প্রতি মাসে সাধারণতঃ কত সংসার-খরচ বলে আসত মিঃ চট্টরাজ?

কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাট সিস্টেমের বাড়িটা থেকে ভাড়া বাবদ ৬০০, পাওয়া যায় আর ব্যাঙ্ক থেকে ৬০০,। এই বারশত করে প্রতি মাসে আসত। তাছাড়া ৪০০,।৫০০, প্রতি মাসেই বেশী চেয়ে পাঠাতেন যেটা আবার তুলে দেওয়া হত ব্যাঙ্ক থেকেই।

ব্যাঙ্ক থেকে অত টাকা তুলতেন প্রতি মাসে? প্রশান্ত বসাক প্রশ্ন করেন চট্টু

হ্যাঁ, ইদানীং বছর দেড়েক থেকেই তো অমনি টাকা খরচ হচ্ছিল।

তার আগে?

বাড়িভাড়ার টাকাতেই চলে যেত।

তা ইদানীং বছর দেড়েক ধরে এমন কি খরচ বেড়েছিল মিঃ চট্টরাজ, যে বিনয়েন্দ্রবাবুর অত টাকার প্রয়োজন হত?

তা কেমন করে বলব বলুন। টাকা তিনি চাইতেন, আমরা পাঠিয়ে দিতাম মাত্র। তাঁর অর্থ তিনি ব্যয় করবেন তাতে আমাদের কি বলবার থাকতে পারে বলুন? শুধু ঐ কেন, গত এক বছরের মধ্যেই তো তাঁর কলকাতার আরও যে দুখানা ছোট বাড়ি ছিল তাও তিনি বিক্রি করেছেন।

এবার মিঃ বসাক ঘুরে তাকালেন প্রতুলবাবুর মুখের দিকে এবং প্রশ্ন করলেন,

কেন অত টাকার প্রয়োজন হত ইদানীং তাঁর, সে সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন প্রতুলবাবু?

আজ্ঞে না, তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পেত না। কাউকে তিনি কিছু বলতেনও না।

আচ্ছা মিঃ চট্টরাজ, বিনয়েন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনার কি রকম পরিচয় ছিল?

বিশেষ কিছুই না বলতে গেলে। বেশীর ভাগ তাঁর যা কিছু বলবার তিনি চিঠিতে বা ফোনেই জানাতেন।

এ বাড়িতে ফোন আছে নাকি? কই দেখিনি তো! বললেন প্রশান্ত বসাক।

জবাব দিলেন প্রতুলবাবু, আছে ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যে।

বাইরে এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। পুরন্দর চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

আসুন পুরন্দরবাবু, বিশ্রাম নেওয়া হল?

হ্যাঁ। আমাকে তাহলে অনুগ্রহ করে এবারে যাবার অনুমতি দিন ইন্সপেক্টার। কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি, ডাকামাত্রই আবার আমি এসে হাজির হব।

আমি এখুনি একবার কলকাতায় যাব। ফিরে এসে আপনাকে বলব কখন আপনাকে ছেড়ে দিতে পারব মিঃ চৌধুরী। জবাব দিলেন ইন্সপেক্টার।

রেবতী চায়ের ট্রে হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

॥ সাতাশ ॥

লালবাজারে কিছু কাজ ছিল, সে কাজ শেষ করে মিঃ বসাক সোজা সেখান থেকে কিরীটীর টালিগঞ্জ ভবনে এসে হাজির হলেন।

কিরীটী তাঁর দোতলার বসবার ঘরে আলো জ্বেলে বসে একখানা জ্যোতিষ-চর্চার বই নিয়ে পড়ছিল।

জংলী এসে সংবাদ দিল, ইন্সপেক্টার বসাক এসেছেন।

নিয়ে আয় এই ঘরেই। বই থেকে না মুখ তুলেই কিরীটী বললে।

একটু পরে প্রশান্ত বসাকের পদশব্দে পূর্ববৎ বই হতে না মুখ তুলেই একটা সাদা

কাগজের বুকে একটা কুষ্টির ছকের পাশে কি সব লিখতে লিখতে আহ্বান জানাল কিরীটী, আসুন মিঃ বসাক, বসুন। সপ্তম স্থানে রাহু, অষ্টমে বুধ।

মিঃ বসাক বসতে বসতে বললেন, জ্যোতিষ চর্চা আবার শুরু করলেন কবে থেকে?

ভারতের বহু পুরাতন ও অবহেলিত অদ্ভুত সায়েন্স এই জ্যোতিষচর্চার ব্যাপার মিঃ বসাক। এবং সময় ও নক্ষত্র যদি ঠিক ঠিক হয় তো অনেক কিছুই দেখবেন, নির্ভুল পাবেন আপনি গণনায়। অঙ্ক শাস্ত্রের মত ঠিক হলে শুদ্ধ উত্তর ঠিক আপনি পাবেনই।

জ্যোতিষ চর্চাটাকে সত্যি সত্যিই তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ রায়?

নিশ্চয়ই, এ একটা অত্যাশ্চর্য সায়েন্স। আর বিশ্বাসের কথা বলছেন, এ তো আপনি বিশ্বাস করেন যে চন্দ্রের কলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নদীর জোয়ার-ভাটার পরিবর্তন হয়?

তা অবিশ্যি করি।

তবে কেন আপনার বিশ্বাস করতে বাধে মানুষের দেহের উপরেও গ্রহ উপগ্রহের প্রভাব আছে? জানেন না আপনি, ভৃগুর কি অসাধারণ ক্ষমতা। আমি এ যতই পড়ছি এবং যতই মনে মনে বিশ্লেষণ করছি ততই বিস্ময় যেন আমার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কুষ্টির ছকটা আর কিছুই নয়, মানুষের বহু বিচিত্র রহস্যময় অজ্ঞাত জীবনের কতকগুলো সত্য ও অবধারিত সূত্র একত্রে গ্রথিত একটা সংকেত মাত্র। সূত্রগুলির সঠিক পাঠোদ্ধার করতে পারলে আপনি সুনিশ্চিত পৌঁছবেন সেই অজানিত সংকেতের নির্ভুল মীমাংসায়। আজ উত্তরপাড়ার নীলকুঠির যে হত্যা-রহস্য আপনাকে চিন্তিত করে—

বাধা দিলেন ইন্সপেক্টার, আশ্চর্য, কি করে জানলেন যে সেই ব্যাপারেই আপনার কাছে আমি এসেছি!

কিছুটা শুনেছি আজ দুপুরে, আপনাদের হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলাম, সেখানেই। শুনলাম, নীলকুঠির মার্ডারের মোটামুটি কাহিনীটা এবং সেখানেই শুনলাম আপনিই সেই ঘটনাটা তদন্ত করছেন বর্তমানে। তার পরই অকস্মাৎ আপনার আমার কাছে আগমন। ব্যস্, একেবারে অঙ্কশাস্ত্রের যোগ-বিয়োগ—উত্তর মিলে গেল।

সত্যি! সেই কারণেই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি মিঃ রায় এই সময়ে।

না না—এর মধ্যে বিরক্তির কী আছে। বলুন, শোনা যাক।

প্রশান্ত বসাক সেই একেবারে গোড়া থেকেই সব বলে যেতে লাগলেন।

কিরীটী সোফাটার উপর পা এলিয়ে দু চক্ষু বুজে একটা চুরোট টানতে টানতে শুনতে লাগল।

কাহিনী যখন শেষ হল, কিরীটী তখনও চোখ বুজে পূর্ববৎ সোফার উপরে হেলান দিয়েই বসে আছে।

ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা যেন থমথম করছে।

ওয়াল-ক্লকটা ঢং ঢং করে রাত্রি নটা ঘোষণা করল।

সময় সংকেতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী চোখ মেলে তাকাল, এবং মৃদু কণ্ঠে এই সর্বপ্রথম প্রশ্ন করল, আপনি যা বললেন তার মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।

কী বলুন তো?

প্রথমতঃ ধরুন, সিঙ্গাপুরী মুক্তা।

কিন্তু সিঙ্গাপুরী মুক্তার ব্যাপারটা তো—

হ্যাঁ। যতটুকু মুক্তা সম্পর্কে আপনি জেনেছেন, আমার মনে হচ্ছে, সেটাই সব নয়, আংশিক মাত্র। দ্বিতীয়তঃ সেই রহস্যময়ী নারী—লতা। লতা শব্দের আর একটি অর্থ জানেন তো, সাপ, এবং সেই সাপই শুধু নয়, ইউ. পি. থেকে আগত সেই আগন্তুকের কথাটাও আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে। যেমন করে হোক ঐ দুটি ব্যক্তিবিশেষের খুঁটিনাটি কিছু সংবাদ বা পরিচয় আপনাকে জানতে হবে। আর আপনার মুখে সমস্ত কথা শোনবার পর, মনে মনে আমি যে ছকটি গড়ে তুলেছি তা যদি ভুল না হয়, অর্থাৎ আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তো জানবেন, এ ক্ষেত্রে হত্যার কারণ বা মোটিভ প্রেমঘটিত।

প্রেমঘটিত!

হ্যাঁ, প্রেমেরই যে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র গতি। এবং যে প্রেম ক্ষেত্রবিশেষে নিঃস্ব করে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে, মনে রাখবেন, সেই প্রেমই আবার ভয়াবহ গরল উদ্গীরণ করতে পারে।

আচ্ছা মিঃ রায়, আপনার কি মনে হয় হত্যাকারী কোন পুরুষ না নারী?

পুরুষও হতে পারেন, নারীও হতে পারেন। অথবা উভয়ের একত্রে মিলিত প্রচেষ্টাও থাকতে পারে। কিন্তু সে তো শেষ কথা বর্তমান রহস্যের। তার পূর্বে যে সূত্রগুলি ধরে আপনি অগ্রসর হবেন সেগুলো হচ্ছে, এক নম্বর, প্রত্যেকেরই গত চার-পাঁচ বছরের জীবনের অতীত ইতিহাস। বিনয়েন্দ্র, রজত, সুজাতা দেবী ও

পুরন্দর চৌধুরীর। দু নম্বর, সেই ছায়ামূর্তির অন্বেষণ। যে ছায়ামূর্তিকে ইদানীং বিনয়েন্দ্র রাত্রে নীলকুঠিতে ঘন ঘন দেখতেন এবং রামচরণ ও ড্রাইভার করালীও দেখছে বলে জানা যায়। তিন নম্বর, সেই শ্রীমতী রহস্যময়ী লতা। তাঁকেও খুঁজে বের করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে জানতে হবে সেই লতা বিনয়েন্দ্রর কুমার জীবনে কতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। চার নম্বর, বিনয়েন্দ্রর শয়নকক্ষ ও গবেষণা ঘরটি আর একবার পঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনাকে দেখতে হবে। এই চারটি প্রশ্নের মধ্যেই বিনয়েন্দ্রর হত্যার কারণ বা মোটিভটি জড়িয়ে আছে জানবেন।

প্রশান্ত বসাক গভীর মনোযোগ সহকারে কিরীটীর কথাগুলো শুনতে থাকেন।

কিরীটী একটু থেমে আবার বলে, এবারে হত্যা করা সম্পর্কে যা আমার মনে হচ্ছে, বিনয়েন্দ্রর হত্যার ব্যাপারটি হচ্ছে pre-arranged, premeditative and a well planned murder। খুব ধীরে-সুস্থে, সময় নিয়ে, প্ল্যান করে, এবং ক্ষেত্র তৈরি করে তারপর হত্যা করা হয়েছে বেচারীকে। এবং খুব সম্ভবতঃ, তার কিছুটা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বেচারী রামচরণ জানতে পারায় হত্যাকারী রামচরণকেও সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। অতএব সেটাও ইচ্ছাকৃত হত্যা। দুটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের যিনি হোতা, জানবেন, তিনি যেমন ধূর্ত তেমনি সতর্ক, তেমনি শয়তানী বুদ্ধিতে পরিপক্ব। এবং সম্ভবতঃ আজ কাল বা দু-চারদিনের মধ্যেই হোক, হত্যাকারী আবার হানবে তার মৃত্যু-ছোবল।

কিরীটীর কথায় প্রশান্ত বসাক যেন চমকে ওঠেন, বলেন, কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

ঠিকই বলছি। আমার calculation যদি মিথ্যা না হয় তো শীঘ্রই আবার একটি বা ততোধিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে। অতএব সাবধান। খুব সাবধান। কিন্তু যাক সে কথা, এবারে আসা যাক আপনার সূত্রগুলির মধ্যে। ১নং, ভাঙা ঘড়ি। ২নং, অপহৃত বিনয়েন্দ্রর রবারের চপ্পল জোড়া। ৩নং, রামচরণের ঘরে তার নিত্যব্যবহার্য চিরুনিতে প্রাপ্ত কয়েকগাছি নারীর কেশ। ৪নং, তিনখানি চিঠি।

॥ আঠাশ ॥

প্রশান্ত বসাক কিরীটীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের গাড়িতে এসে যখন বসলেন, রাত তখন সোয়া দশটা।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন উত্তরপাড়া যাবার জন্য।

চলন্ত গাড়ির মধ্যে বসে আর একবার সমস্ত ব্যাপারটা ও কিরীটীর কথাগুলো মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগলেন প্রশান্ত বসাক।

নীলকুঠিতে যখন এসে পৌঁছলেন রাত্রি তখন প্রায় পৌনে এগারটা।

সিঁড়ির মুখেই রেবতীর সঙ্গে প্রশান্ত বসাকের দেখা হয়ে গেল।

এবং রেবতীর কাছেই শুনলেন, এতক্ষণ সকলে ওর জন্য অপেক্ষা করে এই সবে খেতে বসেছেন।

রজতবাবু রাত আটটা নাগাদ ফিরে এসেছেন এবং আরও একটি সংবাদ পেলেন, সুন্দরলাল নামে এক ভদ্রলোক রায়পুর থেকে এসেছেন।

প্রশান্ত বসাক সোজা একেবারে খাবার ঘরেই এসে প্রবেশ করলেন। ঘরের মধ্যে টেবিলের সামনে বসে সবেমাত্র সকলে তখন আহার শুরু করেছেন।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত চারটি প্রাণী—সুজাতা, রজত, পুরন্দর চৌধুরী ওঁদের তো চেনেনই প্রশান্ত বসাক, চেনেন না কেবল চতুর্থ ব্যক্তিকে। পরিধানে তাঁর স্যুট, মাথায় পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ি এবং চোখে কালো লেন্সের চশমা। বুঝলেন, উনিই আগন্তুক সুন্দরলাল।

প্রশান্ত বসাকের পদশব্দে সকলেই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

রজত ও সুজাতা পাশাপাশি একদিকে ও অন্যদিকে টেবিলের পাশাপাশি বসে পুরন্দর চৌধুরী ও সুন্দরলাল।

প্রশান্ত বসাক ঘরে প্রবেশের মুখেই লক্ষ্য করেছিলেন, রজত ও সুজাতা নিম্নকণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে কী যেন কথাবার্তা বলছে। আর সুন্দরলাল ও পুরন্দর চৌধুরী দুজনে কথাবার্তা বলছেন। ইন্সপেক্টারকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সর্বাগ্রে রজতই তাঁকে আহ্বান জানাল, আসুন মিঃ বসাক, আপনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে এইমাত্র আমরা সকলে বসলাম।

না না—তাতে কি হয়েছে, বেশ করেছেন। বলতে বলতে এগিয়ে এসে একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন প্রশান্ত বসাক, তারপর বললেন, দাহ হয়ে

গেল ?

হ্যাঁ।

রেবতী এসে ইন্সপেক্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার খাবার দিতে বলি ?

হ্যাঁ, বল।

ওকে আপনি বোধ হয় চিনতে পারছেন না মিঃ বসাক ? সুন্দরলালকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে প্রশ্ন করল রজত।

না। মানে—

সুন্দরলালই জবাব দিলেন ইংরেজীতে, My name is Sundar Lal Jha।

সুস্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ। কোথাও এতটুকু জড়তা নেই, এবং গলাটা সরু ও মিষ্টি।

হ্যাঁ, রেবতীই বলছিল আপনার এখানে আসবার কথা এইমাত্র। তা আপনি—

বিনয়েন্দ্রবাবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে পৌঁছে এঁদের মুখে সব শুনে তো একেবারে তাজ্জব বনে গেছি ইন্সপেক্টার, how horrible, how absurd !

ইন্সপেক্টার কিন্তু কোন জবাব দেন না। তাঁর মনে পড়ে ঘণ্টাখানেক আগে কিরীটীর সেই কথাগুলো—pre-arranged, pre-meditative and a well planned murder !

সুন্দরলাল আবার বললেন, এতক্ষণ আমি চলেই যেতাম, কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই যাইনি। তাছাড়া ওঁরা বিশেষ করে বললেন ডিনারটা খেয়ে যেতে—

সে তো ভালই করেছেন, মৃদুকণ্ঠে ইন্সপেক্টার বলেন, তা উঠেছেন কোথায় ?

কলকাতায়, তাজ হোটেলে।

আপনি যখন বিনয়েন্দ্রবাবুর বিশেষ পরিচিত তখন হয়তো তাঁর সম্পর্কে একটু খোঁজখবরও পাব আপনার কাছে। প্রশান্ত বসাক বললেন।

তাঁর সঙ্গে আলাপ আমার ইদানীং ঘনিষ্ঠ হলেও পরিচয় আমার তাঁর সঙ্গে একপক্ষে তাঁর থার্ড ইয়ারে ছাত্রজীবনে কয়েক মাস সহপাঠী হিসাবেই হয়। তারপর পড়া ছেড়ে দিয়ে আমার এক আত্মীয়ের কাছে নাগপুরে গিয়ে ব্যবসা শুরু করি। দীর্ঘকাল পরে আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা এই কলকাতারই

একটা বিজ্ঞান সভায়। তারপর বার দু-তিন নাগপুর থেকে কলকাতায় এলেই আমি এখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতাম। সেদিক দিয়ে তাঁর পার্সোন্যাল ব্যাপারের বিশেষ তেমন কিছুই আমি জানি না। তাই সেরকম সাহায্য আপনাকে করতে পারব বলে তো আমার মনে হয় না, মিঃ বসাক।

আপনি বিনয়েন্দ্রবাবুর সহপাঠী যখন, তখন পুরন্দরবাবুর সঙ্গেও বোধ হয় আপনার সেই সময়েই আলাপ মিঃ ঝা?

প্রশান্ত বসাকের আকস্মিক প্রশ্নে চকিতে সুন্দরলাল তাঁর পার্শ্বেই উপবিষ্ট পুরন্দর চৌধুরীর দিকে একবার তাকালেন। তারপর মৃদু স্মিতকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গেও আমার আলাপ আছে।

মিঃ বসাক সুন্দরলালের সঙ্গে এমনি ঘরোয়া সহজভাবে কথাবার্তা বলতে বলতেই তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে সুন্দরলালকে দেখছিলেন।

বয়েস যাই হোক না কেন, সুন্দরলালকে কিন্তু পুরন্দর চৌধুরী ও বিনয়েন্দ্র রায়ের সহপাঠী হিসাবে যথেষ্ট কম বয়েসী বলেই মনে হচ্ছিল।

তাই শুধু নয়, মুখে যেন কেমন একটা রমণী-সুলভ কমনীয়তা। দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো, সরু গোঁফ।

দেহের গঠনটাও ভারী সুশ্রী—লম্বা, খুব রোগাও নয়, আবার মোটাও নয়।

কাঁটা-চামচের সাহায্যে আহার করছিলেন সুন্দরলাল, হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা সরু সরু।

ডান হাতের অনামিকায় ও মধ্যাঙ্গুষ্ঠে দুটি পাথর বসানো স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়। একটি পাথর, প্রবাল। অন্যটি বোধ হয় হীরা।

ঘরের আলোয় আংটির হীরাটি ঝিলমিল করছিল।

টেবিলে বসে খেতে খেতেই নানাবিধ আলোচনা চলতে লাগল অতঃপর।

আহারাদির পর পুনরায় আগামী কাল আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দরলাল বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

রজত অসুস্থ ছিল, সেও শুতে গেল।

সুজাতার ঘুম আসছিল না বলে তিন তলার ছাতে বেড়াতে গেল।

কেবল একটা টর্চ ও লোডেড পিস্তল পকেটে নিয়ে প্রশান্ত বসাক বাড়ির পশ্চাতের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

চাঁদ উঠতে আজ অনেক দেরি। অন্ধকার আকাশে এক ঝাঁক তারা জলজ্বল

করছে।

দীর্ঘ দিনের অযত্নে বাগানের চারিদিকে প্রচুর আগাছা নির্বিবাদে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার রাত্রি যেন চারিদিককার আগাছা ও জঙ্গলের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। প্রাচীরের সীমানা ঘেঁষে বড় বড় দুটি কনকচাঁপার গাছ। ডালে ডালে তার অজস্র বিকশিত পুষ্প-গন্ধ বাতাসে যেন ম-ম করছে।

পায়ে-চলা একটা অপ্রশস্ত পথ বাগানের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে প্রাচীর সীমানার গেট পর্যন্ত, সেই পথটা ধরেই এগিয়ে চললেন প্রশান্ত বসাক।

॥ ঊনত্রিশ ॥

সুজাতা একাকী তিনতলার ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আজ যেন কোথায়ও হাওয়া এতটুকুও নেই। অসহ্য একটা গুমোট ভাব।

কালই সকালে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে মনস্থ করেছিল সুজাতা। এবং যাবার জন্য গতকাল দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তার মনের মধ্যে একটা আগ্রহও যেন তাকে তাড়না করছিল। কিন্তু এখন সে তাড়না যেন আর তত তীব্র নেই।

ছোট্‌কার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে যে বিহ্বলতা এসেছিল সেটাও যেন কেমন থিতিয়ে এসেছে। নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে হয়।

বিশেষ একখানি মুখ মনের মধ্যে যেন কেবলই ভেসে ভেসে ওঠে। মনে হয় সত্যিই তো, তাড়াতাড়ি লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়ে কি হবে! সেই তো দৈনন্দিনের রুটিন-বাঁধা একঘেয়ে শিক্ষয়িত্রীর জীবন।

একই বহুবার পঠিত বইয়ের পাতাগুলি একের পর এক উল্টে যাওয়া, একই কথা, একই লেখা, কোন বৈচিত্র্য নেই। কোন নূতনত্ব বা কোন আবিষ্কারের আনন্দ বা উত্তেজনা নেই।

সেই স্কুল, সেই বাসা।

বহু পরিচিত লক্ষ্ণৌ শহরের সেই রাস্তাঘাটগুলো।

সীমাবদ্ধ একটা গণ্ডির মধ্যে কেবলই চোখ-বাঁধা বলদের মত পাক খাওয়া।

এই জীবন তো সুজাতা কোনদিন চায়নি। কল্পনাও তো কখনো করেনি। সারাটা জীবন ধরে এমনি করেই সে রুক্ষ এক মরুভূমির মধ্যে ঘুরে ঘুরেই বেড়াবে!

সেও তো কতদিন স্বপ্ন দেখেছে, জীবনের পাত্রখানি তাঁর একদিন সুধারসে কানায় কানায় ভরে উঠবে। জীবন-মাধুর্য পরিপূর্ণতায় উপচে পড়বে।

জীবনের ত্রিশটা বছর কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেল!

কোথা থেকে এত মিষ্টি চাঁপা ফুলের গন্ধ আসছে! মনে পড়ল আজই সকালে জানলার ভিতর দিয়ে সে দেখেছে বাগানের প্রাচীর সীমানার ধার ঘেঁষে বড় বড় দুটি কনক চাঁপার গাছ অজস্র স্বর্ণ-ফুলে যেন ছেয়ে আছে। এ তারই গন্ধ।

ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদ দেখা দিল আকাশ-দিগন্তে। আবছা মৃদু কোমল আলোর একটি আভাস যেন চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।

কত রাত হয়েছে, কে জানে!

সুজাতা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

শেষ সিঁড়িতে পা দিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই আপনার অজ্ঞাতেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে যায় সুজাতা।

ও কি! ওটা কি!

চাঁদের আবছা আলোয় বারান্দায় দীর্ঘ শ্বেত বস্ত্রাবৃত ওটা কি!

ভয়ে আতঙ্কে স্থান কাল ভুলে দীর্ণ আর্ত একটা চিৎকার করে উঠল সুজাতা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ির শেষ ধাপের উপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

প্রশান্ত বসাকও তখন সবেমাত্র বাগান থেকে ফিরে দোতলায় ওঠবার প্রথম ধাপে পা দিয়েছেন। সুজাতার কণ্ঠনিঃসৃত আর্ত সেই তীক্ষ্ণ চিৎকারের শব্দটা তাঁর কানে যেতেই তিনি চমকে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পান যেন একটা দ্রুত পদধ্বনি উপরের বারান্দায় মিলিয়ে গেল। এক মুহূর্তও আর দেরি করলেন না প্রশান্ত বসাক।

প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে দু-তিনটা সিঁড়ি এক একবারে অতিক্রম করে ছুটলেন উপরের দিকে।

বারান্দায় এসে যখন পৌঁছলেন, দেখলেন পুরন্দর চৌধুরীও ইতিমধ্যে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন।

কি! কি ব্যাপার! কে যেন চিৎকার করল! পুরন্দর চৌধুরী সামনেই প্রশান্ত বসাককে দেখে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, আমিও শুনেছি সে চিৎকার। বলতে বলতেই হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল

তিনতলার ছাতে ওঠবার সিঁড়িটার মুখেই কী যেন একটা পড়ে আছে।

ছুটেই একপ্রকার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে প্রশান্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও সুজাতাকে চিনতে তাঁর কষ্ট হয় না।

পুরন্দর চৌধুরীও প্রশান্ত বসাকের পিছনে এসে গিয়েছিলেন এবং তিনিও সুজাতাকে চিনতে পেরেছিলেন। বিস্মিতকণ্ঠে তিনি বললেন, এ কি, সুজাতা দেবী এখানে পড়ে!

প্রশান্ত বসাক ততক্ষণ সুজাতার জ্ঞানহীন দেহটা পরম স্নেহে দু হাতে তুলে নিয়েছেন। সুজাতার ঘরের দিকে এগুতে এগুতে বললেন, ছাতের সিঁড়ির দরজাটায় শিকল তুলে দিন তো মিঃ চৌধুরী।

সুজাতার ঘরে প্রবেশ করে তার শয্যার ওপরেই ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলেন সুজাতাকে।

চোখে মুখে জলের ছিটে দিতেই সুজাতার লুপ্ত জ্ঞান ফিরে এল।

চোখ মেলে তাকাল সে।

সুজাতা দেবী!

কে?

আমি প্রশান্ত সুজাতা দেবী।

আমি—

একটু চুপ করে থাকুন।

কিন্তু সুজাতা চুপ করে থাকে না। বলে, এ বাড়িতে নিশ্চয়ই ভূত আছে প্রশান্তবাবু।

ভূত!

হ্যাঁ। স্পষ্ট বারান্দায় আমি হেঁটে বেড়াতে দেখেছি।

ইতিমধ্যে পুরন্দর চৌধুরী রজতকে ডেকে তুলেছিলেন। রজতও এসে কক্ষে প্রবেশ করে বলে, ব্যাপার কি, কি হয়েছে সুজাতা?

প্রশান্ত বসাক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী ঠিক দেখেছেন বলুন তো সুজাতা দেবী?

সাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটা মূর্তি বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছিল। আমাকে দেখেই ছুটে সেই মূর্তিটা যেন ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

প্রশান্ত বসাককে মনে হল যেন অত্যন্ত চিন্তিত।

রজত আবার কথা বলে, তাহলে রেবতী যে ছায়ামূর্তির কথা এ বাড়িতে মধ্যে

মধ্যে রাত্রে দেখা দেয় বলেছিল তা দেখছি মিথ্যা নয়।

ছায়ামূর্তি? সে আবার কি? পুরন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করলেন রজতকে।

হ্যাঁ, আপনি শোনেননি?

কই, না তো।

যাকগে সে কথা। রজতবাবু, এ ঘরে আপনি ততক্ষণ একটু বসুন, আমি আসছি।

কথাটা বলে হঠাৎ যেন প্রশান্ত বসাক ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ ত্রিশ ॥

প্রশান্ত বসাক সুজাতার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালালেন।

কিরীটীর কথাটাই তাঁর ঐ মুহূর্তে নতুন করে মনে পড়েছিল, সে বলেছিল ল্যাবরেটারী ঘরটা আর একবার ভাল করে দেখতে।

শূন্য ঘর। কোথাও কিছু নেই।

তবু সমস্ত ল্যাবরেটারী ঘর ও তৎসংলগ্ন বিনয়েন্দ্রর শূন্য শয়ন ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন।

কিন্তু কোথায়ও কিছু নেই। আবার ল্যাবরেটারী ঘরে ফিরে এলেন।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ল্যাবরেটারীর মধ্যস্থিত বাথরুমের দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা।

এগিয়ে গেলেন প্রশান্ত বসাক বাথরুমের দিকে।

কিন্তু বাথরুমের দরজাপথে প্রবেশ করতে গিয়েই যেন দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন। দরজার সামনে কতকগুলো অস্পষ্ট জলসিক্ত পায়ের ছাপ। ছাপগুলো ঘরের মধ্যে এসে যেন বাথরুম থেকে প্রবেশ করেছে। খালি পায়ের ছাপ। বাথরুমের খোলা দরজাপথে প্রশান্ত বসাক ভিতরে উঁকি দিলেন, বাথরুমের মেঝেতে জল জমে আছে, বুঝলেন ঐ জল লেগেই পায়ের ছাপ ফেলেছে এ ঘরে।

প্রশান্ত বসাক এবারে বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বাথরুমে একটি মাত্রই কাচের জানালা। ঠিক ল্যাবরেটারী ঘরেরই জানালার অনুরূপ।

লোহার ফ্রেমে ঘষা কাচ বসানো একটি মাত্রই পাল্লা। এবং সেই পাল্লাটি ঠিক মধ্যস্থলে একটি ফালক্রামের সাহায্যে দড়ি দিয়ে ওঠা নামা করা যায়।

প্রশান্ত বসাক বাথরুমের মধ্যে ঢুকে দেখলেন, জানলার পাল্লাটি ও.......

হস্তধৃত টর্চের আলোর সাহায্যে বাথরুমের আলোর সুইচটা খুঁজে নিয়ে আলোটা জ্বালালেন মিঃ বসাক।

বাথরুমটা আলোয় ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে প্রশান্তর মনে হল ঘরের সংলগ্ন ঐ বাথরুমটি যেন বরাবর ছিল না। পরে তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে ঐ বড় হল-ঘরটির সংলগ্ন এই ছোট ঘরটি পূর্বে অন্য কোন ব্যাপারে ব্যবহার করা হত, বিনয়েন্দ্র পরে সেটিকে নিজের সুবিধার জন্য বাথরুমে পরিণত করে নিয়েছিলেন।

প্রশান্তর বুঝতে কষ্ট হয় না, বাথরুমের ঐ জানলাপথেই কেউ এ ঘরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু কি ভাবে এল জানলাপথে!

কাচের জানলার পাল্লাটার তলা দিয়ে উঁকি দিলেন। নীলকুঠির পশ্চাতের বাগানের খানিকটা অংশ চোখে পড়ল।

আরও একটু ঝুঁকে পড়ে ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে চোখে পড়ল জানলার ঠিক নীচেই চওড়া কার্নিশ।

সেই কার্নিশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় বটে, তবে সেটা বেশ বিপদসঙ্কুল এবং শুধু তাই নয় সাহসেরও প্রয়োজন।

আবার ঘরের মেঝেতে জলসিক্ত সেই অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন—যদি কোন বিশেষত্ব থাকে পদচিহ্নগুলোর মধ্যে। কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বই চোখে পড়ল না প্রশান্ত বসাকের।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে একসময় ফিরে এলেন ল্যাবোরেটারী ঘরের মধ্যে প্রশান্ত বসাক।

পূর্বোক্ত ঘরে প্রশান্ত বসাক যখন ফিরে এলেন, রজত সুজাতার পাশে বসে আছে আর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে লম্বা সেই বিচিত্র পাইপটায় নিঃশব্দে ধূমপান করছেন পুরন্দর চৌধুরী। সুজাতার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

একটা কটু তীব্র তামাকের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রশান্তর পদশব্দে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই যুগপৎ চোখ তুলে দরজার দিকে তাকাল। পুরন্দর চৌধুরীই প্রথমে কথা বললেন, Anything wrong ইন্সপেক্টার?

না। কিছুই দেখতে পেলাম না।

আমার মনে হয় হঠাৎ উনি কোন রকম ছায়া-টায়া দেখে হয়তো—

পুরন্দর চৌধুরীর কথাটা শেষ হল না। জবাব দিল সুজাতাই, কোন রকম যে সেটা নয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত মিঃ চৌধুরী। হঠাৎ দেখে আচমকা চিৎকার করে উঠেছিলাম বটে সত্যি, তবে সে দেখার মধ্যে কোন রকম র ভুল হয়নি।

কিন্তু তাই যদি হবে, তবে এত তাড়াতাড়ি সেটা উধাও হয়ই বা কি করে না থেকে? কথাটা বললে রজত।

কিন্তু সেটাই তো আমার না দেখবার বা কিছু একটা ভুল দেখবার একমাত্র নয় রজতদা। জবাবে বলে সুজাতা।

না। উনি ভুল দেখেননি রজতবাবু। কথাটা বললেন এবারে প্রশান্ত। এবং তাঁর কথায় ও তাঁর গলার স্বরে পুরন্দর চৌধুরী ও রজত দুজনেই যেন যুগপৎ চমকে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

সত্যি বলছেন আপনি মিঃ বসাক? কথাটা বলে রজত।

হ্যাঁ রজতবাবু, আমি সত্যিই বলছি। কিন্তু রাত প্রায় পৌনে দুটো বাজে, বাকি রাতটুকু আপনারা সকলেই ঘুমবার চেষ্টা দেখুন, আমিও এবারে শুতে যাব, ঘুমে আমার দু চোখ ভেঙে আসছে।

সমস্ত আলোচনাটার উপরে যেন অকস্মাৎ একটা দাঁড়ি টেনে প্রশান্ত বসাক বোধ হয় ঘর ত্যাগ করে নিজের ঘরে শুতে যাবার জন্যই পা বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। এবং কক্ষ ত্যাগের পূর্বে সুজাতাকে লক্ষ্য করে বললেন, ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়ে শোবেন মিস রয়।

কথাটা শেষ করেই আর মুহূর্তমাত্রও দাঁড়ালেন না ইন্সপেক্টার, নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

অতঃপর রজত ও পুরন্দর চৌধুরীও যে যার ঘরে শুতে যাবার জন্য পা বাড়াল।

প্রশান্ত নিজের নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা কেবল ভেজিয়ে দিলেন।

ঘুমের কথা বলে আলোচনার সমাপ্তি করে বিদায় নিয়ে এলেও ঘুম কিন্তু প্রশান্ত বসাকের দু চোখের কোথাও তখন ছিল না।

তিনি কেবল নিজের মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া আর একবার ভাল করে ভেবে দেখতে চান।

বাথরুমের মেঝেতে, জলসিক্ত পদচিহ্নগুলো সত্যিই তাঁকে বিশেষ ভাবেই যেন বিচলিত করে তুলেছিল। আর কিছু না হোক পদচিহ্নগুলো সুস্পষ্টভাবে একটা জিনিস প্রমাণিত করছে, ওই রাত্রে কিছুক্ষণ আগে কোন তৃতীয় ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাব ওই নীলকুঠিতে ঘটেছিল নিঃসন্দেহে। কোন ছায়ার মায়া নয়। এবং লছমনের মুখে শোনা সেই ভৌতিক আবির্ভাবের সঙ্গে যে আজকের রাত্রে সুজাতা দেবীর দেখা ছায়ামূর্তির বিশেষ এক যোগাযোগ আছে সে বিষয়েও তাঁর যেন কোনই আর সন্দেহ বা দ্বিমত থাকছে না।

আর এও বোঝা যাচ্ছে ভৌতিক ব্যাপারটা এ বাড়িতে পূর্বে যারা দেখেছে তাদের সে দেখাটাও যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি ব্যাপারটাও সত্যি সত্যিই কিছু আসলে ভৌতিক নয়।

লছমনের মুখ থেকেই তার জবানবন্দিতে শোনা গেছে রামচরণ বিনয়েন্দ্র এবং এবং লছমন নিজেও পূর্বে এ বাড়িতে রাত্রে ওই ছায়ামূর্তি নাকি দেখেছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা চলে আসছে বেশ কিছুদিন ধরে। এবং ছায়ামূর্তির ভৌতিক মুখোসের অন্তরালে যখন সত্যিকারের একটি জলজ্যান্ত মানুষ আছে তখন ওর পশ্চাতে কোন রহস্য যে আছে সেও সুনিশ্চিত।

॥ একত্রিশ ॥

নীলকুঠির আশেপাশে একমাত্র বাঁদিকে লাগোয়া একটা দোতলা বাড়ি ভিন্ন আর কোন বাড়ি নেই প্রশান্ত বসাক সেটা পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন।

জায়গাটার গত কয়েক বৎসরে অনেক কিছু ডেভালপমেণ্ট হলেও ঐ অঞ্চলটির বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি।

ভোরের আলো আকাশে ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্ত বসাক নীলকুঠি থেকে বের হয়ে পড়লেন।

কুঠির আশপাশটা একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

বাঁদিককার দোতলা বাড়িটায় একজন প্রফেসার থাকেন, সংসারে তাঁর এক বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী। পূর্বেই সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল গত মাসখানেক ধরে প্রফেসার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে পুরীতে চেঞ্জে গেছেন। বর্তমানে বাড়ি দেখাশোনা করে একটি ভৃত্য।

ঘুরতে ঘুরতে প্রশান্ত বসাক নীলকুঠির ডান দিকে এবারে এলেন। সংকীর্ণ একটি গলিপথ। গলিপথটি বড় একটা ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। এবং পথটি বরাবর গঙ্গার ধার পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

এগিয়ে গেলেন সেই গলিপথ ধরে প্রশান্ত বসাক। গঙ্গার একেবারে ধারে গিয়ে যেখানে পথটা শেষ হয়েছে, বিরাট শাখা-প্রশাখাবহুল একটি পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ সেখানে।

ঢালু পাড় বরাবর অশ্বত্থ গাছের তলা থেকে গঙ্গার মধ্যে নেমে গেছে।

অশ্বত্থতলা থেকে নীলকুঠির লাগোয়া পশ্চাতের বাগানটার সবটাই চোখে পড়ে। এবং বাড়ির পশ্চাতের অংশটাও সবটাই দেখা যায়। নীলকুঠির দিকে তাকাতেই দোতলার ঐ দিককার একটি খোলা জানালা প্রশান্ত বসাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খোলা জানলার সামনে যেন স্থির একটি চিত্র। চিনতে কষ্ট হয় না কার চিত্র সেটা।

সুজাতা।

দৃষ্টি তাঁর সম্মুখের দিকে বোধ হয় গঙ্গাবক্ষেই প্রসারিত ও স্থির। হাওয়ায় মাথার চূর্ণ কুন্তলগুলি উড়ছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন প্রশান্ত বসাক সেদিকে। চোখ যেন আর ফিরতে চায় না।

ধীরে ধীরে এক সময় চোখ নামিয়ে পূর্বের পথে আবার ফিরে চললেন প্রশান্ত বসাক।

গলির অন্যদিকে যে সীমানা-প্রাচীর বহু স্থানে তা ভেঙে ভেঙে গিয়েছে। সেই রকম ভাঙাই একটা জায়গা দিয়ে প্রাচীরের অন্য দিকে গেলেন প্রশান্ত বসাক। প্রায় দু-তিন কাঠা জায়গা প্রাচীরবেষ্টিত। জীর্ণ একটি একতলা পাকা বাড়ি। গোটা তিনেক দরজা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে একটি দরজার কড়ার সঙ্গে তালা লাগানো।

এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রশান্ত বসাক সেই দরজার সামনে। পাকা ভিতের বহু জায়গায় ফাটল ধরেছে—সিমেণ্ট উঠে গিয়ে তলাকার ইটের গাঁথুনি বিশ্রী ক্ষত-চিহ্নের মত দেখাচ্ছে।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল সেই তালা দেওয়া দরজাটার সামনেই জীর্ণ বারান্দার মেঝেতে অনেকগুলো অস্পষ্ট শ্বেত পদচিহ্ন।

এবারে দিনের স্পষ্ট আলোয় পরীক্ষা করে দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, সেই শ্বেত পদচিহ্নগুলো পড়েছে পায়ে চুন লেগে থাকার দরুন। এবং এও মনে হয় গত রাত্রে

যে পদচিহ্ন অস্পষ্ট জলসিক্ত তিনি বাথরুমে দেখেছেন এগুলো ঠিক তারই অনুরূপ।

ঘরের দরজাটা বন্ধ, তালাটা ধরে টানলেন, কিন্তু ভাল জার্মান তালা, সহজে সে তালা ভাঙবার উপায় নেই।

এমন সময় হঠাৎ তাঁর কানে এল তুলসীদাসের দোঁহা মৃদু কণ্ঠে কে যেন গাইছে।

সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, একজন মধ্যবয়সী হিন্দুস্থানী গঙ্গা থেকে সদ্য স্নান করে বোধ হয় হাতে একটা লোটা ঝুলিয়ে তুলসীদাসের দোঁহা গাইতে গাইতে ঐ গৃহের দিকেই আসছে।

হিন্দুস্থানী ব্যক্তিটি দণ্ডায়মান প্রশান্ত বসাকের কাছ বরাবর এসে মুখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কিস্‌কো মাঙতে হে বাবুজী?

এ কোঠিমে আপই রহেতে হে?

হ্যাঁ। লেকেন আপ্‌ কিস্‌কো মাঙতে হে?

আপ্‌কো নাম কেয়া জী?

হরিরাম মিশির।

ব্রাহ্মণ?

হ্যাঁ, কানৌজকা ব্রাহ্মণ।

ও। এমনি বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছিলাম মিশিরজী। ভেবেছিলাম পোড়ো বাড়ি।

হঠাৎ এমন সময় পাশের একটি বন্ধ দরজা খুলে গেল এবং একটি হিন্দুস্থানী তরুণী আবক্ষ ঘোমটা টেনে বের হয়ে এল।

মিশিরজী তরুণীকে প্রশ্ন করে, কিধার যাতা হায় বেটি? গঙ্গামে?

তরুণী কোন কথা না বলে কেবল মাথা হেলিয়ে গঙ্গার দিকে চলে গেল।

প্রশান্ত বসাক চেয়ে থাকেন সেই দিকে, বিশেষ করে সেই তরুণীর চলার ভঙ্গিটা যেন প্রশান্ত বসাকের চোখের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

চোখ যেন ফেরাতে পারেন না।

বাবুজী!

মিশিরজীর ডাকে আবার ফিরে তাকালেন প্রশান্ত বসাক।

বাবুজী কি এই উত্তর পাড়াতেই থাকেন?

অ্যাঁ! না—মানে—

এখানে ঢুকলেন কি করে? গেটে আমার তালা দেওয়া।

না না—গেট দিয়ে আমি ঢুকিনি ; ঐ যে ভাঙা প্রাচীর—তারই ফাঁক দিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম পোড়ো বাড়ি।

হ্যাঁ বাবুজী, এতদিন পোড়ো বাড়িই ছিল, মাসখানেকের কিছু বেশী হবে মাত্র আমরা এখানে এসে উঠেছি। তা বাবুজী দাঁড়িয়েই রইলেন, ঘর থেকে একটা চৌকি এনে দিই, বসুন—

না না, মিশিরজী, ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এমনিই বেড়াতে চলে এসেছি। এবারে যাই।

প্রশান্ত বসাক তাড়াতাড়ি নেমে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

মিশিরজীও এগিয়ে এল, চলুন বাবুজী, আপনাকে গেট খুলে রাস্তায় দিয়ে আসি।

গেট থেকে বের হয়ে প্রশান্ত বসাক কিন্তু নীলকুঠির দিকে গেলেন না, উলটো পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন।

এগিয়ে যেতে যেতে একবার ইচ্ছা হল, পিছন ফিরে তাকান, কিন্তু তাকালেন না। তবে পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পেতেন তখনও খোলা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মিশিরজী একদৃষ্টে প্রশান্ত বসাকের গমনপথের দিকেই তাকিয়ে আছে।

তার দু চোখের তারায় ঝকঝকে শাণিত দৃষ্টি, বহুপূর্বেই তার সহজ সরল বোকা বোকা চোখের দৃষ্টি শাণিত ছোরার ফলার মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

॥ বত্রিশ ॥

অনেকটা পথ ঘুরে ক্লান্ত প্রশান্ত বসাক যখন নীলকুঠিতে ফিরে এলেন বেলা তখন প্রায় পৌনে আটটা।

দোতলায় চায়ের টেবিলে প্রভাতী চায়ের আসর তখন প্রায় ভাঙার মুখে।

টেবিলের দু পাশে রজত, পুরন্দর চৌধুরী ও সুজাতা বসে এবং শুধু তারা নয়, গত সন্ধ্যার পরিচিত সেই কালো কাচের চশমা চোখে স্যুটপরিহিত যুবক সুন্দরলালও উপস্থিত।

প্রশান্ত বসাককে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই একসঙ্গে তাঁর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। এবং কথা বললে পুরন্দর চৌধুরী, এই যে মিঃ বসাক,

সকাল বেলাতেই উঠে কোথায় গিয়েছিলেন ?

এই একটু মর্নিংওয়াক করতে গিয়েছিলাম। তারপর মিঃ সুন্দরলাল, আপনি কতক্ষণ ?

এই আসছি।

সুজাতা ততক্ষণে উঠে চায়ের কেতলিটার গায়ে হাত দিয়ে তার তাপ অনুভব করে বললে, কেতলির চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আপনি চা খাননি, রেবতীকে বলে আসি কিছু গরম চা দিতে প্রশান্তবাবু।

কথাগুলো বলে এগিয়ে যেতে উদ্যত হতেই সুজাতাকে বাধা দিলেন মিঃ বসাক না না—আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস রয়। বসুন আপনি।

সুজাতা স্মিতকণ্ঠে বললে, ব্যস্ত নয়, আমিও আর একটু চা খাব।

গতরাত্রের মত আজও ঘরে প্রবেশ করার মুখে প্রশান্ত বসাক লক্ষ্য করেছিলেন, মিঃ সুন্দরলাল ও পুরন্দর চৌধুরী পাশাপাশি একটু যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেই নিম্নকণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর কথা বলছিলেন, এবং প্রশান্ত বসাকের কক্ষমধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা যেন অকস্মাৎ চুপ করে গেলেন।

সুজাতা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দু মিনিট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় এখুনি আসছি বলে প্রশান্ত বসাকও বের হয়ে এলেন ঘর থেকে। এবং সোজা নিচে চলে গেলেন।

নিচের তলায় প্রহরারত কনস্টেবল মহেশকে নিম্ন অথচ দ্রুতকণ্ঠে কি কতগুলো নির্দেশ দিয়ে বললেন, যাও এখুনি, বাইরে গেটের পাশে হরিসাধন আছে সাধারণ পোশাকে, যা যা বললাম তাকে বলবে। যেমন যেমন প্রয়োজন বুঝবে সে যেন করে।

ঠিক আছে, আমি এখুনি গিয়ে বলে আসছি।

মহেশ বাইরে চলে গেল।

মহেশকে নির্দেশ দিয়ে প্রশান্ত বসাক যেমন ঘুরে সিঁড়ির দিকে দোতলায় ওঠবার জন্য পা বাড়াতে যাবেন, আচমকা তাঁর নজরে পড়ল নীচের একখানি ঘরের ভেজানো দুই কবাটের সামান্যতম মধ্যবর্তী ফাঁকের মধ্য দিয়ে একজোড়া শিকারীর চোখের মত জলজ্বলে চোখের দৃষ্টি যেন চকিতে কবাটের অন্তরালে দেখা দিয়েই আত্মগোপন করল।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রশান্ত বসাক।

মুহূর্তকাল ভ্রূকুঞ্চিত করে কি যেন ভাবলেন, তারপর সোজা এগিয়ে গেলেন

সেই ঈষন্মুক্ত দ্বারপথের দিকে।

হাত দিয়ে ঠেলে কবাট দুটো খুলে ফেললেন, খালি ঘর, ঘরে কেউ নেই।

চিনতে পারলেন করালীর ঘর ওটা। পাশেই পাচক লছমনের ঘর। দু-ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটার দিকে এবারে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু দরজার কবাট ঠেলতে গিয়ে বুঝলেন ওপাশ থেকে দরজা বন্ধ। বের হয়ে এলেন করালীর ঘর থেকে প্রশান্ত বসাক। বারান্দা দিয়ে গিয়ে লছমনের ঘরের সামনের দরজা ঠেলতেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু দেখলেন পাচক লছমনের ঘরও খালি। সে ঘরেও কেউ নেই। আরো দেখলেন করালী ও লছমনের ঘরের মধ্যবর্তী দরজার গায়ে সেই ঘর থেকেই খিল তোলা। ঐ ঘরের ঐ মধ্যবর্তী দরজাটি বাদেও আরও, দুটি দরজা ছিল। এবং দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটি বাদেও অন্য দুটি দরজাই খোলা ছিল।

যার চোখের ক্ষণিক দৃষ্টি ক্ষণপূর্বে মাত্র তিনি পাশের ঘরের উন্মুক্ত দরজা-পথে দেখেছিলেন, সে অনায়াসেই তাহলে এ দ্বিতীয় দরজাটি দিয়ে চলে যেতে পারে।

হঠাৎ ঐ সময় বারান্দার দিকে দ্বিতীয় যে দ্বারটি সেটি খুলে গেল এবং চায়ের কাপ হাতে গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে করালী এসে ঘরে প্রবেশ করেই ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান ইন্সপেক্টারকে দেখে যেন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, ইন্সপেক্টার সাহেব!

হ্যাঁ, তোমার ঘরটা আমি দেখছিলাম করালী।

করালী চা-ভর্তি কাপটা একটা টুলের উপরে নামিয়ে রেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

কোথায় ছিলে করালী?

রান্নাঘরে চায়ের জন্য গিয়েছিলাম সাহেব।

রান্নাঘরে আর কে কে আছেন?

লছমন আর নতুন দিদিমণি আছেন।

প্রশান্ত বসাক করালীর সঙ্গে দ্বিতীয় আর কোন কথাবার্তা না বলে করালী যে পথে ঘরে প্রবেশ করেছিল ক্ষণপূর্বে, সেই খোলা দ্বার দিয়েই বের হয়ে গেলেন। এবং সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন সুন্দরলাল ঘরে তখন নেই। রজত আর পুরঞ্জয় চৌধুরী বসে বসে গল্প করছেন, আর কেউ ঘরে নেই।

একটু পরেই সুজাতা এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং তার পিছনে পিছনেই

চায়ের কেতলী নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল রেবতী।

চা পান করতে করতেই সামনাসামনি উপবিষ্ট সুজাতার দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বসাক বলেন, তাহলে আজই আপনি কলকাতায় চলে যাচ্ছেন মিস রয়?

সুজাতা প্রশান্ত বসাকের প্রশ্নে একবার মাত্র তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, তাই ভেবেছিলাম যাব, কিন্তু রজতদা বলছে, দু-চারদিনের মধ্যে ও ফিরে যাবে, সেই সঙ্গেই যাবার জন্যে।

হ্যাঁ মিঃ বসাক, আমি তাই বলছিলাম সুজাতাকে। যেতে ওকেও হবে, আমাকেও হবে। এদিককার ব্যবস্থাপত্র যাহোক একটা কিছু করে যেতে হবে তো। এবং সেজন্য ওর ও আমার দুজনেরই থাকা প্রয়োজন। আপনি কি বলেন মিঃ বসাক? রজত কথাগুলো বললে।

হ্যাঁ, আপনারাই যখন বিনয়েন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশান তখন—

ইন্সপেক্টারকে বাধা দিল সুজাতা, না, ছোট্‌কার সম্পত্তির এক কপর্দকও আমি স্পর্শ করব না, তা আমি রজতদাকে বলেই দিয়েছি।

হ্যাঁ, সুজাতা তাই বলছিল বটে। কিন্তু মিঃ বসাক, আপনিই বলুন তো তাই কখনও কি হয়। সম্পত্তি ওকেও আমার সঙ্গে সমান ভাগে নিতে হবে বৈকি, কি বলেন?

না রজতদা, ও আমি স্পর্শও করব না। তুমিই সব নাও।

কিন্তু আমিই বা তোর ন্যায্য সম্পত্তি নিতে যাব কেন? বেশ তো, তোর ভাগ তুই না নিস—যে ভাবে খুশি দান করে যা বা যে কোন একটা ব্যবস্থা করে যা।

বেশ, তাই করে যাব।

এমন সময় প্রতুলবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

এই যে প্রতুলবাবু, আসুন। রজত আহ্বান জানাল প্রতুলবাবুকে।

প্রতুলবাবু এগিয়ে এসে একটা খালি চেয়ারে উপবেশন করলেন।

অ্যাটর্নী চট্টরাজকে একবার আজ আসবার জন্য আপনাকে খবর দিতে হবে প্রতুলবাবু। রজত বলে।

প্রতুলবাবু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে রজতের মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন। প্রতুলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রজত কথাটার আবার পুনরাবৃত্তি করে, ছোট্‌কার অ্যাটর্নী চট্টরাজকে কাল কোন এক সময় আসবার জন্য একটা সংবাদ দেবেন। তাছাড়া, আমিও আর এখানে অনির্দিষ্ট কাল বসে থাকতে পারব

না। লাহোরে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

প্রতুলবাবু যেন এতক্ষণে ব্যাপারটা কিছু যাহোক বুঝতে পারেন। বললেন, এ বাড়িতে তাহলে আপনারা কেউই থাকবেন না রজতবাবু?

কে থাকবে এই চক্রবর্তীদের ভুতুড়ে নীলকুঠিতে বলুন। শেষকালে কি চক্রবর্তীদের প্রেতাত্মার হাতে বেঘোরে প্রাণটা দেব!

তাহলে এ বাড়িটার কী ব্যবস্থা হবে?

আপনি রইলেন, বেচে দেবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু আমি তো আর চাকুরি করব না রজতবাবু। মৃদু শান্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন প্রতুলবাবু।

তার মানে, চাকরি ছেড়ে দেবেন?

হ্যাঁ। তাছাড়া, এসব বাড়িঘর-দোর সব যখন আপনারা বেচেই দেবেন তখন আর আমার প্রয়োজনই বা কি! চক্রবর্তী মশাইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই এক প্রকার আমার কোন কাজকর্ম ছিল না। তবু চক্রবর্তী মশাই মরবার আগে বিশেষ করে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, বিনয়েন্দ্রবাবুকে যেন একলা ফেলে আমি না চলে যাই। তাই ছিলাম। তা এখন সে প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

হঠাৎ এমন সময় সুজাতা কথা বলে, এক কাজ করলে হয় না রজতদা?

কী?

ছোট্‌কার ঐ ল্যাবরেটারীটা প্রাণের চাইতেও প্রিয় ছিল। সমস্ত নীলকুঠিটাকেই একটা গবেষণাগারে পরিণত করে দুঃস্থ বৈজ্ঞানিকদের এখানে গবেষণার একটা ব্যবস্থা করে দিলে হয় না?

কিন্তু আমার তো মনে হয়—

রজতকে বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, অবিশ্যি আমি আমার অংশের ব্যবস্থাটা সেই ভাবেই করতে পারি। তবে তুমি—

না না—কথাটা তুই নেহাত মন্দ বলিসনি সুজাতা। দেখি ভেবে। হ্যাঁ প্রতুলবাবু, আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন, কোথায় কার কি দেনা-পাওনা আছে, চাকরবাকরদের মাইনেপত্র কে কি পাবে না পাবে সব একটা হিসাবপত্র করে ফেলুন। যত তাড়াতাড়ি পারি এদিককার সব মিটিয়ে দিয়ে আমাকে একবার লাহোর যেতে হবে।

যে আজ্ঞে। তাই হবে। এখন তাহলে আমি উঠলাম

প্রতুলবাবু বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখুন। বেশি দূরে নয়, সামনেই হয়তো তিনি আছেন।

সামনেই আছে?

হ্যাঁ। জানেন, আমাদের বাংলা দেশে এক শ্রেণীর সাপ আছে, যাকে বলা হ গ্রাম্য ভাষায় লাউডগা সাপ। লাউপাতার সবুজ পত্রের মতই তার গায়ের বর্ণ এবং সেই কারণেই সাপ যখন লাউ গাছে জড়িয়ে থাকে হঠাৎ বড় একটা চোখে পড়ে না। অথচ সাবধান না হলে দংশন করে।

কিরীটির শেষের কথায় চকিতে একটা সম্ভাবনা যেন বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই প্রশান্ত বসাকের মনের মধ্যে ঝিলমিল করে ওঠে। তবে কি—সঙ্গে সঙ্গেই তারপর প্রা প্রশান্ত বসাক বলে ওঠেন, বুঝেছি। বুঝেছি আপনার ইঙ্গিত মিঃ রায়। ধন্যবা ধন্যবাদ। আচ্ছা নমস্কার। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে প্রশান্ত বসাক কয়েকট মুহূর্ত মনে মনে কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার রিসিভারটা তুলে নিয়ে হেড কোয়ার্টারে কনেকশন চাইলেন।

প্রশান্ত বসাক জিজ্ঞাসা করলেন, যে সংবাদগুলো জানবার জন্য ওয়্যার করতে বলেছিলাম তার জবাব এসেছে কি?

না, এখনও আসেনি, জবাব এলে—

এলেই আমাকে জানাবেন, এ বাড়ির ফোন-নম্বরটা টুকে নিন।

প্রশান্ত বসাক নীলকুঠির ফোন-নম্বরটা দিয়ে দিলেন।

ঐদিন সমস্ত দ্বিপ্রহরটা মিঃ বসাক তন্ন তন্ন করে ল্যাবরেটারী ঘরের যাবতী সব কিছু নেড়ে-চেড়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন। যদি আর কোন নতুন সূ পাওয়া যায়।

ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ড্রয়ারে আলমারির মধ্যে একটা হাতীর দাঁতের সুদৃ কৌটো পেলেন। এবং পেলেন একটা নোট-বই। কৌটোটার মধ্যে আট-দশট মুক্তো পাওয়া গেল। বুঝলেন ঐগুলিই সেই সিঙ্গাপুরী মুক্তা। আর কালো মরোক্কো চামড়ায় বাঁধা ডিমাই সাইজের নোট-বুকটা। নোট-বুকটার প্রায় দুইয়ে তিন অংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

নানা ধরনের অঙ্ক, রসায়ন শাস্ত্রের অনধিগম্য অবোধ্য সব ফরমূলা লেখা পাতা পাতায়।

অন্যমনস্কভাবে নোট-বইয়ের পাতাগুলো উল্টাতে লাগলেন প্রশান্ত বসাক হঠাৎ শেষের দিকে একটা পাতায় দেখলেন দুর্বোধ্য সব অঙ্কের নীচেই স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লেখা—লতা।

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন তিনি অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠলেন। অকস্মাৎ তাঁর মনের মধ্যে একটা সরীসৃপ যেন শিরশিরিয়ে উঠেছে। এবং শুধু লতা শব্দটিই : তার চারপাশে নানাপ্রকারের বিচিত্র সব কালির আঁকিবুঁকি কাটা।

আবার পাতা উল্টে চললেন। এবং অন্য আর এক পাতায় দেখলেন লেখা—লতা চলে গেল।

তার নীচে আবার অঙ্ক কষা আছে। আবার পাতা উল্টে চললেন। হঠাৎ আবার শেষের একটা পৃষ্ঠায় নজর আটকে গেল। সেখানে লেখা : লতা কি আর ফিরে কোনদিনই আসবে না! তবে সে কেন এল!

একদৃষ্টে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বার বার লেখাটা পড়তে পড়তে হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য আর একটি কথা মনে পড়ে যায় প্রশান্ত বসাকের।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায় তাঁর।

যে সম্ভাবনাটা এইমাত্র তাঁর মনে উদয় হয়েছে তার মীমাংসার জন্য তাড়াতাড়ি নোট-বুকটা বন্ধ করে পকেটে পুরে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন প্রশান্ত বসাক।

বাইরে বেলা অনেকখানি গড়িয়ে এসেছে। সূর্যের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে।

নিজের নির্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন প্রশান্ত বসাক; এবং ঘরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

॥ চৌত্রিশ ॥

ঐদিনই সন্ধ্যার দিকে ডাইনিং হলে সান্ধ্য চা-পানের পর এক সময় প্রশান্ত বসাক তাঁর পকেট থেকে চারখানা কাগজ বের করলেন। চারখানা কাগজেই কি যেন সব লেখা রয়েছে। লেখা কাগজ চারখানি হাতে করে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সুজাতা, রঞ্জত ও পুরন্দর চৌধুরী ও প্রতুলবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা প্রত্যেকেই এই কাগজগুলো পড়ে দেখুন। কাগজে আমি বাংলায় আপনাদের প্রত্যেকের জবানবন্দি সংক্ষেপে আলাদা আলাদা করে লিখেছি। পড়ে দেখুন, আপনারা যে যেমন জবানবন্দি দিয়েছেন আমার লেখার সঙ্গে তা মিলছে কিনা।

প্রত্যেকেই যেন একটু বিস্মিত হয়ে যে যার হাতের কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরে পড়তে শুরু করে।

প্রশান্ত বসাক নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকেন।

খুব সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি, পড়তে কারোরই বেশি সঃ

পড়লেন? কারও জবানবন্দিতে কোন ভুল নেই তো? প্রত্যেকের দিকেই তাকিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্নটা করলেন প্রশান্ত বসাক।

না। প্রত্যেকেই জবাব দেয়।

বেশ। এবারে আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাগজের তলায় বাংলায় বেশ পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। উপরিউক্ত জবানবন্দির মধ্যে কোন ভুল নেই এবং পরে তার নীচে আপনারা যে যার নাম দস্তখত করুন।

প্রথমটায় কয়েকটা মুহূর্ত প্রশান্ত বসাকের প্রস্তাবে কেউ কোন জবাব দেয় না। কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

আমার বক্তব্যটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন?

জবাব দিল এবারে প্রথমে রজতই, বললে, হ্যাঁ। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না মিঃ বসাক, এর কি প্রয়োজন ছিল?

সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলবাবু জবাব দেন, তাই মিঃ বসাক। আমিও তাই বলতে চাইছিলাম। তাছাড়া আমি তো এখানে আদৌ উপস্থিতই ছিলাম না।

কিন্তু আমার প্রস্তাবে আপনাদের আপত্তি কি থাকতে পারে তাও তো বুঝতে পারছি না প্রতুলবাবু।

আমার ও আমাদের যার যা বলবার ছিল সবই খোলাখুলি ভাবে আপনাদের কাছে বলেছি ইন্সপেক্টার। কথাটা বললে রজত।

অস্বীকার করছি না রজতবাবু সে কথা আমি। এবং পড়েই তো দেখলেন, আপনারা যে যেমন জবানবন্দি আমাদের কাছে দিয়েছেন সেইটুকুই কেবল ঐ কাগজে লিখেছি আমি। তবে আপনাদের আপত্তিটাই বা হচ্ছে কেন? অবিশ্যি you are at liberty—যদি কিছু অন্যরকম লিখে থাকি সে জায়গাটা বরং কেটে ঠিক করে আপনারাই লিখে দিন।

প্রশান্তবাবু তো ঠিকই বলছেন রজতদা। দিন কলম, আমি লিখে সই করে দিচ্ছি। এতক্ষণে সর্বপ্রথম কথা বললে সুজাতা।

প্রশান্ত বসাক সুজাতার দিকে কলমটা এগিয়ে দিলেন।

সুজাতা কোনরূপ দ্বিধামাত্রও না করে জবানবন্দির নীচে নিজের নামটা সই করে কাগজটা এগিয়ে দিল প্রশান্ত বসাকের দিকে, এই নিন।

পুরন্দর চৌধুরী এবার কথা বললেন, আমি যদি ইংরাজীতে লিখি আপত্তি

আছে আপনার মিঃ বসাক ?

কেন বলুন তো ?

দীর্ঘ দিনের অনভ্যাসের ফলে বাংলা আমি বড় একটা আজকাল লিখতে পারি না। তাছাড়া আমার বাংলা হস্তাক্ষরও অত্যন্ত বিশ্রী।

প্রশান্ত বসাক মৃদু হেসে বললেন, তা হোক। বাংলাতেই লিখুন।

অগত্যা পুরন্দর চৌধুরী যেন বেশ একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই প্রশান্ত বসাকের নির্দেশ মত কাগজটায় লিখে দিলেন।

এবং রজত ও প্রতুলবাবুও নাম সই করে দিলেন।

প্রত্যেকের লেখা ও সই করা কাগজগুলো অতঃপর আর না দেখেই ভাঁজ করে প্রশান্ত বসাক নিজের জামার বুকপকেটে রেখে দিলেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে এ ঘরে চা-পানে বসবার সময় যে আবহাওয়াটা ছিল, প্রশান্ত বসাক প্রদত্ত কাগজে নাম সই করবার পর যেন হঠাৎ সে আবহাওয়াটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। অচিন্তনীয় একটা পরিস্থিতি যেন হঠাৎ একটা ভারী পাথরের মতই সকলের মনের মধ্যে চেপে বসে। কেউ কোন কথা মুখ ফুটে স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে পারছে না, অথচ মনের গুমোট ভাবটাও যেন আর গোপন থাকছে না কারো।

বেশ কিছুক্ষণ ঘরের আবহাওয়াটা যেন একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে থমথম করতে থাকে।

সকলেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

ঘরের অস্বস্তিকর আবহাওয়া যেন প্রত্যেকেরই কেমন শ্বাস রোধ করে আনে। হঠাৎ সেই স্তব্ধতার মধ্যে কথা বলে ওঠেন পুরন্দর চৌধুরী, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি কালই চলে যেতে চাই মিঃ বসাক।

বেশ। যাবেন। তবে কলকাতায় যেখানেই থাকুন ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন যাবার আগে।

কিন্তু কলকাতায় তো আমি থাকব না মিঃ বসাক। প্লেন পেলে কালই আমি সিঙ্গাপুর চলে যাব।

সিঙ্গাপুর আপনি হেড কোয়ার্টারের পারমিশন ছাড়া যেতে পারবেন না মিঃ চৌধুরী।

কিন্তু সে পারমিশনের জন্য সব কাজকর্ম ফেলে এখনো যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাকে কলকাতায় বসে থাকতে হয়—

পুরন্দর চৌধুরীর কথাটা শেষ হল না। প্রশান্ত বসাক বললেন, না, আর বড়জোর চার-পাঁচদিনের বেশী আপনাকে আটকে রাখা হবে না মিঃ চৌধুরী।

চার-পাঁচদিনের মধ্যেই তাহলে আপনাদের তদন্তের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলতে চান মিঃ বসাক? পুরন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

সেই রকমই তো আশা করা যাচ্ছে। আর শেষ না হলেও আপনাদের কাউকেই আটকে রাখা হবে না।

ভাল।

কথাটা বলে সহসা পুরন্দর চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

রজত প্রতুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রতুলবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, আপনি একবার নীচে আসবেন কি?

চলুন।

প্রতুলবাবু ও রজতবাবু ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে কেবল রইলেন প্রশান্ত বসাক ও সুজাতা। টেবিলের দুধারে দুজনে পরস্পরের মুখোমুখি বসে।

হঠাৎ প্রশান্ত বসাকের কণ্ঠস্বরে যেন চমকে মুখ তুলে তাকাল সুজাতা তাঁর দিকে।

একটা কথা বলছিলাম সুজাতা দেবী।

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ।

বলুন।

যদি কিছু মনে না করেন তো কথাটা বলি। প্রশান্ত বসাক যেন ইতস্ততঃ করেন।

বলুন না।

আপনি আজই কলকাতাতেই চলে যান বরং—

কেন বলুন তো? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুজাতা প্রশ্নটা করে প্রশান্ত বসাকের মুখের দিকে।

তাছাড়া প্রথমে আপনি তো যেতেও চাইছিলেন।

কিন্তু তখন তো আপনিই যেতে দিতে চাননি।

না চাইনি। কিন্তু এখন নিজে থেকেই আপনাকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ

নাচ্ছি মিস

মৃদু স্নিগ্ধকণ্ঠে সুজাতা বলে, কেন বলুন তো ?

নাই বা শুনলেন এখন কারণটা।

বেশ। তবে আজ নয়, কাল সকালেই চলে যাব।

কাল ?

হ্যাঁ।

কি ভেবে প্রশান্ত বসাক বললেন, বেশ, তাই যাবেন।

তারপর আরো কিছুক্ষণ বসে দুজনে কথা বলেন।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

ঐদিন রাত্রে।

কিরীটী ফোনে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল, চব্বিশ ঘণ্টাও উত্তীর্ণ হল না, তা সত্যি হয়ে গেল।

সে রাত্রে সকলের খাওয়াদাওয়া চুকতে প্রায় এগারটা হয়ে গেল। এবং খাওয়াদাওয়ার পর রাত সোয়া এগারটা নাগাদ যে যার নির্দিষ্ট ঘরে শুতে গেল।

প্রশান্ত বসাক তাঁর নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরের দরজার ভিতর থেকে খিল তুলে দিয়ে বাগানের দিককার খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করছিলেন একটা সিগারেট ধরিয়ে।

কিন্তু দুটি শ্রবণেন্দ্রিয়ই তাঁর সজাগ হয়ে ছিল একটি সাঙ্কেতিক শব্দের প্রত্যাশায়।

ঠিক আধঘণ্টা পরে তাঁর ঘর ও পাশের ঘরের মধ্যবর্তী দরজার গায়ে টুক্ টুক্ করে দুটি মৃদু টোকা পড়ল।

মুহূর্তে এগিয়ে গিয়ে দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে দিতেই অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত একজন নিঃশব্দে এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এসেছেন! মৃদু কণ্ঠে শুধালেন প্রশান্ত বসাক।

হ্যাঁ।

আপনার ঘর থেকে যখন বের হন কেউ আপনাকে দেখেনি তো ? দেখেনি তো কেউ আপনাকে ল্যাবরেটারী ঘরে ঢুকতে ?

না।

তাহলে এবারে আপনি নিশ্চিন্তে গিয়ে ঐ বিছানাটার ওপরে শুয়ে পড়ুন ?

শুয়ে পড়ব ?

হ্যাঁ। শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোন

প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায় না।

কি হল ?

কিন্তু কি ?

আপনি—

আমি ! আজ রাত্রে আমার ঘুমের আশা আর কোথায় !

কেন ?

একজন সম্ভবতঃ আসবেন, তাঁকে রিসিভ করতে হবে।

এত রাত্রে আবার কে আসবে !

কে আসবেন তা জানি না, তবে আশা করছি একজনকে। অবিশ্যি ভাবা হয়তো নাও আসতে পারেন আজ।

তবে মিথ্যে মিথ্যে জেগে থাকবেন কেন ? আসবার যখন তাঁর কোন স্থিরতা নেই।

তাই তো জেগে থাকতে হবে। মহৎ ব্যক্তিবিশেষ আসছেন, অভ্যর্থনার জন্য না জেগে বসে থাকলে চলবেই বা কেন !

তা রেবতী বা দারোয়ানকে বলে রাখলেই তো পারতেন, তিনি এলে তখন আপনাকে খবর দিত।

মৃদু হাসির সঙ্গে প্রশান্ত বসাক বলেন, সোজা রাস্তা দিয়ে জনান্তিকে তিনি আসবেন না বলেই তো এত হাঙ্গামা।

কি আপনি বলছেন !

ঠিক তাই সুজাতা দেবী। তাই তো আপনাকে পূর্বাহ্ণেই এ ঘরে এসে শোবার জন্য বলেছিলাম।

কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর আসবার কি সম্পর্ক ?

সেইজন্যই তো এত সাবধানতা, এত সব আয়োজন। বিশেষ করে আপনি জানেন না, কিন্তু তিনি আপনারই জন্য আসবেন আমার ধারণা।

এ সব কি আপনি বলছেন বলুন তো প্রশান্তবাবু ?

ভাবছেন হয়তো এই মাঝরাত্রে আপনাকে এ ঘরে ডেকে এনে আরব্য উপন্যাস

শানাতে শুরু করিলাম, তাই না সুজাতা দেবী? বলতে বলতে আচমকা যেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, কিন্তু আর না, এবারে আপনি শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে—

বাইরে এত রাত্রে!

হ্যাঁ, বেশী দূরে নয়, আপনার আজ রাত্রের পরিত্যক্ত শূন্য ঘরে। নিন, আপনি শুয়ে পড়ুন তো।

আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কোথায়?

কেন, আমার ঘরে। এখন বুঝতে পারছি, আমার ঘরে আজ রাত্রে কিছু ঘটবে। আপনি জানেন, আর সেইজন্যই আমার বিছানার ওপরে পাশবালিশটা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে আমাকে এ ঘরে চলে আসতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ, তাই সুজাতা দেবী। কিন্তু আপনি—আপনি জানেন না বা বুঝতে পারছেন না হয়তো সেখানে যাওয়া আপনার এখন খুব বিপজ্জনক, risky!

তা হোক, তবু আপনার সঙ্গে আমি যাব।

কিন্তু সুজাতা দেবী—

বললাম তো। যাব। সুজাতার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা।

কিন্তু আপনি! আপনি আমার সঙ্গে না গেলেই হয়তো ভাল করতেন সুজাতা দেবী।

ভাল-মন্দ বুঝি না। আমি যাব।

কয়েক মুহূর্ত প্রশান্ত বসাক কি যেন ভাবলেন, তারপর মৃদু নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন-বেশ, তবে চলুন।

প্রথমে প্রশান্ত বসাক দরজা খুলে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিলেন বারান্দার এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, শূন্য খাঁ খাঁ করছে।

পা টিপে টিপে প্রথমে প্রশান্ত বসাক তারপর বের হলেন ঘর থেকে এবং তাঁর পশ্চাতে অনুসরণ করল তাঁকে সুজাতা। এদিকে ওদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে দুজনে সুজাতার ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন।

ঘরের দরজাটা সুজাতা খুলেই রেখে এসেছিল। কেবলমাত্র দরজার কবাট দুটো ভেজানো ছিল প্রশান্ত বসাকের পূর্ব-নির্দেশ মত।

ভেজানো দরজার গায়ে কান পেতে কি যেন শোনবার চেষ্টা করলেন মিঃ বসাক; তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ভেজানো কবাট দুটি ফাঁক করে প্রথমে ঘরের

মধ্যে নিজে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর পশ্চাতে প্রবেশ করে সুজাতা। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

প্রথমটায় অন্ধকারে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমে একটু একটু করে ঘরের অন্ধকারটা যেন উভয়ের চোখেই সয়ে আসে।

বাগানের দিককার খোলা জানলা বরাবর খাটের উপরে বিস্তৃত শয্যায় অস্পষ্ট মনে হয় কে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

পায়ে হাত দিয়ে স্পর্শের ইঙ্গিতে মিঃ বসাক সুজাতাকে নিয়ে গিয়ে ঘরের সংলগ্ন যে বাথরুম তার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

চাপা সতর্ক কণ্ঠে সুজাতা প্রশ্ন করে, বাথরুমের মধ্যে এলেন কেন?

চুপ। এখানেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করে বাথরুমের ঈষদুন্মুক্ত দরজাপথে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন ঘরের ভিতরে প্রশান্ত বসাক।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। ভারী পাথরের মত যেন সমস্ত অনুভূতির উপরে চেপে বসেছে সময়ের মুহূর্তগুলো। যেন অত্যন্ত শ্লথ ও প্রলম্বিত মুহূর্তগুলি মনে হয়।

তবু এক সময় মিনিটে মিনিটে প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

সুজাতার পা দুটো যেন টনটন করছে।

রেডিয়াম ডায়েলযুক্ত দামী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বসাক দেখলেন রাত প্রায় পৌনে একটা। নাঃ! আজ রাতে বোধ হয় এল না।

কিন্তু মিঃ বসাকের চাপা কণ্ঠে উচ্চারিত কথাটা শেষ হল না। ইতিমধ্যে আকাশে বোধ হয় চাঁদ দেখা দিয়েছিল, সামান্য চাঁদের আলো বাগানের দিককার খোলা জানলাপথে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল।

খুট করে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। এবং তারপরই প্রশান্ত বসাক দেখলেন কে একজন জানলাপথে মাথা তুলে ঘরের ভিতর উঁকি দিচ্ছে।

এসেছে। অনুমান তাহলে তাঁর মিথ্যা হয়নি।

অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনার ঢেউ যেন মুহূর্তে মিঃ বসাকের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতই প্রবাহিত হয়ে যায়।

জানলাপথে ওদিকে ততক্ষণে মাথার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উর্ধ্বাংশও স্পষ্ট হয়ে উঠে মিঃ বসাকের চোখের সামনে। জানলাপথেই ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে শয্যার দিকে। শয্যার একেবারে কাছটিতে দাঁড়াল।

হঠাৎ চমকে উঠলেন মিঃ বসাক।

খোলা জানলায় আর একখানি মুখ দেখা গেল। এবং বিড়ালের মতই নিঃশব্দে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিও ঘরে প্রবেশ করল প্রায় প্রথম ছায়ামূর্তির পিছনে পিছনেই।

কিন্তু যত নিঃশব্দেই দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি ঘরে প্রবেশ করুক না কেন, প্রথম ছায়ামূর্তি বোধ হয় সেই ক্ষীণতম শব্দটুকুও শুনতে পেয়েছিল।

চকিতে প্রথম ছায়ামূর্তিও ঘুরে দাঁড়াল।

প্রথম ছায়ামূর্তি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে আলোর সুইচটা টিপে দিয়েছিল। খুট্ করে একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বলে ওঠে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সমস্ত কক্ষটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুমের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বজ্রকঠিন কণ্ঠে মিঃ বসাক বলে উঠলেন, মিঃ চৌধুরী!

ঘরের মধ্যে যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হল।

বিদ্যুৎ-চমকের মতই যুগপৎ দুই ছায়ামূর্তিই ঘুরে দাঁড়ায়।

কৌতূহলী সুজাতাও ইতিমধ্যে প্রায় মিঃ বসাকের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সে দেখল মিঃ বসাকের উদ্যত পিস্তলের সামনে সামান্য দূরের ব্যবধানে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুরন্দর চৌধুরী ও সুন্দরলাল। উভয়ের চোখেই হতভম্ব বোবা দৃষ্টি।

উদ্যত পিস্তল হাতে ওঁদের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সুজাতাকে সম্বোধন করে মিঃ বসাক বললেন, সুজাতা দেবী, নীচে রামানন্দবাবু অপেক্ষা করছেন, তাঁকে ডেকে আনুন।

॥ ছত্রিশ ॥

থানা-ইনচার্জ রামানন্দ সেন ঘরে এসে প্রবেশ করতেই মিঃ বসাক তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, এঁদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করুন মিঃ সেন, এঁরাই বিনয়েন্দ্র রায় ও রামচরণের যুগ্ম হত্যাকারী।

রামানন্দ সেন বারেকের জন্য তাঁর সম্মুখে তখনো প্রস্তরমূর্তিবৎ দণ্ডায়মান পুরন্দর চৌধুরী ও সুন্দরলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, এঁদের মধ্যে একজনকে তো চিনতে পারছি মিঃ বসাক কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে তো ঠিক এখনও চিনতে পারছি না। দ্বিতীয় ঐ মহাশয় ব্যক্তিটি কে?

মৃদু হাসলেন মিঃ বসাক রামানন্দ সেনের কথায়। তারপর স্মিত কৌতুক ভরা কণ্ঠে বললেন, ভদ্রমহাশয় ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষ উনি নন, উনি ভদ্রমহিলা মিঃ সেন।

পুরুষ নন, মহিলা! বিস্মিত কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হয় কথাটা রামানন্দ সেনের।

এবং শুধু রামানন্দ সেনই নন। ঘরের মধ্যে ঐ সময় উপস্থিত সুজাতা মিঃ বসাকের কথায় কম বিস্মিত হয় না।

সে বলে ওঠে, কি বলছেন প্রশান্তবাবু!

ঠিকই বলেছি আমি মিস রয়। ওষ্ঠের উপরে চিকন ঐ গোঁফটি আসল নয়, মেকী, মাথায় শিরস্ত্রাণ ঐ রেশমী পাগড়ি ওটিও আংশিক ছদ্মবেশ মাত্র। ওর নীচে রয়েছে বেণীবদ্ধ কেশ। চশমার কালো কাচের অন্তরালে রয়েছে দুটি নারীর চক্ষু।

কথাগুলো বলতে বলতেই ঘুরে দাঁড়ালেন মিঃ বসাক সুন্দরলালের দিকে এবং বললেন, উনি শ্রীমতী লতা দেবী।

আবার রামানন্দ সেন ও সুজাতা দুজনেই যুগপৎ চমকে মিঃ বসাকের দিকে তাকান।

কী বললেন? লতা দেবী!

কিন্তু যাকে সম্বোধন করে কথাগুলি মিঃ বসাক ক্ষণপূর্বে বললেন তিনি কিন্তু নির্বাক। পাষাণপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল।

মিঃ বসাক পুনরায় বলে উঠলেন, এত তাড়াতাড়ি অবিশ্যি প্রথম দিনের দর্শনেই আপনার চেহারায়, কণ্ঠস্বরে ও হাতের আঙুলে আমার সন্দেহ হলেও

আপনি যে সত্যি সত্যিই পুরুষ নন নারী এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারতাম না। যদি না আজই দ্বিপ্রহরে কিরীটীর সংকেত আপনার প্রতি আমাকে বিশেষভাবেই সজাগ করে দিত। তা সত্ত্বেও আমি বলব মিস সিং, আপনার ছদ্মবেশধারণ অপূর্ব নিখুঁত হয়েছিল।

একেবারে সামনাসামনি ও খোলাখুলি ভাবে চ্যালেঞ্জড্ হলেও ছদ্মবেশী লতা দেবী পাষাণপুত্তলিকার মতই এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যেন পরমুহূর্তেই পাথরের মত দণ্ডায়মান লতা দেবীকে তাঁর প্যান্টের পকেটে ডান হাতটা প্রবেশ করতে উদ্যত দেখেই চকিতে পিস্তল সমেত নিজের হাতটা উদ্যত করে মিঃ বসাক কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন, no—no—সে চান্স আপনাকে আমি দেব না। মিস সিং, প্যান্টের পকেট থেকে হাত সরান। সরান—Yes—হ্যাঁ, এতদিন ধরে এমন নৃশংস খেলা খেললেন, তারপরেও শেষটায় আপনারই জিতে আমাদের মাত করে দিয়ে যাবেন, তাই কি হয়! বলতে বলতে মিঃ রামানন্দ সেনের দিকে তাকিয়ে মিঃ বসাক এবারে বললেন, মিঃ সেন, শ্রীমতী সিংয়ের বডিটা সার্চ করুন। চৌধুরী সাহেবকেও বাদ দেবেন না যেন।

দ্বিধামাত্র না করে রামানন্দ সেন ইন্সপেক্টারের নির্দেশমত এগিয়ে গেলেন, এবং লতা সিংয়ের বডি সার্চ করতেই তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে বের হয়ে এল একটি মোটা কলমের মত বস্তু এবং শুধু তাই নয়, ছোট অটোমেটিক পিস্তলও একটি পাওয়া গেল।

আর পুরন্দর চৌধুরীর বডি সার্চ করে পাওয়া গেল একটি চমৎকার ভাবে কাপড়ে মোড়া এক হাত পরিমাণ কালো প্লাস্টিকের তৈরী রড ও একটি অটোমেটিক পিস্তল।

প্লাস্টিকের রডটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে রামানন্দ দেখছিলেন। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়ায় মিঃ বসাক বলে উঠলেন, সাবধান মিঃ সেন, ওটা যা ভাবছেন বোধ হয় তা নয়, নিছক একটি প্লাস্টিকের তৈরী রড নয়। আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো খুব সম্ভবতঃ ওটা একটা স্প্রেয়িং অ্যাপারেটাস্। এবং ওর ভিতরে আছে তীব্র কালকূট,—স্নেক ভেনম্।

কী বলছেন আপনি মিঃ বসাক!

ঠিকই বলছি বোধ হয়। দিন তো বস্তুটি আমার হাতে।

এগিয়ে দিলেন রামানন্দ সেন বস্তুটি ইন্সপেক্টারের হাতে। বসাক প্লাস্টিকের একটু পরীক্ষা করতেই দেখতে পেলেন, তার একদিকে রয়েছে কলমের

ক্যাপের মত একটি ক্যাপ। এবং সেই ক্যাপটি খুলতেই দেখা গেল তার মাথার দিকটা যেমন সরু হয়ে আসে তেমনি তারও মাথার দিকটা ক্রমশঃ সরু হয়ে এসেছে এবং সেই সরু অগ্রভাগে বিন্দু পরিমাণ একটি ছিদ্র। আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে দেখা গেল বড়টির অন্যদিকে একটি ক্ষুদ্র স্প্রিংও আছে। সেই স্প্রিংটা টিপতেই পিচকারীর মত কি খানিকটা গাঢ় তরল পদার্থ ছিটকে বের হয়ে এল।

প্রশান্ত বসাক এবারে বললেন, হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। দেখলেন তো। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন এই বিশেষ যন্ত্রটির সাহায্যেই হতভাগ্য বিনয়েন্দ্রবাবুকে সে রাত্রে এবং পরশু রাত্রে হতভাগ্য রামচরণকে হত্যা করা হয়।

উঃ, কি সাংঘাতিক! রামানন্দ সেন বলেন আত্মগতভাবে।

হ্যাঁ, সাংঘাতিকই বটে। এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপারও বটে। প্রশান্ত বসাক আবার বললেন। তারপর একটু থেমে আবার শুরু করলেন, যে বিজ্ঞান মানুষের সমাজজীবনে এনেছে প্রভূত কল্যাণ, যে বিজ্ঞানবুদ্ধি ও আবিষ্কার যুগে যুগে সমাজজীবনের পথকে নব নব সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, সেই বিজ্ঞান-প্রতিভাই বিকৃত পথ ধরেই এনেছে অমঙ্গল—সর্বনাশা ধ্বংস। লতা দেবী ও মিঃ চৌধুরী দুজনেই অপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু বিকৃত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে ওঁদের উভয়ের মিলিত প্রতিভা মঙ্গল ও সুন্দরের পথকে খুঁজে পেলে না। ফলে ওঁরা নিজেরাও ব্যর্থ হল, ওঁদের প্রতিভাও ব্যর্থ হল।

ওদিকে রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছিল।

ঘরের জানলাপথে প্রথম আলোর আবছা আভাস এসে উঁকি দেয়।

লতা ও পুরন্দর চৌধুরীকে আপাততঃ আলাদা আলাদা করে দুজনকেই পুলিসের হেপাজতে রেখে সকলে নীচে ঘরে নেমে এলেন।

সংবাদ পেয়ে রজতও এসে ওঁদের সঙ্গে যোগ দিল।

প্রশান্ত বসাকের নির্দেশমত ড্রাইভার করালীকেও পূর্বাহ্ণেই অ্যারেস্ট করা হয়েছিল।

সুজাতা, রজত ও রামানন্দ সেন সকলেই উদগ্রীব পুরোপুরি সমগ্র রহস্যটা জানবার জন্য। কী ভাবে বিনয়েন্দ্র ও রামচরণ নিহত হল, আর কেনই বা হল

মিঃ বসাক বলতে লাগলেন তখন সেই কাহিনী।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

কিরীটী আমাকে সব শুনে বলেছিল এই হত্যা-রহস্যের মধ্যে কোন একটি নারী আছে। কিরীটীর কথা শুনে সমগ্র ঘটনা পুনর্বার আমি আদ্যপান্ত মনে মনে বিশ্লেষণ করি। এবং তখনই আমার মনে পড়ে বিনয়েন্দ্র নিহত হবার কিছুদিন পূর্বেই এই নীলকুঠিতে এক রহস্যময়ী নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং যে নারী অকস্মাৎ যেমন এখানে এসে একদিন উদয় হয়েছিল তেমনি অকস্মাৎই আবার একদিন দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করে। রামচরণের মুখেই আমি জানতে পারি যে, তার নাম লতা। বলাই বাহুল্য, আমার মন তখন সেই অন্তরালবর্তিনী লতার প্রতিই আকৃষ্ট হয়। এখন অবিশ্যি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, সুরন্দরলালের ছদ্মবেশের অন্তরালেই ছিল সেই লতা এবং সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারছি, ওই লতা বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরী উভয়েরই যথেষ্ট পরিচিত ছিল ; যেহেতু প্রথমতঃ ল্যাবরেটারী অ্যাসিস্টেণ্টরূপে সমস্ত প্রার্থীর মধ্যে লতাকেই যখন বিনয়েন্দ্র মনোনীত করেছিলেন তখন লতার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ হয়েছে ও সেই সঙ্গে প্রমাণ হয়েছে লতা তাঁর মনের অনেকখানিই অধিকার করেছিল। তার আরো প্রমাণ —লতা নামটি আমি বিনয়েন্দ্রর নোটবুকের বহু পাতাতেই পেয়েছি। এখন কথা হচ্ছে লতা, বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরী এই ট্রায়োর পরিচয় পরস্পরের সঙ্গে কতদিন ধরে। গোলমালটা অবিশ্যি গড়ে উঠেছে দুটি পুরুষ বন্ধুর মধ্যে ঐ মধ্যবর্তিনী নারীকেই কেন্দ্র করে। কিন্তু হত্যার কারণটা কি একমাত্র তাই, না আরো কিছু ? এই তথ্যটি অবিশ্যি এখন আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। তবে বিনয়েন্দ্র রামচরণকে হত্যা করা হয়েছিল কি ভাবে সেটা এখন আমি স্পষ্টই অনুমান করতে পারছি। এবং সেই অনুমানের পরেই আমার মনে হচ্ছে সে রাত্রে যখন বিনয়েন্দ্র তাঁর গবেষণাগারে নিজের কাজে ব্যস্ত তখন হয়তো লতা এসে দরজায় টোকা দেয়। দরজা খুলে লতাকে দেখতে পেয়ে অত রাত্রে নিশ্চয়ই প্রথমটায় বিনয়েন্দ্র বিস্মিত হন। এবং খুব সম্ভব লতার সঙ্গে যখন বিনয়েন্দ্র কথা বলছেন সেই সময় তাঁর অলক্ষ্যে এক ফাঁকে সেই ঘরে প্রবেশ করে পশ্চাৎ দিক হতে এসে অতর্কিতে কোন কিছু ভারী বস্তুর সাহায্যে পুরন্দর চৌধুরী বিনয়েন্দ্রকে তাঁর ঘাড়ে আঘাত করেন। যার ফলে বিনয়েন্দ্র পড়ে যান ও পড়ে যাবার সময় ধাক্কা লেগে বা কোন কারণে টেবিল থেকে আরও দু-একটা কাচের যন্ত্রপাতির সঙ্গে বোক

হয় ঘড়িটা মাটিতে ছিটকে পড়ে ভেঙে যায়। কিন্তু এর মধ্যেও আছে, ঐ ভাবে মাথায় বা ঘাড়ে অতর্কিতে একটা আঘাত হেনেই তো হতভাগ্য বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করা যেত। তবে কেন আবার ভয়ঙ্কর মৃত্যুগরল সর্পবিষ প্রয়োগ করা হল তার শরীরে? আর একাকী পুরন্দর চৌধুরীই তো তার বন্ধুকে হত্যা করতে পারত; তবে লতার সহযোগিতার প্রয়োজন হল কেন? মনে হয় আমার, প্রথমতঃ তার কারণ ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার রূপ দেবার জন্যই ঐ ভাবে পিছন থেকে অতর্কিতে বিনয়েন্দ্রকে আঘাত হেনে প্রথমে কাবু করা হয়েছিল এবং এমন ভাবে সেই ভারী বস্তুটি কাপড় মুড়ে নেওয়া হয়েছিল যাতে করে সেই ভারী বস্তুটির আঘাতটা তার কাজ করবে, কিন্তু চিহ্ন রাখবে না দেহে। দ্বিতীয়তঃ, আঘাত হেনে অজ্ঞান করে নিতে পারলে পরে বিষ প্রয়োগ করবার সুবিধা হবে। এবং লতার সহযোগিতার প্রয়োজনও হয়েছিল; আমার মনে হয়, এই জন্যই অন্যথায় অত রাত্রে বিনয়েন্দ্রর গবেষণা-ঘরে পুরন্দর চৌধুরীর প্রবেশ সম্ভবপর ছিল ছিল না একা একা। এবং কোনমতে পুরন্দর চৌধুরী একা প্রবেশ করলেও হঠাৎ অমন করে পশ্চাৎ দিক থেকে আঘাত করবার সুযোগ ও পেত না, যেটা সহজ হয়ে গিয়েছিল উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায়। এবং লতাকে প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে বিনয়েন্দ্রকে কথাবার্তার মধ্যে অন্যমনস্ক রেখে সেই ফাঁকে একসময় পশ্চাৎ দিক হতে গিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বিনয়েন্দ্রকে আঘাত করা পুরন্দর চৌধুরীর পক্ষে ঢের বেশী সহজসাধ্য ছিল। যা হোক, আমার অনুমান ঐ ভাবেই বিনয়েন্দ্রকে অজ্ঞান করে পরে সাক্ষাৎ মারণ-অস্ত্র ঐ বিশেষ অ্যাপারেটাসটির সাহায্যেই মুখের মধ্যে সর্প-বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়। ঐ বস্তুটি জোর করে মুখে প্রবেশ করাবার চিহ্নও ছিল ওষ্ঠে, যা থেকে মৃতদেহ পরীক্ষা করেই মনে আমার সন্দেহ জাগায়। এবং পরে সমগ্র ব্যাপারটাকে হত্যা নয়,—আত্মহত্যা এই রূপ দিয়ে হত্যাকারী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। তারপর পরে মৃতদেহের পাশে একটা বিকারে কিছু সর্প-বিষ রেখে দেয় আত্মহত্যার প্রমাণস্বরূপ।

কিন্তু কথা হচ্ছে ঐ ভাবে বিশেষ অ্যাপারেটাসের সাহায্যে দেহের মধ্যে বিষ-প্রয়োগ না করে সাধারণ ভাবেও তো গলায় বিষ ঢেলে কাজ শেষ করা যেতে পারত। তার জবাবে আমার মনে হয়, অজ্ঞান অবস্থায় বিষ গলায় ঢেলে দিলেও যদি তার খুব বেশী অংশ পেটের মধ্যে না যায় তো কাজ হবে না, অথচ অজ্ঞান অবস্থায় খুব বেশী বিষও ভিতরে প্রবেশ করানো কষ্টসাধ্য হবে। এবং সম্ভবতঃ সেইটাই ছিল কারণ। দ্বিতীয় কারণ, এমন অভিনব একটা পথ নেওয়া হয়েছিল

যাতে কারো কারো মনে কোনরূপ সন্দেহই না জাগে। এখন কথা হচ্ছে, বিশেষ করে সর্প-বিষই কেন হত্যাকারী বেছে নিয়েছিল বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করবার যন্ত্রস্বরূপ? তার উত্তরে বলব, বিনয়েন্দ্র সর্প-বিষের নেশায় অভ্যস্ত ছিল। যাতে তার দেহে বিষ পেলেও পুরন্দরের কাহিনী শুনে লোকে মনে করত, হয় বিনয়েন্দ্র আত্মহত্যা করেছে না হয় বেশী খেয়ে সর্প-বিষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আর যে বিষে সে অভ্যস্ত ছিল সে বিষ দিয়ে হত্যা করতে হয়েছিল বলেই বেশী পরিমাণ বিষের প্রয়োজন হয়েছিল।

কিন্তু যা বলছিলাম, পুরন্দর চৌধুরী ও লতা দুই বিজ্ঞানীর মিলিত হত্যা-প্রচেষ্টা অভিনব সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সকলের দৃষ্টির বাইরে ত্রিকালদর্শী একজন, যিনি সর্বদা দুটি চক্ষু মেলে সদা জাগ্রত, সদা সচেতন, যাঁর বিচার ও দণ্ড বড় সূক্ষ্ম, তাঁকে যে আজ পর্যন্ত কেউ এড়াতে পারেনি—মদগর্বী মানুষ তা ভুলে যায়। আজ পর্যন্ত কোন পাপ, কোন দুষ্কৃতিই যে চিরদিনের জন্য ঢাকা থাকে না আমরা তা বুঝতে চাই না বলেই না পদে পদে আমরা পর্যুদস্ত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হই।

॥ আটত্রিশ ॥

পুরন্দর চৌধুরী, লতা ও করালীকে রামানন্দ সেনই পুলিস-ভ্যানে করে নিয়ে গেলেন-যাবার সময়।

অভিশপ্ত নীলকুঠি!

সন্ধ্যার দিকে ঐ দিনই নীলকুঠির ঘরে ঘরে ও সদর দরজায় তালা পড়ে গেল।

রজত কলকাতায় চলে গেল।

আর সুজাতা গেল তার দূর-সম্পর্কীয় এক মাসীর বাড়িতে বরাহনগর। ছুটির এখনো দশটা দিন বাকি আছে, সুজাতা সে দশটা দিন মাসীর ওখানেই থাকবে স্থির করল।

দিন পাঁচেক বাদে বিকেলের দিকে প্রশান্ত বসাক কী একটা কাজে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন, ফেরবার পথে কি মনে করে সুজাতার মাসীর বাড়ির দরজায় এসে গাড়িটা থামালেন।

সুজাতা বাসাতেই ছিল. সংবাদ পেয়ে বাইরে এল।

আপনি!

হ্যাঁ, হঠাৎ এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম যাবার পথে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? সুজাতা বলে।

খালি একটা চেয়ারে বসতে বসতে প্রশান্ত বসাক বললেন, লক্ষ্ণৌ ফিরে যাচ্ছেন কবে?

আরও দিন দশেকের ছুটি নিয়েছি।

তাহলে এখন এখানেই থাকবেন বলুন?

তাই তো ভাবছি।

এবং শুধু ঐ দিনই নয় তার পরের সপ্তাহে আরও চার-পাঁচবার দুজনে দেখা হল।

হঠাৎ তার পর থেকে ঘন ঘন কাজ পড়ে যায় যেন ঐ দিকে প্রশান্ত বসাকের এবং ফেরবার পথেই দেখাটা করেন তিনি সুজাতার সঙ্গে। কারণ সুজাতার কথা তাঁর মনে পড়ে প্রত্যেক বারেই।

অবশ্য সেটা খুবই স্বাভাবিক।

সেদিন দ্বিপ্রহরে রামানন্দ সেনের সঙ্গে হেডকোয়ার্টারের নিজস্ব অফিসরুমে বসে প্রশান্ত বসাক নীলকুঠির হত্যাব্যাপার নিয়েই আবার আলোচনা করছিলেন।

পুরন্দর চৌধুরী বা লতা এখনও তাদের কোন জবানবন্দি দেয়নি।

তদন্ত চলছে, পুরোপুরি কেসটাও এখনও তৈরী করা যায়নি।

রামানন্দ সেন বলছিলেন, কিন্তু আপনি ওদের সন্দেহ করলেন কি করে ইন্সপেক্টার?

ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা নয়, হত্যা—নিষ্ঠুর হত্যা, সে আমি অকুস্থানে অর্থাৎ ল্যাবরেটারী ঘরে প্রবেশ করে, মৃতদেহটা পরীক্ষা করে ও অন্যান্য সব কিছু দেখেই বুঝেছিলাম মিঃ সেন, আর তাতেই সন্দেহটা আমার ওদের উপরে ঘনীভূত হয়।

কি রকম?

প্রথমতঃ মৃতদেহের position, সে সম্পর্কে পূর্বেই আমি আলোচনা করেছি আপনাদের সঙ্গে। দ্বিতীয়তঃ, মৃতদেহ ও তার ময়নাতদন্তের রিপোর্টও তাই প্রমাণ করেছে। তৃতীয়তঃ, বিনয়েন্দ্রর নিত্যব্যবহার্য অপহৃত রবারের চপ্পলজোড়া। সেটা কোথায় গেল? আপনাদের বলিনি সেটা রক্তমাখা অবস্থায় পাওয়া যায়

নীলকুঠির বাঁ পাশের পোড়ো বাড়ির মধ্যে। খুব সম্ভব অতর্কিতে ঘাড়ে আঘাত পেয়ে বিনয়েন্দ্র যখন মেঝেতে পড়ে যান তখন টেবিলের উপর থেকে ঘড়িটার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাচের অ্যাপারেটাস্‌ও মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়; যে ভাঙা কাচের টুকরোয় হত্যাকারী বা তার সঙ্গীর সম্ভবতঃ পা কেটে যায়। রক্ত পড়তে থাকে। তখন তারা ঘরের সিঙ্কের ট্যাপে পা ধোয় ও পরে ঐ চপ্পলজোড়া পায়ে দিয়েই হয়তো ঘর থেকে বের হয়ে যায় যাতে করে রক্তমাখা পায়ের ছাপ মেঝেতে না পড়ে। আপনি জানেন না মিঃ সেন, ওদের যেদিন অ্যারেস্ট করা হয় সেই দিনই হাজতে পুরন্দর চৌধুরী ও লতার পা পরীক্ষা করে দেখা যায় লতাদেবীর পায়েই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। এবং তারই পায়ের পাতায় ক্ষত ছিল। পা ধোবার পর উত্তেজনার মধ্যে ওরা ঘরের সিঙ্কের ট্যাপটা বন্ধ করে রেখে যেতে ভুলে যায়—যেটা খুব স্বাভাবিক, আর তাইতেই সেই ট্যাপটা আমরা খোলা অবস্থায় দেখি। নীলকুঠিতে ওদের প্রবেশে অত রাত্রে সাহায্য করেছিল করালী, এবং ওরা দুজনে যখন করালীর সাহায্যে নীলকুঠিতে প্রবেশ করে বা বের হয়ে যায় তখন হয়তো রামচরণের নজরে ওরা পড়েছিল বলেই তাকে প্রাণ দিতে হল পরে হত্যাকারীর হাতে। দ্বিতীয় রাত্রে আমার সঙ্গে যখন ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যে বসে এক কাল্পনিক কাহিনী বলে নিজেকে সন্দেহমুক্ত করবার জন্য ও নিজের alibi সৃষ্টির চেষ্টায় আমাকে বোকা বোঝাবার চেষ্টায় রত ছিল, সম্ভবতঃ পূর্বেই পুরন্দর রামচরণকে হত্যা করে কাজ শেষ করে এসেছিল। এবং কেমন করে সে রাত্রে সেটা সম্ভব হয়েছিল নীলকুঠির উপরের ও নীচের তলাকার নক্‌শা দেখলেই আপনি তা বুঝতে পারবেন। রাত্রে সকলের শয়নের কিছুক্ষণ পরেই পুরন্দর চৌধুরী ঘর থেকে বের হয়ে যান এবং বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে যান। করালীর সাহায্যে রামচরণকে হত্যা করে দোতলায় ওঠবার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে আবার। তারপর আমার দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করবার জন্য শব্দ করে ল্যাবরেটারী ঘরের দিকে যায়। কারণ সে জানত আমি সম্ভবতঃ জেগেই থাকব। এবং পূর্বেও ছায়াকুহেলীর দুঃস্বপ্ন গড়ে তোলবার জন্য ঐ সিঁড়ি দিয়েই সে উপরে উঠে যেত; কারণ অন্য সিঁড়ির দরজাটা রাত্রে বন্ধ থাকত। শেষ রাত্রে যেদিন করালীকে দেখে সুজাতা দেবী ভয় পেয়েছিলেন সে রাত্রেও ওই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়েই উপরে উঠে পালাবার সময়ও সেই পথেই পালায়। এবারে আসা যাক ওদের আমি সন্দেহ করলাম কি করে। পুরন্দর চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রমাণ, সেই চিঠি। যা বিনয়েন্দ্রর নামে রজতবাবু ও সুজাতা দেবীকে ও তার নামেও

লেখা হয়েছিল। চিঠিটা যে পুরন্দরেরই নিজের হাতে লেখা সেটা তার কৌশলে জবানবন্দির কাগজে নাম দস্তখত করে নেওয়ার ছলে সংগ্রহ করে দুটো লেখা মিলিয়ে দেখতেই ধরা পড়ে যায় আমার কাছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওভাবে risk সে নিতে গেল কেন? বোধ হয় তার মধ্যেও ছিল তার আত্ম-অহমিকা বা সুনিশ্চয়তা নিজের উপরে। দ্বিতীয় প্রমাণ, পুরন্দর চৌধুরীর জবানবন্দি, যা আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। খবর নিয়ে আমি জেনেছিলাম, গত পনেরদিন ধরেই পুরন্দর চৌধুরী কলকাতার এক হোটেলে ছিল। হোটেলটির নাম 'হোটেল স্যাভয়'। সেখানকার এক বয়ের মুখেই সংবাদটা আমি পাই। তৃতীয় প্রমাণ, লতাকে আমার লোক অনুসরণ করে জানতে পারে সেও হোটেল স্যাভয়ে উঠেছিল পুরন্দরের সঙ্গে পুরুষের বেশে, কিন্তু সে যে পুরুষ নয় নারী, সেও ঐ হোটেলের বয়ই অতর্কিতে একদিন জানতে পারে। তারপরে বাকিটা আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম ও কিরীটী আমার দৃষ্টিকে সজাগ করে দিয়েছিল।

হঠাৎ ঐ সময় টেবিলের উপরে টেলিফোনটা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং শব্দে।

রিসিভারটা তুলে নিলেন বসাক, হ্যালো—

আপনাকে একবার আসতে হবে স্যার।

কেন, ব্যাপার কী?

লতা দেবী সুইসাইড করবার চেষ্টা করছিলেন।

বল কি হে!

হ্যাঁ, এখনও অবস্থা খারাপ। তিনি আপনাকে যেন কি বলতে চান।

॥ ঊনচল্লিশ ॥

আর দেরি করলেন না প্রশান্ত বসাক। পুলিস হাসপাতালে ছুটলেন। একটা কেবিনের মধ্যে লতা দেবী শুয়েছিলেন। জানা গেল, গোটা দুই সিঙ্গাপুরী মুক্তা তাঁর কাছে ছিল; সেই খেয়েই তিনি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছেন। অবস্থা ভাল নয়।

মিঃ বসাককে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মৃদু কণ্ঠে লতা দেবী বললেন, মিঃ বসাক!

কাছে এসে বসলেন মিঃ বসাক।

আমি কিছু আপনাকে বলতে চাই। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। তবে জানবেন শেষ মুহূর্তে মিথ্যা কথা বলছি না।

বলুন।

মিঃ বসাকের চোখের ইঙ্গিতে রামানন্দ সেন আগেই কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলেন।

লতা দেবীর শেষ জবানবন্দি রামানন্দ সেন লিখে নিতে লাগলেন।

এবং বলাই বাহুল্য বাঁচানো গেল না লতাকে।

পরের দিন ভোরের দিকেই তাঁর মৃত্যু হল বিষের ক্রিয়ায়। এবং মৃত্যুর পূর্বে যে কাহিনী তিনি বিবৃত করে গেলেন, সেটা না জানতে পারলে নীলকুঠির হত্যা-রহস্যের যবনিকা তুলতে আরও কতদিন যে লাগত কে জানে!

শুধু তাই নয়, কখনও যেত কিনা তাই বা কে বলতে পারে।

মৃত্যুপথযাত্রিণী লতা সংক্ষেপে এক মর্মান্তিক কাহিনী বলে গেল তাঁর শেষ সময়ে। দুটি পুরুষের প্রবল প্রেমের আকর্ষণের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত কাউকে সে পেলে না, কাউকেই সুখী করতে পারল তো নাই, উপরন্তু তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করল সে হত্যাকারীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং অন্যজনকেও বিদায় দিতে হল মর্মান্তিক এক পরিস্থিতির মধ্যে। এবং সবচাইতে করুণ হচ্ছে দুজনকেই সে ভালবেসেছিল; তবে একজনের ভালবাসা সম্পর্কে সে সর্বদা সচেতন থাকলেও অন্যজনকেও যে ভালবাসত এবং ঘটনাচক্রে তারই মৃত্যুর কারণ হয়েছিল—শেষ মুহূর্তে সেটা সে বুঝতে পারল ব্যথা ও অনুশোচনার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গিয়েছে।

আরও পাঁচদিন পর—

বিনয়েন্দ্র ও রামচরণের হত্যা-রহস্যের যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রশান্ত বসাক পুলিসের কর্তৃপক্ষকে দাখিল করেছিলেন, সেটা একটি কল্পিত উপন্যাসের কাহিনীর চেয়ে কম বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ নয়। একটি নারীকে ঘিরে দুটি পুরুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আজন্মপোষিত হিংসা যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে এবং হাসিমুখে বন্ধুত্বের ভান করে কী ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর দুই বন্ধু একের প্রতি অন্যে সেই প্রতিহিংসার গরল বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চয় করে তুলতে পারে ও শুধুমাত্র সময় ও

সুযোগে সেই প্রতিহিংসার গরল-মাখানো বাঁকানো নখরে চরম আঘাত হান জন্য লতার স্বেচ্ছাকৃত জবানবন্দি না পেলে হয়তো সম্যক বোঝাই যেত কোনদিন। এবং বিনয়েন্দ্র ও রামচরণের হত্যা-রহস্যের উপরেও কোনদিন আলোকসম্পাত হত কিনা তাই বা কে বলতে পারে।

॥ চল্লিশ ॥

বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরীর পরস্পরের আলাপ হয় কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে।

দুজনেই ছিল প্রখর তীক্ষ্ণধী ছাত্র। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে যখন তারা উঠল, তারই মাসখানেক বাদে পাঞ্জাব থেকে লতা সিং পড়তে এল কলকাতায়।

লতার বাপ ছিল পাঞ্জাবী আর মা ছিল লুধিয়ানা-প্রবাসী এক বাঙালীর মেয়ে। লতা তার জন্ম-স্বত্ব হিসাবে পাঞ্জাবী পিতার দেহসৌষ্ঠব ও বাঙালী মায়ের রূপ-মাধুর্য পেয়েছিল।

লুধিয়ানার কলেজেই পড়তে পড়তে হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় লতার মা লতাকে নিয়ে তাঁর পিতার কাছে কলকাতায় চলে আসেন; কারণ লতার মাতামহ তখন দীর্ঘকাল পরে আবার তাঁর নিজের মাতামহর বাড়ি ও সম্পত্তি পেয়ে, কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেছেন।

লতা, পুরন্দর ও বিনয়েন্দ্র যে কলেজে পড়তেন সেই কলেজেই সেই শ্রেণীতে এসে ভর্তি হল।

বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরীর সহপাঠিনী লতা। এবং ক্রমে লতার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় বিনয়েন্দ্র ও পুরন্দর চৌধুরীর। দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়েই ভালবাসলেন লতা সিংকে। আর সেই হল যত গোলযোগের সূত্রপাত। কিন্তু পরস্পরের ব্যবহারে বা কথাবার্তায় কেউ কারও কাছে সে-কথা স্বীকার করলে না বা প্রকাশ পেল না। ইতিমধ্যে নানা দুর্বিপাকে পড়ে পুরন্দর চৌধুরীকে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা শুরু করতে হল।

পুরন্দর চৌধুরী ও বিনয়েন্দ্র দুজনেই লতাকে ভালবাসলেও লতার কিন্তু মনে মনে দুর্বলতা ছিল পুরন্দর চৌধুরীর উপরেই একটু বেশী। সে কথাটা জানতে বা বুঝতে পেরেই হয়তো বিনয়েন্দ্র সরে দাঁড়িয়েছিলেন পুরন্দর চৌধুরীর

থেকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সরে দাঁড়ালেও প্রেমের ব্যাপারে এত বড় বিনয়েন্দ্র কোন দিনই ভুলতে তো পারেনইনি, এমন কি লতাকেও বোধ হয় ভুলতে পারেননি। এবং সেই কারণেই পুরন্দরকে ক্ষমা করতে পারেননি। চিরদিন মনে মনে পুরন্দর চৌধুরীর প্রতি একটা ঘৃণা পোষণ করে এসেছেন।

যা হোক, পুরন্দর পড়াশুনা ছেড়ে দিলেন এবং বিনয়েন্দ্র ও লতা যথাসময়ে পাস করে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগে নাম লেখালেন। সেখানে থেকে পাস করে বিনয়েন্দ্র নিলেন অধ্যাপনার কাজ, আর লতা বাংলার বাইরে একটা কেমিক্যাল ফার্মে চাকরি নিয়ে চলে গেল।

পুরন্দর চলে গেলেন সিঙ্গাপুরে। সেখানে গিয়ে লিং সিংয়ের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। পুরন্দর বর্ণিত সিঙ্গাপুর-কাহিনী প্রায় সবটাই সত্য কেবল সত্য নয় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের আকস্মিক সর্পদংশনে মৃত্যুর কথাটা। তাদের তিনি নিজ হাতে বিষ দিয়ে হত্যা করে সেই বাড়িতেই কবর দিয়েছিলেন। এবং পরে অবিশ্যি ওই সংবাদ তারযোগে সিঙ্গাপুর স্পেশাল পুলিসই মাত্র কয়েকদিন আগে আমাকে জানায়। সেই নৃশংস হত্যার পর থেকে পুরন্দর অন্য নামে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছিল এতকাল।

তাই বলছিলাম পুরন্দর চৌধুরী শুধু নৃশংসই নয়, মহাপাষণ্ড।

এদিকে বিনয়েন্দ্র অনাদি চক্রবর্তীর বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে নতুন করে আবার জীবন শুরু করলেন। এবং ক্রমে পুরন্দর ও বিনয়েন্দ্রর পরস্পরের প্রতি পোষিত যে হিংসাটা দীর্ঘদিনের অদর্শনে বোধ হয় একটু ঝিমিয়ে এসেছিল, সেটা ঠিক সেই সময়েই অকস্মাৎ একদিন জ্বলে উঠল পুরন্দর কলকাতায় এসে বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে দেখা করায় এবং সেখানে লতাকে দেখে নতুন করে আবার সেটা জেগে উঠল দীর্ঘকাল পরে। যার ফলে যাবার পূর্বে পুরন্দর বিনয়েন্দ্রকে সিঙ্গাপুরী মুক্তার নেশার হাতেখড়ি দিয়ে গেলেন।

সিঙ্গাপুরী মুক্তার নেশা ধরানোর ব্যাপারটা পূর্বাহ্ণেই অবিশ্যি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য পুরন্দর চৌধুরী মিঃ বসাকের নিকট তাঁর বিবৃতিকালে স্বীকার করেছিলেন।

ঐ সময় লতার সঙ্গেও নিশ্চয়ই পুরন্দরের কোন কথাবার্তা হয়েছিল, যাতে করে ঐ সিঙ্গাপুরী মুক্তার নেশায় কবলিত করে তাকে দীর্ঘ দিন ধরে দোহন করে বিনয়েন্দ্রকে একেবারে ফাঁকরা করে ফেলা ও লতাকে পাওয়া। এক ঢিলে দুই পাখী বধ করা।

বলাই বাহুল্য, ইতিপূর্বে একসময় লতার চাকরি গিয়ে সে বেকার হয়ে পড়ে আর ঠিক সেই সময় দৈবক্রমেই যেন একজন ল্যাবরেটারী অ্যাসিস্টেন্টের প্রয়োজন হওয়ায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় বিনয়েন্দ্র। সেই বিজ্ঞাপন দেখে লতা আবেদন পাঠায়। আবেদনকারীদের মধ্যে হঠাৎ লতার আবেদনপত্র দেখে প্রথমটায় বিনয়েন্দ্রর কি রকম সন্দেহ হয়। তিনি লতাকে একটা চিঠি দেন দেখা করবার জন্য। লতা পত্রের জবাব দেয়, এবারে আর লতাকে চিনতে বিনয়েন্দ্রর কষ্ট হয় না। আবার লতাকে তিনি চিঠি দেন সাক্ষাতের জন্য। লতা সাক্ষাৎ করতে এল এবং বলাই বাহুল্য দীর্ঘদিন পরে লতার প্রতি যে সুপ্ত প্রেম এতকাল বিনয়েন্দ্রর অবচেতন মনে ধিকি ধিকি জ্বলছিল তা লেলিহ হয়ে উঠল দ্বিগুণ তেজে। লতা কাজে বহাল হল। লতা অবিশ্যি তখনও অবিবাহিতা।

লতাকে বিনয়েন্দ্রর নীলকুঠিতে আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করবার পরই পুরন্দরের মনে লতাকে ঘিরে আবার বসনার আগুন দ্বিগুণ ভাবে জ্বলে ওঠে। তাছাড়া বেলাকে বিবাহ করলেও তার প্রতি কোন দিনই সত্যিকারের ভালবাসা জন্মায়নি তার। এবং লতাকে দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই লতার প্রতি তার পুরাতন দিনের আকর্ষণ আবার নতুন করে জেগে উঠল। বেলাকে ও তার পুত্রকে হত্যা করে লতাকে বিবাহ করবার পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল পুরন্দর। বেলার মৃতদেহ কোনদিন দৈবক্রমে যদি আবিষ্কৃত হয় তখন যাতে সহজেই হত্যার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে, ওই কাল্পনিক কাহিনী পূর্বাহ্ণেই বলবার অন্যতম আর একটি কারণ ছিল বোধ হয় তাই আমার কাছে।

পরে সিঙ্গাপুরে ফিরে গিয়ে বেলাকে হত্যা করে সেই যে পুরন্দর আবার কলকাতায় এল আর ফিরে গেল না সেখানে। নীলকুঠির পাশের সেই ভাঙা বাড়িতে গোপনে আশ্রয় নিল ও; প্রতি রাত্রে উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল। এবং সেই সঙ্গে চলতে লাগল বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করবার পরিকল্পনা। সেই ভাঙা বাড়িতে তাদের গতিবিধির উপর যাতে কারও নজর না পড়ে সেজন্য দ্বিতীয় একজনকে সেখানে নিয়ে আসা হল মিশিরজীর পরিচয়ে। অর্থাৎ এবারে পাকাপোক্ত ভাবেই শুরু হল ওদের অভিযান। শুধু যে পুরন্দর চৌধুরীই দুঃসাহসী ছিল তাই নয়, লতাও ছিল। পাঞ্জাবী বাপের রক্ত ছিল তার শরীরে, তাই তার পক্ষে সে রাত্রে কার্নিশ বেয়ে পুরন্দরের পিছু পিছু সুজাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করাটা এমন কষ্টসাধ্য হয়নি কিছু। সে যাক, যা বলছিলাম।

॥ একচল্লিশ ॥

সে যাক, যা বলছিলাম, প্রশান্ত বসাক বলতে লাগলেন: পূর্ব পরিকল্পনা মতই সব ঠিক হয়ে গেলে ড্রাইভার করালীকে ওখানে প্রহরায় রেখে লতা অকস্মাৎ একদিন অন্তর্হিতা হল। এবং নীলকুঠি থেকে অন্তর্হিতা হয়ে সে প্রবেশ করল গিয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে।

হত্যার দিন রাত্রে করালীর সাহায্যে সদর খুলিয়ে লতা এল বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে। সবে হয়তো তখন বিনয়েন্দ্র সিঙ্গাপুরী মুক্তার নেশায় রঙিন হয়ে উঠছে। লতা এসেই দরজায় নক্ করে এবং বিনয়েন্দ্র অকস্মাৎ ঐ রাত্রে গবেষণা-ঘরের দরজা খুলে লতাকে সামনে দেখে বিহ্বল হয়ে যান। আনন্দিতও যে হয়েছিলেন সেটা বলাই বাহুল্য। এবং তারপর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। পরে একসময় বিনয়েন্দ্রর অজ্ঞাতে পুরন্দর ল্যাবরেটারী ঘরে প্রবেশ করে। লতার সঙ্গে গল্পে মশগুল বিনয়েন্দ্র, এমন সময় পশ্চাৎ দিক থেকে পুরন্দর এসে বিনয়েন্দ্রর ঘাড়ে আঘাত করে। বিনয়েন্দ্র অতর্কিত আঘাতে টুল থেকে পড়ে যান মাটিতে এবং পড়বার সময় তাঁর হাতে লেগে টেবিলের উপর থেকে ঘড়িটা ও দু-একটা কাচের যন্ত্রপাতিও সম্ভবত মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। একটা কাচের পাত্রে খানিকটা অ্যাসিড ছিল, সেটা মেঝেতে পড়ে যায়। ঘাড়ে আঘাত করে বিনয়েন্দ্রকে অজ্ঞান করে পুরন্দর বিচিত্র ওই স্প্রেয়িং অ্যাপারেটাস্‌টার সাহায্যে বিনয়েন্দ্রর গলার মধ্যে আরো সর্পবিষ ঢেলে দেয়। তারপর ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার রূপ দেবার জন্য মেঝের ভাঙা কাচের টুকরো ও অ্যাসিড সরিয়ে ও মুছে নিতে গিয়ে অতর্কিতে লতার পা কেটে যায়। তখন সে রক্ত ধুয়ে ফেলতে ও ঘরের মেঝের সব চিহ্ন মুছে নিতে ঘরের ওয়াসিং সিঙ্কের ট্যাপ খুলে ন্যাকড়া বা রুমাল জলে ভিজিয়ে সব ধুয়ে মুছে ফেলে। কিন্তু মেঝে থেকে অ্যাসিডের দাগ একেবারে যায় না এবং চলে যাবার সময় পুরন্দর ট্যাপটা বন্ধ করে রেখে যেতে ভুলে যায়। কাচের ভাঙা টুকরোয় পা কেটে যাওয়ায় লতা বিনয়েন্দ্রর রবারের চপ্পল-জোড়া পায়ে দিয়ে নিয়েছিল, কারণ সে এসেছিল খালি পায়ে। যে চপ্পল আমি পাশের বাড়ির মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। শুধুমাত্র বিনয়েন্দ্রর হত্যাব্যাপারটাকে আত্মহত্যার রূপই যে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছিল তা নয়, ঐ হত্যাপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভৌতিক ব্যাপারও গড়ে তোলা হয়েছিল মধ্যে মধ্যে কিছুদিন পূর্ব

হতেই করালীর প্রচেষ্টায়, বলা বাহুল্য আমার একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে। বিনয়েন্দ্রর মৃতদেহের পাশে গ্লাস-বিকারের মধ্যে যে তরল পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যেও পরীক্ষা করে সর্প-বিষই পাওয়া যায়। তাতে করে অবিশ্যি বিনয়েন্দ্রর দেহে সর্প-বিষ পাওয়ার ব্যাপারটা যে আদৌ আত্মহত্যা নয় এবং হত্যাই সেটা আমার আরও দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস হয়। কারণ, বিনয়েন্দ্র যে সর্প-বিষ নিয়ে গবেষণা করছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই তার বিকারে সর্প-বিষ পাওয়া ও মৃত্যুর কারণ সর্প-বিষ হওয়ার সন্দেহটা বৃদ্ধিই করেছিল। এই গেল বিনয়েন্দ্রর হত্যার ব্যাপার। দ্বিতীয়, রামচরণকেও হত্যা করে পুরন্দর চৌধুরীই পররাত্রে। এবং হত্যা করবার পর সে ল্যাবরেটারীতে যায় নিজের একটা alibi তৈরী করবার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। সে ভাল ভাবেই জানত যে, রাত্রে আমি সজাগ থাকব ও সহজেই সে আমার দৃষ্টিতে পড়বে এবং তখন তার সেই কাহিনী বলে আমাকে সে তার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখবে পূর্বেই বলেছি সে-কথা। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে কিরীটীর সঙ্গে আলোচনার পর তার উপরেই আমার সন্দেহটা জাগতে পারে এবং আমি সেই ভাবেই পরে তদন্ত চালাতে পারি। কিরীটীই পুরন্দরের উপরে আমার মনে প্রথমে সন্দেহ জাগ্রত করে ও চিঠিগুলোর উপরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। পরে অবিশ্যি আলাদা আলাদা কাগজে জবানবন্দি লিখে তার উপরে প্রত্যেকের নাম দস্তখত করতে আমি সকলকে বাধ্য করি। এবং প্রত্যেকের আলাদা হাতের লেখা ও তার সঙ্গে সুজাতা, রজত ও পুরন্দর চৌধুরীর কাছে প্রাপ্ত বিনয়েন্দ্রর নামে লেখা চিঠির লেখা মেলাতেই দেখা গেল, একমাত্র পুরন্দর চৌধুরীর হাতের লেখার সঙ্গেই বেশ যেন কিছুটা মিল আছে। পরে অবিশ্যি হাতের লেখার বিশেষজ্ঞও সেই মতই দিয়েছেন। যা হোক, তারপর পুরন্দর চৌধুরীর প্রতিই সন্দেহটা আরও যেন আমার ঘনীভূত হয়। এবং এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন, ঐ তিনখানা চিঠি যে আদৌ বিনয়েন্দ্রর লেখা নয় সেটার প্রমাণ পূর্বেই আমি পেয়েছিলাম বিনয়েন্দ্রর ল্যাবরেটারী ঘরের মধ্যে ড্রয়ারে প্রাপ্ত তার নোট-বইয়ের মধ্যেকার বাংলা লেখা দেখে এবং সেই লেখার সঙ্গে চিঠির লেখা মেলাতেই। বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করা হয়েছিল। এবং তাঁর হত্যার সংবাদও তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিশন হিসাবে রজত ও সুজাতা পেতই একদিন না একদিন। তবে তাদের ওভাবে অত তাড়াতাড়ি হত্যা-মঞ্চে টেনে আনা হল কেন বিনয়েন্দ্রর নামে চিঠি দিয়ে? তারও কারণ ছিল বৈকি।

এবং সেটা বুঝতে হলে আমাদের আসতে হবে পুরন্দর চৌধুরীর সত্যিকারের পরিচয়ে। কে ওই পুরন্দর চৌধুরী।

আমরা জানি অনাদি চক্রবর্তী তাঁর পিতার একমাত্র সন্তানই ছিলেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁর একটি ভগ্নীও ছিল। নাম প্রেমলতা।

প্রেমলতার তের বছর বয়সের সময় বিবাহ হয় এবং ষোল বৎসর বয়সে সে যখন বিধবা হয়ে ফিরে এল পিতৃগৃহে তখন তার কোলে একমাত্র শিশুপুত্র, বয়স তার মাত্র দুই। প্রেমলতা অনাদি চক্রবর্তী থেকে আঠারো বছরের ছোট ছিল। মধ্যে আরও দুটি সন্তান অনাদির মার হয়, কিন্তু তারা আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। প্রেমলতা বিনয়েন্দ্রর মার থেকে বয়সে বছর চারেকের বড় ছিল। বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসবার বছরখানেকের মধ্যে সহসা এক রাত্রে প্রেমলতা তার শিশুপুত্রসহ গৃহত্যাগিনী হয়। এবং কুলত্যাগ করে যাওয়ার জন্যই অনাদি চক্রবর্তী তার নামটা পর্যন্ত চক্রবর্তী বংশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলেন। কিন্তু জোর করে মুছে ফেললেই আর সব-কিছু মুছে ফেলা যায় না।

যা হোক, গৃহত্যাগিনী প্রেমলতার পরবর্তী ইতিহাস খুঁজে না পাওয়া গেলেও তার শিশুপুত্রটির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এক অনাথ আশ্রমে সেই শিশু মানুষ হল বটে, তবে কুলত্যাগিনী মায়ের পাপ যে তার রক্তে ছিল! সেই পাপের টানেই সেই শিশু যতই বড় হতে লাগল তার মাথার মধ্যে শয়তানি বুদ্ধিটাও তত পরিপক্ক হতে লাগল।

সেই শিশুকেই পরবর্তী কালে আমরা দেখছি পুরন্দর চৌধুরী রূপে। পুরন্দর চৌধুরী তাঁর যে জীবনের ইতিবৃত্ত দিয়েছিল তা সর্বৈব মিথ্যা, কাল্পনিক।

নিজের সত্যিকারের পরিচয়টা পুরন্দর চৌধুরী জানিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনদিন সাহস করে গিয়ে তার মামা অনাদি চক্রবর্তীর সামনে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ, সে জানত অনাদি চক্রবর্তী কোনদিনই তাকে ক্ষমার চক্ষে তো দেখবেনই না, এমন কি সামনে গেলে দূর করেই হয়তো তাড়িয়ে দেবেন।

তাই কলেজে অধ্যয়নকালে সহপাঠী বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয় তখন থেকেই বিনয়েন্দ্রর প্রতি একটা হিংসা পোষণ করতে শুরু করে পুরন্দর এবং সে হিংসায় নতুন করে ইন্ধন পড়ে লতা সিংয়ের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

পুরন্দর চৌধুরী অনাদি চক্রবর্তীর সঙ্গে বিনয়েন্দ্রর কোন সম্পর্ক নেই জেনে প্রথমে যেটুকু নিশ্চিন্ত হয়েছিল, পরে অনাদি চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর যখন সে জানতে পারল বিনয়েন্দ্রকেই অনাদি তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন তখন থেকেই সে

নিশ্চিন্ত ভাবটা তো গেলই, ঐ সঙ্গে বিনয়েন্দ্রর প্রতি আক্রোশটা আবার নতুন করে দ্বিগুণ হয়ে জেগে ওঠে। এবং প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই মনে মনে বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করতে থাকে পুরন্দর। কিন্তু ঐ সময় কিছুদিনের জন্য ভাগ্যচক্রে তাকে সিঙ্গাপুরে ভাগ্যান্বেষণে যেতে হওয়ায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে থাকে মাত্র। তবে ভোলেনি সে কথাটা। বিনয়েন্দ্রকে কোনমতে পৃথিবী থেকে সরাতে পারলে সে-ই হবে অনাদি চক্রবর্তীর সম্পত্তির অন্যতম ওয়ারিশন তাও সে ভুলতে পারেনি কোনদিন। আর তাই সে কিছুতেই নীলকুঠির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি। নীলকুঠিতে পুরন্দর ছায়াকুহেলীর সৃষ্টি করে। তার ইচ্ছা ছিল, ঐ ভাবে একটা ভৌতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে পরে কোন এক সময় সুযোগ মত বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করবে। সেই মতলবেই ধীরে ধীরে পুরন্দর তার পরিকল্পনামত এগুচ্ছিল।

এদিকে একদা যৌবনের বাঞ্ছিতা লতাকে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে হঠাৎ আবার নতুন করে কাছে পেয়ে বিনয়েন্দ্র পাগল হয়ে উঠল। এবং অন্যদিকে আকস্মিক ভাবে আবার একদিন রাত্রে বহুকাল পরে পুরন্দরকে দেখে লতা বুঝতে পারল যৌবনের সে-ভালবাসাকে আজও সে ভুলতে পারেনি। এবং সেই ভালবাসার টানেই পুরন্দরের পরামর্শে তার দুষ্কৃতির সঙ্গে হাতে হাত মেলাল লতা।

পরে অবিশ্যি ধরা পড়ে, মুক্তির আর কোন উপায়ই নেই দেখে অনন্যোপায় লতা আত্মহত্যা করে তার ভুলের ও সেই সঙ্গে প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত করল।

কিন্তু বলছিলাম পুরন্দর চৌধুরীর কথা। কেন সে সুজাতা ও রজতকে বিনয়েন্দ্রর নামে চিঠি দিয়ে অত তাড়াতাড়ি নীলকুঠিতে ডেকে এনেছিল?

কারণ, বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করলেই সে সমস্ত সম্পত্তি পাবে না। রজত ও সুজাতা হবে তার অংশীদার। কিন্তু তাদের সরাতে পারলে তার পথ হবে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক। তাই সে ওদের হাতের সামনে ডেকে এনেছিল সুযোগ ও সুবিধামত হত্যা করবার জন্যই।

বিনয়েন্দ্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে সে তার সম্পত্তি লাভের প্রথম সোপান তৈরী করেছিল; এখন রজত ও সুজাতাকে হত্যা করতে পারলেই সব ঝামেলাই মিটে যায়। নিরঙ্কুশ ভাবে সে ও লতা বিনয়েন্দ্রর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই নিরপরাধিনী স্ত্রী ও তার শিশুপুত্রকে ও বিনয়েন্দ্রকে হত্যা করে যে পাপের বোঝা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তারই অমোঘ দণ্ড যে মাথার উপরে

কে আসবে ভেবে, পুরন্দর চৌধুরী বোধ হয় স্বপ্নেও তা ভাবেনি।

সাজানো ঘুঁটি যে কেঁচে যেতে পারে শেষ মুহূর্তেও তা বোধ হয় ধারণাও করে- পুরন্দর। এমনিই হয়। এবং একেই বলে ভগবানের মার। যাঁর সূক্ষ্ম বিচারে দান ত্রুটি, কোন ভুল থাকে না। যাঁর নির্মম দণ্ড বজ্রের মতই অকস্মাৎ অপরাধী পীর মাথার উপরে নেমে আসে।

নইলে তাঁরই দেওয়া সিঙ্গাপুরী মুক্তা-বিষ খেয়ে লতাকেই বা শেষ মুহূর্তে মহত্যা করে তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কেন? আর হতভাগ্য ন্দর চৌধুরীকেই বা অন্ধকার কারাকক্ষের মধ্যে ফাঁসির প্রতীক্ষায় দণ্ড পল র দিন গণনা করতে হবে কেন?

॥ বিয়াল্লিশ ॥

...র শেষ এইখানেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হল না। রঞ্জতকে জের সম্পত্তির দাবি লিখে দিয়ে পরের দিন যখন সুজাতা আবার লক্ষ্ণৌ ফিরে বার জন্য ট্রেনে উঠে বসেছে এবং কামরার খোলা জানলাপথে তাকিয়ে ছিল, মন সময় পরিচিতি একটি কণ্ঠস্বরে চমকে সুজাতা ফিরে তাকাল।

সুজাতা!

তুমি এলেছ!

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে এলাম।

কী?

এখন যাচ্ছ যাও, এক মাসের মধ্যেই আমিও ছুটি নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

তোমাকে নিয়ে আসতে।

ঢং ঢং করে ট্রেন ছাড়বার শেষ ঘণ্টা পড়ল।

গার্ডের হুইসেল শোনা গেল।

কি, তুমি যে কিছু বলছ না? প্রশান্ত প্রশ্ন করে।

কী বলব ?

কেন, বলবার কিছু নেই ?

ট্রেনটা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে তখন। সুজাতার চোখের [illegible] অকারণেই ছলছল করে আসে। সে কেবল মৃদু কণ্ঠে বলে, না।